# আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রঃ) : ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ


**তত্ত্বাবধায়ক**

**ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ**

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**গবেষক**

**মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন**

রেজি. নং- ১৪১

শিক্ষা বর্ষ: ২০১২-১৩

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।



**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ**

**অক্টোবর ২০১৭ খ্রি.**

# প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত **"আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রঃ) : ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে রচিত হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইত:পূর্বে এই শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে এটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য অনুমোদন করছি।

**(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)**
**অধ্যাপক**
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
rashidnumani@yahoo.com

# ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রঃ) : ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে এ শিরোনামে ইত:পূর্বে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। সেই সাথে আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমার এ অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোথাও প্রকাশ বা কোন প্রকার ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করিনি।

(মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি. নং- ১৪১
শিক্ষা বর্ষ : ২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ্ তা'আলা'র দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও হাম্‌দ পেশ করছি, যিনি আমাকে **"আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রঃ) : ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান"** শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ রচনার তাওফীক দান করেছেন। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের পবিত্র দরবারে, যার উসিলায় মহান আল্লাহ্ আঠার হাজার মাখলূক সৃষ্টি করেছেন।

অত:পর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের প্রতি, যিনি সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। যিনি গবেষণা কর্মটির উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ, তথ্য ও তত্ত্বগত শুদ্ধিকরণ, ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা ও সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে এ অভিসন্দর্ভের মান বৃদ্ধিকরণে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। এ জন্য তাঁর নিকট আমি চিরঋণী ও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অপরিমেয় অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

**"আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রঃ) : ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান"** শিরোনামে গবেষণা কর্মের জন্য আমি এম.ফিল প্রোগ্রামে যোগদান করে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক মরহুম প্রফেসর ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দীন স্যারের দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতায় এম.ফিল থেকে স্থানান্তর হয়ে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে যোগদান করি। পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে যোগ দেয়ার কিছুদিনের মধ্যেই শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক মরহুম ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দীন স্যার ইন্তিকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন)। (আল্লাহ্ পাক তাঁকে জান্নাতবাসী করুন; জান্নাতের আ'লা মকাম দান করুন।) এ অবস্থায় আমার গবেষণার কার্যক্রম যখন স্তব্ধ, সেই মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ইসলামী সাহিত্য জগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র, আশিকে রাসূল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও সুনিপুন গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যার। তিনি আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধান করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসা না হলে আমার গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হত না। বিনয়ের সাথে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. আব্দুল অদুদকে, গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যার কাছে আমি বার বার শরণাপন্ন হয়েছি। তিনি কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেননি, বরং সহযোগিতার পাশাপাশি অগ্রগতির খোঁজখবর নিয়েছেন। আরো স্মরণ করি ড. মাওলানা মোহাম্মদ নাছির উদ্দীনকে যিনি তথ্য-উপাত্ত ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণা কাজে সহযোগিতা করেছেন।

আমার দীর্ঘকাল গবেষণা কর্মে যারা তথ্য-উপাত্ত, পরামর্শ ও আন্তরিক দু'আ জানিয়ে প্রতিনিয়ত প্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-কাদেরী (রহ.), শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ওবাইদুল হক না'ঈমী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ সগীর উসমানী, মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, মুফতী কাযী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফিয মুহাম্মদ সোলায়মান আনসারী, মুফাসসির মাওলানা কাযী মুহাম্মদ ছালেকুর রহমান আল-কাদেরী, হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী, লেখক গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, অধ্যক্ষ মাওলানা কাযী মুহাম্মদ আব্দুল আলিম রিযভী, মাওলানা মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, উপাধ্যক্ষ মুফতী আবুল কাসেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল খালেক শওক্বী, মাওলানা মুহাম্মদ মুরশেদুল হক প্রমুখ অন্যতম।

আরো স্মরণ করছি ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোহাম্মদ শাহ্ আলম, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়্যদ কুদরত উল্লাহ, মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন আজম, রশিদ আহমদ কাজল, সাংবাদিক মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, মুহাম্মদ আখতার হোসাইন, মুহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন, মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, মুহাম্মদ খলীল উল্লাহ, স্নেহের মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মুহাম্মদ ইয়াছিনকে, যারা আমার গবেষণা কর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

গবেষণা কর্মে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, জয়েন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, মহাসচিব শাহ্জাদ ইব্‌ন দিদার, যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার আমার গবেষণা কর্মে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁদের প্রতি কতৃজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কতৃজ্ঞতা জানাচ্ছি সৈয়্যদ মিনহাজ উদ্দীনের প্রতি, যিনি কম্পোজের কাজে সময় দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

আমি আমার অভিসন্দর্ভে বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে সহযোগিতা নিয়েছি। যেমন- মদীনা মুনাওয়ারার মাক্তাবা আল-মাসজিদ আন-নববী ও ইসলামিক ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, ভারতের জামেয়া মানযারুল ইসলাম লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগীয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা লাইব্রেরি, ঢাকা কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্রাসা লাইব্রেরি ইত্যাদি। এ সকল লাইব্রেরির কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা আমাকে গবেষণা কর্মের জন্য সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি আমার এ গবেষণার সফলতার জন্য আমার আব্বা ও আম্মা সর্বদা দু'আ করেছেন। আমার গবেষণা কর্মকে বেগবান করার জন্য নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার সহধর্মিণী আরিফা বিল্লাহ্। দু'আ করছি আমার স্নেহের হোসাইন মোহাম্মদ জাওয়াদ ও আয়মান জুআইরিয়াকে, যারা গবেষণা চলাকালীন সময়ে কোন কিছুর আবদার করে আমার কাজে কখনো ব্যাঘাত ঘটায়নি।

আমি প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন!

**মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন**
**গবেষক**

## সংকেত পরিচয়

| | |
|---|---|
| ১. আল কুরআন, ১ : ২ | : প্রথম সংখ্যাটি সূরা এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি আয়াতের নির্দেশক। |
| ২. (সা.) | : সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম |
| ৩. (আ.) | : আলায়হিস্ সালাম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) |
| ৪. (রা.) | : রাদ্বিআল্লাহু আনহু (মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) |
| ৫. (রহ.) | : রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (তাঁর উপর আল্লাহ্র করুণা বর্ষিত হোক) |
| ৬. (অনু.) | : অনুবাদক |
| ৭. (অনূ.) | : অনূদিত |
| ৮. (হি.) | : হিজরী |
| ৯. খ. | : খণ্ড |
| ১০. তা. বি. | : তারিখ বিহীন |
| ১১. পৃ. | : পৃষ্ঠা |
| ১২. ড. | : ডক্টর |
| ১৩. ডা. | : ডাক্তার |
| ১৪. দ্র. | : দ্রষ্টব্য |
| ১৫. প্রা. | : প্রাগুক্ত |
| ১৬. পূ. | : পূর্বোক্ত |
| ১৭. ই.ফা.বা. | : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ |
| ১৮. মৃ. | : মৃত/মৃত্যু |
| ১৯. খ্রি. | : খ্রিস্টাব্দ |
| ২০.জ. | : জন্ম |
| ২১. P. | : Page |
| ২২. P P | : Pages 1-4 |
| ২৩.Vol. | : Volume |
| ২৪. Ed. | : Edition |

# প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণমালার (الحروف الهجائية العربية) বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে এ অভিসন্দর্ভে

অনুসৃত নিয়ম

| বর্ণ | প্রতিবর্ণ | বর্ণ | প্রতিবর্ণ | বর্ণ | প্রতিবর্ণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ء = ا | ’ ঊর্ধ্ব কমা | ز | য | ق | ক, ক্ব |
| ب | ব | س | স | ك | ক |
| ت | ত | ش | শ | ل | ল |
| ث | স, ছ | ص | স | م | ম |
| ج | জ | ض | য, দ্ব | ن | ন |
| ح | হ | ط | ত, ত্ব | و | ওয়া, ভ |
| خ | খ | ظ | য | ة-ه | হ |
| د | দ | ع | ‘উল্টো কমা | ى | য় |
| ذ | য | غ | গ | | |
| ر | র | ف | ফ | | |

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| প্রত্যয়ন পত্র | i |
| ঘোষণা পত্র | ii |
| কৃতজ্ঞতা স্বীকার | iii |
| সংকেত পরিচয় | vi |
| প্রতি বর্ণায়ন | vii |
| **ভূমিকা** | **১-৫** |


## প্রথম অধ্যায়


| | | |
|---|---|---|
| | **আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) : জীবন পরিক্রমা** | **৬-৬০** |
| ১.১ | জন্ম ও বংশ পরিচয় | ০৬ |
| ১.২ | শৈশব কাল | ১০ |
| ১.৩ | শিক্ষার্জন | ১১ |
| | ১.৩.১ প্রাথমিক শিক্ষা | ১১ |
| | ১.৩.২ উচ্চশিক্ষা তথা তাফসীর, হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন | ১২ |
| ১.৪ | তরীকতের দীক্ষাগ্রহণ | ১৩ |
| | ১.৪.১ আধ্যাত্মিক সাধনা ও খিলাফত লাভ | ১৫ |
| | ১.৪.২ সিল্‌সিলার শাজরা | ১৬ |
| | ১.৪.৩ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য | ২০ |
| ১.৫ | বিবাহ-শাদী ও সন্তান-সন্ততি | ২১ |
| ১.৬ | বিদেশ ভ্রমণ ও আউলিয়ায়ে কিরামের ফয়েজ লাভ | ২১ |
| | ১.৬.১ হজ্জব্রত পালন | ২৩ |
| | ১.৬.২ বাংলাদেশে আগমন | ২৪ |
| ১.৭ | শিক্ষকতা ও মাদ্‌রাসা পরিচালনা | ২৪ |
| | ১.৭.১ সমসাময়িক প্রখ্যাত উলামায়ে কিরামের সাথে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সম্পর্ক | ২৫ |
| ১.৮ | খিলাফত প্রদান ও প্রসিদ্ধ কয়েকজন খলীফার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি | ২৬ |
| | ১.৮.১ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারামাত | ৩১ |
| | ১.৮.২ কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলিম মুরীদ | ৪৪ |
| ১.৯ | শেষ জীবন, ইন্তিকাল ও কাফন-দাফন | ৫৬ |
| | ১.৯.১ মালফূযাত | ৫৭ |
| | ১.৯.২ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) সম্পর্কে উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ কয়েকজন আলিম ও বুদ্ধিজীবী'র অভিমত | ৫৯ |

## দ্বিতীয় অধ্যায়


**ইসলামী শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ** **৬১-১১৭**

২.১ ইসলামী শিক্ষার প্রকৃতি ও স্বরূপ ৬১

২.২ ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা ৬৪

২.৩ ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ৬৬

২.৪ ইসলামী শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৬৮

২.৫ যুগে যুগে ইসলামী শিক্ষা ৬৯

২.৫.১ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র যুগে ইসলামী শিক্ষা (৬১০-৬৩২ খ্রি.) ৬৯

২.৫.২ খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) ৭৯

২.৫.৩ উমাইয়া যুগে ইসলামী শিক্ষা (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) ৮৪

২.৫.৪ আব্বাসীয় যুগে ইসলামী শিক্ষা (৭৫১-১২৫৮ খ্রি.) ৮৫

২.৫.৫ ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা (৬৩৪-১৯৪৭ খ্রি.) ৯০

২.৫.৬ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা (১২০৩-২০১৭ খ্রি.) ১০২


## তৃতীয় অধ্যায়


**আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) : ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা** **১১৮-১৫৮**

৩.১. ধর্মীয় চিন্তাধারা ১১৮

৩.১.১ ধর্মের পরিচয় ১১৮

৩.১.২ ধর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি ১২০

৩.১.৩ মানব জীবনে ধর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১২০

৩.১.৪ ইসলাম ধর্ম ১২২

৩.১.৫ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ধর্মীয় চিন্তা ও প্রায়োগিক বাস্তবতা ১৩৬

৩.২. সামাজিক চিন্তাধারা ১৪১

৩.২.১ সমাজের সংজ্ঞা ১৪২

৩.২.২ ইসলামী সমাজ ১৪৩

৩.২.৩ উপমহাদেশে মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা ১৫০

৩.২.৪ মুসলিম সমাজের উন্নয়নে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র অবদান ১৫৪

৩.৩. রাজনৈতিক চিন্তাধারা ১৫৬

৩.৩.১ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র রাজনৈতিক চিন্তাধারা ১৫৭

## চতুর্থ অধ্যায়


**আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ও সমসাময়িক ভারতীয় উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুসলিম মনীষী** ১৫৯-১৯৭

৪.১ আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী (রহ.) ১৫৯

৪.২ আল্লামা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ.) ১৬৩

৪.৩ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযিযুল হক শে'রে বাংলা (রহ.) ১৭০

৪.৪ আল্লামা শাহ্ আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ছালেহ্ (রহ.) ১৭৫

৪.৫ আল্লামা সরদার আহমদ লায়েলপূরী (রহ.) ১৮০

৪.৬ আল্লামা সৈয়্যদ আবুল হাসান আলী নদভী ১৮৪

৪.৭ আল্লামা মুফতী শফী উকাড়ভী (রহ.) ১৮৯

৪.৮ আল্লামা খাজা আবদুল মজীদ শাহ্ (রহ.) ১৯২

৪.৯ আল্লামা মুস্তাফা রেযা খান নূরী বেরেলভী (রহ.) ১৯৫


## পঞ্চম অধ্যায়


**ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রাতিষ্ঠানিক অবদান** ১৯৮-২৫৬

৫.১ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন ১৯৮

৫.২ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯৯

৫.২.১ কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১৯৯

৫.২.২ মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম ২০৭

৫.২.৩ মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, চন্দ্রঘোনা, চট্টগ্রাম ২১৫

৫.২.৪ মাদ্রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, বানুর বাজার, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম ২১৯

৫.২.৫ তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ২২৫

৫.২.৬ মির্জা হোসাইন তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম ২২৬

৫.৩ ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ২২৭

৫.৩.১ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম ২২৭

৫.৩.২ দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম ২৪৮

৫.৪ ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ২৫১

## ষষ্ঠ অধ্যায়


**আধ্যাত্মিক শিক্ষালয়-খানকাহ্ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার** ২৫৭-২৭০

৬.১ খানকাহ্ পরিচিতি ২৫৭

৬.২ খানকাহ্ ভিত্তিক ইসলামী কার্যক্রম ২৫৭

৬.৩ নৈতিক চরিত্র প্রতিষ্ঠায় খানকাহ্'র অবদান ২৫৭

৬.৪ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খানকাহ্ ২৫৮

৬.৫ খানকাহ্'র প্রাত্যহিক কর্মসূচি ২৫৯

৬.৬ ইসলাম প্রচারে খানকাহ্'র গুরুত্ব ২৫৯

৬.৭ রাজ্য বিস্তারে খানকাহ্'র প্রভাব ২৫৯

৬.৮ তরীকত চর্চার প্রাণকেন্দ্র খানকাহ্ ২৬০

৬.৯ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্সমূহ ২৬১


## সপ্তম অধ্যায়


**ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ভূমিকা** ২৭১-৩০৪

৭.১ ইসলামী সংস্কৃতি ২৭১

৭.১.১ ইসলামী সংস্কৃতির উৎস ২৭১

৭.১.২ ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৭২

৭.২ ইসলামী সংস্কৃতির বিবর্তন ও রূপরেখা ২৭২

৭.৩ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে মুসলিম মিল্লাত ২৭৩

৭.৪ ইসলামী সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ভূমিকা ২৭৪

৭.৪.১ জশনে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) ২৭৫

৭.৪.২ পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদের সংস্কার কর্মের ব্যাপক প্রসার ২৮৯

৭.৪.৩ আযানের পূর্বে ও পরে দুরূদ শরীফ প্রচলন ২৯১

৭.৪.৪ ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে মাসিক গিয়ারভী শরীফের প্রচলন ২৯৬

৭.৪.৫ উরস-ফাতিহার ব্যাপক প্রচলন ৩০০

## অষ্টম অধ্যায় ৩০৫-৩২০

**ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা**

৮.১ নূরানী তাকরীর ৩০৫
৮.২ মাজমূ'আয়ে সালাওয়াতে রাসূল-এর প্রকাশনা ৩০৯
৮.৩ মাসিক তরজুমান ৩১৩
৮.৪ আওরাদে কাদেরিয়া রহমানিয়া ৩১৫
৮.৫ সাময়িকী, বার্ষিকী ও অন্যান্য প্রকাশনা ৩১৬

## নবম অধ্যায়

**বক্তৃতা, বিবৃতি ও পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ভূমিকা** ৩২১-৩৬৫

৯.১ ইসলাম প্রচারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র ঐতিহাসিক বক্তৃতা ও পত্রাবলী ৩২১
৯.২ ইসলাম প্রচারে সাহাবায়ে কিরামের পত্রাবলী ৩২৩
৯.৩ ইসলাম প্রচারে আউলিয়ায়ে কিরামের বক্তৃতা ও পত্রাবলী ৩২৩
৯.৪ ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র বক্তৃতাবলী ৩২৩
৯.৫ ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র পত্রাবলী ৩৪৯

**উপসংহার** ৩৬৬

**গ্রন্থপঞ্জি** ৩৬৮

**পরিশিষ্ট-১**

**পরিশিষ্ট-২**

**পরিশিষ্ট-৩**

**পরিশিষ্ট-৪**

**পরিশিষ্ট-৫**

**পরিশিষ্ট-৬**

**পরিশিষ্ট-৭**

**পরিশিষ্ট-৮**

**পরিশিষ্ট-৯**

**পরিশিষ্ট-১০**

**পরিশিষ্ট-১১**

**পরিশিষ্ট-১২**

**পরিশিষ্ট-১৩**

**পরিশিষ্ট-১৪**

**পরিশিষ্ট-১৫**

**পরিশিষ্ট-১৬**

**পরিশিষ্ট-১৭**

**পরিশিষ্ট-১৮**

**পরিশিষ্ট-১৯**

**পরিশিষ্ট-২০**

**পরিশিষ্ট-২১**

# ভূমিকা

ইসলাম মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, শোষণমুক্ত সার্বজনীন ও কালজয়ী জীবনাদর্শ। এতে রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা; জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের পূর্ণতা। ইসলামই একমাত্র মানবতা, নৈতিকতা, সততা, দয়ার্দ্রতা, পরোপকারিতা, সহনশীলতা, সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের উজ্জ্বলতম আদর্শ। পৃথিবীর অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, গণিতবিদ, ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অকুণ্ঠচিত্তে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার পরেও ইসলাম নিয়ে ষড়যন্ত্রের অন্ত নেই। বিশ্বব্যাপী ইসলামের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার হীন প্রয়াসে আবহমান কাল ধরে সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত চলছে। কিন্তু যুগে যুগে অকুতোভয় সৈনিকরা ঐ সকল অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন-ভিন্ন করে সর্বত্র ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে অম্লান ও অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসে ঐতিহাসিক অবদান রেখে আসছেন। যাদের আত্মত্যাগ ও বহুমুখী অবদানে ইসলাম আজ বিশ্বব্যাপী সত্যাশ্রয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম হিসেবে এখনো প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তাঁদের মধ্যে অলীয়ে কামেল, আধ্যাত্মিক সাধক, সত্যের প্রচারক, মুসলিম জাহানের অনন্য ব্যক্তিত্ব, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) অন্যতম।

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর দ্বীন প্রচার, সমাজ সংস্কার ও শরী'আত-তরীকতের বহুবিধ কর্মকাণ্ড কেবল তাঁর মাতৃভূমি বা স্বদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি মুসলিম মিল্লাতের তত্ত্বাবধান, মুসলিম জনতার ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ এবং ইসলামের সঠিক রূপরেখা সুন্নী মতাদর্শের প্রচার-প্রসারে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি সারাজীবন দিশেহারা মানবগোষ্ঠীকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং মুসলিম জাতিকে ইসলামের চিরশত্রু ইহুদী-নাসারা, খোদাদ্রোহী, নবীদ্রোহী, ওহাবী-সালাফী, শিয়া, কাদিয়ানী ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদের নাগপাশ থেকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা, কাশ্মীর, সাউদি আরব, আফ্রিকা, আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সফর করে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিপ্লবের পর সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে নাসারা-বেনিয়াদের যে সুগভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল, সে নাজুক সন্ধিক্ষণে মুসলিম মিল্লাতের আকীদা সংরক্ষণে, সর্বোপরি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.)। তাঁরই চিন্তাধারার স্বার্থক রূপায়নে এতদ্ঞ্চলে এগিয়ে আসেন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী ঢাকাস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, আল্লামা সিরিকোটি (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি সংস্থা আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র পৃষ্ঠপোষকতাসহ এদেশের শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা,

হিফ্যখানা প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন করে তিনি যে অবদান রেখেছেন তার আলোকে তাঁকে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায়।

তরীকতপন্থী বিচ্ছিন্ন সুন্নী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে গঠন করেন 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' এবং তরীকতপন্থী মুসলিম ভাইদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন 'খানকাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া'। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মাদ্রাসা, মসজিদ, এতিমখানা ও তরীকত চর্চার কেন্দ্র খানকাহ্ শরীফ। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এ সব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নবীপ্রেমই আল্লাহ্ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। তাঁর রূহানিয়্যাতের প্রভাবে ভক্ত-অনুরক্ত মুরীদানের মধ্যেও নবীপ্রেমের এ অমূল্য সম্পদ সর্বাধিক লক্ষণীয়।

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র বিশাল কর্মময় জীবনের উপর গভীর আলোচনা ও গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। এই মহান অলীয়ে কামেলের জীবনাদর্শ যথার্থ অনুসরণে এ জাতি ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জনে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের পথ খুঁজে পাবে।

দ্বীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এগুলো থেকে প্রতি বছর কৃতিত্বের সাথে যোগ্য আলিম, হাফিয ও ক্বারী তৈরি হয়ে দেশে-বিদেশে দ্বীনের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে এ সব মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বহুমুখী শিক্ষা অর্জন করে অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সরকারী-বেসরকারী পদস্থ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন এবং স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র আদর্শ প্রতিফলনে সচেষ্ট রয়েছেন। সর্বোচ্চ সনদ নিয়ে কেউবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কেউবা সাহিত্যাঙ্গনে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে তাঁর অনুসৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

বহুমুখী প্রতিভাধর এমন একজন মহান ব্যক্তিত্ব বিশ্বমুসলিমের কাছে যেভাবে মূল্যায়িত হওয়ার কথা ছিল, সেভাবে হন নি। তাই আমি তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম বিশেষত ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর বিশাল অবদান তুলে ধরার মানসে বক্ষমান অভিসন্দর্ভ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছি।

আমার অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের জন্য নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে **"আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) : জীবন পরিক্রমা"**। এ অধ্যায়ে তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়, শৈশব কাল, শিক্ষার্জন, তরীকতের দীক্ষাগ্রহণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিক সাধনা ও খিলাফত লাভ, সিলসিলার শাজরা, হজ্জ পালন, বিবাহ-শাদী, সন্তান-সন্ততি, বিদেশ ভ্রমণ, মাদ্রাসার দায়িত্ব পালন, বাংলাদেশে আগমন, খিলাফত প্রদান, দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কিরামের সাথে সম্পর্ক, তাঁর কারামত, প্রসিদ্ধ কয়েকজন আলিম মুরীদ, তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীর অভিমত, মালফূযাত, ইন্তিকাল ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **“ইসলামী শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ”** শিরোনামে। এ অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ ও প্রকৃতি, ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস, ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা, ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব, ইসলামী শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, যুগে যুগে ইসলামী শিক্ষা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র সময়কালে শিক্ষার সূচনা, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে ইসলামী শিক্ষা, ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়টির নামকরণ করেছি **“ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ধর্মীয়, সমাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা”** শিরোনামে। এ অধ্যায়ে ধর্মের সংজ্ঞা, ধর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি, ইসলাম পরিচিতি, ইসলাম ও মুসলিম দর্শন, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ধর্মীয় চিন্তাধারা, সমাজের সংজ্ঞা, ইসলামী সমাজের পরিচয়, ইসলামী সমাজের মূল বুনিয়াদ, উপমহাদেশে মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সমাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইত্যাদি আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে **“আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ও সমসাময়িক ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকজন মুসলিম মনীষী”**। এ অধ্যায়ে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সমসাময়িক প্রসিদ্ধ নয়জন মুসলিম মনীষী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন : ১. আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী (রহ.) ২. আল্লামা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (রহ.) ৩. আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযীযুল হক শে'রে বাংলা (রহ.) ৪. আল্লামা শাহ্ আবু জা'ফর মুহাম্মদ সালেহ্ (রহ.) ৫. আল্লামা সরদার আহমদ লায়েলপূরী (রহ.) ৬. আল্লামা সৈয়্যদ আবুল হাসান আলী নদভী ৭. আল্লামা মুফতী শফী' উকাড়ভী (রহ.) ৮. আল্লামা খাজা আব্দুল মজিদ শাহ্ (রহ.) ৯. আল্লামা মুফতী মুস্তাফা রেযা খান নূরী বেরলভী (রহ.)। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত মনীষীদের জীবন ও কর্ম, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের অবদান এবং আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সাথে তাঁদের সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **“ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রাতিষ্ঠানিক অবদান”** শিরোনামে। এ অধ্যায়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা তথা কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম; মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, চন্দ্রঘোনা, চট্টগ্রাম; মাদ্‌রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম) বানুর বাজার, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম; তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; মির্জা হোসাইন তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম; দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা রাউজান, চট্টগ্রাম এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আরো আলোকপাত করা হয়েছে তাঁর পৃষ্ঠপোষকাতায় পরিচালিত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্থা আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র কার্যক্রম সম্পর্কে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে **“আধ্যাত্মিক শিক্ষালয়-খানকাহ্ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার”**। এ অধ্যায়ে খানকাহ্ পরিচিতি, খানকাহ্ ভিত্তিক ইসলামী কার্যক্রম, নৈতিক চরিত্র প্রতিষ্ঠায় খানকাহ্'র অবদান, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খানকাহ্, ইসলাম প্রচারে খানকাহ্'র গুরুত্ব,

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্সমূহ তথা খানকাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, বলুয়ার দীঘির পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; আলমগীর খানকাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম; খানকাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া কায়েৎটুলি, ঢাকা, খানকাহ্-এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া মাদারটেক, ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত কয়েকটি খানকাহ্ শরীফের পরিচিতি ও কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **"ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ভূমিকা"** শিরোনামে। এ অধ্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামী সংস্কৃতির বিবর্তন ও রূপরেখা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে মুসলিম মিল্লাত, ইসলামী সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর ভূমিকা, জশ্নে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদের সংস্কার কর্মের ব্যাপক প্রসার, আযানের পূর্বে ও পরে দুরূদ শরীফ প্রচলন, উরস, ফাতিহা, গিয়ারভী শরীফ প্রচলন, মিলাদ কিয়ামে আ'লা হযরতের সালামে রিযা'র সংযোজন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় সাজানো হয়েছে **"ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র রচনা ও প্রকাশনা"** শিরোনামে। এ অধ্যায়ে তাঁর নূরানী তাকরীর, মাজমু'আয়ে সালাওয়াতে রাসূল (সা.), আওরাদে কাদেরিয়া, মাসিক তরজুমান, অন্যান্য সাময়িকী ও বার্ষিকী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **"বক্তৃতা-বিবৃতি ও পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ভূমিকা"** শিরোনামে। এ অধ্যায়ে ইসলাম প্রচারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র ঐতিহাসিক বক্তৃতা ও পত্রাবলী, ইসলাম প্রচারে সাহাবায়ে কিরামের পত্রাবলী, ইসলাম প্রচারে আউলিয়া কিরামের বক্তৃতা ও পত্রাবলী, ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র বক্তৃতা ও পত্রাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্তগুলো মৌলিক ও প্রামাণ্য দলীলসহ গ্রহণযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ, হাদীস গ্রন্থ, জীবনী গ্রন্থ, রিজাল শাস্ত্র, সাহিত্য, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, দেশী-বিদেশী জার্নাল, সাময়িকী ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, সাময়িকী সংকলন সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের পাঠাগার ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে গবেষণা কর্মকে মৌলিক, তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অভিসন্দর্ভের মূল আলোচনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধকার ও গ্রন্থকারের লেখনীর শিরোনাম হুবহু রাখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সাংকেতিক বর্ণ এবং পাদটীকায় তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাংকেতিক রূপসহ আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়নে যে নীতি অনুসৃত হয়েছে, অভিসন্দর্ভের শুরুতে পৃথকভাবে সেগুলোর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে লিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যসমূহ একাধিক সূত্র থেকে যাচাই করে এর যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর সন্নিবেশ করা হয়েছে।

পরিশেষে অভিসন্দর্ভের সুবিস্তৃত আলোচনার সারসংক্ষেপ 'উপসংহার' শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জি এবং একুশটি পরিশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছে।

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) কেবল একজন ব্যক্তি ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠানের মত। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান তথা এই উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান ইতিহাসে স্বর্ণালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তাঁর বহুমূখী সংস্কার কর্ম বিশেষত আধ্যাত্মিক প্রভাবে এ অঞ্চলের মুসলিম জনতার হৃদয়ে আল্লাহ্ ও রাসূল প্রেমের বহ্নিশিখা যুগ যুগ ধরে প্রজ্বলিত থাকবে।

আমার এ অভিসন্দর্ভে মহান এ অলীর জীবন ও কর্মের যে আলোচনা-পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে তার দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ মহান সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদের জীবনের নানাদিক সম্পর্কে জানার দ্বার উম্মোচিত হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমার এ গবেষণা কর্মটি জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে ইন্‌শা আল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ আমাকে ও এই অভিসন্দর্ভের পাঠককুলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন !

وصلّى الله تعالى على خير خلقه محمّد و على اله وأصحابه أجمعين-

# প্রথম অধ্যায়

## আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) : জীবন পরিক্রমা

### ১.১ জন্ম ও বংশ পরিচয়

**জন্ম**

আধ্যাত্মিক সাধক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার হরিপুরের সিরিকোট নামক গ্রামে সৈয়্যদ বংশের এক সু-প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি প্রিয়নবী রাহমাতুল্ লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ৩৯তম বংশধর।[২]

**বংশ পরিচয়**

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র পিতা ছিলেন আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি পেশোয়ারী (রহ.)। তাঁর বংশীয় ধারা-পূর্বপুরুষ সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তাঁর বংশিয় শাজরা নিম্নরূপ-

১. সায়্যিদাতুন নিসা হযরত ফাতিমাতুয্ যাহ্‌রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা

↓

২. সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

↓

৩. হযরত ইমাম যয়নুল আবিদীন রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৪. হযরত ইমাম বাক্বির রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

---

১. মুহাম্মদ জানআক মুসাযায়ী, *তাযকিরা* (পাকিস্তান : আরাকীনে মজলিশে গাউসিয়া ওয়াডাপগা, পেশোয়ার, ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ৬; ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা কামাল সম্পাদিত, জার্নাল অব দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ***আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) : ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান,*** দি ফ্যাকাল্টি অব থিওলজী এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ১৯৯৯, খ. ৮, সংখ্যা-১, পৃ. ৯১; ***মাসিক তরজুমান*** (চট্টগ্রাম : ৩২১, দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার, পঞ্চদশ বর্ষ, ১১ ও ১২ তম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৬), পৃ. ২৮; মুহাম্মদ উসমান গনি ও অন্যান্য সম্পাদিত, ***আল-লিওয়া,*** **"আস্ সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ ওয়া শাখছিয়্যাতুহুল কুবরা"** (চট্টগ্রাম : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা কামিল শিক্ষার্থিদের বিদায়ী স্মরণিকা ১৯৯৮), পৃ. ১২৫; কাজী আবদুল ওহাব সম্পাদিত, ***আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ স্মারক গ্রন্থ*** (চট্টগ্রাম : ১ম সংস্ক., আগস্ট ১৯৯৪), পৃ. ২৫; মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন*** (চট্টগ্রাম : রেযা ইসলামিক একাডেমী, ১ম সংস্ক., ১৯৯৮), পৃ. ১৮৫

২. ***শাজরা শরীফ***, সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া (চট্টগ্রাম : আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ১৯৯৭), পৃ. ২৫; মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫; উল্লেখ্য, তাঁর বংশীয় শাজরায় বিভিন্ন লেখক তাঁকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চল্লিশতম অধস্তন পুরুষ হিসেবে দেখিয়েছেন। গবেষণা ও পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ৩৯তম অধস্তন পুরুষ।

৫. হযরত ইমাম সৈয়্যদ জা'ফর সাদিক্ব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৬. হযরত ইমাম সৈয়্যদ ইসমাঈল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৭. হযরত ইমাম সৈয়্যদ জালাল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৮. হযরত ইমাম সৈয়্যদ শাহ্ ক্বায়িম (কায়েন) রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৯. হযরত ইমাম সৈয়্যদ জা'ফর কা'ব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

১০. হযরত ইমাম স্যৈয়দ ওমর রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

১১. হযরত ইমাম সৈয়্যদ গাফ্ফার রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

১২. হযরত ইমাম সৈয়্যদ মুহাম্মদ গীসূদরায রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (ওফাত-৪২১ হিজরী)

↓

১৩. হযরত ইমাম সৈয়্যদ মাস'উদ মাশওয়ানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

১৪. হযরত ইমাম সৈয়্যদ তাগাম্মুয শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

১৫. হযরত ইমাম সৈয়্যদ সুদূর রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

১৬. হযরত ইমাম সৈয়্যদ মূসা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

১৭. হযরত ইমাম সৈয়্যদ মাহমূদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

১৮. হযরত ইমাম সৈয়্যদ আবদুর রহীম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

১৯. হযরত ইমাম সৈয়্যদ আবদুল গফূর রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

২০. হযরত ইমাম সৈয়্যদ আবদুল জালাল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

২১. হযরত ইমাম সৈয়্যদ আবদুর রঊফ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

২২. হযরত ইমাম সৈয়্যদ আবদুল করীম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

২৩. হযরত ইমাম সৈয়্যদ আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

২৪. হযরত ইমাম সৈয়্যদ গফূর শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি (কাফুর শাহ্)

↓

২৫. হযরত ইমাম সৈয়্যদ নাফ্ফাস শাহ্ (তাফাহ্হুস শাহ্) রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

২৬. হযরত ইমাম সৈয়্যদ আবী শাহ্ মুরাদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

২৭. হযরত ইমাম সৈয়্যদ ইউসুফ শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

২৮. হযরত ইমাম সৈয়্যদ হোসাইন শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

২৯. হযরত ইমাম সৈয়্যদ হাজী হাশেম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৩০. হযরত ইমাম সৈয়্যদ আবদুল করীম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৩১. হযরত ইমাম সৈয়্যদ ঈসা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৩২. হযরত ইমাম সৈয়্যদ ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৩৩. হযরত ইমাম সৈয়্যদ খোশহাল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৩৪. হযরত ইমাম সৈয়্যদ শাহ্ খান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৩৫. হযরত ইমাম সৈয়্যদ কাযিম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৩৬. হযরত সৈয়্যদ খান-ই যামান শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৩৭. হযরত সৈয়্যদ সদর শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৩৮. হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

↓

৩৯. হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ **তৈয়্যব শাহ্** রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক পুরুষ হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র [৩] যোগ্য উত্তরসুরী আর সিরিকোটি (রহ.)ছিলেন খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.)'র[৪] খলিফা। সে সূত্রে আল্লামা

৩. সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার হরিপুরের সিরিকোট গ্রামে সৈয়্যদ বংশের এক প্রসিদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর একজন উর্ধ্বতন পুরুষ মীর সৈয়্যদ গীসু দরাজ (রহ.) মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারত হয়ে আফগানিস্তানে আগমন করেন। মীর সৈয়্যদ গীসু দরাজের ছেলে সৈয়্যদ মাস'উদ মাশওয়ানী (রহ.)'র এগারতম অধস্তন পুরুষ সৈয়্যদ গফুর শাহ্ (রহ.) পাকিস্তানের হাজারা জেলার হরিপুরের সিরিকোট গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। হযরত গফুর শাহ্ (রহ.)'র অধস্তন পুরুষ হযরত সৈয়্যদ সদর শাহ্ (রহ.)'র ঔরসে হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র জন্ম হয়। তিনি ১২ বছর বয়সে পবিত্র কুরআনের হিফ্য শেষ করেন। অতঃপর ভারতের কয়েকটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ মেয়াদী মাদ্রাসা শিক্ষার স্তর বা কোর্স সমাপ্ত করে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, উসূল, নাহ্ভ, সরফ, মানতিক, আকাঈদ, বালাগাত, দর্শন, হিকমত, ফালসাফা ইসলামী সাহিত্য, তাসাওউফ, তরীকত, মা'রিফত ও হাকীকতসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়াদির সর্বোচ্চ সনদ নিয়ে পাণ্ডিত্য ও বুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আফ্রিকা গমন করেন এবং আফ্রিকার কেপটাউন, মুম্বাসা ও জোহানেসবার্গে ব্যবসার পাশাপাশি

তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) কাদেরিয়া তরীকার খিলাফত প্রাপ্ত হয়ে সারা জীবন মানুষকে ইসলামের সুমহান শিক্ষা এবং তরীকতের দীক্ষা দানে ব্যস্ত ছিলেন।

**‘তৈয়্যব’ নামকরণ**

‘তৈয়্যব’ শব্দের অর্থ ‘পাক’ বা পবিত্র। শব্দটি পবিত্র কুরআনে এসেছে এভাবে وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ “পবিত্র শহর, যার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় তার রবের অনুমতিক্রমে”।[৫] আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্’র জন্মের কিছুদিন পূর্বে তাঁর পিতা আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)স্বীয় পীর-মুর্শিদ আল্লামা খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.)’র দরবারে গেলে তিনি তাঁর শাহাদত অঙ্গুলি পিঠে ঘষতে ঘষতে বলেন “ইয়ে পাক ছীয্ তুম লে লো” অর্থাৎ “এই

---

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় একটি ইবাদতখানাও নির্মিত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বার্মার রেঙ্গুন সফর করেন। সেখানে অসংখ্য মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুনে “আনজুমান-এ শূরায়ে রহমানিয়া” নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ হতে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) “আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট” নামে পরিচালিত হয়ে আসছে। তাঁরই নির্দেশে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মাজমু‘আয়ে সালাওয়াতির রাসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামক ত্রিশপারা সম্বলিত একটি দরূদ শরীফের গ্রন্থ প্রথমবারের মত প্রকাশিত হয়। তিনি বার্মায় বাঙালি মসজিদের খতিব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদীর সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক সাহেবের অনুরোধে ১৯২৫ মতান্তরে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) চট্টগ্রামে আগমন করেন। আফ্রিকার ক্যাপটাউন, মুম্বাসা এবং জোহেন্সবার্গে ‘আফ্রিকাওয়ালা’, বাংলাদেশে ‘সীমান্তপীর’, ‘পেশওয়ারী’, আবার কোথাও ‘সিরিকোটি’ নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত জমি‘য়তে ওলামায়ে ইসলাম’র সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া নামে একটি দ্বীনি ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠান’ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ, ভারত, বার্মা ও আফ্রিকাসহ মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ সফর করেন। তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল করেন। (***মাসিক তরজুমান***, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ১৪১৭ হি., পৃ. ৯; ত্রয়োদশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ১৯৯৪, পৃ. ১১; মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২১; এম সেলিম খান সম্পাদিত বাগে সিরিকোট (চট্টগ্রাম : তৈয়্যবিয়া সোসাইটি বাংলাদেশ-১৯৯৬), পৃ. ১৯-২০, ৩০, ৩৪, ৩৬, ৪৫-৫০, ৫৫, ৫৭, ৭১-৭৩, ৭৫, ৭৯; ***শাজরা শরীফ,*** সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া, প্রাগুক্ত, ১৯৯৭, পৃ. ২০; ***দৈনিক পূর্বকোণ***, ১০ জুন ১৯৯৩, পৃ. ৩; ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা কামাল সম্পাদিত, ***জার্নাল অব দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ,*** ১৯৯৯, খ. ৮, সংখ্যা-১, পৃ. ১০৫-১০৭

৪. খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.) ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হরিপুর জেলার চৌহর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফকীর মুহাম্মদ খিজরী (রহ.)। তিনিও একজন আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ ছিলেন। বংশিয় ধারায় তিনি হযরত আলী (রহ.)’র সাথে সম্পৃক্ত। ৮ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। পবিত্র কুরআনই ছিল তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। এছাড়া তাঁর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তবে তিনি স্ব-যুগের জ্ঞানী-গুণী ও আধ্যাত্মিক পুরুষদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত রহমানিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা তাঁরই প্রতিষ্ঠিত একটি প্রসিদ্ধ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ত্রিশপারা দরূদ শরীফ সম্বলিত মাজমু‘আয়ে সালাওয়াতির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁরই রচিত অমূল্য গ্রন্থ। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শনিবার ৮০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন [***মাসিক তরজুমান***, ত্রয়োদশ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ৩৬, ৪৭; পঞ্চদশ বর্ষ ১১ ও ১২শ সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ. ৮২, ১১৬; এম সেলিম খান চাটগামী সম্পাদিত, ***বাগে সিরিকোট,*** (চট্টগ্রাম : তৈয়্যবিয়া সোসাইটি বাংলাদেশ-১৯৯৮) পৃ. ৯৫; ড. মুস্তাফা কামাল সম্পাদিত, ***জার্নাল অব দি ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি স্টাডিজ***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭; মুহাম্মদ আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী, ***তাযকিরা-ই আকাবিরে আহলে সুন্নাত*** (লাহোর : ফরিদ বুক স্টল, ২০০০ খ্রি.), ২য় সংখ্যা, পৃ. ২১৬]

৫. আল কুরআন, ৭ : ৫৮

পবিত্র বস্তুটি তুমি নিয়ে নাও"। এটা ছিল তাঁর জন্মের পূর্বাভাস। পীর-মুর্শিদের ইশারানুযায়ী জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'তৈয়্যব'।[৬]

## ১.২ শৈশবকাল

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) আধ্যাত্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে শৈশবকাল থেকে তিনি সেভাবে বেড়ে ওঠেন। শিশু বয়সেই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ যুক্ত হয়। তাই আধ্যাত্মিকতার চর্চা, অনুশীলন ও অনুপম গুণাবলীর সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ তাঁর শৈশবকাল থেকেই ঘটতে থাকে। জন্মের কয়েক মাস পর বরকতের জন্য সেই সময়ের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে শিরনী খাওয়াতে সিরিকোটে এসেছিলেন খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। ৬/৭ মাসের শিশু তৈয়্যব শাহ্কে সম্বোধন করে খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, "তৈয়্যব তুম নেহী খা-তে, তো হামভী নেহী খায়েঙ্গে" অর্থাৎ তৈয়্যব, তুমি না খেলে আমরাও খাব না।[৭] তা শুনতেই গরম শিরনীতে হাত ঢুকিয়ে দিলেন শিশু 'তৈয়্যব শাহ্'। এ অবস্থা দেখে খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হেসে ফেললেন। হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর এই ছোট্ট শিশুর মধ্যে এমন বোধ, চেতনা ও অলৌকিকত্ব দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। শিশু তৈয়্যব শাহ্ ওই গরম শিরনী শিশুসূলভ ভঙ্গিতে খাচ্ছিলেন, যা তাঁর হাতে-মুখে লেগেছিল, কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি।[৮] তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের আনুগত্য এতই প্রবল ছিল যে, একদিন শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী মায়ের দুধ পান করতে চাইলে আধ্যাত্মিক সাধক খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.)'র নিষেধাজ্ঞার কারণে পরবর্তীতে তিনি আর কখনো মায়ের দুধ পান করেন নি।[৯]

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ৮ বছর বয়সে পিতার সাথে ভারতের আজমীর শরীফে গরীবে নাওয়ায খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (১১৪১-১২৩৬ খ্রি.) মাযার শরীফ যিয়ারত লাভে ধন্য হন।[১০] তিনি গরীব নাওয়ায'র মাযার শরীফের চত্বরে মনের খেয়ালে ঘুরাফেরা করতে লাগলেন। হঠাৎ এক নূরানী চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে তাঁকে পাশে বসিয়ে খুব আদর স্নেহ করে কিছু দু'আ পড়ালেন। ওই সময় আল্লামা সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মু'আল্লিম'র ঘরে অবস্থানরত ছিলেন। পরে আব্বাজানের কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলে হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

---

৬. ***শাজরা শরীফ***, সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া, (চট্টগ্রাম : আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া বাংলাদেশ, ১৯৯৭) পৃ. ১২; সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, ***সৈয়্যদ মুহম্মদ তৈয়্যব শাহ্ জীবনী গ্রন্থ***, (চট্টগ্রাম : তাসলীমা একাডেমী, ২০০৬) ১ম সংস্ক., পৃ. ৪৫

৭. ***মাসিক তরজুমান***, প্রাগুক্ত, ৩৮তম বর্ষ, পৃ. ১৩

৮. ***শাজরা শরীফ***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৯. খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.) তাঁকে মায়ের দুধ পানে বারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন-"তৈয়্যব তুম বডা হো গেয়া, দুধ মাত পিয়ো" অথাৎ-তৈয়্যব তুমি বড় হয়ে গেছ, এখন থেকে আর দুধ পান করবে না (***মাসিক তরজুমান***, প্রাগুক্ত ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৯৯৩, পৃ. ১৭; ***শাজরা শরীফ***- সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪; ড. মুস্তাফা কামাল সম্পাদিত ***জার্নাল অব দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

১০. ***মাসিক তরজুমান***, প্রাগুক্ত, ত্রয়োদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯৯৩, পৃ. ১৭; কাজী আবদুল ওহাব সম্পাদিত আল্লামা **তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) স্মারক গ্রন্থ**; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; ড. মুস্তাফা কামাল সম্পাদিত ***জার্নাল অব দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭; ***শাজরা শরীফ***, প্রাগুক্ত, ২৩ তম সংস্ক., পৃ. ১৫

বলেন, "বেটা ওয়হ্ তো খাজা থে"[১১] অর্থাৎ বৎস, উনিই-তো খাজা গরীবে নাওয়ায। এভাবেই খাজা গরীব নাওয়ায রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র কৃপালাভে ধন্য আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র রূহানিয়্যাত বা আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ শৈশবকাল থেকেই শুরু হয়।

## ১.৩ শিক্ষার্জন

### ১.৩.১ প্রাথমিক শিক্ষা

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় পিতা আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র তত্ত্বাবধানেই শুরু হয়। তিনি এগার বছর বয়সে কুরআন মাজীদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতিসহ হিফ্য সমাপ্ত করেন।

তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত হরিপুরের 'রহমানিয়া ইসলামিয়া আলিয়া' মাদ্রাসা হতে। তিনি এতে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখা তথা ইলমুন্ নাহ্ভ ওয়াস্ সার্ফ (ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব), ইলমুল হাদীস, ইলমুত তাফসীর, ইলমুল ফিক্হ, ইলমু উসূলিল ফিক্হ, ইলমুল কালাম, ইলমুল বাদী', ইলমুল মা'আনী, ইলমুল বায়ান, ইলমুন নাসিখ্ ওয়াল মানসূখ, ইলমুন নুযূল, ইলমুত তাওয়ারীখ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম ও ফকীহ, মুফাস্সিরে কুরআন, মুহাদ্দিসে আ'যম (পাকিস্তান) আল্লামা সরদার আহমদ লায়েলপুরী'র[১২] নিকট ধর্মীয় জ্ঞানের দরস গ্রহণ করেছিলেন। জগত বিখ্যাত আলেম

---

১১. *মাসিক তরজুমান*, ৩৩তম বর্ষ, সংখ্যা-১২, পৃ. ৩১

১২. আল্লামা সরদার আহমদ লায়েলপুরী (রহ.) পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত তাহসীল বাটালা, দেয়ালগড় কসবায় জন্মলাভ করেন। তিনি দেয়ালগড়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে ইসলামিয়া হাই স্কুল (বাটালা) থেকে কৃতিত্বের সহিত মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য লাহোরে দেয়াল সিঙ্গলালে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে মুফতীয়ে আ'যম হিন্দ হযরত মুস্তাফা রেযা খান, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত হামেদ রেযা, সরদরুশ শরীয়াহ মুফতী আমজাদ আলী, সদরুল আফাযিল আল্লামা না'ঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী উল্লেখযোগ্য। তাঁর সর্বশেষ শিক্ষাসনদ ছিলো দাওরায়ে হাদীস। আহলে সুন্নাতের আক্বীদা পরিপন্থি বাতিল মতবাদে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। মাওলানা মাহবুব রেযা বেরেলভী বর্ণনা করেছেন–"আল্লামা সরদার আহমদ লায়েলপুরী (রহ.) কিতাবের কেবল শত-সহস্র পৃষ্ঠা মুখস্থ রাখতেন, এমনটি নয়; বরং লক্ষ-লক্ষ উদ্ধৃতিসমূহ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি যখনই বক্তব্যে বিভিন্ন কিতাবের রেফারেন্স পেশ করতেন, তখন মনে হতো যে, কিতাবের এ সব ইবারত তাঁর সম্মুখেই রয়েছে। তিনি এগুলো দেখে দেখে বর্ণনা পেশ করছেন।" তিনি তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান'র অপূর্ব সমন্বয়ক ছিলেন। বহুমুখী ইল্ম ও আমলের অধিকারী ছিলেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ছিল। বিশেষ করে ইলমে হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অতুলনীয় পারদর্শিতা ছিল। তিনি হাফেযে হাদীস ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি সদরুশ শরী'আহ মুফতী আমজাদ আলী (রহ.)'র যোগ্য উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তাঁর দরস ও তাদ্রীসের পদ্ধতি ছিল অন্যান্যদের চাইতে ব্যতিক্রম। তাঁর প্রতিটি পাঠই ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞান সম্মত। তিনি জামেয়া রেযভীয়া মুজহেরে ইসলাম সংলগ্ন একটি "সুন্নী রেযভী জামে মসজিদ" নির্মাণ করেন। প্রতি সপ্তাহে জুমা'বারে এ মসজিদে খুৎবা পেশ করতেন এবং নামায পড়াতেন। তিনি মাদারেসে দীনিয়া আরবীয়া রেযভীয়া প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। হাজার হাজার যোগ্য আলিম, মুদাররিস, মুনাযির, মুবাল্লিগ, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও খতীব এ সব মাদরাসা থেকে বের হয়েছেন। তিনি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) প্রতিষ্ঠিত মানযারে ইসলামে দীর্ঘদিন হেড মাওলানার দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া স্বীয় জীবদ্দসায় ৯০ এর অধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে। ইমাম আহমদ রেযা খান, মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ (রহ.) ও অন্যান্য সুন্নী ওলামাগণের রচিত গ্রন্থাবলীর সহিত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে পরিচিত করে তোলার জন্য সুন্নী রেযভী কুতুবখানা কায়েম করেন। তিনি ছিলেন অতিথি পরায়ন। ৭ শা'বান ১৩৯০ হিজরী মুতাবেক ১৯ অক্টোবর, ১৯৭০ খ্রি. তিনি স্বীয় প্রভুর ডাকে সাড়া দেন। শাহজাদায়ে হযরত সদরুশ

সদরুল আফাযিল আল্লামা না'ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদীও[১৩] ছিলেন তাঁর অন্যতম উস্তাদ। তাছাড়া সুদীর্ঘ ষোল বছর স্বীয় পিতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বহুমুখী ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন। সাথে সাথে তরীকত শিক্ষার স্তরগুলোও অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

### ১.৩.২ উচ্চশিক্ষা তথা তাফসীর, হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন

খাজা হযরত আব্দুর রহমান চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হরিপুরের প্রসিদ্ধ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহমানিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা হতে হাদীস, ফিক্হ, তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি উচ্চতর সনদ লাভ করেন। তিনি উল্লিখিত দুই শিক্ষক ছাড়াও যাদের কাছে জ্ঞান অর্জন

---

শরী'আহ আল্লামা আবদুল মুস্তাফা আজহারী তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। অতঃপর রেযভী জামে মসজিদের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।{মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, ***মুহাদ্দিসে আ'যম পাকিস্তান*** (চট্টগ্রাম : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ২০০৭), পৃ. ৬}

১৩. সদ্‌রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ না'ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী ২১ সফর ১৩০০ হিজরী মুতাবেক ১লা জানুয়ারী ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়্যদ মুহাম্মদ মু'ঈনুদ্দীনও ছিলেন স্ব-যুগের বিজ্ঞ আলিম-ই দীন। তাঁর পূর্বপুরুষ বাদশাহ আলমগীরের শাসনামলে ভারতবর্ষে আগমন করে বসতি স্থাপন করেন। এ সময় তাঁর পূর্বপুরুষগণ বাদশাহ'র অধীনে নিষ্ঠার সাথে উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন এবং বাদশাহ'র কাছ থেকে ভূ-সম্পত্তি উপহার পান। আট বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজীদ হিফ্য সমাপ্ত করেন। তিনি আপন পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তদানীন্তন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম মাওলানা ফযল-ই-আহমদের সান্নিধ্যে এসে 'মোল্লা হাসান' পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। আল্লামা শাহ গুল মুহাম্মদ (রহ.)'র অধীনে হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৩২০ হি./১৯০২ খৃ. সনে দস্তারে ফযীলত লাভ করেন। মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ না'ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী হযরত মাওলানা শাহ্ গুল মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র হাতে সিলসিলাহ্-ই-কাদেরিয়ার বায়'আত গ্রহণ করেন। ১৩২৮ হিজরীতে তিনি মুরাদাবাদে "মাদ্রাসা-ই আঞ্জুমানে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র" ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এ মহান দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় 'জামেয়া না'ঈমিয়া' যা আজো ভারত বর্ষের একটি প্রসিদ্ধ ইদারা হিসেবে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর থেকে লেখালেখি ও ফাত্ওয়া দানে মনোযোগী হন। তাফ্সীর, আক্বাইদ এবং কবিত্ব (শায়েরী) সহ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর ২০ (বিশ) টি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। আ'লা হযরত তাঁকে স্বীয় খলীফাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেন। পরে তিনি আ'লা হযরতের খলীফা হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠতম তার্কিকগণের অন্যতম। আ'লা হযরত (রহ.) অনেক সময় তাঁকে নিজ স্থলাভিষিক্ত করে বিভিন্ন মুনাযারায় (তর্কযুদ্ধে) প্রেরণ করতেন। তিনি মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে সকল তর্কের অবসান ঘটিয়ে বিজয়ী হয়ে আসতেন। তিনি তাঁর জীবনে খ্রিষ্টান, কমিউনিস্ট, আর্য, রাফিযী, ওহাবী, ক্বাদিয়ানী, খারেজী ও লা-মাযহাবী প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম-মতবিশ্বাসীদেরকে তর্কে চরমভাবে পরাজিত করেন। তিনি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মুরাদাবাদ হতে "আল সুওয়াদ আল আ'যম" মাসিক পত্রিকা বের করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের চিহ্নিত করে সতর্ক এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করত: নিয়মিতভাবে লেখা প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'আল বালাগ' ও 'আল হেলাল' পত্রিকায় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেন। অতঃপর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে যখন মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সিদ্ধি আন্দোলন চলছিল; মুসলমানদেরকে হিন্দু করার ষড়যন্ত্র চলছিল এবং অনেকেই এ পথে পা বাড়িয়ে বিভ্রান্ত হতে চলছিল, তখন তিনি বেরেলীতে 'জামা'আতে রিযা-ই মুস্তাফা' প্রতিষ্ঠা করেন। সুন্নী আলিমদের একত্রিত করে ঐ ষড়যন্ত্র পূর্ণরূপে প্রতিহত করেন। তারপর ঘোকল আন্দোলনের মুকাবেলায় তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে নিজ শহরে 'অল ইন্ডিয়া সুন্নী কনফারেন্স' কায়িম করেন। এ কনফারেন্সে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন তিনি। তাঁরই সহযোগিতায় ড. আল্লামা ইকবাল ও কায়িদ-ই আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্'র রাজনৈতিক আন্দোলন বেগবান হয় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম আসে। (মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, ***কানযুল ঈমান*** (চট্টগ্রাম : গুলশান-ই- হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স) ২০১০, পৃ. ৭

করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আল্লামা হাফেজ আব্দুর রহমান এবং হাফেজ আব্দুল হামিদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদুপরি, মুহাদ্দিসে আ'যম হযরত আল্লামা সরদার আহমদ লায়েলপুরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সাথে তাঁর বিশেষ আধ্যাত্মিক সম্পর্কও ছিল। কখনো কখনো মুহাদ্দিসে আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ছাত্রদের দস্তারবন্দী বা পাগড়ী প্রদান উপলক্ষে বিশেষ মাহফিলে সৈয়্যদযাদা হিসেবে হযরত তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে বিশেষভাবে দাওয়াত দিতেন এবং তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে হাদীসের ছাত্রদের দস্তারে ফযিলত বা পাগড়ী প্রদান করতেন।[১৪]

## ১.৪ তরীকতের দীক্ষাগ্রহণ

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ইলমে শরী'আতের বিভিন্ন শাখায় বিচরণের পর ইলমে মা'রিফাত হাসিলের প্রতি উদগ্রীব হয়ে পড়েন। পরিশেষে স্বীয় পিতা হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র হাতে বায়'আত গ্রহণ করে নিয়মিত তরীকত চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।[১৫] শরী'আত ও তরীকতের জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জন ও বেলায়তে ওয্মার আসনে আসীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে গোপন রাখতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র স্বভাবের, সামাজিক ও বন্ধুবৎসল। প্রত্যেকের সাথে সৌহার্দ্য ও হৃদ্যতার সম্পর্ক বজায় রাখতেন। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন আল্লাহ্‌র মনোনিত ধর্ম ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র একনিষ্ঠ অনুসারী, ধর্ম প্রচারক। তিনি জন্মগতভাবে সুন্নী, মাযহাবগতভাবে হানাফী ও তরীকতগতভাবে "কাদেরী"[১৬]। তিনি গাউসুল আ'যম[১৭] মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের

---

১৪. ড. মুস্তাফা কামাল সম্পাদিত ***জার্নাল অব দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২; মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, প্রাগুক্ত, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, পৃ. ১৮৭

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. কাদেরিয়া তরীকার অনুসারীদেরকে কাদেরী বলা হয়। হযরত শায়খ সৈয়্যদ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এ তরীকার ইমাম ও সকল তরীকার শিরমনি। তাঁকে গাউসুল আ'যম এবং মুহিউদ্দীনও বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে তাঁকে অনেকে 'বড়পীর' নামেও অভিহিত করে থাকেন। তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এ তরীকার নামকরণ করা হয় "কাদেরিয়া"। তিনি আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িকতার মধ্যে ভারসাম্য বিধান করেছেন এবং বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে ইসলামী তাসাওউফকে উদ্ধার করে স্ব মহিমায় ভাস্বর করে তুলেছিলেন। সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের উপযোগী করে ইলম-ই তাসাওউফ তথা তরীকতের মূলনীতি প্রণয়ন ও ভিত রচনা করেন হযরত গাউসুল আ'যম (রহ.); যদিও তাঁর পূর্বে রাসূল (সা.) হতে তরীকত চর্চা ও সূফী সাধনা হয়ে আসছে। যেমনটি ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) ইলম-ই ফিক্‌হের ভিত রচনা করেছিলেন আর তাঁর পূর্বেও ফিকহ্ চর্চা ছিল। তাই গাউসুল আ'যম নামকরণ তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি মাত্র। বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)'র কারণে এ তরীকার স্থান শীর্ষে। অন্যান্য তরীকার পূর্ণতা যেখানে শেষ, সেখান হতে এ তরীকার সূচনা। এ জন্য অন্যান্য তরীকার মাঝে এ তরীকার অবস্থান পরিদৃষ্ট হয়। সূর্য যেমন অন্য সব গ্রহ-উপগ্রহের মাঝে আলো বিতরণ করে, ঠিক তেমনি কাদেরিয়া তরীকা।

১৭. 'গাউস' শব্দের অর্থ দান। প্রচলিত অর্থে গাউস মানে ত্রাণকর্তা, সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক জগতের ব্যক্তিত্বদের মধ্যে এমন এক স্তরের অধিকারী, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্ন থাকে। যুগে যুগে শরী'আত-তরীকতের মৌলিক আদর্শ হতে বিচ্যুত মানব জাতিকে হিদায়তের পথে পরিচালিত করার জন্য ত্রাণকর্তার ভূমিকায় যাঁরা বিশ্বে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের উপর যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই গাউসুল আ'যম। এটা আধ্যাত্মিক তথা অদৃশ্য জগত হতে সৃষ্টিজগত পরিচালনার্থে নির্ধারিত সর্বশ্রেষ্ঠ পদবী। এ পদে অলিকুল সম্রাট শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) সমাসীন। সাহাবা ও ইমামগণের পর হতে ইমাম মাহদী (আ.)'র আগমন পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়কালে তিনিই একমাত্র এ পদে অধিষ্ঠিত আছেন মর্মে সকল যুগের আলিম-ওলামা মত ব্যক্ত করেছেন। গাউসুল আ'যম নামটি তাসাউফ শাস্ত্রেরই একটি পরিভাষা। এ নামটি আল্লাহ

জিলানী[১৮] (রহ.) প্রবর্তিত কাদেরিয়া সিলসিলা চর্চা করতেন এবং এই কাদেরিয়া তরিকায় বায়'আত করাতেন।

তা'আলার গুনবাচক নাম সমূহে নেই। কাজেই এটা বান্দারই নাম; স্রষ্টার নয়। (ড. গোলাম ইয়াহ্ইয়া আন্জুম, ***তারিখ-ই মাশায়িখ-ই ক্বাদিরিয়া*** (দিল্লী : কুতুবখানা আমজাদিয়া-২০০৩), খ.১, পৃ. ১২০; কাযী আবদুল ওয়াজেদ, ***শানে গাউসুল আ'যম*** (চট্টগ্রাম : গাউসিয়া প্রকাশনী-২০০৩), পৃ. ২৯

১৮. ইমাম যাহবীর মতে, তাঁর নাম আবদুল ক্বাদির বিন আবু সালিহ আবদুল্লাহ বিন জঙ্গী দোস্ত, তবে ফতহুল গায়িব গ্রন্থের ভূমিকায় আছে মুহিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ বিন আবু সালিহ (মুসা) জঙ্গী দোস্ত বিন আবদুল্লাহ। তিনি ৪৭০হি./১০৭৮ খৃ. সনে পারস্যের (ইরান) কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে পর্বত ঘেরা বেলাভূমি গিলানস্থ (আরবী উচ্চারণে জিলান) নীফ বা নায়ফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইবন তুগ্রা বারদীর মতে, বাগদাদ ও ওয়াসিতের মধ্যস্থিত জীল্ গ্রামই তাঁর জন্মভূমি। তাঁর পিতা আবু সালিহ (রহ.) ছিলেন হযরত হাসান (রহ.)'র বংশধর আর তাঁর মা উম্মুল খায়ির ফাতিমা (রহ.) ছিলেন হযরত হুসাইন (রহ.)'র বংশধর। দু'জনই ছিলেন পরম ধার্মিক ও কামিল অলি। সুতরাং হযরত গাউসুল আ'যম (রহ.) বুযুর্গ পরিবারে হাসানী ও হুসাইনী দুই পবিত্র ধারার মোহনা হয়ে এ ধরাধমে শুভাগমন করেন। তখন তাঁর মায়ের বয়স ছিল (সা.) ৬০ বছর। শায়খ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ.)'র বর্ণনা মতে, তাঁর জন্মের সময় তাঁর কাঁধে রাসূল (সা.)'র কদম মুবারকের নক্সা বিদ্যমান ছিল। ৪৮১ হিজরীতে এগার বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতাকে হারান। পরে তাঁর বুযর্গ নানা আবদুল্লাহ সাওমায়ী' (রহ.) তাঁকে লালন পালন করেন। তিনি ছিলেন মা-বাবার জৈষ্ঠ্য পুত্র। শিশুকাল থেকেই স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। মাতৃগর্ভে তাঁর বেলায়াত প্রকাশ হতে থাকে। তাই জন্মলগ্ন হতে ধর্মকর্ম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। তাঁর শুভ জন্মদিন ০১ রমযান। সেদিন হতে পুরো রমযান মাসে দিনের বেলায় মায়ের দুধ পান করতেন না। অথচ, ইফতারের সময় হলেই তিনি মায়ের দুধ পান করতেন। প্রথম প্রথম তাঁর মা দুধ পান করানোর জন্য অনেক চেষ্টা করতেন, পরে তিনি প্রকৃত বিষয় আঁচ করতে সক্ষম হন। পাঁচ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। সাত বছর বয়স হতেই নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। মাত্র আট বছরে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন এবং ৪৯৬ হি. সনে কৃতিত্বের সনদ লাভ করেন। আঠার বছর বয়সে ৪৮৮ হিজরী সনে মায়ের অনুমতিক্রমে তৎকালের শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণকেন্দ্র বাগদাদে জ্ঞানার্জনের জন্য গমণ করেন এবং বিখ্যাত নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তা ছাড়া সে সময়ে প্রচলিত খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণের নিজস্ব শিক্ষাকেন্দ্রেও তিনি যাতায়াত করতেন। ৪৯২ হিজরীতে যখন তিনি বাগদাদে জ্ঞান সাধনায় গভীরভাবে নিমগ্ন, ঠিক ঐ সময়ে তাঁর বিদূষী বৃদ্ধা জননী ৮২ বছর বয়সে জিলান শহরে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। এমনিতে তিনি শাস্ত্রীয় বিদ্যায় শিক্ষানবীশ কালে আধ্যাত্মিক সোপান অতিক্রম করতে সক্ষম হন। এতদ্সত্বেও কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করে তিনি মা'রিফাতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেন। একই সাথে হযরত আবু সাঈদ মাখযূমী (রহ.)'র হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন ও খিলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবিচল কাণ্ডারী। তবে তাঁর প্রচারিত তরীকা হাম্বলীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি ৫০৯ হি./১১১৬ খৃ. সনে ৩৮ বছর বয়সে হজ্ব পালন করেন এবং যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে গিয়ে যখন রওযা মুবারকের সামনে কবিতা পাঠ করছিলেন, তখন হঠাৎ রওযা মুবারকের ভিতর থেকে মহানবী তাঁর নূরানী হাত বের করে দেন। তৎক্ষণাৎ গাউসুল আযম (রহ.) ঐ হাতে চুম্বন করেছিলেন। এ ধরনের বিরল ঘটনা এটাই প্রথম,যা উপস্থিত হাজার হাজার দর্শনার্থী প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী (রহ.) ১১২৭ খৃস্টাব্দে ইসলাম প্রচার কাজে মনোনিবেশ করেন এবং ১১৩৪ খৃষ্টাব্দে নিযামিয়া মাদ্রাসা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইন্তিকাল পূর্ব পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে এ মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। সেখানে তিনি একটি খানকাহও প্রতিষ্ঠা করেন এবং সকল শ্রেণীর লোকের জন্য তাঁর দুয়ার উম্মুক্ত রাখেন। আগন্তুক শিক্ষার্থীদের তিনি সমভাবে জাহিরী-বাতিনী শিক্ষা দান করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল চিত্তাকর্ষক সহজ-সরল, যা সাধারণ মানুষও বুঝতে পারত। তাসাউফের পরিভাষা ছিল বিরল। তারপরও ভাবাবেগে অনেকের মৃত্যু ঘটত। তাঁর যশ, খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অল্প দিনে বিদ্যার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে এই মাদ্রাসা জীর্ণ কুটিরের পরিবর্তে সুরম্য অট্টালিকায় পরিণত হয়। তাঁর অসাধারণ চরিত্র, সাধুতা, সত্যবাদিতা, অকপটতা, অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রগাঢ় জ্ঞান লোকের মনের গভীরে রেখাপাত করে। লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। অনেক মুসলমান উচ্চতর জীবন ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভ করেন। হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)'র পবিত্র সত্তা ও জীবন চরিত ছিল অলৌকিকত্বে পরিপূর্ণ, যা শেকড় সন্ধানী গবেষকদের জন্য গুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার; বিশ্বকোষ এবং সারা দুনিয়ার মুসলামানদের জন্য

## ১.৪.১ আধ্যাত্মিক সাধনা ও খিলাফত লাভ

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সর্বদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জীবনাদর্শকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। তাঁর চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, পানাহার, শিক্ষা-দীক্ষা তথা সার্বিক জীবনে সুন্নাতে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র একটি বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠত। তিনি ছিলেন একাধারে অলি-ই কামেল, অন্তঃচক্ষু সমৃদ্ধ দূরদর্শিতার অধিকারী, বেলায়তের বেগমান ঝর্ণাধারা, শরীয়তের রাহবার, তরীকতের পথ-প্রদর্শক, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পেশওয়া, বাতিলের স্বরূপ উন্মোচনকারী, বিদ'আত ও কুসংস্কার মূলোৎপাটনকারী, বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার, আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণপুরুষ।

ইবাদত-বন্দেগী ও কঠোর রিয়াযতের মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। বুযুর্গ পিতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সাথে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) চট্টগ্রামে অবস্থানকালে স্বীয় পিতা কর্তৃক সিরিকোট দরবার শরীফের সাজ্জাদানসীন নিযুক্ত হন।[১৯] ওই সময় হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি চট্টগ্রাম তশরীফ আনলে আন্দরকিল্লাহ কোহিনূর ইলেক্ট্রনিক প্রেসের উপর ২য় তলায় লাইব্রেরীতে বেশির ভাগ সময় অবস্থান করতেন। উক্ত প্রেসের মালিক বর্তমানে বহুল প্রচারিত দৈনিক আজাদীর সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক জনাব এম.এ.মালেক পরিবার। সেখান থেকেই হুযূর সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতেন। আখেরী সফরে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি চট্টগ্রামস্থ রিয়াজুদ্দীন বাজারে মরহুম শেখ আফতাব উদ্দীন সাহেবের দোকানে এক ধর্মীয় প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে সশরীরে বিদায় নিয়ে যাবেন, সেহেতু এখানকার মুরীদদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে খিলাফতের গুরু দায়িত্বটি নেয়ার জন্য আহবান করলেন। উপস্থিত সবাই নিজ নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করে হুযূরের কাছে ক্ষমা চাইলেন। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি খতমে গাউসিয়া শরীফ চলাকালে সেখানে উপস্থিত অনেক অনুসারীর সামনে হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে খিলাফত দানে ধন্য করার কথা ঘোষণা করলেন। তাঁকে 'খলীফায়ে আ'যম' উপাধিতে ভূষিত করে সিলসিলায়ে কাদেরিয়ার যোগ্য স্থলাভিষিক্ত বলেও ঘোষণা দেন। হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হতে তরীকতের খিলাফত লাভের সময় তাঁর বয়স ছিল ৪২ বছর।

---

অনাগত কাল ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন একাধারে মহাবিদ্বান, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও মহাতপস্বী, তাঁর প্রণীত গ্রন্থাদি এ কথার স্বাক্ষ্য বহন করে। এসব গ্রন্থের মধ্যে ফুতুহুল গায়িব, গুনিয়াতুত তালিবীন, সির্‌রুল আসরার, ফাতহুর রাব্বানী ও ক্বাসিদায়ে গাউসিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর বয়স ৫১ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বৈবাহিক জীবনের সুচনা করেন। তাঁর সকল সন্তানই শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরীমায় উন্নত ছিলেন। তিনি ১১ রবিউস সানী ৫৬১হি./১১৬৬ খৃ. সনে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে ইহকাল ত্যাগ করেন ঐ দিনকেই ফাতিহা-ই ইয়াযদাহুম বলা হয়। তাঁর মাজার শরীফ বাগদাদে অবস্থিত। সর্বস্তরের মানুষের জন্য এটি উন্মুক্ত।

১৯. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯ সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, ***সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) জীবনী গ্রন্থ***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) স্বীয় পিতার যোগ্য উত্তরসূরী এবং আধ্যত্মিক জগতের অনেক উঁচু স্তরের অলি। আর এজন্যই কুতুবুল আউলিয়া হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহামাতুল্লাহি আলায়হি প্রায়ই বলতেন, "তৈয়্যব কা মক্বাম বহুত উঁচা হ্যায়, তৈয়্যব মাদারযাদ অলি হ্যায়, মুস্তাক্বিল মে সিলসিলা-ই আলিয়া কাদেরিয়া কা কাম তৈয়্যব সম্ভালেগা। তোমহারে লিয়ে এক নওজোয়ান মজবুত পাবন্দে সুন্নাত পীর কি যরূরত হ্যায়, আওর উয়হ তৈয়্যব শাহ্ হ্যায়।"[২০] অর্থাৎ "তৈয়্যব শাহ্'র স্থান উর্ধ্বে। তৈয়্যব মাতৃগর্ভের অলি। অদূর ভবিষ্যতে সিল্‌সিলা-ই আলিয়া কাদেরিয়ার সার্বিক কার্যক্রম তৈয়্যবই পরিচালনা করবেন। তোমাদের জন্য সুন্নাতের অনুসারী একজন দৃঢ়চিত্ত নওজোয়ান পীরের প্রয়োজন। আর সেই পীর হচ্ছেন "তৈয়্যব শাহ"। আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলতেন, "তৈয়্যব শাহ্ সাহেবের সাথে আলাপে সতর্কতা অবলম্বন করবে, তিনি মাতৃগর্ভের অলি এবং আমিও তাঁকে অলি হিসেবে জানি।"[২১]

তিনি তরীকতের এত উন্নত স্তরে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাঁর সম্মুখে লোকজন সাধারণতঃ ভীত সন্ত্রস্ত থাকত। তিনি পিতার অনুপস্থিতিতে পাকিস্তানের হরিপুর শহরের সিরিকোট শরীফের বৃহত্তম জামে মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামাযের ইমামতি করতেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ হতে পিতার নির্দেশে এতদ্‌অঞ্চলের সর্ববৃহৎ ঈদের জামা'আতে ইমামতি ও খুতবা পাঠ শুরু করেন। এ দায়িত্ব ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত পালন করেন। ১১ই জিলক্বদ ১৩৮০ হিজরী মুতাবিক ২৫ মে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার পিতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) ইহধাম ত্যাগ করলে স্বাভাবিকভাবে পিতার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সার্বিক দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে, যা তিনি সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করতে সক্ষম হন।[২২] ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ সব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

সুস্থ থাকলে ইমামত ও খেতাবতের দায়িত্ব নিজেই পালন করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষণীয়, প্রাঞ্জল ও আন্তরিকতাপূর্ণ। সর্বদা রাসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রেমের শিক্ষা দিতেন। প্রায়শ তিনি তাঁর সারগর্ভ বক্তব্যে খাঁটি আশেক্বেরাসূল, আল্লামা ইকবাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র বিভিন্ন শ্লোক পেশ করতেন। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে এত উঁচু স্তর অতিক্রম করেছিলেন যে, রাসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও মাশায়িখ হযরাতের ইশারা ব্যতীত কোন কিছুই করতেন না। আউলিয়া-ই কেরামের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর।

### ১.৪.২ সিল্‌সিলার শাজরা

আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র পক্ষ হতে খিলাফত লাভের পর তিনি সিলসিলার খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তাঁর সিলসিলার শাজরা নিম্নরূপ-

১. হুযূর আকরাম রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

↓

২০. *মাসিক তরজুমান*, ৩৩তম বর্ষ, সংখ্যা-১২, পৃ. ৩২

২১. *মাসিক তরজুমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২২. *মাসিক তরজুমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

২. শে'রে খোদা হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু[২৩]

↓

৩. ইমামুশ্ শুহাদা হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু[২৪]

↓

৪. হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু[২৫]

↓

৫. হযরত ইমাম বাকির রাহমাতুল্লাহি আলায়হি[২৬]

↓

---

২৩. হযরত আলী (রা.) : জন্ম ১৩ই রজব ৬০০ খ্রিস্টাব্দ। শাহাদাত ১৭ই রমজান, শুক্রবার, ৪০ হিজরী/৬৬২ খৃস্টাব্দ। তিনি বালকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। নবীজি (সা.)'র চাচাত ভাই, পোষ্য ও জামাতা। ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হোসাইন (রা.) এর পিতা। ডাক নাম আবু তুরাব ও আবুল হাসান। পিতার নাম আবু তালিব। মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। নবীজির সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য ছিল প্রায় ৩০ বছর। তাঁর উপাধি ছিল হায়দার, মুরতাজা ও আসাদুল্লাহ্। তিনি ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর লাশ মোবারকের গোসল দান করার সৌভাগ্য অর্জনকারী, যুদ্ধে মুসলামদের পতাকা বহনকারী, অমিত বিক্রম যোদ্ধা এবং দুনিয়াতে থেকেই জান্নাতের সুখবর প্রাপ্ত মহা সৌভাগ্যবান দশজন সাহাবীর একজন। কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি প্রায় ৪ বছর নয় মাস কাল মুসলিম জাহানের খলীফা ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম পুলিশ বিভাগের প্রবর্তন করেছিলেন। নবীজির (সা.) ইন্তিকালের ৩০ বছর পর ৬৩ বছর বয়সে তিনি শহীদ হন। (শাহজাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল, *সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়ার মাশায়েখ পরিচিতি*, (ঢাকা : সিরাজিয়া ফাউন্ডেশন, ২০১৬), পৃ. ১১

২৪. হযরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু : জন্ম- ৫ই শাবান ৪র্থ হিজরী, শাহাদাত ১০ই মুহররম, ৬১ হিজরী/ ৬৮০ খ্রস্টাব্দ। ৪র্থ হিজরীর ৫ই শাবান (৬২৬ খৃ.) পবিত্র মদীনা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অতিশয় স্নেহ করতেন এবং তাঁকে বেহেশতী যুবকদলের সর্দার হবার সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১৮টি। তাঁর সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি হোসাইনকে ভালবাসে সে যেন আমাকে ভালবাসে, আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শত্রুতা করে, সে যেন আমার সাথে শত্রুতা করল।" ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর মুতাবিক ৬১ হিজরী সনের ১০ই মুহররম পবিত্র আশুরার দিনে কারবালার প্রান্তরে স্বৈরাচারী, দুরাচার ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে স্বপরিবারে ৭২ জন সঙ্গীসহ শাহাদাত বরণ করেন। (শাহজাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল, *সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়ার মাশায়েখ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, ২০১৬, পৃ. ১১)

২৫. হযরত ইমাম যয়নুল আবিদিন (রহ.) : হযরত ইমাম জয়নুল আবিদিন (রহ.) এর পূর্ণ নাম আলী আসগর ইবনে হোসাইন। তাঁর ডাক নাম ছিল আবুল হাসান। উপাধি ছিল 'জয়নুল আবিদিন' অর্থাৎ ধার্মিকগনের অলংকার এবং আস্ সাজ্জাদ অর্থাৎ বেশি বেশি সিজদাকারী)। তিনি ছিলেন ইমাম হোসাইনের চতুর্থ পুত্র সন্তান, তাঁর জন্ম হয়েছিল ৩৮ হিজরী/৬৫৯ খৃস্টাব্দে পবিত্র নগরী মদীনায়। তাঁর মাতা শহরবানু ছিলেন সর্বশেষ পারস্য রাজা ইয়াজদিজর্দের সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা। কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনারাজির একজন চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন তেইশ বছরের এ যুবক। আপন তিন বড় ভাই ও নিকটাত্মীয়দের নির্মম হত্যাকান্ড তিনি দেখেছিলেন খুবই কাছ থেকে। আজীবন এ দুঃসহ স্মৃতির বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে। কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনাবলীর পর তিনি পবিত্র নগরী মদীনায় ফিরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর ইমাম হাসান (রাদিআল্লাহু আনহু) কন্যা বিবি ফাতিমাকে বিবাহ করে তিনি সংসার জীবন শুরু করেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে নবী বংশের একমাত্র জীবিত পুরুষ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্ব শ্রেণীর মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। (শাহজাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল, *সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়ার মাশায়েখ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, ২০১৬, পৃ. ১২)

২৬. হযরত ইমাম বাকির (রহ.) : হযরত ইমাম বাকির (রহ.) ছিলেন হযরত ইমাম যায়নুল আবেদিন (রহ.)'র পুত্র। ৫৭ হিজরী সনে/৬৭৮ খৃ. তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম হাসানের কন্যা উম্মে আবদুল্লাহ (রা.) ছিলেন তাঁর মাতা। তাঁর ডাকনাম ছিল 'আবু জা'ফর। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)। মুহাম্মদ আল বাকির শব্দের অর্থ হচ্ছে 'রহস্যের ব্যাখ্যাকারী' বা 'গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী। তিনি ব্যাপক অধ্যয়ন ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ৫৭ বছর বয়সে (১১৪ হিজরীতে/৭৩২ খৃস্টাব্দে) বিষ

৬. হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি[২৭]

↓

৭. হযরত মূসা কাযেম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি[২৮]

↓

৮. হযরত শাহ্ মূসা রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৯. হযরত মা'রূফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

১০. হযরত সিররিউস সাকতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

১১. হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

১২. হযরত আবু বকর জা'ফর আশ্ শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

---

প্রয়োগ তাঁকে শহীদ করা হয়। পিতার কবরগাহের নিকটে জান্নাতুল বাকীতেই তাঁকে দাফন করা হয়। (শাহজাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল, *সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়ার মাশায়েখ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, ২০১৬, পৃ. ১২)

২৭. হযরত ইমাম জা'ফর আস সাদিক **(রা.)** : তাবেয়ীগণের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সাধকপুরুষ হচ্ছেন- হযরত ইমাম জাফর আস সাদিক (রা.)। মদীনায় ৮৩ হিজরী সনে ৭০৩ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ ইবনে আলী অর্থাৎ ইমাম বাকের (রা.)। তাঁর পূণ্যশীলা মাতা উম্মে ফারওয়া ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রপৌত্র। তাঁর প্রকৃত নাম জা'ফর ইবন মুহাম্মদ এবং ডাক নাম 'আবু আবদিল্লাহ'। নিজ নামের চাইতে 'আস সাদিক' বা সত্যবাদী উপাধিতেই তিনি মুসলিম জাহানের সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পিতা মুহাম্মদ বাকির (রা.) এর জৈষ্ঠপুত্র। প্রখ্যাত সাধক হযরত দাউদ তায়ী (রা.) এবং ইমাম আ'যম হযরত আবু হানিফা (রা.) ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। কুরআন ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। একজন বিশিষ্ট পন্ডিত, সুসাহিত্যিক ও আইনজ্ঞ ছিসেবে তাঁর সুখ্যাতি তৎকালীন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। তাঁর প্রগাঢ় পান্ডিত্য ও গুণাবলী, চরিত্রের উর্ধগামী পবিত্রতার কারণে তদীয় বংশের শত্রুদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। ইলমে মা'রিফাতের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বিশেষ প্রজ্ঞাবান। (শাহজাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল, *সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়ার মাশায়েখ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, ২০১৬, পৃ. ১৩)

১৫ রজব, ১৪৮ হিজরী, ৭৬৬ খৃস্টাব্দে ৬৫ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয় হিজরী শতকের মাঝামাঝি সময়ে আব্বাসীয় খলীফা আবু জা'ফর আল মানসুর এর রাজত্বকালে বিষ প্রয়োগে এ মাহন সাধককে হত্যা করা হয়। মদীনা মুনাওয়ারায় জান্নাতুল বাকীতে পিতার কবরের পাশেই মহা মনীষী হযরত ইমাম জা'ফর আস সাদিক এর (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) শেষ শয্যা রচিত হয়েছে। (শাহজাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল, *সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়ার মাশায়েখ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, ২০১৬, পৃ. ১৩)

২৮. হযরত ইমাম মুসা আল কাযিম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি : হযরত ইমাম মুসা আল কাযিম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ১২৯ হিজরিতে (৭৪৭খৃ.) পবিত্র মদিনা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম আবুল হাসান। প্রকৃত নাম মুসা বিন জা'ফর হলেও "আল কাযিম" উপধিতেই তিনি সর্বত্র পরিচিত। তাঁর উন্নত চরিত্র সকল শ্রেণীর লোকদের নিকট তাঁকে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল এবং তাঁর জন্য বয়ে এনেছিল আল কাযিম বা ধৈর্যশীল উপাধি। অসীম ধর্মনিষ্টা ও আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার প্রাণান্ত প্রয়াসের জন্য তিনি 'আল আবদুস সালিহ' অর্থাৎ পবিত্র অনুগত উপাধিও লাভ করেছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হন। তাঁকে গ্রেফতার করে বাগদাদের কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয়। ১৮৩ হিজরীর ২৫ রজব মুতাবিক ১ লা সেপ্টেম্বর ৭৯৯ খৃ. ৫৪ বছর বয়সে কারাগারে বন্দী অবস্থাতেই হযরত ইমাম মুসা আল কাযিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছিল। ইরাকের বাগদাদ নগরীর কাযিমিয়্যাহ নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। (শাহজাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল, *সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়ার মাশায়েখ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪)

১৩. হযরত আব্দুল ওয়াহিদ আত্-তামীমি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

১৪. হযরত আবুল ফরাহ আত্-তারতুসী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

১৫. হযরত করশী হানকারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

১৬. হযরত আবূ সা'ঈদ মুবারক মাখযূমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

১৭. হযরত গাউসুল আ'যম আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

১৮. হযরত সৈয়্যদ আব্দুর রায্যাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

১৯. হযরত খাজা আবূ সালিহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

২০. হযরত সৈয়্যদ শিহাব উদ্দীন আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

২১. হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

২২. হযরত খাজা সৈয়্যদ মুহাম্মদ শামসুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

২৩. হযরত আলাউদ্দীন শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

২৪. হযরত বদরুদ্দীন হোসাইন শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

২৫. হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ফারূক্ব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

২৬. হযরত খাজা সৈয়্যদ শরফুদ্দীন কাসেম শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

২৭. হযরত সৈয়্যদ আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

২৮. হযরত খাজা সৈয়্যদ হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

২৯. হযরত সৈয়্যদ আবদুল বাসিত শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৩০. হযরত সৈয়্যদ আবদুল কাদির (দ্বিতীয়) রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৩১. হযরত সৈয়্যদ মাহমুদ শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৩২. হযরত আবদুল্লাহ শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৩৩. হযরত ইনায়াতুল্লাহ শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৩৪. হযরত হাফিয আহমদ বারামূলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৩৫. হযরত আবদুস সবূর শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৩৬. হযরত গুল মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৩৭. হযরত পীরে কাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৩৮. হযরত খাজা মুহাম্মদ রফীক্ব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৩৯. হযরত আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৪০. হযরত শাহ্ মুহাম্মদ আনোয়ার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৪১. হযরত মুহাম্মদ ইয়াকুব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৪২. খাজায়ে খাজেগান হযরত আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৪৩. হযরত কুত্বুল আউলিয়া সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

↓

৪৪. হযরত আল্লামা **সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্** রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ।[২৯]

### ১.৪.৩ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

তাঁর অনুপম চরিত্র সুন্নতে রাসূলের প্রতিচ্ছবি, সুন্দর আচরণ, মধুর ব্যবহার, মৃদু রসিকতা, উদারতা, দানশীলতা, সহমর্মিতা, দৃঢ়তা, স্থিরতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও আতিথেয়তার ক্ষেত্রে সত্যই তিনি যেন নবী চরিত্রের বাস্তব নমুনা। তিনি দুনিয়া বিমুখ, পরহেযগার ও স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। অন্যায়, অবিচার, মিথ্যা, কপটতা, অত্যাচার, পাপাচার, স্বজনপ্রীতি, তোষামোদ, অজ্ঞতা, দুর্ব্যবহার ইত্যাদি থেকে তিনি অনেক দূরে থাকতেন। তিনি বাল্যকাল থেকে খোদাভীতি ও নবীপ্রেমে তিনি ছিলেন যুগের ওয়াইস করণী। আল্লাহ্-রাসূলের সন্তুষ্টি লাভই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী। তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যে এবং আধ্যাত্মিক আকর্ষণে অনেক খ্রিস্টান, হিন্দু তথা বিধর্মী তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বক্তব্য নাস্তিক মতবাদ তথা অনৈসালামিক কার্যক্রম ও তৎপরতা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ঈমানী চেতনা জোরদার করেছে।[৩০] তাঁর তাকওয়া ও পরহেযগারীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ফরয ইবাদতের সাথে সাথে প্রতিনিয়ত নফল ইবাদত ও তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা। তাঁর হৃদয়ে রাসূলপ্রেম ছিল অসাধরণ। এ জন্যই দিবা-রাত্রি তাঁর মুখে নবী-ই কায়েনাত সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দুরূদ শরীফ ও সালাম জারী  থাকতো। তিনি প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর পবিত্র কুরআনের দর্স দিতেন। যে কোন বৈধ পানীয় পানে সুন্নাত সম্মতভাবে তিন চুমুকে পান করতেন। টুপিবিহীন অবস্থায় কোথাও বের হতেন না। সদা মিস্ওয়াক সাথে রাখতেন

---

২৯. ***শাজরা শরীফ***, সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৬০; মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৩০. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

ও মিস্ওয়াক করতেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে তিনি সুন্নাত-ই মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন।

**মমত্ববোধ**

মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও মমত্ববোধ ছিল অত্যন্ত গভীর। সাক্ষাতপ্রার্থী হাজার হাজার লোকের মধ্যে প্রত্যেককেই তিনি সাক্ষাৎ দানের চেষ্টা করতেন। সঙ্গত কারণে কখনো তা সম্ভব না হলেও তিনি তাঁর বেলায়তী ক্ষমতায় সকলকে পরিতৃপ্ত করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর সান্নিধ্যে আগত হাজার হাজার সাক্ষাতপ্রার্থীই মনে করতেন যেন আল্লাহ্‌র এ মহান অলি (সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন এবং তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। এটা ছিলো তাঁর বিশেষ কারামত। তিনি তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থীদের কষ্টের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতেন। চিন্তিত ও ক্লান্ত মুরীদদের জন্য দু'আ করতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে দেশ-বিদেশের নেতৃবর্গ তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে রূহানী ফুয়ূযাত দ্বারা উপকৃত হতেন। একবার বাংলাদেশের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নূরুদ্দীন সাহেবও পাকিস্তানে তাঁর দরবারে দু'আ নেয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ভক্ত-মুরীদদেরকে রূহানী সন্তান মনে করতেন। মুরীদদের সাথে তিনিও রূহানী পিতা হিসেবে আন্তরিকতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন।

## ১.৫ বিবাহ-শাদী ও সন্তান-সন্ততি

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সৈয়্যদ বংশের মুহতারামা সৈয়্যদা সা'ঈদা বেগমকে শাদী করেন। তাঁরই গর্ভে বর্তমান পীর সাহেব আল্লামা তাহের শাহ্, সৈয়্যদা খাদীজা বেগম এবং আল্লামা পীর সাবির শাহ্ জন্মলাভ করেন। আরও একজন ছেলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন; কিন্তু অল্প বয়সে ইন্তিকাল করেন। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র স্ত্রী ২০১১খ্রি. ৩১ অক্টোবর ইন্তিকাল করেন। পরদিন সিরিকোট শরীফেই নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সুযোগ্য সন্তান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.) জানাযার ইমামতি করেন।[৩১]

## ১.৬ বিদেশ ভ্রমণ ও আউলিয়ায়ে কিরামের ফয়েজ লাভ

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইসলামী শিক্ষা, শরী'আত-তরীকত-মা'রিফাত ও সুন্নী মতাদর্শের প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলাদেশসহ ভারত, বার্মা, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, আফ্রিকা, ব্রিটেন, সাউদি আরব ও মস্কো সফর করেন।[৩২] এসব দেশে দ্বীনের খিদমতের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক খিদমতের মাধ্যমেও জনকল্যানমূলক অবদান রাখেন। তাঁর অনুসরণে সে সব দেশে তাঁর বহু ভক্ত-অনুরক্ত সৃষ্টি হয়, তারা সেখানে এখনো ইসলামের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

---

৩১. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারি, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২০.০৭.২০১৭ খ্রি.

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

বিভিন্ন দেশ সফরে তাঁর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার শরীফ যিয়ারত। তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করে অনেক সম্মানিত অলীর মাযার শরীফ যিয়ারত করেন। শাহানশাহে বাগদাদ গাউসে পাক মাহবুবে সুবহানী, কুত্বে রাব্বানী, পীরানে পীর, শায়খ সৈয়্যদ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী আল হাসানী ওয়াল হুসাইনী (রহ.)'র মাযার, নজফে মওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু'র মাযার শরীফ যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। একদা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাযার যিয়ারতের পরক্ষণে একজন অচেনা ব্যক্তি মশকে করে পানি নিয়ে এসে তাঁকে পান করালেন। তিনি সফর-সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "দেখিয়ে, মাওলা আলী শেরে খোদাকী খাসায়েস মে সে ইয়ে এক বড়ী খুসূসিয়াত হ্যায় কেহ্ আপ বড়ে মেহমান নওয়ায হ্যাঁয়, মুঝে পিয়াস লাগী থী, মাওলা আলী শেরে খোদানে মুঝে পানি পিলা কর মেহমান নওয়াযী আদা ফরমায়া"।[৩৩] অর্থাৎ দেখুন, মাওলা আলী শে'রে খোদার বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে এটি একটি বড় বৈশিষ্ট্য যে, তিনি বড় মেহমান নওয়ায। আমার পিপাসা লাগায় তিনি আমাকে পানি পান করিয়ে মেহমানদারীর সুন্নাত পালন করলেন। তিনি কারবালায় সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাযার যিয়ারত করেছেন। যেখানে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শাহদাত বরণ করেছেন সেখানে গিয়ে সফর সঙ্গীদের বলেন, "এখানেই ইমাম হুসইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছেন এবং পরক্ষণে এখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রওযা শরীফ থেকে এসে ইমাম হুসাইনকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।"[৩৪] হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত মুসা কাযিম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত ইমাম মারূফে কারখী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত সারিয়্যুস্ সাকতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, বাগদাদের সালমান পার্ক এলাকায় বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত হোযায়ফাতুল ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহ ইরাকে প্রায় ৬০ জন সাহাবী ও অলির মাযার যিয়ারত করেছেন। ভারতে সুলতানুল হিন্দ নায়েবে মুস্তাফা খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশ্তী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত আমীর খুসরু রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, পাকিস্তানের খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত দাতা গঞ্জে বখশ্ আলী হাজভিরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও পীরে কাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মাযার যিয়ারত করেন। অনেক সময় তিনি মাযারে শায়িত অলিগণের সাথে আধ্যাত্মিকভাবে কথাবার্তাও বলতেন। যেমন পীরে কাঙ্গালের যিয়ারতের সময় তাঁর সাথে হযরত তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র কথা বলছিল। এ সময় তাঁর সাথে বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট মুরীদান বিশেষতঃ আল্লামা মুফ্তী ওবাইদুল হক না'ঈমী সাহেবও ছিলেন। বাংলাদেশে সিলেটের হযরত শাহ্ জালাল ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত শাহ্ পরান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ঢাকার হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত শরফুদ্দিন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, চট্টগ্রামের হযরত গাউসুল আ'যম শাহ্ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও হযরত গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, কুত্বুল

---

৩৩. *মাসিক তরজুমান*, ৩৩তম বর্ষ, সংখ্যা-১২, পৃ. ৩২

৩৪. প্রগুক্ত, পৃ. ৬০

আকতাব হযরত শাহ্ আমানত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাযী আযিযুল হক শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত তারেক শাহ্ মিয়া রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত জুন শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত জঙ্গী শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত শাহ্ চান্দ আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং বার্মা, পাক-ভারত উপমহাদেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ আউলিয়া-ই কেরামের মাযারসমূহ যিয়ারত করেছেন।[৩৫] প্রত্যেকটি মাযার শরীফে তাঁর অনেক কারামতও সংঘটিত হয়েছে। তিনি রূহানী জগতের কাশ্‌ফ সমৃদ্ধ হিসেবে মাযারে অবস্থানরত বুযুর্গের সাথে আধ্যত্মিকভাবে কথা বলতে পারতেন। তাছাড়া, তিনি শরী'আত ও তরীকতের খিদমতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ সফর করার সময়ও বিভিন্ন আউলিয়া-ই কিরামের মাযার শরীফ যিয়ারত করেছেন। এ সব অলিদের মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক সাধনা, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও তরীকতের খিদমত আন্‌জাম দেয়া। তাঁর সফরের ফলে সে সব স্থানে অনেক অনুসারী সৃষ্টি হয়েছে, যাদের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার আরো জোরদার হচ্ছে।

### ১.৬.১ হজ্জব্রত পালন

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মাতা সাহেবানীকে সাথে নিয়ে প্রথমবার হজ্জব্রত পালন করেন। এরপর ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বারের মত হজ্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি অনেকবার হজ্জ ও ওমরাহ্ পালন করেন।[৩৬]

১৯৭৯ সনের সফরে হজ্জব্রত পালনের পর সাহেবযাদা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ সহ সফরসঙ্গীদের নিয়ে যথারীতি মদীনা মুনাওয়ারায় হাজিরা দেন। একদা মসজিদে নববীতে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন-"তাহাজ্জুদ কী নামাযকে বা'দ হুযূরে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে দরবার মে হাযেরী দীজিয়ে; দরবার-ই পাক মে সালামী পেশ কীজিয়ে"। এবং আরো বললেন, "ইয়ে এক এ্যয়সা দরবার হ্যায়, এহাঁ সে সারী কায়েনাত মে শান ও শওকত আওর সব কুছ তাকসীম হো রহী হায়। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আরয়হি ওয়াসাল্লাম হায়াতুন্নবী, হাযির-নাযির আউর রাহমাতুল লিল আলামীন হ্যাঁয়।[৩৭] অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ নামাযের পর হুযূর করীম আক্বা-মওলা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ করবেন। আর দরবারে নববী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন এক দরবার যেখান থেকে শান-মান ও মর্যাদা, এক কথায় সবকিছু বন্টন করা হয়; হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হায়াতুন্নবী (জীবিত), হাযির-নাযির এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ।

তিনি অনেক বার হজ্জব্রত পালন ও রওযাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যিয়ারত করেন। ওমরাহ্ ও হজ্জ পালনকালে মক্কা ও মদীনা শরীফে অনেক সাহাবা-ই কেরামের যিয়ারত করেন। হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কা শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলে তিনি প্রায়শ রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যখানে অবস্থান করতেন এবং সেখানে আসর, মাগরিব ও এশার নামায আদায়

৩৫. ড. মুস্তাফা কামাল সম্পাদিত *জার্নাল অব দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৩৬. শাহ্‌জাহান মোহাম্মদ ইসমাঈল, *নূরে সিরিকোট*, (ঢাকা : সিরাজিয়া ফাউন্ডেশন, ২০১৬) পৃ. ৩৮

৩৭. দৈনিক পূর্বকোণ, ১৫ জুন, ১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ৬; *আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি স্মারক গ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

করতেন। একদিন তিনি কথায় কথায় ভক্ত-মুরীদদের উদ্দেশ্যে বলেন, "দেখ, সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামের রূহ মুবারকের সম্মেলন এখানে হয়"।[৩৮]

### ১.৬.২ বাংলাদেশে আগমন

আল্লামা সৈয়্যদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আগমন করেন ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। তখন ছিল আরবী শা'বান মাস। ঐ বছর রমজান মাসেই তিনি আন্দরকিল্লাহ জামে মসজিদে তারাবীহ নামাযের ইমামতি করেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে স্বীয় পিতা ও মুর্শিদ কুতবুল আউলিয়া আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র চেহলাম শরীফে যোগাদানের উদ্দেশ্যে কাদেরিয়া তরীকার সাজ্জাদানশীন বা সিরিকোটি দরবার শরীফের প্রধান হিসেবে বাংলাদেশ আগমন করেন। তাঁর এ শুভাগমনে বিমান বন্দরে হাজার-হাজার ভক্ত অনুরক্ত তাঁকে স্বাগত জানায়। চেহ্লাম উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মাহফিলে নূরানী তাকরীরের মাধ্যমে মুরীদদের সান্তনা দেন এবং আন্জুমানসহ হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার কথা ঘোষণা করেন। তিনি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রত্যেক বছরই বাংলাদেশে নিয়মিত আগমন করেন। কয়েক বছর রমযান মাসে খতমে তারাবীহ্ ও ঈদের জামা'আতে ইমামতি করেন এবং নূরানী বক্তব্য প্রদান করেছিলেন।[৩৯] ১৯৭৬ খ্রি. থেকে ১৯৮৬ খ্রি. পর্যন্ত পুনরায় নিয়মিত ভাবে আগমন করেছেন এবং এ সময়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্বীন-মিল্লাতের বিশাল খেদমত আন্জাম দিয়েছেন।

### ১.৭ শিক্ষকতা ও মাদ্রাসা পরিচালনা

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হরিপুর শহরে খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুহ্তামিম (অধ্যক্ষ) পদে অধিষ্ঠিত হন। এতে তিনি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দানে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। অবশ্য তিনি পরবর্তীতে উক্ত পদ ছেড়ে দিয়ে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত মাদ্রাসার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।[৪০] তিনি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্রাসায়ও হাদীসের দরস দিয়েছিলেন।[৪১]

দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তিনি একবার জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশে বলেছিলেন "ধর্মীয় মাদ্রাসা হচ্ছে কোন দেশের অস্ত্র তৈরীর কারখানার মত, যা দ্বারা শত্রুর মুকাবিলা করা সম্ভব হয়।[৪২] এজন্যে তিনি স্বদেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমার সহ বিদেশে অনেক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ভূটানেও ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলাদেশে অনেক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এ সব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব

---

৩৮. *মাসিক তরজুমান*, প্রাগুক্ত, পঞ্চদশ বর্ষ, ১১ ও ১২ তম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৯৬, পৃ. ২৮
৩৯. শাহজাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল, *নূরে সিরিকোট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৪০. *মাসিক তরজুমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৪১. *মাসিক তরজুমান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৪২. *তাযকিরা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ দ্বীনি-সামাজিক সংস্থা আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মুহাম্মদপুরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম কেন্দ্র ঢাকা কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা। তাঁর জীবদ্দশায় এটি কামিল হাদীসে উন্নীত হয়। ঢাকায় এ প্রতিষ্ঠান অন্যান্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে কুরআন, হাদীস, আকায়িদ সহ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছেন চট্টগ্রামের হালিশহরে তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, ও কালুরঘাটস্থ মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া হাফিযিয়া (দরসে নিযামী)। এতদ্ব্যতীত পাকিস্তানের করাচির আউরঙ্গী টাউনে মাদ্রাস-ই তৈয়্যবিয়া কাদেরিয়াসহ আরো বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বব্যাপী ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে যুগান্তকারী ভুমিকা পালন করেছেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় প্রতিষ্ঠিত তৈয়্যবিয়্যা অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসার পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন।[৪৩] তিনি মায়ানমারের রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুনে) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাদ্‌রাসা-ই আলীয়া আহলে সুন্নাত। তাছাড়া কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে গাউসিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, নরসিংদী জেলার মাঝিনা নদীর পাড়ে তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসাসহ বহু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়। শুধু তাই নয়, বরং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, নীলফামারী, সৈয়দপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়াসহ বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর অনুপ্রেরণায় সুন্নি মতাদর্শের উপর গড়ে ওঠেছে।

### ১.৭.১ সমসাময়িক প্রখ্যাত ওলামায়ে কিরামের সাথে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সম্পর্ক

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সাথে যে সব প্রখ্যাত ওলামা-মাশাইখদের সাক্ষাৎ হয়েছে এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, তাঁদের মধ্যে পাকিস্তানের আল্লামা শাহ্ আহমদ নূরানী সিদ্দীকী (রহ.), আল্লামা আব্দুল কাইউম হাযারভী (রহ.), আল্লামা তৈয়্যবুর রহমান চৌহরভী (রহ.), আল্লামা মুফতী ওয়াকারুদ্দীন (রহ.), প্রফেসর ড. মাসউদ আহমদ (রহ.), আল্লামা আশরাফ সিয়ালভী (রহ.), আল্লামা আব্দুল হাকীম শরফ কাদেরী (রহ.), মুফতী মাওলানা হাবীবুল বাশার আযীযী (রহ.), আল্লামা আব্দুর রহমান চিশতী (রহ.), আল্লামা নসরুল্লাহ খান (রহ.), বার্মার মাওলানা আব্দুল হামিদ (রহ.), বাংলাদেশের ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাযী আযিযুল হক শেরে বাংলা (রহ.), আল্লামা আবুল ফসীহ্ মুহাম্মদ ফোরকান (রহ.), শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করীম নকশবন্দী (রহ.), অধ্যক্ষ আল্লামা জাফর আহমদ সিদ্দীকী (রহ.), অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেয এম.এ. জলিল (রহ.), অধ্যক্ষ আল্লামা ইদ্রিস রেযভী, অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-কাদেরী (রহ.), শে'রে মিল্লাত মুফতী ওবায়দুল হক্ব নঈমী, কুত্ববে মদীনা খলীফা-ই আ'লা হযরত আল্লামা যিয়াউদ্দিন কাদেরী, মদিনা শরীফের মাওলানা ফজলূর রহমান কাদেরী (রহ.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদুপরি, মুহাদ্দিসে আ'যম আল্লামা সরদার আহমদ খাঁন লায়েলপুরী, গায্যালী-ই যমান আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ সা'ঈদ কাযেমী এবং হাকীমুল উম্মত

৪৩. মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, *ইসলামের মহান সংস্কারক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩

মুফাস্‌সিরে কুরআন আল্লামা মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খাঁন না'ঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রমুখের সাথেও গভীর সম্পর্ক ছিল।

## ১.৮ খিলাফত প্রদান ও প্রসিদ্ধ কয়েকজন খলিফার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া তথা তরীকতের কার্যক্রম যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সিলসিলার মাশায়িখ হযরাতের ইশারায় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় সাহেবযাদাদ্বয় যথাক্রমে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মুদ্দাযিল্লুহুল আলী ও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মুদ্দাযিল্লুহুল আলীকে সিরিকোট দরবার শরীফে খেলাফত প্রদান করেন।[৪৪] বর্তমানে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মুদ্দাযিল্লুহুল আলী স্বীয় সম্মানিত পিতা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছেন। অতঃপর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া সিরিকোট শরীফে আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আলকাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আলহাজ্ব আমীনুর রহমান আলকাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং আলহাজ্ব ওয়াজের আলী আলকাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকেও খিলাফত প্রদান করেছেন। উপরোল্লোখিত খলীফাত্রয় তাঁর জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বার্মা সফরের সময় ইসমাঈল মুহাম্মদ দাউদজী বাগিয়া নামক এক বুযুর্গ ব্যক্তিকে ক্বাদিরিয়া আলিয়ার খেলাফত প্রদান করেন।[৪৫] তদুপরি, পেশওয়ার নিবাসী পীরযাদা সৈয়্যদ সা'ঈদুর রহমান শাহ্‌কেও খেলাফত দানে ধন্য করেছেন।[৪৬] নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি :

### ক. আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.)

তিনি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জিলার সিরিকোট গ্রামস্থ সৈয়্যদাবাদ শরীফে সম্ভ্রান্ত সৈয়্যদ পরিবারে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪৭] তবে তাঁর খাদিম জনাব হাজী মুহাম্মদ রশীদুল হকের মতে, ১৯৪১ সনটি যথাযথ। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র ৪০তম বংশধর। তিনি স্বদেশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও তাফসীর, হাদীস, আকাঈদ, ফিক্‌হ ও উসূল প্রভৃতি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে মাত্র কয়েক বছরে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন পিতামহ আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)ও পিতা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) প্রমুখ। অধিকন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র তাওয়াজ্জুহ্‌তে তিনি সবিশেষ লালিত-পালিত হন। তিনি দ্বীনি জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আধুনিক সাধারণ জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। পরে গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এফ.এস.সি.তে ভর্তি হন এবং ফাইনাল পর্যন্ত অধ্যয়ন করে চিকিৎসা শাস্ত্রে

---

৪৪. ড. মুস্তাফা কামাল সম্পাদিত, *জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

৪৫. মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, *সিরিকোট থেকে রেঙ্গুন*, (চট্টগ্রাম : চাটগাঁ প্রকাশনা, ২০১৫), পৃ. ৯৭

৪৬. আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান বলেন, ২০ জুন, ২০০৩ বর্তমান হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুল আলীকে সিরিকোট দরবার শরীফে বলতে শুনেছি যে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় সাহেবযাদাদ্বয় ব্যতীত পাকিস্তানে একমাত্র পীরযাদা সা'ঈদুর রহমান কাদেরীকে তরীকতের খিলাফত দান করেছেন।

৪৭. ড. আবদুল মাবুদ, *পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০১৬, পৃ. ৪১৯

প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। এ ছাড়াও আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির প্রকৌশলী ও কারিগরীতে তাঁর জ্ঞান অবলোকণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদেরকেও অবাক করে দেয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞানার্জনের পর তিনি কঠোর ইবাদত-রিয়াজতে মনোনিবেশ করেন।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতামহ আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র রওযা মুবারক যিয়ারত করতে উপস্থিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, আগামীতে আসার সময় প্রিয় নাতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্কে যেন নিয়ে আসা হয়।[৪৮] পরবর্তী সময়ে আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) তাঁকে সাথে নিয়ে গিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। তিনিই আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র পরে এ সিলসিলার হাল ধরেন এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতির শিখরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি হজ্জ পালনকালে 'আরাফার ময়দানে' পিতামহ আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র হাতে বায়'আত গ্রহণ করে মনোজগতকে সমৃদ্ধ করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় পিতা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) হতে খিলাফত প্রাপ্ত হন।[৪৯] বর্তমানে দেশ-বিদেশে এক কোটির অধিক লোক তাঁর সিলসিলার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তরিকত চর্চা করে যাচ্ছেন।

এ সিলসিলার গুরু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে হযরত তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.)'র মর্যাদা হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ন্যায় তুলে ধরা হয়েছে ও তাঁকে ইমামতির নির্দেশ দান করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) হতে যাঁরা খিলাফত লাভ করেছেন, তাঁদের মাঝে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.)'র অবস্থান শীর্ষে। অধিকন্তু তিনি শায়খের পরে তাঁর উপর অর্পিত বিশেষ গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানে পারদর্শী এ মহান ব্যক্তি তাঁর এ জ্ঞান-গরীমাকে গোপন রাখতে সদা তৎপর থাকেন। কদাচিৎ প্রকাশ হয়ে গেলে সাথে সাথে তা স্বীয় পীর মাশায়িখের দিকে সম্পৃক্ত করে দেন। নিতান্তই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যবহ, ইহ ও পরকালের নির্দেশনাপূর্ণ সমুচিত তাঁর বক্তব্য অনন্য।

তিনি একাধারে সাত বছর বিনিদ্র ইবাদতে মশগুল ছিলেন। যে দিন তাঁর পিতা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) এ পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করেন, সে দিনের আগের রাতে তাঁর পিতা স্বীয় বিছানায় তাঁকে নিদ্রা যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি ইতস্তত: বোধ করলে পিতার কঠোর নির্দেশে শুয়ে পড়ার সাথে সাথে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। মধ্যরাতে হঠাৎ যখন তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর পিতা তাহাজ্জুদের নামায আদায়রত। পিতার ইন্তিকালের পর সেই রাতে ঘুমের কারণে অযূর পানির ব্যবস্থা করার সুযোগ না হওয়ায় আপনজনের কাছে তাঁকে আফসোস করতে দেখা গেছে অনেক বার। আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের মাধ্যমে পিতার খিদমতে বিনিদ্র রাত যাপন এ যুগে সত্যই বিরল।

৪৮. *মাসিক তরজুমান,* ১৩তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৪৯. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

যেখানে খ্যাতনামা ওলামাদের জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ওয়াজ-তাকরীর করে দু'একজনকে হিদায়ত করা দূরহ; সেখানে তাঁর এক পলক দৃষ্টিতেই হাজার হাজার মানুষ হিদায়ত গ্রহণ করা, নামাযী-তাহাজ্জুদ গুজারী হওয়া এবং দ্বীন-মাযহাবের খাদেমে পরিণত হওয়া সত্যিই তাঁর কারামত বৈ কিছু নয়। হিদায়ত দানে তাঁর এ প্রক্রিয়াটি খাজা গরীবে নাওয়ায মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)'র তাবলীগের ধারার সাথে মিলে যায়।

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্'র শ্রদ্ধেয় পিতা মাঠ পর্যায়ে ইসলামের জন্য যে সংস্কার কর্ম করে গেছেন, তিনি তাতে নিরবে খিদমত আন্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। পিতার ইন্তিকালের পর সিলসিলা ও আধ্যাত্মিকতার এ সব বাগানে এবং এ দেশের সুন্নীয়তের ময়দানে যে সকল আগাছা-পরগাছা গজে উঠেছে, তা তিনি সুনিপুনভাবে অপসারন করে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মন ও মানসিক অবস্থাতে বেশ গুরুত্বারোপ করেন। মহান আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তাঁর দৃঢ় আস্থা, প্রেম-প্রীতি ও সম্মান তাঁর পথ্য, সুন্নাত ও সুন্নীয়ত তাঁর জীবনধারা, নিবৃত্তে ইবাদত-বন্দেগী ও জ্ঞানচর্চা তাঁর সাধনা, শান্ত-শিষ্টতা তাঁর অভ্যাস এবং নিরব প্রয়াস তাঁর কর্মপন্থায় পরিগনিত। তাই রিয়ামুক্ত সাদাসিধে দিনাতিপাত তাঁর সহজাত অভ্যাস। একই সাথে গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)'র সাথে তাঁর নিগূঢ় সম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ হতে পিতার নির্দেশক্রমে সিলসিলার প্রচার-প্রসার কাজে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন তিনি। তাঁর সান্নিধ্য প্রাপ্তদের মতে- তিনি স্বীয় জযবাত, কামালিয়াত ও ভক্তদের আবেগোচ্ছাসকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে তিনি আপোষহীন। শরী'আতের অনুসরণ-অনুশীলন, পাকাপোক্ত ইয়াকীন ও ইখলাস-মুহাব্বত তাঁর অনন্য তালিম। তাই তো হাজার মানুষের ভীড়ের মাঝে দূরে-কাছের এ সব আমলে সচেষ্টদের প্রতি সমানভাবে তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ হওয়া সত্যিই বিস্ময়কর। এ জন্য আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) বলেছিলেন- 'এমনও সময় আসবে তাঁকে দূর হতে এক নজরে দেখাটাও মহা মূল্যবান অনুভূত হবে'।[৫০]

### খ. আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ (মু.যি.আ.)

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এবোটাবাদ শেতালু (হাজারা) সিরিকোট গ্রামস্থ সৈয়্যদাবাদ শরীফে সম্ভ্রান্ত এক সৈয়্যদ পরিবারে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ জন্মগ্রহণ করেন।[৫১] তাঁর পিতা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)এবং তাঁর দাদা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)। তিনি বাল্যকাল থেকে অতি মেধাবী ও সৎচরিত্রের অধিকারী। শিশুকালে তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কৈশোরে স্থানীয় মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। পাকিস্তানের এবোটাবাদ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শরী'আহ্ বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ করেন। পরবর্তীতে কুরআন,

৫০. ড. আবদুল মাবুদ, *ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার অবদান* (অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২১৭

৫১. ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম, *আল্লামা আব্দুর রহমান চৌহরভী (রহ.) ইসলামী শিক্ষা ও আরবী সাহিত্য তাঁর অবদান* (অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ) ইসলমি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, পৃ. ৫০

হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, উসূল, নাহ্‌ভ, সার্‌ফ, মানতিক, বালাগত, আকাঈদ, দর্শন, হিকমত, ফালসাফা, তাসাওউফ, মা'রিফাত, তারিকত, সাহিত্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৫২]

বাল্যকাল থেকে তিনি নির্মল, অনিন্দ্য সুন্দর ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবন সুন্নাতে রাসূল'র বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, চাল-চলন, নৈতিকতা-মানবতা, উদারতা-বদান্যতা ও সহনশীলতায় তিনি সর্বস্তরে গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব। ইসলামি আদর্শের যথার্থ অনুশীলন সুন্নাতে নববীর অনুকরণ, মসলকে আ'লা হযরত ও মাযহাবে হানাফীর অনুসরণে তিনি অটল, অবিচল ও দৃঢ় প্রত্যয়ী। ইসলামি শরী'আত ও জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধ হওয়া তিনি বাতেনী জগতকে সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে তাঁর আব্বাজান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন।[৫৩]

তিনি ইবাদত-বন্দেগী, যিকর-আযকার ও রিয়াযত এর মাধ্যমে সূলূক ও তরীকতের সূধা পানে পরিতৃপ্ত হন। বুযুর্গ পিতা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত প্রদান করে তাকে 'পীরে বাঙ্গাল' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার যোগ্যতম স্থলাভিষিক্ত করে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। তিনি স্বীয় পিতার সাথে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আগমন করেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার আগমন করেন।[৫৪] এরপর তিনি বহুবার বাংলাদেশ আগমন করেন।

তিনি ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঁচবার স্থানীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়লাভ করেন। তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান মুসলিম লীগের দলীয় প্রার্থী হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়লাভ করে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন।[৫৫] পরবর্তীতে পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ববার গ্রহণ করে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাওয়ায শরীফের রাজনৈতিক উপদেষ্টা হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষভাবে আলোচিত হন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানের মুসলিম লীগ এর সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ (মু.যি.আ.) বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সফর করে ইসলামের আদর্শ বিস্তারে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর আহবানে আন্‌জুমান ট্রাস্ট পরিচালনাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি দা'ওয়াতে খায়র প্রবর্তন করে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদের তত্ত্বাবধানে 'তারবীয়াত বা প্রশিক্ষণ এবং গাউসিয়া তারবীয়াতি নিসাব অনুযায়ী দর্‌স দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞ 'উলামা-ই কিরাম ও দক্ষ প্রশিক্ষকরা নির্দিষ্ট সেশনে

---

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৫৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আন্‌জামে-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাষ্টের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৪২৭

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮

প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করেন। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ-এর শাখা কমিটির কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত সূচী ও সেশন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকেন।

**গ. আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ আল কাদেরী (রহ.)**

আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ আল কাদেরী (রহ.)১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বাকলিয়ার চরচাক্তাই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাযহাব, মিল্লাত, শরীয়ত, তরীকত তথা সামাজিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁর সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা তাঁকে মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তরীকতজগতে অকৃত্রিম খেদমত আন্জাম দানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সিরিকোট দরবার শরীফ হতে আল কাদেরী উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তৎকালিন চট্টগ্রামের পৌরসভার কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন। একই সময়ে বক্সিরহাট মার্চেন্ট ডিফেন্স কমিটির সভাপতি, চট্টগ্রাম বন্দর ট্রাস্ট'র সম্মানিত সদস্য। জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদের একজন প্রতিষ্ঠাতা গভর্ণর। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান সোয়াবিন ও তুলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, চট্টগ্রাম বণিক সমিতির অন্যতম সদস্য সহ অসংখ্য স্কুল কলেজ, এতিমখানা হেফযখানা, মক্তব-মাদ্রাসা, সেবামূলক সংগঠন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) কর্তৃক জামেয়া প্রতিষ্ঠাকালে জনাব নূর মোহাম্মদ আল কাদেরী জামেয়া নির্মাণকল্পে, প্রয়োজনীয় সব লোহা ও সিমেন্ট প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে বদান্যতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বলুয়ার দীঘির পাড়স্থ তাঁর বাস ভবনের তৃতীয় তলা 'খানকাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া' নামে এক বিশাল খানকাহ্ শরীফ মিল্লাতের জন্য উৎসর্গ করেন। তরীকতপন্থী সুন্নী মুসলিম ভাইদের সরব পদচারণায় জিক্‌রে এলাহী এ না'তে মুস্তাফার ঝংকারে যা সদা মুখরিত। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ১৪০০ হিজরীতে ১৯ শে মুহররম সোমবার এ ইন্তিকাল করেন।[৫৬]

**ঘ. আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর (রহ.)**

আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর (রহ.)১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ২ ডিসেম্বর নোয়াখালী জেলার তালুয়া চানপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শরী'আত-তরীকতের প্রচার-প্রসারে নিবেদিত প্রাণ এই ব্যক্তি আজীবন জামেয়া ও আন্জুমানের খেদমত করে যান। আন্জুমানের কোষাধ্যক্ষ পদে নিষ্ঠার সাথে আজীবন দায়িত্ব পালন করেন। হযরত সিরিকোটি (রহ.)'র অগণিত মুরীদানের মধ্যে তিনি ছিলেন ফানা ফিশ শায়খ এর মর্যাদায় উত্তীর্ণ। নিজ গ্রামে সুন্নীয়তের প্রচারকল্পে মুহাম্মদিয়া তৈয়্যবীয়া নামে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই মার্চ নশ্বর দুনিয়া হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। স্বীয় পীর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ইমামতিতে তাঁর নামাযে জানাযা সম্পন্ন হয়।[৫৭]

**ঙ. আলহাজ্ব আমিনুর রহমান আলকাদেরী (রহ.)**

আলহাজ্ব আমিনুর রহমান আলকাদেরী (রহ.)১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার চান্দগাঁও থানার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ৫০ এর দশকের প্রথমভাগে তিনি হযরত

---

৫৬. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

সিরিকোটি (রহ.)'র মোবারক হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। ইবাদত, রিয়াযত, মোরাকাবা, মোশাহাদা, মুর্শিদের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসায় তিনি মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন হন। হুযূর (রহ.) কর্তৃক খেলাফতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। আজীবন রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত সুন্নীয়তের সুতিকাগার জামেয়া কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া ও ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার খেদমত করে যান। পীর-মুর্শিদের নির্দেশে জশ্নে জুলূছে সদারত করার বিরল সম্মান ও অর্জন করেছিলেন তিনি। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৬ই এপ্রিল মহান প্রভূর সানিধ্যে চলে যান।[৫৮]

### ১.৮.১ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারামাত

কারামত ( كرامة ) শব্দটি كرم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দয়া, অনুগ্রহ। সুতরাং কারামত হল, মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতি অতি গোপনীয় সম্মানজনক দয়া ও অনুগ্রহ বিশেষ। এটি অলি-বুযুর্গদের হতে প্রকাশিত এবং প্রচলিত রীতি-নীতির ব্যতিক্রম নৈসর্গিক বিষয়। কেবল সুন্নী-মুমিন-মুত্তাকীই এ সুপ্ত ক্ষমতা লাভ করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ও মহানবী'র সুন্নাত অনুসারী হওয়াই তাঁর জন্য মূখ্য, বাকী সব তাঁর নিকট গৌণ হয়। যখন এ কারামত সংঘটিত হয়, তখন সংশ্লিষ্ট অলি তা সংঘটিত করার জন্য প্রস্তুত নাও থাকতে পারেন। এমনকি তৎক্ষমতা সম্পর্কে তিনি অবগত নাও হতে পারেন। এ ব্যাপারে অবগত হলেও তিনি সেই কৃতিত্বের দাবীদার হবেন না; বরং সংঘটিত কারামত স্বীয় রাসুল ও শায়খগণের দিকে সম্পৃক্ত করে দিবেন এবং নিজ সুপ্ত ক্ষমতা গুপ্ত রাখতে সচেষ্ট থাকবেন। তা এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে মুহাব্বত করে এ নি'আমত দান করেন। তাছাড়া মুহাব্বত হল গোপন বিষয়।

মূলত এ সুপ্ত ক্ষমতাকে গোপন রাখাই মু'জিযা ও কারামতের পার্থক্য নিরূপণ করে। অধিকন্তু এ অলৌকিকত্ব ঐ অলির স্বীয় রাসুলের রিসালাত ও নুবুয়্যতকে প্রমাণ করে। এ দিক বিচারে কারামত হল মু'জিযার পরিপূরক। ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী'র (রহ.)মতে, "প্রত্যেক অলির কারামত নবী-রাসূলের মু'জিযা রূপে গণ্য।"[৫৯]

নবী-রাসূল হতে প্রকাশিত হয় মু'জিযা আর অলি আল্লাহ্ হতে প্রকাশিত হয় কারামত রূপে। এমনকি একই ধরণের কারামত একাধিক অলির মাঝেও প্রকাশ হতে পারে। মহানবী'র মু'জিযা কিন্তু তিনি ছাড়া অন্য কারো হতে তা সম্ভব নয়। বস্তুত এ সব অলৌকিক বিষয় প্রকাশ করেন আল্লাহ্ তা'আলা। নবী-রাসূল ও অলি হলেন এ সবের প্রকাশস্থল। এ জন্য অলিগণের কারামত তাঁদের ইন্তিকালের পরও প্রকাশিত হয়।

বস্তুতনবী-অলিগণের কোন কর্মকাণ্ড তাদের ইচ্ছাতে হয় না। তাঁদের ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাতে পরিগণিত, আর তাঁরা যা ইচ্ছা তা কার্যকর করার ক্ষমতা রাখেন এবং করেনও। তাই নবী-রাসূলগণ মা'সুম (নিষ্পাপ) এবং অলিগণ মাহফুয (সংরক্ষিত) হয়ে থাকেন। কারামত ইন্দ্রজাল হতে মুক্ত। বহি:র্জগতের বস্তুসমূহের উপর আত্মিক ক্ষমতা লাভের নির্দশন মাত্র। কারামতের কোন কিছুই শির্ক নয়। পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত হযরত মারয়াম (আ.)'র নিকট বদ্ধকক্ষে অমৌসুমী

---

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

৫৯. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইয়াফি'ঈ, *কাসাসুল আউলিয়া*, উর্দু অনুবাদক আশরাফ আলী থানবী (ইন্ডিয়া : মাকতাবাত-ই থানবী দেওবন্দ, ১৯৯৫) খ. ১, পৃ. ৬৪

ফলাদি ও খাবার আসা,[৬০] শত বছরের মৃত খেজুর গাছ তাঁরই স্পর্শে মুহূর্তে ফলন্ত গাছে পরিণত হওয়া,[৬১] হযরত সোলায়মান (আ.)'র উম্মত আ-সিফ বিন বরখিয়া কর্তৃক রাণী বিলকিসের আশি টন ওযনের সিংহাসন এক পলকে তৎকালের দু'মাসের দূরত্বের পথ ইয়ামেন হতে সিরিয়াতে নিয়ে আসা[৬২] এবং আসহাবে কাহাফ গুহায় ঘুমিয়ে পড়া ও পানাহার ছাড়াই শত শত বছর পর অবিকল জাগ্রত হওয়া[৬৩] ইত্যাদি ঘটনা দ্বারা কারামতের সত্যতা ও বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়।[৬৪]

সকল সুন্নী মুসলমান এ সব ঘটনা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। ইবন সীনা ও ইবন খালদুনের মত দার্শনিকরাও অকপটে কারামতের যথার্থতার পক্ষে জোরালো মত পোষণ করেন।[৬৫] পবিত্র

---

৬০. মহান আল্লাহ্ বলেন-

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشأ بغير حساب-

"যখন যাকারিয়া তাঁর (মারয়াম) নিকট মিহরাব তথা নামায পড়ার স্থানে যেতেন, তখন তাঁর নিকট নতুন রিযিক্ব তথা অমৌসুমী ফল পেতেন। তিনি বললেন, মারয়াম ! এ গুলো তোমার নিকট কোত্থেকে আসল ? উত্তর দিল, সেটা আল্লাহ্'র নিকট থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অগণিত রিযিক্ব দান করেন। (আল কুরআন, ০৩ : ৩৭)

৬১. মহান আল্লাহ বলেন-

فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا و هزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى و اشربى و قرى عينا

তারপর তাঁকে (মারয়াম) প্রসব বেদনা একটা (শুষ্ক) খেজুর বৃক্ষমূলে নিয়ে আসল, সে (বেদনাকাতর হয়ে) বলে উঠল, 'হায় ! আমি যদি কোন মতে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম।' অত:পর তাঁকে (উপত্যকার) পাদদেশ হতে একজন আহবান করল, 'তুমি দু:খ কর না, নিশ্চয় তোমার প্রভু তোমার পাদদেশে (মিষ্ট পানির) ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। তুমি (শুষ্ক) খেজুর বৃক্ষের গোড়া ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তখন তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুরসমূহ ঝড়ে পড়বে। সুতরাং তুমি খাও, পান কর ও চক্ষু জুড়াও।" (আল কুরআন, ১৯:২৩-২৬)

৬২. قال يايها الملؤا ايكم يأتينى بعرشها قبل ان يأتونى مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك و انى عليه لقوى امين قال الذى عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى أاشكر ام اكفر و من شكر فانما يشكر لنفسه و من كفر فان ربى غنى كريم

"সুলায়মান (আ.) বললেন, হে সভাসদবর্গ, তোমাদের মধ্যে কে আছ ! যে তাঁর (রাণী বিলকিসের) সিংহাসন আমার নিকট সে অনুগত হয়ে উপস্থিত হওয়ার আগে নিয়ে আসতে পার ? এক দুষ্ট জ্বীন বলল, ( এ সভা সমাপ্তিতে) হুযূর নিজ আসন হতে দাঁড়ানোর পূর্বে আমি ওটা নিয়ে আসতে পারব। নি:সন্দেহে আমি সে-টা করার ক্ষমতা সম্পন্ন বিশ্বস্থ হই। আর যার নিকট পবিত্র গ্রন্থের জ্ঞান ছিল, তিনি (আসিফ বিন বারখিয়া) বললেন, হুযূরের সমীপে আমি পেশ করব (আপনার চোখের) পলক (বন্ধ করে) পুণরায় খোলার আগে। অত:পর যখন তিনি (সুলায়মান আ.) সে-টা তাঁর নিকটে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার প্রভু বিশেষ কৃপা, যাতে তিনি পরীক্ষা করে নেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি না অকৃতজ্ঞ হই ! বস্তুত: যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে স্বীয় কল্যাণে করে আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, তবে জেনে রাখা দরকার; আমার প্রভু কারো মুখাপেক্ষী নন, পরম করুণাময় সমস্ত প্রশংসার অধিকারী।" (আল কুরআন, ২৭:৩৮-৪০)

৬৩. و كذالك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة

আর এভাবেই আমি তাদেরকে (গুহাবাসীদের দীর্ঘ মেয়াদকালের পর) জাগরিত করলাম; যাতে তাঁরা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, একদিন কিম্বা একদিনের কিয়দাংশ। অন্যরা বলল, তোমাদের অবস্থান সম্পর্কে তোমাদের প্রভু সর্বাধিক অবগত আছেন। সুতরাং তোমাদের কাউকে এ রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে নগরে প্রেরণ কর। (আল কুরআন, ১৮:১৯)

৬৫. আ.ফ.ম.আবদুল হক ফরিদী, *মাদরাসা শিক্ষা বাংলাদেশ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২০

কুরআনে বর্ণিত কারামত সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো নিঃসন্দেহে মুহকামের (বিধিবদ্ধ) অন্তর্ভূক্ত, যা অস্বীকার করা কুফরী। অনুরূপ এ সব আয়াত যে কেউ বিশ্বাস করে অথচ স্বযুগে বা আল কুরআনে উল্লিখিত নয়; মহানবীর যুগের পরে প্রকাশিত কারামত অস্বীকার করাও গোমরাহী।

বাস্তবিক পক্ষে, নবীর জন্য মু'জিযা প্রকাশ করা অপরিহার্য হলেও অলি নির্ণয়ের জন্য কারামত প্রকাশ হওয়া অপরিহার্য নয়। এটি তাঁদের অপরাপর নিদর্শনাবলীর একটি মাত্র। এ কারণে রাসূলের সুন্নাত ও প্রবর্তিত ধর্মীয় আইন পালনে অবিচল থাকাই প্রকৃত কারামত ও কামালিয়্যাত। যেহেতু অনেক সময় যুগের প্রচলিত ধারায় এ আদর্শ ধারণ করা দুর্বোধ্য, দূরহ এবং অস্বাভাবিকও হয়ে থাকে। কেবল আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ কৃপায় তা পালনে অটল থাকা সম্ভব। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী (রহ.)বলেন-"কারামত দু'ধরনের। **(ক)** অনুভবগত (حسى), সাধারণ মানুষ এটাকে কারামত মনে করে। যেমন: অদৃশ্য ও ভবিষ্যতের খবর প্রদান করা, তাৎক্ষনিক দু'আ কবুল হওয়া ও জাগতিক নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য সিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি।

**(খ)** বোধগম্য (معنوى), নির্দিষ্ট লোকই এ সম্পর্কে অবগত। যেমন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শরী'আত ও সুন্নাত অনুসরণ এবং অনুশীলনে অধিকতর আগ্রহী হওয়া, তৎবিরোধী কার্যকলাপ ঘটে যাওয়া থেকে সদা শংকিত থাকা, সাধারণ মুসলমানের মত শরী'আতের বিধান পালন বজায় রাখা ও ষড়রিপুকে পরিশুদ্ধ করে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্ন থাকা।" [৬৬]

সুতরাং, শরী'আত ও সুন্নাত পালনে যতই ঘাটতি হবে, ততই পূর্ণতায় কমতি হবে। কেননা, রাসূলের মত কোন নবী-অলি-ফেরেশ্তা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করেন নি এবং করতেও পারবেন না। তারপরও তিনি শরী'আতের বিধান বজায় রেখেছেন, ঘর-সংসার করেছেন, দেশ-দশের সেবা করেছেন, সমাজ পরিচালনা করেছেন এবং মানুষের নিকট দ্বীন-মাযহাবের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। অতএব এভাবে সকলের সাথে বসবাস করে শরী'আত অনুসরনের মধ্য দিয়ে তরীকত চর্চার মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। এটাই তো কারামত।

সত্যিকার আউলিয়া-ই কেরামের জন্য কারামত গোপন রাখা পূর্বশর্ত। অবশ্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র অলিগণের যে সব কারামত প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা শরী'আত সম্মত। আল্লাহ্‌র প্রকৃত অলিগণের কারামাত দেখে সাধারণ মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং ইসলামের সত্যতা বুঝতে পারে। এমনিভাবে আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে অসংখ্য কারামত প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলো তাঁর অধ্যাত্মিক জগতে পরিপূর্ণতা অর্জনের বাস্তব প্রমাণ বহন করে। তাঁর ৭৭ বছরের জিন্দেগী ছিল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জীবনাদর্শের এক বাস্তব মডেল। সুন্নাতে রাসূলের যথার্থ অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। বিলায়ত ও কামালিয়াতের সুমহান মর্যদায় অধিষ্ঠিত এ মহান অলি সর্বদা নিজেকে গোপন রাখতেন। শরী'আত, তরীকতও সুন্নিয়াতের খিদমতে বিভিন্ন দেশ সফরকালে মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে তাঁর অসংখ্য কারামাত তথা অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে। জন্মলগ্ন হতেই তাঁর উচ্চ মর্যাদার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর কতিপয় করামত নিম্মে উল্লেখ করা হলো-

**এক.**

হাজী হাবিবুর রহমান কাদেরী, (পেশওয়ার, পাকিস্তান) বর্ণনা করেন,

> ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। ওই বছর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ সাহেব সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পীর সাবের শাহ্ সাহেব আল্লামা সৈয়্যদ

---

৬৬. শায়খ আবদুল ক্বাদির ঈসা আল শা'যলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৬

মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র খলিফা পীরযাদা সা'ঈদুর রহমানকে হজ্জ ও যিয়ারতের জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) রুপিয়া প্রদান করেছেন। সা'ঈদুর রহমান সাহেব আমাকে বললেন, তুমিও পীর সাবের শাহ্'র নিকট সাক্ষাৎ কর যেন তোমারও হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায় এবং আমরা উভয়ে একসাথে হজ্জ ও যিয়ারতে চলে যাব ইনশাল্লাহ! এদিকে আমারও হজ্জে যাওয়ার একান্ত আগ্রহ। অত:পর আমি পীর সাবের শাহ্ হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি বললেন এ বছর সরকারী কোটা শেষ হয়ে গেছে। এ বছর তোমার হজ্জে যাওয়া সম্ভবপর নয়। পীরযাদা সা'ঈদুর রহমান ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে হজ্জে চলে গেলেন। আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম, সে রাত্রেই আল্লামা সৈয়্যদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)স্বপ্নে সান্ত্বনা প্রদান করে আমাকে বললেন-"দুঃখের কোন কারণ নেই, সা'ঈদুর রহমান সাহেব হজ্জে আগে গেছেন; তোমার নাম্বার পরে আসছে। আরো শুভ সংবাদ দিলেন তুমি আগামী ৩ বছর অবশ্যই হজ্জ ও যিয়ারতে মদিনায় গমন করবে। শান্ত হয়ে যাও"। আশ্চর্য কারামাত। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে আমার হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল; অথচ আমার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। অনেক কর্জও ছিল। হজ্জের ওসীলায় তাও পরিশোধ হয়ে গেল। ঘটনাটি ঘটেছিল হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ইন্তিকালের এক বছর পর।[৬৭]

**দুই.**

হাজী হাবিবুর রহমান কাদেরী, (পেশওয়ার, পাকিস্তান) আরো বর্ণনা করেন-

১৯৭৯ খ্রি. জুলাই মাসে আমার শাদী হয়। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে সে বিবাহে দাওয়াত করা হল। তিনি সাহেবযাদা হযরত সৈয়্যদ কাসেম শাহ্কে সাথে নিয়ে আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। তিনি আক্দের খুতবা পাঠ করেছেন। মহল্লার ইমাম মরহুম মাওলানা আবদুল হক মনে মনে বললেন, আজ ২০ রুপিয়া থেকে বঞ্চিত হলাম। তখনকার সময়ে আমাদের এলাকায় আক্দের হাদিয়া ২০ রুপিয়ার বেশি ছিল না। আর তিনি হুযূর ক্বেবলার সাথে ভালভাবে পরিচিতও ছিলেন না। তিনি আক্দ পড়ানোর পর উক্ত ইমাম সাহেবকে ২০০ রূপিয়া হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করলেন। ইমাম সাহেব আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন যে, তিনি আমার অন্তরের খবর কিভাবে জানলেন ? আরো মজার ব্যাপার যে, হুযূর আমাকে ১ এর বদলে দশ হিসাবে ২০ এর বদলে ২০০ রূপিয়া প্রদান করলেন। তখন থেকে উক্ত ইমাম সাহেব হুযূরের ভক্ত হয়ে গেলেন এবং তাঁর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার সাথে একাধিক বার সিরিকোট দরবার শরীফ আসা যাওয়া করেছেন। যতবারই এসেছেন তিনি উক্ত ইমাম সাহেবেকে কিছু না কিছু হাদিয়া তোহফা পেশ করতেন। তিনি ইন্তিকালের সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন- বিয়েতে কোন কর্জ হয়েছে কিনা? আমি লজ্জায় 'না'

---

৬৭. সাক্ষাৎকার, হাজী হাবিবুর রহমান কাদেরী, তারিখ- ০৫.০৭.২০১৩ খ্রি.

বলেছি। বিদায়ের মূহূর্তে আমি হুযূরকে এক জোড়া কাপড় দিয়েছিলাম আর তিনি আমাকে ১৪০০/- (এক হাজার চারশত) রূপিয়া দান করলেন, যা দিয়ে আমার কর্জ পরিশোধ করার ব্যবস্থাও হয়ে গেল; অথচ কর্জের কথা আমি লজ্জায় স্বীকার করিনি। এভাবে তিনি স্বীয় মুরীদদের নিজ কৃপা ও দয়ায় হাজারো সমস্যা সমাধান করেন।[৬৮]

**তিন.**

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বাংলাদেশে সফরকালে শরী'আত ও তরিকতের প্রচার-প্রসার কল্পে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র দ্বীনি মাহফিলে তাশরীফ নিতেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি মাহফিল যেন একেকটি বিশাল সুন্নি করফারেন্স। এখানকার আলেম-ওলামা ও সুন্নি জনতার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেখানে বার্ষিক একটি সফল ও সার্থক অনুষ্ঠান এবং সমাবেশ করতে রীতিমত হিমশিম খেতে দেখা যায়, সেখানে হুযূরের সফরকালীন মাসব্যাপী দৈনিক একাধিক মাহফিলে সুন্নী জনতার ব্যাপক উপস্থিতি বিশাল কনফারেন্সকেও হার মানাতো। হুযূর অসংখ্য করামতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কারামতের কথা খুব প্রসিদ্ধ। তা হচ্ছে-

মাযারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 'সাধারণত: অলি প্রেমিকরা সম্মান বা ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। এ প্রচলিত রীতির যথার্থ অনুসরণে যানবাহন চালকরা যাত্রাপথে গাড়ি একটু আস্তে চালানোর প্রচলন রয়েছে। তাই একদা তাঁকে বহনকারী গাড়ির চালকও হযরত শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লিহি আলায়হি'র মাযারের পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়ি একটু আস্তে চালাতে চাইলে তিনি বললেন- "জরুরি নেহি।" অর্থাৎ থামানোর বা আস্তে চালানোর প্রয়োজন নেই। গাড়ি যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেল। এতে সকলের মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হল। হুযূর চালককে কেন নিষেধ করলেন ? কারো পক্ষে এর মর্ম বুঝা সম্ভব হয়নি। অনুষ্ঠান শেষে একই সড়ক দিয়ে তিনি ফেরার পথে চালককে গাড়ি থামাতে বললেন। তিনি ভক্তবৃন্দসহ গাড়ি থেকে নেমে হযরত শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মাযার যিয়ারত করলেন। যিয়ারত শেষে চট্টগ্রাম শহরে আসর পর হুযূরের প্রিয় শিষ্যদের কয়েকজন যাবার সময় নিষেধ করা, আর আসার সময় য়িয়ারত করার রহস্য জানতে চাইলে হুযূর বললেন, "আমরা যাবার সময় হযরত আল্লামা শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মাযার শরীফে নিদ্রারত ছিলেন বিধায় তাঁর সাথে দেখা করিনি, কিন্তু আসার সময় দেখতে পেলাম যে, তিনি জাগ্রত আল্লাহ্র অলিগণের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা ও পরিধি কত ব্যাপক ও বিস্তৃত তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। তিনি যে একজন কাশ্ফ বা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কামিল অলি ছিলেন, তা এ ঘটনার মাধ্যমে পুনরায় প্রমাণিত হল।[৬৯]

**চার.**

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি শরী'আত ও তরিকতের প্রচার-প্রসারে মায়ানমারের রেঙ্গুনেও অসমান্য অবদান রেখেছেন। তিনি জীবদ্দশায় বহুবার রেঙ্গুন সফর করেছেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে একটি কাফেলাসহ রেঙ্গুন সফরে রওয়ানা হলেন তিনি। আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক না'ঈমী সাহেব, আলহাজ্ব আমিনুর রহমান আল-কাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আন্জুমানের

---

৬৮. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল মরহুম আলহাজ্ব মুহাম্মদ জাকারিয়াসহ অনেকে এ কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মায়ানমারে তখন সামরিক শাসন চলছিল। বিমান বন্দরে কঠোর আইনের প্রয়োগ ছিল। যাত্রীদের তল্লাশীও কঠোরভাবে চলছে। জনৈক কাস্টম অফিসার প্রথমে আলহাজ্ব আমিনুর রহমান আল-কাদেরিকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ তল্লাশী চালান। পর্যায়ক্রমে সবার তল্লাশী চলছিল। হুযূরের তল্লাশীর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। কাস্টম কর্মকর্তা হুযূরকে নিয়ে তল্লাশী কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই কম্পিত অবস্থায় দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। পরবর্তীতে হুযূরসহ আর কাউকে তল্লাশী করা হল না।[৭০] কাফেলাসহ যাত্রীদের অনেকেই রেঙ্গুন বিমান বন্দরে এ আশ্চার্যজনক ঘটনা অবলোকন করলেন।

এদিকে হুযূরের আগমন বার্তা প্রচারের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি; তবুও রেঙ্গুন বিমান বন্দরে পদার্পনের সাথে সাথে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়ে গেল। রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জনাব ইসমাইল বাগীয়া কাফেলার সকলের প্রতি অকৃত্রিম খিদমত প্রদর্শন করলেন। রেঙ্গুনে হুযূরের মিশনকে সফল করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। হুযূর তাঁকে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করলেন। হুযূরের নির্দেশে তিনি রেঙ্গুনস্থ তেঙ্গানজো নামক স্থানে খান্‌কা-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া নামে সেগুন কাঠের একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেন। তরীকতের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে নির্মিত এ খানকাহ্ শরীফ বর্তমানে মায়ানমার ও রেঙ্গুনের তরিকতপন্থী মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

**পাঁচ.**

আলহাজ্ব মাওলানা নূর মোহাম্মদ ছিদ্দিকী বলেন-

> ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রাহামাতুল্লাহি আলায়হি'র বাংলাদেশ সফরের মেয়াদ শেষ। তিনি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম হতে ঢাকায় রওয়ানা হয়ে গেছেন। ইত:মধ্যে আমার বন্ধু ফরিদ আহমদ চৌধুরী আমাকে এসে বললেন যে, তিনি আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র হাতে বায়'আত গ্রহণ করবেন। আমি আমার বন্ধু ফরিদকে বললাম, হুযূর এতদিন চট্টগ্রামে অবস্থানকালে তুমি তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করো নি। আর এখন কিভাবে সম্ভব ? হুযূর আগামীকাল পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবেন। বন্ধু ফরিদের অন্তরের দৃঢ়তা দেখে রাতেই আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ি। উল্লেখ্য যে, ইত:পূর্বে আমরা কোনদিন ঢাকায় যাইনি। ঢাকার কোন এলাকা সম্পর্কেও আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। রাত ২টায় আমরা ঢাকার কমলাপুর ষ্টেশনে পৌঁছি। টেক্সিযোগে মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া মাদ্‌রাসায় গিয়ে খোজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)খানকাহ শরীফে অবস্থান করছেন। মাদ্‌রাসা-কমিটির একজন লোক বললেন, সম্ভবত হুযূর ক্বেবলা ফযরের নামাজ মসজিদে পড়াবেন এবং নামাযের শেষে বায়'আত করাবেন। রাত গভীর হওয়ায় খাবারের দোকান বন্ধ। একদিকে ক্ষুধার যন্ত্রণা, অন্যদিকে নতুন জায়গা। সব কিছু মিলে চরম পেরেশানী। তারপরও বায়'আত গ্রহণের জন্য ভোর পর্যন্ত

৭০. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

> অপেক্ষা করলাম। ফজরের নামাযে সত্যই হুযূর তাশরীফ আনলেন। নামায শেষ হল। এখন বায়'আতের কাজ। আমি (নূর মোহাম্মদ সিদ্দিকী) ও ফরিদ আহমদ চৌধুরী বায়'আত গ্রহণের জন্য পেছনের সারিতে বসলাম। হঠাৎ হুযূর তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)হাতের ইশারায় বায়'আত পরিচালনা কাজে রত একজনকে নির্দেশ দিলেন, পেছনের সারির দু'জন যুবককে সামনের সারিতে আসতে বলো। তখন আমরা দু'জনের চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলাম না। আমরা বুঝতে পারলাম, আমরা যে ক্ষুধার যন্ত্রণা ও যাতায়াতের কষ্টদায়ক অবস্থা অতিক্রম করে এসেছি, তা হুযূরের অজানা ছিলনা। সেদিন আরো বুঝতে পারলাম, বাস্তবে আল্লাহ্‌র অলিদের কারামত সত্য।[৭১]

**ছয়.**

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রকৃত অনুসারী অলিগণ রূহানী শক্তির প্রভাবে আলমে বরযখ বা কবর বাসীদের অবস্থা সম্পর্কেও জানেন। এটা তাঁদের বিশেষ কারামত। জ্ঞান-বিজ্ঞান যেখানে ব্যর্থ, সেখানে আল্লাহ্‌র অলিগনের রূহানী শক্তি কার্যকর। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে শেরে মিল্লাত মুফতী ওবাইদুল হক না'ঈমী সাহেবের ভাষায়, "একদা মুর্শিদে বরহক আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সাথে আমি, মরহুম আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ আল-কাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ছোট ভাই ও বড় ছেলে যথাক্রমে আলহাজ্ব আবদুল হাকিম ও আহমদ হাসান হযরত পীরে কাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মাযার শরীফে গমন করি। তিনি দীর্ঘক্ষণ ধ্যানে মগ্ন থাকেন এবং আমরাও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এরপর হুযূর কেবলার সাথে আমরা মোটর গাড়ি যোগে মাইসারা নামক স্থান হতে সিরিকোট দরবারে ফিরছিলাম। এমতাবস্থায় হুযূর কেবলা তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আমাকে উদ্দেশ্য করে যা বললেন তাঁর অনুবাদ হচ্ছে- "মাওলানা সাহেব, হয়ত আপনাদের কষ্ট হয়েছে যে, আমি পীরে কাঙ্গাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র দরবারে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম। আমি যখন গভীর ভাবে ধ্যানে মগ্ন ছিলাম, তখন পীরে কাঙ্গালের সাথে উর্দু ভাষায় কিছু নিবেদন করলাম। আর পীরে কাঙ্গাল পশতু ভাষায় উত্তর দিলেন; অথচ তিনি ইন্তিকাল করেছেন দীর্ঘদিন পূর্বে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞান মোটেই হ্রাস পায়নি; বরং বৃদ্ধি পেয়েছে।"[৭২] আল্লাহ্‌র অলিগণ যে স্বীয় মাযার শরীফে জীবিত এবং আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন-এটাই তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী সাহেব তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন।

**সাত.**

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি পেশোয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সংবাদ পেয়ে বাংলাদেশ থেকে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন ও জামেয়ার সম্মানিত শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক না'ঈমী সাহেব জিলক্বদ মাসের প্রথম সপ্তাহে পেশোয়ার গিয়ে পৌঁছলেন। হুযূরের সাক্ষাৎ লাভে তাঁরা আনন্দিত। ১০ জিলক্বদ বাদ যুহর

৭১. সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৭২. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

সাহেবজাদা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ মুদ্দাযিল্লুহুল আলী, শাহযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ কাসেম শাহ (মু.যি.আ), জনাব সোলাইমান বাম (করাচী) সহ সকলে এক সাথে হুযূরকে সহ একটি ভাড়া করা গাড়িতে করে পেশোয়ার হতে সিরিকোট শরীফের উদ্দেশ্য রওয়ানা হলেন। যাত্রাপথে আসরের নামায আদায়ের জন্য ড্রাইভারকে গাড়ি থামানোর জন্য বলা হলো। একাধিকবার বলা সত্ত্বেও ড্রাইভার সেদিকে কোন প্রকার কর্ণপাত করল না। দ্রুতবেগে গাড়ি চালাতে রইল। হঠাৎ বিকট শব্দ করে পিছনের চাঁকা ফুটো হয়ে গেলে ড্রাইভার গাড়ি থামাতে বাধ্য হল। গাড়ি থেকে নামা মাত্র স্থানীয় কিছু লোকজন হুযূরের দিকে দৌঁড়ে এলেন। হুযূর ক্বেবলাকে চিনতে পেরে তাঁরা কফেলার সবাইকে মিষ্টি, শরবত ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করালেন। আপ্যায়ন শেষে হুযূরের ইমামতিতে আসরের নামায আদায় করা হল। ইত্যবসরে ড্রাইভার তাঁর পরিচিত দোকান হতে একটি চাকা নিয়ে গাড়িতে লাগিয়ে দিল। পুরাতন চাকাটি মেরামত করে অতিরিক্ত চাকা হিসেবে প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য গাড়ির ভিতরে রেখে দিল। সিরিকোটের উদ্দেশ্যে পুনরায় দ্রুত বেগে রওয়ানা হলে। মাগরিবের নামায আসন্ন। এবারও ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলা হল ড্রাইভার পূর্বের ন্যায় কর্ণপাত করল না। মাগরিবের সময় শেষ হবার উপক্রম হল। আবার হঠাৎ ঠিকই বিকট শব্দ করে গাড়ির নতুন চাকাটি ফুটো হয়ে গেল। মাগরিব আদায়ের সুযোগ হল। হুযূর ক্বেবলার ইমামতিতে মাগরিরেব নামায আদায় করা হলো। এবার মেরামত কৃত দুর্বল চাকাটি লাগিয়ে দিল। রাত ৭.৩০ মিনিট। কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে যেন উধাও হয়ে গেল। প্রায় এক ঘন্টা পর আসলো হুযূর জিজ্ঞেস করলেন-কোথায় গিয়েছিলে? বললো, নতুন চাকার সন্ধান করতে। সিরিকোটের পাহাড়ী রাস্তা উঁচু-নিচু হওয়ায় সিরিকোট গমন বিপজ্জনক। তখন হুযূর কড়াভাবে বললেন, "ইয়ে পুরানা পায়া বহুত কমজোর হ্যায়, মগর সিরিকোট তক চলে গা। ইসলিয়ে কেহ্ হাম এশাকী নামায সিরিকোট পড়েঙ্গে।" অর্থাৎ এ পুরাতন চাকাটি খুব দুর্বল, কিন্তু এটা দ্বারা সিরিকোট পর্যন্ত যাওয়া যাবে। কারণ, আমরা এশার নামায সিরিকোট শরীফেই আদায় করবো।[৭৩] এবার কিন্তু ড্রাইভার রওয়ানা হল। যাত্রাপথে বিন্দুমাত্র অসুবিধা ছাড়াই নিরাপদে যথাসময়ে সিরিকোট শরীফে পৌঁছে গেল। ড্রাইভার হুযূরের মেহমান হিসেবে সিরিকোট শরীফেই রাত যাপন করল। সে যাত্রাপথে আসর ও মাগরিবের জন্য গাড়ি না থামানো পরিনতি বুঝতে পারলো। মহান অলির ওসীলায় নিশ্চিত মারাত্মক দুর্ঘটনার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টিও তাঁর বুঝতে বাকি রইল না। তাঁর গাড়ির প্রধান আরোহীর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার পরিধি কতটুকু ব্যাপক ও বিস্তৃত তা বুঝতে তাঁর বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না। সে কৃত অপরাধের ভুল স্বীকার করে তাওবা করল এবং বায়'আত গ্রহণ করে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো।[৭৪]

পরবর্তীতে জানা গেল যে, গাড়ির চালক শিয়া আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। তাঁর বিভ্রান্তির অবসান ঘটলো। অন্তরাত্মা তাঁর অলৌকিক আলোতে উদ্ভাসিত হলো। এভাবে অসংখ্য বিভ্রান্ত দিশেহারা পথভ্রষ্ট মানুষ হুযূরের কামালিয়াত ও রূহানিয়াতের প্রভাব দেখে নিজেকে হুযূরের চরণ তলে উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছে।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

৭৪. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

**আট.**

সুন্নীয়তের প্রসারকল্পে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শুভাগমনের স্মৃতি বিজড়িত রবিউল আউয়াল মাসে পবিত্র জশ্নে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর অনুষ্ঠানে এদেশে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলয়হি'র বাংলাদেশ আগমন ছিল সুন্নী মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। পক্ষান্তরে, নবীদ্রোহী বাতিল পন্থীদের জন্য তাঁর শুভাগমন ছিল মরণতুল্য। তাঁরা হিংসার আগুনে জ্বলতো, আর ষড়যন্ত্রের জাল বুনতো। তাই তাঁর আগমন বন্ধ করার ষড়যন্ত্র ছিল তাদের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবয়নের জন্য তাঁরা নানাবিধ অপপ্রচার, ভিত্তিহীন অভিযোগ ও বিদ্বেষপূর্ণ কুট-কৌশলের আশ্রয় নিত। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে রবিউল আউয়াল শরীফ আসন্ন। আন্জুমানের ব্যবস্থাপনায় তাঁরই সভাপতিত্বে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও জশ্নে জুলূস উদযাপিত হবে। লাখো লাখো আশিক্বে রাসূল, নবী-প্রেমিক মুসলমানদের আন্তরাত্মা আনন্দে উদ্বেলিত। শুরু হলো প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র। আগমন বন্ধ করার পাঁয়তারা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আন্জুমান কর্তৃপক্ষ কিছুই জানত না। কিন্তু তাঁর বেলায়তী শক্তিসম্পন্ন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বাতিলের অপতৎপরতা প্রত্যক্ষ করলেন। হুযূর জুলূসের কয়েক মাস পূর্বে আনজুমান কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত এক পত্রে রাষ্ট্রপতির সাথে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ যে বাতিলের যড়যন্ত্র মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন ছিল, আন্জুমান কর্তৃপক্ষ তা বুঝে উঠতে পারেন নি। জুলূসের কয়েকদিন পূর্বে জানা গেল যে, বাতিলপন্থীরা বাংলাদেশ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীসহ উচ্চ পদস্থ কিছু কর্মকর্তাকে প্রভাবিত করে হুযূরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে রেখেছে। তাঁরা পরিকল্পিত মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়ে বাংলাদেশে তাঁর আগমন বন্ধের অপপ্রয়াস চালিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যন্ত তাঁর ভিসা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করে রেখেছে। এদিকে আনজুমান প্রতিনিধি জনাব মরহুম আলহাজ্ব আইয়ূব আলী চৌধুরী হুযূরকে নিয়ে আসার জন্য সিরিকোট অবস্থান করছিলেন। তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ মিশনে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন যে, ভিসা দেয়া হবে না। আনজুমান কর্তৃপক্ষ এ খবর জানতে পেরে দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তাঁরা সচিবালয়ে গেলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে পরিস্কারভাবে জানানো হল যে, কোন অবস্থাতেই ভিসা দেয়া হবে না। প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ সম্পর্কিত হুযূর ক্বেবলার পূর্ব ঘোষণার মর্ম কর্তৃপক্ষ এখন বুঝতে সক্ষম হলেন। প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জনাব হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের সাথে দেখা করে জশ্নে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাহ্ফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু একই দিন ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আয়োজিত ঈদে মীলাদুন্নবী মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে রাষ্ট্রপতির দাওয়াত থাকায় উক্ত মাহফিলে উপস্থিত থাকতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। তবে পরবর্তীতে অন্য কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেলে যোগদান করবেন বলে আশ্বাস বাণী শুনালেন। আনজুমান কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতির কাছে হুযূরের ভিসা সংক্রান্ত সৃষ্ট জটিলতার ঘটনা তুলে ধরলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনিত সকল মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ বিশ্লেষণ সহকারে রাষ্ট্রপতিকে বুঝানো হলো। রাষ্ট্রপতি এরশাদ উপলব্ধি করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ ষড়যন্ত্রমূলক ও বিদ্বেষপ্রসূত। তাই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এ সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে ভিসা প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ মোতাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে ভিসা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন। টেলেক্সযোগে রাওয়ালপিন্ডির বাংলাদেশ মিশনে এ

নির্দেশ পাঠানো হলো। রোজ বুধবার ২.১৫ মিনিট রাওয়ালপিন্ডিস্থ বাংলাদেশ মিশন তাঁর ভিসা প্রদান করলেন। বাংলাদেশ আগমনের জন্য বিমানের টিকেট কনফার্ম করা ছিল। যথা সময়ে হুযূর বাংলাদেশে এসে পৌঁছলেন। প্রতীয়মান হলো, দুনিয়ার কোন অপশক্তি আউলিয়ায়ে কেরামের যাত্রা রোধ করতে পারে না। বাংলাদেশে শুভাগমনের পর ঢাকা মুহাম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় তিনি বললেন, "পহেলে আনেকা খেয়াল নেহি থা, যব রোকাওয়াড লাগায়ী গেয়ী, তো আ-না জরুরী হো পড়ী।" অর্থাৎ প্রথমে আসার ইচ্ছা ছিল না। যখন বাধাঁর সৃষ্টি করা হল, তখন আসাটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো।[৭৫] বাতিলপন্থীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো।

**নয়.**

মাওলানা মুফতী ইব্রাহীম আল-কাদেরী বলেন-

> ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আমার একজন আত্মীয়কে[৭৬] আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র নিকট মুরীদ করানোর জন্য এনেছিলাম। সে দিন ছিলো চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার বার্ষিক সভা। তিনি সেখানেই (জামেয়া ময়দানে) তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন। বায়'আত শেষে হুযূর প্রত্যেকের হাতের তালুতে ফুঁক দিচ্ছিলেন। হাজার হাজার মানুষের মাঝে তিনিও বরকত হাসিল করেছেন ফুঁক গ্রহণ করার মাধ্যমে। তিনি মনে মনে বললেন যদি আরেকবার ওই বরকত হাসিল করতে পারতাম তাহলে ভাল। তাই তিনি আবার হাত দিলেন ফুঁক নেয়ার জন্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র অলি বললেন, "তোমকো দিয়া। এক মর্তবা কাফী হ্যায়।"[৭৭] অর্থাৎ তোমাকে ফুঁক দিয়েছি, একবারই যথেষ্ট।

**দশ.**

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সমন্বয় পরিষদ'র প্রধান সমন্বয়ক জনাব মাওলানা এম এ মতিন একবার সিরিকোট শরীফে গিয়েছিলেন। তখন শাহানশাহে সিরিকোট কুত্বুল আউলিয়া হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র বার্ষিক উরসের সময় দরবারে খতমে কুরআন চলছিল। তখন রাউজান থানাধীন গহিরা নিবাসী হাজী সিরাজুল ইসলাম সাহেবও সিরিকোট শরীফে গিয়ে উরস শরীফে অংশ গ্রহণ করেন। তিনিও একটি পারা পড়ার জন্য নিলেন। তাঁর পারাটির শেষ দু'পাতা পড়ার জন্য মাওলানা এম. এ. মতিন সাহেবের পার্শ্বে রেখে অন্যত্র যান। মাওলানা মতিন সাহেব নিজের পারা পাঠে মগ্ন থাকায় হাজী সিরাজ সাহেবের কথা বুঝতে পারেন নি। খতমে কুরআন শেষের দিকে হুযূর যখন দোয়া করার জন্য আসলেন তখন বললেন, "খতমে কুরআন পূরা হুগিয়া"? অর্থাৎ কুরআন শরীফের খতম শেষ হয়েছে কি ? সবাই বললেন হ্যাঁ শেষ হয়েছে। তিনি বললেন, "সোচো কেসী কা বাক্বী হ্যায় কেহ্ নেহী ? "অর্থাৎ ভেবে দেখো কারো অবশিষ্ট আছে কিনা ? এ বলে তিনি চলে গেলেন, তখন হাজী সিরাজ সাহেব দ্রুত এসে মাওলানা এম.এ.মতিন সাহেবকে বললেন, আমার বকেয়া অংশ পড়েছেন কি? এম.এ.মতিন সাহেব বললেন, আপনি আমাকে পড়তে বলেছিলেন ? খেয়াল করিনি। তখন হাজী সিরাজ সাহেব তাঁর পারাটি

---

৭৫. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

৭৬. ওই লোকটির নাম সৈয়্যদ মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন। রাউজান থানাধীন উত্তর সত্তাস্থ মৌলভী বাড়ীর লোক। বর্তমান ঠিকানা দামপাড়াস্থ হযরত খাজা গরীবুল্লাহ শাহ্ (রহ.) মাজারের সম্মুখস্থ ভবনের অধিবাসী।

৭৭. সাক্ষাৎকার, মুফতী ইবরাহীম আল কাদেরী, রাউজান, চট্টগ্রাম, তারিখ-০৬.০৭.২০১৭ খ্রি.

হাজির করেন। আর এম.এ. মতিন বাকী অংশটুকু পড়ে দিলেন। কিন্তু কী আশ্চার্য ওই অংশটুকু পড়া সমাপ্ত হতেই হুযূর এসে পৌঁছলেন। আর মীলাদ পড়তে নির্দেশ দিলেন।[৭৮]

**এগার.**

গাউসিয়া কমিটির বর্তমান সহ-সভাপতি জনাব আনোয়ারুল হক সাহেব বর্ণনা করেন-

> একবার আমরা একটা দল সিরিকোট শরীফে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় প্রত্যেকেরই মনের আকাঙ্ক্ষা ছিলো হুযূরকে সাথে নিয়ে হযরত দাতা গঞ্জ বখ্শ রাহমাতুল্লাহি আলয়হির মাজার শরীফে যিয়ারত করতে লাহোর যাব। কিন্তু কারো বুকে এ সাহস ছিল না তাঁকে কে এ কথা বলবে। জনাব হাজী মুহাম্মদ জাকারিয়া সাহেব পরামর্শ দিলেন, বাবার কাছে যে আবদার করা যায় না, তা দাদার কাছে করা যায়। তিনি বললেন,"সকালে যিয়ারতের সময় প্রত্যেকেই দাদা হুযূর ক্বেবলার কাছে এই আবেদন পেশ করবেন"। আমরা প্রত্যেকেই তাই করলাম। হুযূরকে কিছুই বলিনি। বিদায়ের সময় আমরা প্রত্যেকেই কান্নায় রত অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করছিলাম। বিদায় বেলায় আমরা কিছু বলার আগে তিনি বললেন,"আপ লোগ লাহোর চলে জা-ইয়ে। মাঁই কাল ফ্লাইট মে আ রাহা হোঁ। আপ লোগো কো সাথ লে কর দাতা গঞ্জে বখ্শ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কী যিয়ারত করনা হ্যায়"।[৭৯] অর্থাৎ আপনারা লাহোর চলে যান। আমি আগামী কাল বিমানে আসছি। আপনাদেরকে সাথে নিয়ে দাতা গঞ্জে বখ্শ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র যিয়ারত করতে হবে।

**বার.**

আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার জয়েন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হকের বর্ণনা-

> ১৯৮৬ খ্রি. ছিল বাংলাদেশে হুযূরের আখেরী সফর। আমাদের বাড়ীতে (চট্টগ্রাম কদমতলী) আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র দাওয়াতের প্রোগ্রাম চূড়ান্ত হল। হুযূর যথা সময়ে তাশরিফ আনলেন। বাড়ী এবং এলাকার সবাই হুযূরের শুভাগমনের খুশী। অন্দর মহলে ঘরের ছোট-বড় সকলে হুযূরের সালাম ও সম্মান প্রদর্শন করলেন। আমার স্ত্রীও নেহায়ত পর্দা-পুশিদা সহকারে হুযূরের খিদমতে সালাম নিবেদন করলেন। তখন আমি আদব সহকারে আরয করলাম যে, আমাদের বিবাহের পর এ যাবৎ মাত্র একটি মেয়ে সন্তান জন্ম হয়েছে গত কয়েক বছর পূর্বে। আর কোন সন্তান জন্ম লাভ করেনি। হুযূরের নিকট বিনয় সহকারে ফরিয়াদ জানালাম যেন একটি পুত্র সন্তানের জন্য দু'আ করেন। এবং মনে মনে আশা ছিল সন্তান হলে তাকে হুযূর ও দাদা হুযূর কেবলার মত হাফিযে কুরআন বানাব। হুযূর দু'আ করলেন। ওই দোয়ার ফলে আমাদের ১ম কন্যার জন্মের সাড়ে তিন বছর পর ছেলে মারুফের জন্ম হয়। বর্তমানে সে হাফিযে কুরআন।[৮০] অনুরূপ হাজী

---

৭৮. সাক্ষাৎকার, মাওলানা এম. এ. মতিন, তারিখ-০৫.০৭.২০১৭ খ্রি.

৭৯. সাক্ষাৎকার, আলহাজ আনোয়ারুল হক, সহ সভাপতি, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, তারিখ-০৫.০৭.২০১৭ খ্রি.

৮০. সাক্ষাৎকার, আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার জয়েন্ট সেক্রেটারী

আকরাম আলী খাঁন, মিয়া খাঁন সওদাগরের বাড়ী, মিয়া খান নগর, ১৯ নং ওয়ার্ড, থানা-বাকলিয়া, জিলা- চট্টগ্রাম ও হুযূর ক্বেবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র দু'আয় প্রায় ৫০/৬০ বছর বয়সে তিনি একটি ছেলে সন্তান লাভ করেন। তিনি নব জাতকের নাম রাখলেন- মোহাম্মদ রেযা খাঁন। বর্তমানে ওই সন্তান হাজী সাহেবের উপযুক্ত উত্তরসূরী।[৮১]

অনূরূপ আরো একটি ঘটনা- মক্কাশরীফের এক (পাকিস্তানী বংশদ্ভোত) বিবাহের পর ১২ বছর অতিক্রম করার পরও কোন সন্তান জন্ম নেয়নি। বেগম আকরাম উদ্দিন মহান অলি আল্লামা তৈয়্যব শাহ্'র কদমে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে নিজের আরজি পেশ করলেন। "হুযূর আপনি সন্তানের জন্য দু'আ করুন।" আল্লাহ্র অলি দু'আ করলেন। দু'আ আল্লাহ্র দরবারে কবুল হল। হুযূর বললেন, "যাও, তোমার একপুত্র সন্তান লাভ হবে।" মু'আল্লিম সোলাইমান আকরাম ও তার স্ত্রীর মনের বাসনা আল্লাহ্র অলির ওসীলায় পূর্ণ হল। তার ঘরে নেমে আসল সুখ শান্তি ও আনন্দের বন্যা। এটা হুযূর ক্বেবলার ১ম বারের ওমরা পালনের ঘটনা। উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন সাহেব বলেন- জন্মের আগেই হুযূর ক্বেবলা আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ উক্ত পুত্র সন্তানের নাম রেখেছেন রায়হান আকরম। তাহাজ্জুদের সময় হাতিমে কা'বায় উপস্থিত সবাইকে নিয়ে হুযূর দু'আ করেছিলেন, পরবর্তীতে আরো দেড় বছর পর হুযূর পুনরায় ওমরায় তাশরীফ নিয়ে যান, তখন সোলাইমান আকরাম উদ্দিনের স্ত্রী উক্ত ছেলেকে হুযূরের কোলে দেন। অতঃপর হুযূর দু'আ করেন। ওই সময় উপস্থিত ছিলেন- আল্লামা নঈমী সাহেব, আলহাজ্ব চিনু মিয়া (ঢাকা), হাজী মতিউর রহমান, হাজী সিরাজুল হক (চট্টগ্রাম) ও হাজী সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা) প্রমুখ।[৮২]

**তের.**

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি চট্টগ্রামের আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক সাহেবের কোহিনূর প্রেস সংলগ্ন বাসায় অবস্থান করছিলেন। আর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন পাকিস্তানের সিরিকোট দরবার শরীফে। তিনি স্বীয় পিতা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র হুজুরা শরীফের দরজা খোলা দেখে ভিতরে প্রবেশ করলেন। হুজুরা শরীফে প্রবেশের সাথে সাথে তিনি স্বচক্ষে দেখলে প্রিয়নবী তাজেদারে মদীনা হুযূর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় নবীজি তাঁকে আল কুরআনুল করিমের দু'টি নিদিষ্ট সূরা দ্বারা দু'রাকাত নামায পড়তে বললেন। নামায শেষে তিনি হুযূরের নূরানী সত্ত্বার দর্শন লাভ করে নিজকে হারিয়ে ফেললেন। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "এ দফতরে আল্লাহ্র অলিদের দায়িত্ব বন্টন করা হয়। এখন এ গুরুদায়িত্ব সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি উপর ন্যস্ত। এ ঘটনা হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি কে চট্টগ্রামে অবস্থানরত জানানোর

৮১. সাক্ষাৎকার, শেখ নাছির উদ্দিন আহমদ, পিতা-মরহুম শেখ আফতাব উদ্দিন (আন্জুমান-এ রহমানিয়ার এককালীন সেক্রেটারী) তারিখ- ২৫ এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.।

৮২. মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, *আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) জীবনী গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

জন্য হযরত তৈয়্যব শাহ্‌কে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুসারে সিরিকোট শরীফ হতে পত্র প্রেরণ করা হলো আলহাজ্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারের ঠিকানায়। চিঠি হস্তগত হবার পর ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পত্রটি দুপুরের খাবার শেষে হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে দিলেন। সিরিকোট শরীফের খবরা-খবর জানার আগ্রহে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবসহ আরো অনেকেই হুযূর ক্বেবলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু সিরিকোটি (রহ.)কোন আগ্রহ না দেখিয়ে পত্র না পড়েই বালিশের নিচে রেখে দিলেন। অতঃপর আসরের নামাযের পর ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে হুযূর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বালিশের নিচ থেকে পত্র নিতে বললেন। পত্র পাঠের নির্দেশ দেয়া হল জনাব মাষ্টার বদিউল আলমকে। পত্র পাঠান্তে তিনি বললেন, "ইয়ে মুঝে মা'লুম হ্যায়, খত আপকে লিয়ে আয়া, মে'রে বাদ কৌন্ আনে ওয়ালা হ্যায়, সমঝানে কে লিয়ে।" (অর্থাৎ এটা আমার জানা ছিল। পত্র আপনাদের জন্য এসেছে ; আমার পরে কে আসবেন তা বুঝাবার জন্য।[৮৩]

**চৌদ্দ.**

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) সত্তরের দশকের শেষের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মুরীদগণের অনুরোধে চিকিৎসার জন্য লন্ডন গমন করেন। হাসপাতালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তার চিকিৎসা করতে লাগলেন হুযূরকে। যে বিশেষ ডাক্তার হুযূরের চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন, তিনি সপ্তাহে দু'দিন লন্ডনে, দু'দিন প্যারিসে, দু'দিন নিউইয়র্কে এবং একদিন বিশ্রামে থাকেন। প্রথম দিন উক্ত ডাক্তার সাহেব ভক্তিসহকারে ভালভাবে প্রয়োজনীয় যা করার ছিল করলেন। দ্বিতীয় দিনও ডাক্তার সাহেব খুব বিনয় ও আদব সহকারে দু'হাত বুকে রেখে উপস্থিত হলেন। প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ সেরে নেয়ার পর হুযূর ক্বেবলাকে সামনে রেখে পেছনের দিকে উল্টো দিকে হেঁটে চলে আসলেন। ডাক্তার সাহেবকে ফি দেয়া হলে তিনি ফি নিলেন না। তিনি বললেন He is a great saint. (তিনি একজন মহান সাধক)।[৮৪] হুযূরের আধ্যাত্মিকতা ডাক্তারের কাছে গোপন থাকেনি। মেডিকেল বোর্ড রোগ নির্ণয়ে তৎপর। পর্যবেক্ষণে রোগ নির্ণয় হল। রোগের নাম- 'লিমফোমা' যা ক্যান্সার হতেও হাজারগুণ ভয়াবহ। মৃত্যুই এর অনিবার্য পরিণতি। ইত:পূর্বে একই রোগের আরো দু'জন রোগী এ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল। একজন হাসপাতালেই মারা যান আর অন্যজন বাসায়। হুযূর আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)তৃতীয় রোগী। রোগের বিবরণ শুনে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। যাঁর সান্নিধ্যে এসে অসংখ্য মুক্তিকামী দিশেহারা মানুষ সত্যের সন্ধান লাভ করে ধন্য হয়, সমস্যায় জর্জরিত হাজারো বনী আদম যার রূহানী ফুয়ূযাত লাভ করে শান্তি পায় এবং বিপদমুক্ত জীবন রচনা করতে পারে, তিনি আজ এই কঠিন রোগে আক্রান্ত। আল্লাহ্‌র করুণায়, হযরাতে কেরামের নেগাহে করমে মরণব্যাধি তাড়াতাড়ি তাকে পরপারে নিয়ে যেতে পারেনি। ছয় মাস পর ঔষধ পরিবর্তন করার কথা বলেছিলেন ডাক্তার সাহেব। ছয় মাস পর ডাক্তারের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন "Is he still alive ?"[৮৫] (তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?) মহান আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে তিনি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের পর আরো ১৩ বছর জীবন যাপন করেছেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি

৮৩. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, হিন্দুস্থান, ইউরোপ, ইরাক, বাগদাদ শরীফ, সৌদি আরবসহ পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শরীয়ত-তরিকতের প্রচার-প্রসারে যে অসাধারণ খেদমত পরিচালনা করেছেন, ইসলামের ইতিহাসে তাঁর এ অবদান চির অম্লান ও অক্ষয় হয়ে থাকবে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রোগ আবার দেখা দিল। আনজুমান কর্তৃপক্ষ ও ভক্ত-অনুরক্তদের অনুরোধে হুযূর পুনরায় লন্ডন হাসপাতালে ভর্তি হলেন। সাহেবযাদা আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ মুদ্দাযিল্লুহুল আলী, সাহেবযাদা কাসেম শাহ্, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, হাজী ইউনুচসহ আরো অনেকে হুযূরের সাথে ছিলেন।

ছয় বছর পূর্বে প্রদত্ত ডাক্তারী রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে সবাই হতবাক ! ইংরেজ নার্স বললেন- He is a great saint that l have never seen in my life.[৮৬] অর্থাৎ তিনি এমন এক সাধক পুরুষ, আমার জীবনে আমি কখনও সাধক পুরুষ দেখিনি। রোগ যতই জটিলতর হচ্ছে নূরানী চেহারার প্রফুল্লতা ততই বেশীই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা এভাবেই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য পার্থিব সুখ-শান্তি, বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। চেহারায় কোন উদ্বেগ নেই। ক্যান্সার থেকেও হাজারগুণ ভয়াবহ জটিল রোগ ধারণ করে আছেন শরীরে, অথচ রোগ-যন্ত্রণায় কোনদিন ‘উহ্’ শব্দটিও উচ্চারণ করেননি। বেলায়তের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের অবস্থা এ রকমই হয়ে থাকে।

### ১.৮.২ কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলিম মুরীদ

দেশবরেণ্য সুন্নী আলিমদের অনেকেই ছিলেন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)’র মুরীদ। যারা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক খিদমত আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ইত:মধ্যে ইন্তিকালও করেছেন। নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলিমের পরিচিতি তুলে ধরা হলো-

**ক. অধ্যক্ষ আল্লামা হাফিয এম.এ জলিল (রহ.)**

ভারতীয় উপমহাদেশে যে সকল ইসলামিক স্কলার স্ব-স্ব কীর্তিতে অম্লান তাঁদের মধ্যে অন্যতম অধ্যক্ষ আল্লামা হাফিয এম.এ. জলিল (রহ.)। উপমহাদেশে হযরত মুজদ্দিদ-ই আলফে সানী, বাদশাহ আলমগীর, শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস-ই দেহলভী এবং ইমাম আহমদ রিযা খান (রহ.) সুন্নি কর্ণধারবৃন্দ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের যেই পূর্ণাঙ্গ ও মযবুত কাঠামো মুসলিম সমাজের জন্য রেখে গিয়েছেন, সেই কাঠামোকে সমৃদ্ধ রাখতে পরবর্তীতে যে সব ক্ষণজন্মা ওলামা-ই আহ্‌লে সুন্নাত আজীবন সচেষ্ট ছিলেন এবং এতদুদ্দেশ্যেই বহু অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে অধ্যক্ষ আল্লামা এম.এ জলিল (রহ.) ছিলেন অন্যতম। তিনি ২৬ ভাদ্র ১৩৪০ বাংলা শনিবার তৎকালিন চট্টগ্রাম বিভাগের চাঁদপুর জিলাধীন মতলব থানার অন্তর্গত আমিয়াপুর গ্রামে এক সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৮৭] তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন দিল্লীর প্রখ্যাত বুযূর্গ এবং সম্রাট আলমগীরের শিক্ষক মোল্লা আহমদ জিয়ূন (রহ.)। তিনি আকীদা বিশ্বাসে সুন্নী, মাযহাবে হানাফী এবং তরীকায় কাদেরী। তাঁর পিতা-মুন্সী আদম আলী মোল্লা এবং মাতা-মালেকা খাতুন।

---

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

৮৭. এম এ. জলিল , ***নূরনবী,*** (ঢাকা : সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ২০০৪), কভার পৃষ্ঠা

অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রহ.) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী পাশ করার পর পবিত্র কুরআনের হিফ্য আরম্ভ করেন। তীক্ষ্ণ মেধার উপর ভর করে ১৯৫৩ খ্রি. দু'বছর তিন মাসে তিনি পবিত্র কুরআনের হিফ্য শেষ করেন। অতঃপর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ইসলামী শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল ১ম বিভাগে বৃত্তিসহ ১৯৫৬ খ্রি. থেকে ও ১৯৬৪ খ্রি. পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।[৮৮] আরবী শিক্ষার পাশাপাশি তিনি সাধারণ বিষয়েও গভীর জ্ঞান লাভ করেন। অত:পর ১৯৬৬ খ্রি. থেকে ১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত ইন্টারমেডিয়েট, ডিগ্রি ও এম.এ (জেনারেল ইতিহাস) উচ্চতর বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগে স্টাইপেন্ডসহ কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। অধ্যয়নকালীন তিনি আরবি, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলাসহ অনেক ভাষা ও বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর সমসাময়িক আলিমদের মধ্যে তিনি একমাত্র আলিমে দ্বীন, যিনি বি.সি.এস (শিক্ষা) সনদ অর্জন করেন। তাঁর কর্মজীবনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া চট্টগ্রাম এবং ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি "আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট"র অধীনে পরিচালিত এ মাদ্রাসাসমূহে মোট ১১ বছর দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষের পদে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে মাদ্রাসার লেখাপড়া আশাতীত উন্নতি লাভ করে। এছাড়া তিনি ১৯৮৭ খ্রি. থেকে ১৯৯০ খ্রি. পর্যন্ত ৪ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে ডাইরেক্টর হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[৮৯] লিখনী ও প্রকাশনা জগতে তিনি বিরল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর ক্ষুরধার লিখনী ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ সমূহ সঠিক আক্বীদা, আমল ও ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা স্বরূপ। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে মুসলমানদের নিকট খুবই সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তাঁর মানসম্মত ও সাড়া জাগানো কিতাবগুলো সুবিবেক পাঠককুলের নিকট এতই পছন্দনীয় যে, তাঁরা সর্বদা নতুন নতুন সংস্করণের প্রতীক্ষায় থাকে। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে ২০টি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।[৯০]

ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও দ্বীন মাযাহাবের অশেষ খিদমত আন্জাম দিয়ে অধ্যক্ষ আল্লামা এম.এ জলিল ২০০৯ খৃস্টাব্দে ২৩ সেপ্টেম্বর রোজ বুধবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল করেন। পরের দিন চাঁদপুর জেলার মতলব আমিয়াপুর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৯১]

---

৮৮. প্রাগুক্ত

৮৯. প্রাগুক্ত

৯০. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের নাম- ১.নূরনবী (সা.) ২. হায়াত-মাওত কবর-হাশর ৩. কারামত-ই গাউসুল আযম (রহ.) ৪. ফতওয়ায়ে ছালাছীন ৫. প্রশ্নোত্তরে আকাঈদ মাসায়িল ৬. বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত ৭. ঈদ-ই মিলাদুন্নবী ও না'ত-ই লহরী ৮. ইসলাহে বেহেস্তী জেওর ৯. মীলাদ ও কিয়ামের বিধান ১০. রাহমাতুললিল্ আলামীন ১১. ইরফানে শরীয়ত ১২. কালেমার হাকীকত ১৩. আহকামুল মাযার ১৪. সফরনামা আজমীর ১৫. ফতোয়া-ই ছালাছা ১৬. গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস ১৭. শি'য়া পরিচিতি ১৮. ফাতাওয়াল হারামাঈন ১৯. মহা সমর কাব্যের ব্যাখ্যা ২০. সুন্নীবার্তা (মাসিক ইসলামিক পত্রিকা)। (প্রাগুক্ত)

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

**খ. অধ্যক্ষ আল্লামা জালালুদ্দীন আল কাদেরী (রহ.)**

খতীবে বাঙ্গাল অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আলকাদেরী চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজিলাধীন চরখানাই গ্রামে ১৯৪৪ খ্রি. ২৯ জুলাই সোমবার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৯২] বাল্যকাল থেকে মুহাম্মদ জালালুদ্দীন অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার্জনের পর পিতার ঐকান্তিক ইচ্ছানুয়ায়ী জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় মেধাবৃত্তি নিয়ে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রামের দারুল উলূম আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল ও কামিল (হাদীস) পাশ করার পর ইলমে ফিক্‌হ'র উপর উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করার উদ্দেশ্যে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছারছিনা আলিয়া মাদ্‌রাসায় কামিল (ফিক্‌হ) বিভাগে ভর্তি হন এবং উক্ত বিভাগে মাদ্‌রাসা বোর্ড পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন ।

মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আলকাদেরী তাঁর সোনালী শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করে জামেয়ায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করার মধ্য দিয়ে তাঁর সাফল্যময় শিক্ষকতার পেশা আরম্ভ করেন। পরে ১৯৮০-১৯৮১ খ্রি. সনে উক্ত মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৮১ খ্রি. সনে অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। ২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত উক্ত পদে দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আসীন থেকেও তিনি ইসলামী শিক্ষা ও দ্বীন-মাযহাবের বহু খেদমত আন্‌জাম দিয়ে গেছেন। ১৯৭০ খ্রি. থেকে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের হামীদুল্লাহ খান জামে মসজিদসহ চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ একাধিক জামি মসজিদে খতীব হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ খ্রি. থেকে বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত অন্যতম মসজিদ জমি'য়াতুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদে তিনিই সর্ব প্রথম খতীব নিযুক্ত হন এবং আজীবন খতীব হিসেবে সুনামের সাথে নিরলসভাবে উক্ত দায়িত্ব পালন করে যান। দেশখ্যাত এ বরেণ্য আলিমে দ্বীন ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক অনেক সংগঠনের পৃষ্টপোষকতা করেন। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষকদের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমি'য়াতুল মুদাররিসি'নের কেন্দ্রিয় সহ সভাপতি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাংলাদেশ'র মহাসচিব, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের সভাপতিমণ্ডলী সদস্যসহ দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথেও তাঁর সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়। আহলে বায়তে রাসূল (সা.) স্মরণে শাহাদাতে কারবালা মাহফিল উদ্‌যাপন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক দূরদর্শিতার ইঙ্গিত দেয়। দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও গবেষকের উপস্থিতির মাধ্যমে চলমান এ মাহফিল একটি আন্তর্জাতিক মানের রূপ ধারণ করে। অনন্য প্রতিভাধর এ ব্যক্তিত্ব দেশের রেডিও এবং টিভির বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সভা-সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। ইসলামী

৯২. ড.আব্দুল হালিম,*অধ্যক্ষ মাও. জালাল উদ্দীন আল কাদেরী (রহ.) : জীবন ও কর্ম,* (চট্টগ্রাম : ইমাম মুসলিম একাডেমী, ২০১২) পৃ. ১৪

শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ বহির্বিশ্বের পকিস্তান, ভারত, ইরাক, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্র সফর করেন।[৯৩]

এ সকল সফরে তিনি বিভিন্ন দেশের ভাষা, শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি হয়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাছাড়া তিনি দেশের একজন অনন্য ও তাত্ত্বিক বক্তা এবং ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাত। তাঁর সুললিত ও মধুর ভাষায় কুরআন-হাদীসের তথ্যভিত্তিক আলোচনার যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। ১৯৭৭ খ্রি. থেকে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখি শুরু করেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাসিক তরজুমান পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৮১ খ্রি. উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে আজীবন উক্ত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে যান। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। কর্মজীবনের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসেন। দু'খণ্ডে বিভক্ত 'দরসে কুরআনে কারীম' গ্রন্থটি তাঁর কুরআনী সাহিত্য চর্চার বিশেষ সফলতা। তাইয়্যিবিয়া একাডেমী, চট্টগ্রাম'র প্রকাশনা ও পরিবেশনায় গ্রন্থটি ২৪ এপ্রিল ২০০১ খ্রি./ ২৯ মুহররম ১৪২২ হি. সনে প্রকাশিত হয়।[৯৪]

### গ. আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ওবাইদুল হক না'ঈমী

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল হক না'ঈমী উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিমে দ্বীন, এবং জামে'য়ার শায়খুল হাদীস। তিনি চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানাধীন চাঁপাতলী গ্রামে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[৯৫] তাঁর পিতা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী নূর আহমদ মুন্‌শী আল-কাদেরী। প্রখ্যাত আলিয়ে কামিল হযরত ভোলা শাহ্ (র.)'র সমসাময়িক হযরত শাহ্ আসাদ আলী ফক্বীর প্রকাশ শাহ্ ফক্বির ইতিহাসের এক ক্লান্তিলগ্নে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য আনোয়ারা অঞ্চলে আগমন করেন এবং বহু লোককে ইসলামের ছায়াতলে সমবেত করেন। তারই বংশধর আল্লামা ওবাইদুল হক না'ঈমী।

বহুমুখী গুণের অধিকারী এ ব্যক্তিত্ব গ্রামের মক্তবেই লেখাপড়ার সূচনা করেন এবং পরবর্তীকালে ধর্মীয় শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়ায় ভর্তি হয়ে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পরীক্ষায় কৃত্তিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। এ জ্ঞান পিপাসু উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের গুজরাটে জামে'য়া না'ঈমিয়ায় গিয়ে মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী (র.)'র বিশেষ সান্নিধ্যে হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ শাস্ত্রসহ ফুনূনাত বিষয়সমূহে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। উল্লিখিত বিষয়ে গভীরতা ও পারদর্শিতা অর্জন করে তিনি পুনরায় স্বদেশে ফিরে আসেন। অতঃপর ১৯৬৫ ডখ্র. ওয়াজেদিয়া আলিয়া হতে কামিল হাদীস'র সনদ লাভ করেন। আবার পরবর্তী বছর (১৯৬৬ ডখ্র.) ঢাকা আলিয়া হতে কামিল ফিক্হ'র ডিগ্রিও লাভ করেন। এভাবে তাঁর বিরল কৃতিত্বময় ছাত্রজীবন সমাপ্ত হয়।

---

৯৩. মুহাম্মাদ ইসকান্দর আলম, *অধ্যক্ষ আল্লামা জালাল উদ্দীন আল কাদেরী : জীবন ও কর্ম*, (চট্টগ্রাম : আল্লামা জালাল উদ্দীন ফাউন্ডেশন, ২০১৭), পৃ. ৮

৯৪. মুহাম্মদ ইকসান্দর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯৫. মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন অনুদিত *দালায়িলে না'ঈমীয়া*, ১৯৯৮ খ্রি. কভার পৃষ্ঠা

আল্লামা নঈমী ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে শিক্ষাজীবন শেষ করে তৎকালিন সু-প্রসিদ্ধ ইসলামী বিদ্যপীঠ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা আর আন্তরিকতার সাথে পাঠ দান শুরু করেন। ইত:মধ্যে তাঁর জ্ঞানের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে পরবর্তী বছর তাঁরই শিক্ষাগুরু অধ্যক্ষ মুফতী ওয়াকার উদ্দীন (রহ.)'র নির্দেশে হাটহাজারী আযিযিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসায় অসাধারণ কৃতিত্বের সাথে পাঠদান করেন। তবে চট্টগ্রামের প্রথিতযশা আলিমে দ্বীন আল্লামা গাযী শে'রে বাংলা আযীযুল হক আল কাদেরী (রহ.) ও তাঁর অন্যতম শিক্ষাগুরু আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশেমী'র নির্দেশে এবং অধ্যক্ষ মাওলানা নসরুল্লাহ খান'র অনুরোধে ১৯৬৮ ডখ্র. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় যোগদান করেন। ওই সন থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দীঘ ৪৪ বছর অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে পাঠদান করে। তিনি সরকারীভাবে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত শায়খুল হাদীস (প্রধান মুহাদ্দিস) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৯৬] এ জ্ঞানতাপস'র কাছ থেকে ইসলামী শিক্ষা জ্ঞান আহরণ করে বহু ছাত্র ইলমে হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ'র উপর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির এবং বিজ্ঞ আলিম তৈরী হয়ে দ্বীন-মাযহাবের খিদমতে রত আছেন। লিখনী জগতে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব রয়েছে। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সময় পেলে লিখতে বসেন 'আকিদা ও আমল বিষয়ক তাঁর অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন ম্যাগাজিন, সাময়িকীতে নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রকাশিত হয়। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ২টি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।[৯৭] পাঠদানে তাঁর প্রবল আগ্রহ এবং একাগ্রতার কারণে আনজুমান কর্তৃপক্ষ তাঁকে অবসরের পরেও জামেয়ার শিক্ষকতায় পূনরায় নিয়োগ দিয়েছে এবং তিনি অদ্যাবধি হাদীসের দরস দিয়ে যাচ্ছেন।

**ঘ. মাওলানা খাজা আবু তাহের (রহ.)**

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, পীরজাদা মাওলাানা খাজা আবু তাহের চল্লিশ এর দশকে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পীরে তরীকত প্রখ্যাত জ্ঞান তাপস, সুফী সাধক হযরতুল আল্লামা হাফেয ক্বারী খাজা আহমদ (রহ.) ছিলেন একজন সুপরিচিত খ্যাতনামা আলেম ও তরীকতের পথপ্রদর্শক। তিনি বাল্যকালেই পিতাকে হারান। উচ্চ ডিগ্রীধারী আলেম খাজা আবু তাহের নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারী মাদ্‌রাসা-এ-আলিয়া ঢাকা হতে কামিল হাদীস ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি, এ অনার্স সম্পন্ন করেন। তিনি ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.), ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শেরে বাংলা আলকাদেরী (রহ.), আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্‌ (রহ.), অলীয়ে কামেল আল্লামা সৈয়্যদ আবিদ শাহ্‌ মুজাদ্দিদী (রহ.) এর চিন্তাধারা ও ভাবধারার স্বার্থক উত্তরসূরী, একজন খ্যাতনামা অলীর ছাহেবজাদা পীরাজাদা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ৮০-এর দশকের শুরুতেই তাবারুকান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্‌ (রহ.)'র মোবারক হাতে বায়'আত গ্রহণ

---

৯৬. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

৯৭. ১. দালায়িলু কিয়াম লি মিলাদ-ই খাইরিল আনাম : উর্দু ভাষায় লিখকের মীলাদের বৈধতা, ফযীলত ও গুরুত্বের উপর প্রামাণিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এটি বাংলা ভাষায় রূপান্তর হয়ে পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ খ্রি.। এটি সংক্ষেপে দালায়িলে না'ঈমিয়া নামে পরিচিত।
২. কাশিফুল মুহাম্মদ শরহে ইমাম মুহাম্মদ : এটি ইমাম মুহাম্মদ আশ-শাইবানী'র সংকলিত মু'আত্তার উর্দু ভাষায় ব্যাখ্যা গ্রন্থ। গ্রন্থাকারে এটি শিগগীর প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারে লিখক আশাবাদী।

করেন। এ আশেকে রাসূল জীবনে ২৪বার হজ্বব্রত পালন করেন। 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার ব্যবস্থাপনায় ১২ই রবিউল আউয়াল ঢাকায় জশনে জুলূস উদ্‌যাপন করা হলেও শেষের দিকে তারিখ পরিবর্তন করে ৯ই রবিউল করায় ১২ই রবিউল আউয়াল ঢাকায় জুলূসের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। আল্লামা খাজা আবু তাহের (রহ.) সেই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত পক্ষকাল ব্যাপী সীরাতুন নবী মাহফিলে তিনি শানে রিসালতের উপর শানদার বক্তব্য পেশ করতেন। ইসলামী শিক্ষার প্রসারকল্পে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার উত্তর শাহ্‌জাহানপুর রেলওয়ে কলোনীস্থ রেলওয়ে হাফেজীয়া আলীয়া মাদাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কমলাপুরস্থ রেলওয়ে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে খতীব হিসাবে যোগ দেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারই প্রচেষ্টায় ঢাকাতে বিশ্ব সুন্নী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামিক ব্যক্তিত্ব ওয়াল্ড ইসলামিক মিশন লন্ডনের সেক্রেটারী জেনারেল আল্লামা আরশাদুল কাদেরী (মু.যি.আ.) তাঁরই আমন্ত্রণে সমাবেশের প্রধান অতিথি হিসেবে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ আগমন করেন। মাযহাব-মিল্লাত তথা সুন্নীয়তের বৃহত্তর খেদমত আন্‌জাম দিয়ে জ্ঞান সাধক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) এর আদর্শের সৈনিক, পীরজাদা আল্লামা খাজা আবু তাহের (রহ.) ৯ই শাবান ১৪১৪ হিঃ ৯ই মাঘ ১৪০০ বঙ্গাব্দ মুতাবিক ২২ শে জানুয়ারী ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে রোজ শনিবার দিবসে ৫০ বছর বয়সে অগনিত ভক্ত-অনুরক্তকে শোক সাগরে ভাসিয়ে মাওলায়ে হাকিক্বীর চির সান্নিধ্যে চলে যান। চাঁদপুর জেলার গাচতলা দরবার শরীফে এ আলেমে দ্বীন চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। প্রতি বৎসর ৯ই মাঘ তাঁর স্মরণে উরস উদ্‌যাপিত হয়।[৯৮]

### ঙ. মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

মাওলানা মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় আলিমে দ্বীন। তিনি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার মাদরাসায় প্রধান ফকীহ হিসেবে পাঠদানে রত আছেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার বায়েজিদ থানাধীন জালালাবাদস্থ কুলগাঁও গ্রামের সৈয়্যদ পরিবারে ১৯৫৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইসহাক উচ্চ বংশীয় লোক ছিলেন।[৯৯] পিতার তত্ত্বাবধানে অতি স্বল্প সময়ে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতসহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আরবী ও ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় ভর্তি হন। দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল (হাদীস) ও কামিল (ফিকহ) এর বোর্ড পরীক্ষায় ১ম বিভাগে মেধাবৃত্তি নিয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ন হন। তাছাড়া জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া অধ্যায়নাবস্থায় কামিল পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাশে মেধা তালিকা প্রথম স্থান অর্জন করেন।

১৯৮২ খ্রি. ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে তিনি খিদমতে নিয়োজিত হয়ে পড়েন তাঁর প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, কর্তৃপক্ষ তাঁকে উন্নত ও পরিকল্পিত পাঠদানের উপর সন্তুষ্ট হয়ে ফিকহ বিভাগের ফকীহ পদে উন্নীত করলেন। বর্তমানে (২০১৭) তিনি একই বিভাগের প্রধান ফকীহ হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সবার নিকট গ্রহনযোগ্য ও সমাদৃত। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মুফতী সৈয়্যদ অছিয়র রহমানের ব্যাপক অবদান রয়েছে। জামেয়ার

---

৯৮. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিযভি, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৩৯

৯৯. মুহাম্মদ জিয়াউল হক, *ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া'র অবদান*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫ খ্রি., পৃ. ৫৭

মাধ্যমিক উচ্চ স্তরে ক্লাশের হাজার হাজার শিক্ষার্থী তারই কাছ থেকে হাদীস, তাফসীর, ও ফিক্হ'র কিতাবদি অধ্যায়ন করে যোগ্য আলিম তৈরি হয়ে দেশ-বিদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষার পাঠদানে রত আছেন। তাঁদের অনেকেই অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, মুফতি সহ বিভিন্ন উচ্চ পদে অধিষ্ঠত আছেন। তিনি ২০০১ ও ২০০৪ খ্রি. জাতীয় পর্যায়ে দু'বার শ্রেষ্ঠ শ্রেণীশিক্ষক নির্বাচিত হন।[১০০]

অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ফাতওয়া-ফারায়িয সহ নিত্য নতুন অনেক সমস্যার সমাধান কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে দক্ষতার সাথে প্রদান করে আসছেন। বিশেষ করে দেশের অন্যতম মাসিক ইসলামী সাময়িক মাসিক তরজুমান প্রশ্নোত্তর বিভাগের উত্তরদাতা হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। পাঠককবৃন্দ প্রতিমাসে তাঁর প্রশ্নোত্তর বিভাগটি প্রকাশ হওয়ার অধীর আগ্রহে থাকেন। আনজুমান কর্তৃক এ প্রশ্নোত্তর বিভাগ পাণ্ডুলিপি আকারে প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের চাহিদা পূরন হয়েছে। মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান উঁচু মাপের একজন গবেষক। চাহিদা অনুযায়ী ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ের উপর মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য অনেক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৩টি গ্রন্থ রয়েছে।[১০১]

### চ. মুফতী কাযী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ

মুফতী কাযী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ শুধু চট্টগ্রাম নয় বরং বাংলাদেশের খ্যাতিমান মুফতিদের মধ্যে অন্যতম এক বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। তিনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভাস্থ বাহুলী গ্রামে চিকন কাযী পাড়ায় ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ খ্রি. জুমা'বার সুবহে সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। হযরত আলী (র.)'র এক অধঃস্তর সন্তান দিল্লীর এক দরবেশ কামাল উদ্দীন (প্রকাশ শেকন বা চিকন কাযী) হযরত শাহ্ চান্দ আউলিয়া (র.)'র প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে পটিয়ার বাহুলী গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তারই বংশ পরম্পরায় কাযী মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ'র ঘরে জন্ম গ্রহণ করে মুফতী আবদুল ওয়াজেদ। মায়ের দিক দিয়ে তিনি আধ্যাত্মিক পরিবারের অন্তভূক্ত। এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সৈয়্যদ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (র.)'র পূর্ব পুরুষ হযরত সৈয়্যদ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী (র.)'র বংশ পরম্পরায় চন্দনাইশ কাঞ্চননগর নিবাসী আল্লামা সৈয়্যদ

---

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১০১. ক). *বাগ-ই খলিল (বাংলা )* এটি ১ম ও ২য় খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়েছে ।

খ).আস্সালাতু আলাল হাবীবিল করিম : উর্দূ ভাষায় এ পুস্তিকায় তিনি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর সালাম-সালাত পড়ার গুরুত্ব ও ফযীলত সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। গ).মুর্শিদে বরহক আল্লামা হযরত সাইয়্যিদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর জীবনী গ্রন্থ : জামেয়ার প্রধান পৃষ্ঠাপোষক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ওলিয়ে কামিল আল্লামা সাইয়্যিদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর জীবন কারামত নিয়ে লিখিত লেখকের নির্ভরযোগ্য রচনা। ১০ টি অধ্যায়ে ভাগ করে অতীব চমৎকার ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক ও ইসলামের শিক্ষা বিস্তারে তাঁর বহুমুখী সংস্কার ও অবদানের কথা তুলে ধরেন। তার দুটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। ক) আল-আতায়াল গাউছিয়া ফিল-ফাতাওয়ার রহমানিয়া এটি মুফতি অছিয়র রহমানের নির্ভরযোগ্য ফাতওয়া গ্রন্থ। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মানব জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান অত্যন্ত সাবলীল আরবী ভাষায় প্রণয়ন করেছেন। খ) সফর নামা : মুফতী সৈয়্যদ অছিয়র রহমান ইসলামী সভ্যতা ও আদর্শ বিস্তারে মিসর, লন্ডন, ভারত, পাকিস্তান সহ মধ্য প্রাচ্যের প্রভৃতি অঞ্চলে সফর করেন। এতে তিনি বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি, কালচার ও আচার ব্যবহারের সাথে ভাব বিনিময়ে অপার সুযোগ হয়েছে। তিনি 'সফর নামা' অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন ইসলামী স্থাপনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ অলি উল্লাহ (রহ.)'র ভ্রাতুস্পুত্র আল্লামা সৈয়্যদ আব্দুল করিম (র.)'র কন্যা রাফিয়া খাতুন তাঁর মাতা।[১০২]

পারিবারিক পরিমণ্ডলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ইসলামী শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্য পটিয়ার ঐতিহ্যবাহী হযরত শাহচান্দ আউলিয়া (রহ.) আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এ মাদ্‌রাসা হতে ১৯৭৫ খ্রি. দাখিল বোর্ড পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১৯ তম স্থান, ১৯৭৭ খ্রি. আলিম বোর্ড পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১৫ তম স্থান, ১৯৭৯ খ্রি. ফাযিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে স্কলারশিপ লাভ করে বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী মেধাবী মুফতী আব্দুল ওয়াজেদ ইসলামী শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভের জন্য জামে'য়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় কামিল হাদিস বিভাগে ভর্তি হয়ে বোর্ড পরীক্ষায় ১৯৯৮ খ্রি. এবং কামিল ফিকহ্ বোর্ড পরীক্ষায় ১৯৮৩ খ্রি. ১ম শ্রেণী অর্জন করে সাফল্যের পরস্পরা অক্ষুন্ন রাখেন। উল্লেখ্য, তিনি ছাত্রজীবনে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহেও মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। আবার ২০০০ ডখ্র. তাফসীর (প্রাইভেট) পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান লাভ করেন।[১০৩]

শিক্ষা জীবনের বর্ণাঢ্য অধ্যায় শেষ করার পর ইসলামী শিক্ষার পাঠদানে নিয়োজিত হন। তিনি ১৯৯৮ খ্রি. জামেয়ার আরবী প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে জামেয়ার ফিক্হ বিভাগে মঞ্জুরী প্রাপ্ত হলে ঐ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। অতএব ১৯৮২ খ্রি. থেকে বর্তমান পর্যন্ত (২০১৭ খ্রি.) অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে হাদিস, তাফসীর ও ফিকহ্ বিভার্গে অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠদানে রত আছেন।

ইসলামী শিক্ষা বিকাশে মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদের অবদান বহুমূখী। কুরআন হাদীসসহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর গভীর পদচারণা লক্ষ্যণীয়। ফাত্ওয়া-ফারায়িযে তাঁর রয়েছে গভীরতা ও পারদর্শিতা। বিভিন্ন জটিল-কঠিন বিষয়ে তাঁর প্রণীত ফাত্ওয়া অত্যন্ত তথ্যনির্ভর এবং আলিম মহলে সমাদৃত। তিনি আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া শরী'আহ্ বোর্ডের স্থায়ী সদস্য এবং জামেয়ার দারুল ইফতা'র অন্যতম পরিচালক।

মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ একজন ক্ষুরধার লিখক, সুসাহিত্যিক, তীক্ষ্ম সমালোচক ও গবেষক আরবী, উর্দূ, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় রয়েছে তাঁর বিশেষ দক্ষতা। আলিম সমাজে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্যে'র স্বীকৃতি রয়েছে। গ্রন্থনা ও প্রকাশনা জগতে তাঁর খিদমত প্রশংসনীয়। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বড় গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ৬টি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য[১০৪] বক্তৃতা ও ভাষণে রয়েছে তাঁর বিশেষ নিপুণতা ও দক্ষতা। তিনি উচু মানের একজন বক্তা, অভিজ্ঞ বিতার্কিক ও প্রাজ্ঞ খতিব। তিনি চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানাধীন বটতলী হযরত

---

১০২. মুফতী আব্দুল ওয়াজেদ, *সকল যুগের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী*, (চট্টগ্রাম : গাউছিয়া প্রকাশনী, ২০১৫), কভার পৃষ্ঠা

১০৩. মুহাম্মদ জিয়াউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১০৪. তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম- ১. সকল যুগের সেরা ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সা.) ২.সাইয়্যিদা ফাতিমা বতুল বিন্তে রাসূল (সা.) ৩.গাউসুল বারী ফি শরহিল বুখারী ৪. গাউসুল মুন'য়িম ফী শরহি মুসলিম ৫.আল-আতায়াল গাউছিয়া ফীল ফাত্ওয়া আশশার'ইয়্যাহ্। ৬. আল খুতাবুল গাউছিয়া।

শাহ্ মোহসেন আউলিয়া (রহ.) মাযার সংলগ্ন হযরত শাহ্ মোহসেন আউলিয়া (রহ.) জামে মসজিদে ১৯৯৭ খ্রি. থেকে সুনামের সাথে খতিবের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

### ছ. শায়খুল হাদিস হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী

হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী এ দেশের প্রথিতযশা মুহাদ্দিস। তিনি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন নাঙ্গলমোড়া গ্রামে ১৯৫৪ খ্রি. এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ আব্দুল মুনাফ ও মাতা সাকীনা খাতুন উচ্চ বংশীয় লোক।[১০৫]

তিনি পিতা-মাতার ঐকান্তিক ইচ্ছায় নিজ গ্রামের দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাঙ্গলমোড়া শামসুল উলূম ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি ওই মাদ্‌রাসা সংলগ্ন হিফ্‌যখানায় ভর্তি হয়ে হাফিয মুহাম্মদ নূর আহমদের তত্ত্বাবধানে হিফ্‌য শিক্ষা লাভ করেন। এরপর জামেয়া হিফ্‌য বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯৬৮ খ্রি. হিফ্‌য সমাপ্তির উপর দস্তার-ই ফযীলত ও সনদ লাভ করেন। জামেয়া হিফয বিভাগে অধ্যয়নের ফাঁকে দরস-ই নিযামীর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ আয়ত্ব করতে সক্ষম হন।

ইসলামী শিক্ষা লাভের মহা প্রয়াসে তিনি নিজ এলাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাঙ্গলমোড়া ফাযিল মাদরাসা থেকে ৮ম শ্রেণী পাশ করে হাটহাজারী ছিপাতলী গাউছিয়া মু'ঈনিয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা হতে যথাক্রমে ১৯৭৬ ডখ্র. ১৯৭৮ খ্রি. ও ১৯৮০ খ্রি. সনে যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল বোর্ড পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। আবার ইসলামী শিক্ষার উপর উচ্চ ডিগ্রি লাভ করার জন্য চট্টগ্রামের দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৮২ খ্রি. কৃতিত্বের সাথে কামিল (হাদীস) সমাপ্ত করেন।[১০৬]

ইসলামী শিক্ষার প্রসার-প্রচারে মাওলানা আনসারীর বর্ণনাতীত অবদান রয়েছে। তাঁর কৃতিত্বময় শিক্ষাজীবন শেষ করেই জামেয়া শিক্ষকতার খিদমতে নিয়োজিত হন। তিনি ১৯৮২ খ্রি. এ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবি প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তাঁর উন্নত পাঠদান ও চমৎকার উপস্থাপনা শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করে। তাঁর কৃতিত্বময় পাঠদানের ধারাবাতিকতায় জামেয়া কর্তৃপক্ষ তাকে মুহাদ্দিস পদে উন্নীত করেন। ইলমে হাদীসের পাঠদানের ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও সহজ ভাষায় হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। এ হাদীস বিশারদ ২০১০ খৃ, জামেয়ার শায়খুল হাদীস পদে পদোন্নতি লাভ করে অদ্যাবধি আন্তরিকতার সাথে ইসলামী শিক্ষার খিদমতে নিয়োজিত আছেন।[১০৭]

১ মার্চ ২০১৬ খ্রি. হতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব রত আছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁরই কাছ থেকে ইলম-ই হাদীসের সনদ গ্রহণ করার জন্য জামেয়া ছুটে আসেন ইলম-ই হাদীসরে পাশাপাশি তিনি ফিক্বহ, উসূল, 'ইলম-ই কালাম ও ফাতওয়া-ফারায়িযসহ বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদী আন্তরিকতার সাথে পাঠদান করেন। তিনি একজন ইসলামী গবেষক, ক্ষুরধার লিখক ও উচু মাপের কলামিষ্ট। মাসিক তরজুমানসহ অসংখ্য ইসলামী

১০৫. জামেয়ার কামিল বিদায়ী শিক্ষার্থী-স্মরণিকা- ২০১৫ খ্রি. *আত্-তৈয়্যব*, পৃ. ৪৬
১০৬. মুহাম্মদ জিয়াউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
১০৭. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

সাময়ীকিতে তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তিনি সদ্য প্রকাশিত গাউছিয়া ত্বরবিয়াত-ই নিসাব আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থেসমূহে উন্নতমানের প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ৩টি গ্রন্থ উল্লেখ যোগ্য[১০৮]

**ছ. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান**

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার ডাবুয়া গ্রামের ইয়াসিন নগর এলাকায় হযরত গাযী খলীফার পুত্র হযরত গোলাম আলী খলীফার সম্ভ্রান্ত বংশে ষাটের দশকে বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামে সম্পন্ন করে ইসলামি শিক্ষার্জনের জন্য উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ দ্বীনী বিদ্যাপীঠ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ভর্তি হয়ে নিয়মিত অধ্যয়ন করে এ প্রতিষ্ঠান হতে বোর্ড পরীক্ষায় দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদিস) যথাক্রমে ১৯৭২, ১৯৭৪ ও ১৯৬৬, ১৯৭৮ খ্রি. কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এতে ক্ষান্ত না হয়ে মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম সরকারী মহসিন কলেজ থেকে আই এ পাশ করেন এবং ১৯৮৩ সনে বাঁশখালী আলাওল কলেজ থেকে বি.এ (পাস)'র সনদও লাভ করেন।[১০৯]

ইসলামী শিক্ষার উপর গভীর জ্ঞান লাভ করার পর দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতায় মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। তিনি অধ্যয়ন জীবন শেষ করার পূর্বেই শিক্ষকতার পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৯৭৯ সন থেকে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত প্রথমে আরবী প্রভাষক পরে মুহাদ্দিস হিসেবে ইসলামী শিক্ষার খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। এরপর ১৯৯৫ খ্রি. বায়েযীদ থানার আহসানুল উলূম আলিয়া মাদ্‌রাসায় কিছুদিন আরবী সাহিত্যের পাঠদান করেন। অতঃপর ১৯৯৭, ১৯৯৭ সনে চট্টগ্রামের রাউজান থানাধীন গহিরা এফ.কে জামেউল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করে দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ইত্যবসরে (১৯৮০-১৯৮৭ সালে) তিনি সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতাকালে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাসিক চট্টগ্রাম থেকে তাজুমান'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[১১০]

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান একজন সৃজনশীল লিখক, ক্ষুরধার প্রাবন্ধিক ও সূক্ষ্ম গবেষক। প্রকাশনা ও গ্রন্থনা জগতে এ দেশে ক'জন আলিম-ওলামার ইসলামী শিক্ষা প্রসারের অবদান অনস্বীকার্য তন্মধ্যে মাওলানা আব্দুল মান্নানের অবস্থান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে তরজমা-ই কুর'আন ও তাফসীর "কানযুল ঈমান ও খাযাঈনুল ইরফান (মূল লেখক ঃ ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) ও তাফসীর -সদরুল আফাযিল সাইয়্যিদ না'ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) ও তরজুমা-ই কুরআন ও তাফসীর (মূল লিখক ঃ ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) ও তাফসীর-হাকীমূল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান (রহ.) এর বাংলা ভাষায় সহজভাবে অনুবাদটি তাঁর অনুবাদ শিল্পে দারুন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১৯৮০-১৯৮৭ সনে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে ধর্মীয় কথিকা

---

১০৮. (ক) মাওয়া'য়িযুল আনসারী (খ) ফাত্ওয়া-ই হানাফিয়্যাহ্ (গ) দরসী তাদরীস।

১০৯. মাও. আব্দুল মান্নান অনুদিত ***কানযুল ঈমান***, (চট্টগ্রাম : ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমি, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৯

১১০. প্রাগুক্ত. পৃ. ৩০

লিখক ও পঠনের সুযোগ পান। তাছাড়া দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগ্যাজিনে স্বনামে ও ছন্মনামে লেখা লেখী করেন। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি সময় পেলে লিখতে বসেন। প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদান ছেড়ে দিয়ে তিনি গবেষণা কর্মে জড়িয়ে পড়েন; এবং ইত:মধ্যে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। ইসলামী শিক্ষা বিকাশে তাঁর অনুবাদ ও গবেষণা কর্মে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।[১১১]

**জ. প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ**

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদূদ চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার চাতরী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন।[১১২] গ্রামের মক্তবে পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে ইসলামী শিক্ষার্জনের জন্য চট্টগ্রাম শহরের আসাদগঞ্জে অবস্থিত সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল, আলিম ও ফাযিল বোর্ড পরীক্ষা সমূহে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইসলামী শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রী লাভের জন্য জ্ঞান পিপাসু মোহাম্মদ আব্দুল অদূদ জামেয়ায় ভর্তি হয়ে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা হতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারী মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া হতে কামিল তাফসীর বিভাগ মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান লাভ করেন।

পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ও বিষয়ের উপর গভীরতা লাভের মহান আশায় মোহাম্মদ আব্দুল অদূদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হয়ে বি.টি, আই এস (অনার্স) ও এম, টি, আই, এস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী অর্জন করেন। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগে ১৯৯৫ খ্রি. প্রভাষক পদে যোগদান করে পাঠদানে সুনাম অর্জন করেন। দেশ, কাল ও সমাজের প্রতি নিষ্ঠাবান গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. আবদুল অদূদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৩ খ্রি. 'বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা (১৯৪৭-১৯৯৭) বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর এ গবেষণার তত্ত্ববধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দীন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার অধিকারী ড. আব্দুল অদূদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফেডারেশনের সদস্য পদ সহ প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন।

---

১১১. মাওলানা আবদুল মান্নান এর লিখিত রচনাবলী- ১. তরজমা-ই কুরআন ও তাফসীর : উর্দূ ভাষায় মূল অনুবাদক ও তাফসীরকারক যথাক্রমে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) ও আল্লামা না'ঈমুদ্দীন মুরাবাদী (রহ.) ২. তরজুমা-ই কুরআন ও তাফসীর : উর্দূ ভাষায় মূল অনুবাদক ও তাফসীরকারক যথাক্রমে ইমাম আহমদ রেযা খান (র.) ও আল্লাম না'ঈমুদ্দীন মুরাবাদী (রহ.), ৩. মিরআতুল মানাজীহ শরহি মিশকাতুল মাসাবীহ, ৪. ফয়যান-ই সুন্নাত: উর্দু থেকে বাংলায় রূপান্তর, (মূল লিখক ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ক্বাদেরী, পাকিস্তান), ৫. ফয়যান-ই রমদ্বান : উর্দু থেকে বাংলায় রূপান্তর, ৬. বরকাত-ই মীলাদ শরীফ : উর্দূ থেকে বাংলায় রূপান্তর (মূল লিখক ঃ মাওলানা শফী উকাড়বী, পাকিস্তান।), ৭. নূরের নবী মানব রূপে : পায়করে নুর উর্দু থেকে বাংলায় রূপান্তর, ৮. আধাঁর থেকে আলোর দিকে : উর্দু থেকে বাংলায় রূপান্তর, ৯. দেওবন্দীরা যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ : ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান (রহ.), ১০. দীওয়ান-ই আযীয : ফার্সি ভাষা থেকে বাংলায় রূপান্তর (ফার্সি কাব্য, মূল লিখক : আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযীযুল হক (র.), ১১. ওহাবী মাযহাবের হাক্বীকত : উর্দূ থেকে বাংলায় রূপান্তর, ১২. বাহজাতুল আসরার : উর্দু থেকে বাংলায় রূপান্তর। (মূল লিখক : আল্লামা শাত্বনূফী র.), ১৩. হজ্ব-ই বায়তুল্লাহ ও যিয়ারতে : মদীনা মুনাওয়ারাহ সচিত্র পূর্ণাঙ্গ হজ্ব গাইড, ১৪. শী'য়া ও মওদূদী মতবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ১৫. একটি শংসয় ও তার নিরসন।

১১২. ড. আব্দুল অদুদ, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, কভার পৃষ্ঠা।

ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদূদ খুব স্বল্প পরিসরে দেশে একজন দূরদর্শী গবেষক, বিজ্ঞ লেখক ও আদর্শবান শিক্ষাবিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। ফলে তিনি ২৪ জুলাই ২০০৮ খ্রি. দেশের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে যোগদান করে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দু'বার ছয় বছর দায়িত্ব পালন করেন। ৩০ নভেম্বর ২০১১ খ্রি. থেকে ২০১৩ খ্রি.  পর্যন্ত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের ডীন হিসেবেও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[১১৩]

এশিয়াটিক সোসাইট অব বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমীর সদস্য এবং ঢাকাস্থ আনোয়ারা সমিতির উপদেষ্টা ড. অদূদ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা ও পত্র-পত্রিকার সাথেও সংশ্লিষ্ট। তিনি ২০০৩ সনের সেপ্টেম্বর থেকে ইদারা-ই তাহকীকাত-ই ইমাম আহমদ রেযা ইন্টারন্যাশনাল, ( পাকিস্তান) কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক মা'আরিফ-ই রিযা পত্রিকার অনারবী সদস্য পদ লাভ করেন।[১১৪] বর্তমানে তিনি এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি. গবেষণার তত্ত্বাবধান করছেন। ইত:মধ্যে বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে তাঁর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রগতিশীল ইসলামী চিন্তা-চেতনার ধারায় অসাধারণ গবেষক ও ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ আব্দুল অদূদ বয়সের তুলনায় বিপুল কর্মযজ্ঞ আয়োজনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর গবেষাণা মূলক প্রবন্ধসমূহ ইসলামী শিক্ষা বিকাশে বিরাট ভূমিকা রাখছে। তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে। তম্মধ্যে 'বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ' গ্রন্থটি তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভ। তিনি এ অভিসন্দর্ভে ১৯৪৭-১৯৯৭ সময়ে যারা বাংলাভাষায় কুরআন চর্চা করেছেন তাঁদের জীবনী উল্লেখসহ তাঁদের কুরআনী সাহিত্যের বিষয়বস্তু, পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট এবং বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চায় তাঁদের অবদান ও ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাযথ প্রামাণিক দলীল ও নির্ভুল তথ্যোপকরণ সংযোজন করেছেন। ড. মুহাম্মদ আব্দুল অদূদকে এ গবেষণার দিক নিদের্শনা দিয়েছেন দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ সুনিপুন গবেষক এবং ঢাবি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দীন।

ড. আব্দুল অদূদ তাঁর শিক্ষকতা জীবনের গবেষণার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও নির্যাস ফসল এ অভিসন্দর্ভে তুলে ধরেন। এ অভিসন্দর্ভটি তিনি ছয়টি অধ্যায়ে সন্নিবেশন করেন। প্রথম অধ্যায়ে পবিত্র কুরআন তরজমা, দ্বিতীয় অধ্যায় পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ চর্চার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় অধ্যায় পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদক ও বঙ্গানুবাদ পরিচিত ও পর্যালোচনা, চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা সাময়িক পত্রে কুরআন চর্চা, পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাভাষায় বিষয় ভিত্তিক কুরআন চর্চা ও ষষ্ঠ অধ্যায় বাংলাভাষায় অনূদিত কুরআনের তুলনামূলক পর্যালোচনা। তিনি তাফসীরে না'ঈমীর বঙ্গানুবাদ শুরু করেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে।

### ঋ. মাওলানা সৈয়্যদ আবু তালেব মুহাম্মদ আলা উদ্দীন

মাওলানা সৈয়্যদ আবু তালিব মুহাম্মদ আলা উদ্দীন চট্টগ্রাম জিলার বৃহত্তম উপজিলা ফটিকছড়ির নানুপুর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাইয়্যিদ পাড়ায় ১৯৫৮ খ্রি. পহেলা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামী শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা সৈয়্যদ আতাউল হক'র ঐকান্তিক ইচ্ছামতে তিনি স্থানীয়

---

১১৩. মুহাম্মদ জিয়াউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩; ড. আবদুল অদূদ, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ*, প্রাগুক্ত, কভার পৃষ্ঠা।

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানুপুর মুযাহিরুল উলূম ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৭০ খ্রি. ও ১৯৭২ ডখ্র. যথাক্রমে দাখিল ও আলিম বোর্ড পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ইসলামী শিক্ষার উপর উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি নিজ গ্রাম ত্যাগ করে সোবহানিয়া আলীয়া (কামিল) মাদরাসা হয়ে ফাযিল, (১৯৭৬ খ্রি.) চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয় মাদরাসা হতে কামিল (হাদীস) ও (১৯৭৮ খ্রি.) কুমিল্লা আলীয়া মাদ্‌রাসা হতে কামিল (ফিক্‌হ) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ইসলামী শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ সনদ অর্জন করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ আবু তালিব তাঁর কৃতিত্বময় শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে ইসলামী শিক্ষার খিদমতের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৭৬ খ্রি. থেকে ১৯৭৮ খ্রি. পর্যন্ত নানুপুর মুযাহিরুল উলূম আলীয়া মাদ্‌রাসায় সুনামের সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করার পর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া (কামিল) মাদরাসায় ১৯৮৭ সনের শুরুতে যোগদান করে ১৯৯৫ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে নিয়োজিত ছিলেন। জামেয়ায় পাঠদানকালে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও দক্ষতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আনজুমান ট্রাস্ট'র কর্তৃপক্ষ তাঁকে আনজুমান পরিচালিত রাজধানীর বুকে অবস্থিত মুহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া (কামিল) মাদরাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করলে তিনি ১৯৯৬ খ্রি. ওই মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ২০০৪ ডখ্র. পর্যন্ত অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার একমাত্র আলীয়া স্তরের দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গহিরা এফ.কে. জামিউল উলূম আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসায় যোগাদান করে ২০১০ খ্রি. পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ইসলামী শিক্ষার খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে (২০১৭ খ্রি.) তিনি জামেয়ায় মুহাদ্দিস ইসলামী শিক্ষার খিদমত আন্‌জাম দিয়ে যাচ্ছেন।[১১৫]

দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে দেশের খ্যাতিমান একাধিক জামে মসজিদে খতীব হিসেবে নিয়েজিত ছিলেন। জুম'আর খুৎবাপূর্ব কুরআন-হাদীসের তাত্ত্বিক আলোচনা মুসল্লিদের নিকট খুবই প্রিয়। অধিকন্তু তিনি একজন জনপ্রিয় আলোচক, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি জামেয়ার মসজিদে ১৯৮৭ খ্রি. থেকে ১৯৯৫ খ্রি. পর্যন্ত অত্যন্ত খ্যাতি ও সুনামের সাথে খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে মুহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যিবিয়া আলীয়া (কামিল) মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকালীন ঢাকার হাইকোট সংলগ্ন হযরত শরফুদ্দীন চিশ্‌তি (রহ.)'র মাযার মসজিদে ২০০৪ থেকে ২০১১ খ্রি. পর্যন্ত খতীবের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। আলেমে দ্বীন অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল কাদেরীর ইন্তিকালের পর তিনি চট্টগ্রাম জমিয়াতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদের খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি সময় পেলে লিখতে বসেন। প্রখ্যাত হাদীসের ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.)'র জীবনীসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

## ১.৯ শেষ জীবন, ইন্তিকাল ও কাফন-দাফন

অসংখ্য ভক্ত, অনুরক্ত ও দ্বীনদার অনুসারীদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে এ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার দিকপাল বিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষ, হাফিয ক্বারী আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)

১১৫. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম, ২০১৭ খ্রি.

৭ জুন, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ যিলহজ্ব, ১৪১৩ হিজরী, সোমবার (পাকিস্তান সময়) সকাল সাড়ে ৯ টায় পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হরিপুর জেলার সিরিকোট গ্রামের নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।[১১৬] তিনি এক স্ত্রী, সুযোগ্য দুই সাহেবযাদা এক মেয়ে এবং অগণিত ভক্ত, অনুরক্ত ও গুণগ্রাহী রেখে যান।

জানা গেছে, ইন্তিকালের দিনে তিনি যথা নিয়মে চাশ্‌ত নামায, তাস্‌বীহ-তাহলীল ও সকালের নাস্তা উপস্থিত মেহমানদের সাথে করেছিলেন এবং হাসিমুখে মহান আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করেন।

এ শোক সংবাদ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে পৌঁছার সাথে সাথে সারাদেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশেষতঃ তাঁর মুরীদগণ শেষবারের মতো এক নজর দর্শন ও নামাযে যানাযায় শরীক হওয়ার জন্য সকলেই ব্যাকুল হয়ে উঠেন। ৮ই জুন ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে নামাযে জানাযা পাকিস্তানের সিরিকোট শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসুরী এবং সুযোগ উত্তরসূরী দরবারে আলিয়া কাদেরিয়ার সাজ্জাদানশীন, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ)। উক্ত জানাযায় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাওয়াজ শরীফ, স্পীকার গওহর আইয়ুব, প্রাদেশিক মন্ত্রী মেহতাব আহমদ খান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর হাজী জাবেদ ইক্ববাল আব্বাসী, এম এন এ সরদার মোহাম্মদ ইউসুফ, এম এন এ নওয়াবযাদা আলাউদ্দীনসহ কেবিনেট মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সাংসদ, রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ নেতৃবর্গ, ওলামা, বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক সহ অসংখ্য ভক্ত, অনুরক্ত উপস্থিত ছিলেন। এ সব নেতৃবৃন্দ তাঁর মাযারে ফাতিহা পাঠ করেন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। নামাযে জানাযার পর তাঁকে সিরিকোট দরবার শরীফে কুত্ববুল আউলিয়া হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র মাযারের পার্শ্বে একই গম্বুজে'র নীচে সমাহিত করা হয়।[১১৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামেল। পাশাপাশি তিনি ছিলেন জগত বিখ্যাত মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফকিহ্, সংগঠক এবং সমাজ সংস্কারক। বহুমখী প্রতিভাবান এই মহান ব্যক্তিত্ব শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশের নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ। তাঁর সুন্দর আদর্শ, অনুপম চরিত্র এবং আধ্যত্মিক জীবনকে অনুসরণ করলে একজন মানুষ পেয়ে যাবে তার চলার পাথেয়; খুঁজে পাবে মুক্তির ঠিকানা, সফল হবে তাঁর উভয় জগত।

### ১.৯.১ মালফূযাত

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) মানুষের হেদায়তের উদ্দেশ্যে নিয়মিত উপদেশ ও নসীহত পেশ করতেন। নিম্নে কতিপয় উল্লেখ করা হলো-

১. হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র সত্ত্বা রূহানিয়ত তথা আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র। যদি বায়'আতের সিলসিলা পীরে তরীকতের মাধ্যমে হুযূর (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে ফয়েজ প্রাপ্ত হবে, নতুবা ফয়েজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

---

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১১৭. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

২. শস্যের পক্কতার জন্য যেমনি সূর্যের আলোর প্রয়োজন, তেমনি রূহানিয়াতের পূর্ণতার জন্য হুযূর আক্দাস (সা.) এর স্বত্ত্বার প্রয়োজন।
৩. শরীরের জন্য প্রয়োজন খাদ্য, আর আত্মার খাদ্য জিকরে ইলাহী, নফল ইবাদত ও দুরূদ শরীফ।
৪. বেলায়ত হুযূরের (সা.) সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়, বাতিল ফিরকার সম্পর্কের মাধ্যমে নয়।
৫. শরী'আত হচ্ছে বিধান, তরীকত হচ্ছে তার উপর আমল করা।
৬. রাসূল (সা.) এর সাথে বেয়াদবী আচরণ কারী ইয়াহুদীদের চেয়েও মারাত্মক।
৭. পীর-মাশায়িখের আস্তানা তাজাল্লিয়াতের কেন্দ্র, এখান থেকে ফয়েজ বন্টন হয়।
৮. হুযূর আকদাস (সা.) এরশাদ করেছেন, "আল্লাহু ইউ'তী ওয়া আনা কাসিমুন" অর্থাৎ আল্লাহ্ দাতা আমি বন্টনকারী, আউলিয়া কিয়াম হুযূর আকদাস (সা.) থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হন।
৯. সহোদর ভাই থেকে পীর ভাইয়ের মর্যাদা বেশী।
১০. গর্ব ও অহংকারীদের নিকট তরীকতের গন্ধও পৌঁছে না।
১১. বেয়াদব লোকদের সাহচর্য থেকে বেচে থাক। না হয় আকীদা পাল্টে যাবে, সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে।
১২. আসহাবে কাহাফের কুকুর সৎলোকদের সাহচর্যের কারণে বেহেস্তে যাবে, হযরত নূহ (আ:) এর ছেলে বদ লোকদের সাহচর্যের কারণে আল্লাহ্র আজাব থেকে রেহায় পায়নি।
১৩. হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এবং গর্ব-অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এজন্য নিজেকে প্রত্যেকের সামনে ছোট মনে করা ভাল।
১৪. ইমাম হোসাইন (রা.) এর মত নজীর বিহীন কোরবাণী কিয়ামত পর্যন্ত কেউ কায়িম করতে পারবে না।
১৫. দুনিয়াকে অবলম্বন মনে কর আর আখিরাতকে মনে কর মাকসুদ।
১৬. আধ্যাত্মিক মূলাকাতের পক্কতার জন্য শারীরিক মূলাকাত প্রয়োজন।
১৭. তাসাওউরে শায়খ যতটুকু মাজবুত হবে, আধ্যাত্মিক স্তর ততটুকু দ্রুত অতিক্রম করবে।
১৮. মুর্শিদের মঞ্জুরে নজর হওয়ার জন্য তাঁর আন্তরিকতার পূর্ণতা অর্জন একান্ত আবশ্যক।
১৯. রাসূল (সা.)'র প্রেমই প্রকৃত ঈমান।
২০. অন্যদের দূর্নামে নিজের কোন উপকার নেই।
২১. আন্তরিক ভালবাসা দ্বারা সে রাজ-রহস্য অর্জন হয়, যা কারো স্বপ্নে বা ধারনায়ও অর্জন হয় না।[১১৮]

উপরিল্লিখিত মালফূযাত ছাড়াও বহু মালফূযাত তাঁর জীবদ্ধশায় আলাপচারিতায়, পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন রচনাবলীতে ও বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও দরস্-তাদরীস বহু মূল্যবান মালফূযাত রয়েছে। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এবং তাঁর ভক্ত-অনুরক্তরা এ সব মালফূযাত সংগ্রহ করে যাচ্ছেন।

---

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

## ১.৯.২ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) সম্পর্কে উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ কয়েকজন আলিম ও বুদ্ধিজীবী'র অভিমত

দেশ-বিদেশের ওলামা ও বুদ্ধিজীবীগণ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও তাঁদের লিখনীতে এ মহান মনীষীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর কর্ম ও অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে কয়েকজন মনিষীর অভিমত উল্লেখ করা হল :

১. পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শায়খ আল্লামা তাহের শাহ্ (মু.যি.আ) বলেন, "আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ছিলেন যামানার শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ"।[১১৯] তাঁর ঈছালে সাওয়াব উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিলে আল্লামা তাহের শাহ্ (মু.যি.আ) আরো বলেন, "হযরত তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ছিলেন এক যুগশ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামিল"।

২. ১৯৯৭ সালে তাঁর চতুর্থ ইছালে সাওয়াব উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, "আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ ছিলেন ইসলামের সফল সংস্কারক"।

৩. অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল্ কাদেরী বলেন-সর্বদা সুন্নাতে রাসূলের অনুসারী ছিলেন হুযূর ক্বেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)। তিনি নিজেও সুন্নাতের উপর আমল করতেন এবং ভক্ত-মুরীদদেরকেও নির্দেশ দিতেন।

৪. চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ছিলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দ্বীনি সংস্কারক"।

৫. ড. আ.ন. ম. মুনির আহমদ চৌধুরী (অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), বলেন-
"হুযূর তৈয়্যব শাহ্ কিবলা সম্পর্কে যা জানতে পেরেছি, তাঁর সার-সংক্ষেপ এই দাঁড়ায় যে, তিনি একজন ইনসানে কামিল ও ইসলামের মহান সমাজ সংস্কারক'।[১২০]

৬. অধ্যাপক খালেদ (সম্পাদক দৈনিক আজাদী, চট্রগ্রাম) বলেন-
"আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ছিলেন এ যুগের অন্যতম সংস্কারক"।[১২১]

৭. শায়খুল হাদিস আল্লামা সোলায়মান আনসারী বলেন-
"আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ছিলেন প্রিয় নবীর একনিষ্ঠ অনুসারী"।[১২২]

৮. আলহাজ্ব আল্লামা ছগির ওসমানী বলেন-
আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।[১২৩]

৯. প্রফেসর কামাল উদ্দিন আহমদ বলেন-
হযরত আল্লামা তৈয়্যব শাহ (রহ.) ইসলামী বিশ্বের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এবং আত্ম বিশুদ্ধতার বৈশিষ্ট্য দিকহারা মুসলমানদেরকে সুন্নীয়তের পতাকা তলে সমবেত হতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। বলতে গেলে তিনি সুন্নী মুসলমাদের ত্রাণকর্তা।[১২৪]

---

১১৯. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নিয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১২১. সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, ***আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ : জীবনী গ্রন্থ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১০. শাহ্ সূফী মুহাম্মদ আবদুশ শুক্কুর নকশবন্দী বলেন-

> মুসলিম সমাজ তাঁর অলৌকিক পরশে আলোকিত, সুশোভিত। তাঁর নূরানী চেহারার ঝলকে অনেক পাপী-তাপী ও পথভ্রষ্ঠ একেকজন খাঁটি ঈমানদার ও রাসূল-প্রেমিক হিসেবে স্বীয় জীবনকে ধন্য করেছেন। তিনি যে সত্যিকারের সুন্নাতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তা তাঁর প্রতিটি কাজে, কর্মে পরিলক্ষিত হয়।[১২৫]

পত্র-পত্রিকা, সাময়িকি ও বিভিন্ন লিখনীতে তাঁর সম্পর্কে বহু অভিমত রয়েছে। বক্ষমান অভিসন্দর্ভের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সংক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বুদ্ধিজীবিদের বিভিন্ন অভিমত দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, আজীবন তিনি ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে দিকভ্রান্ত মানুষদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন।

---

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
১২৫. প্রাগুক্ত।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# ইসলামী শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

## ২.১ ইসলামী শিক্ষার প্রকৃতি ও স্বরূপ

ইসলামী শিক্ষার পরিধি ও দিগন্ত সুবিশাল। এটি মানুষের, দেহ, মন ও আত্মার বৈষয়িক ও নৈতিক বিষয়াদিসহ সবদিকে ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানুষের দেহ, মস্তিষ্ক ও আত্মার সমন্বিত এক অবয়ব পরিচালনার সুন্দর দিক-নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। তাই মানুষের সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ "জ্বিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[১২৬] তাই সঠিক পন্থায় ইবাদত করার একমাত্র উপায় হল ইসলামী শিক্ষা ও তার আদর্শ।

যে কোন জাতির শিক্ষার স্বরূপ সে জাতির জীবনাদর্শের উপর নির্ভর করে। তাই শিক্ষা-ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরি হয় সে জাতির জীবনবোধ, জীবনাচার, জীবনের বিকাশ ও পরিণতি কেমন হবে তার উপর ভিত্তি করেই। পার্থিব জগতে মানুষ কর্মশীল, আর জ্ঞান হলো তার অমূল্য সম্পদ। এই জ্ঞানের মাধ্যমেই আদি মানব হযরত আদম (আ.) ফেরেশতাদের মুকাবিলায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا অর্থাৎ-আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.)কে সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।[১২৭] ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতেও মানুষের প্রয়োজন যথার্থ জ্ঞানের। জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ সম্ভব। তাই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেকাংশেই বিদ্যার্জনের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তাকিদ দেয়া হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত 'দারুল আরকাম'ই[১২৮] ইসলামী শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে নবীজি নিজেই শিক্ষা দিতেন এবং পরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে শিক্ষাদানের জন্য তিনি কতিপয় সাহাবীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নুবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে প্রায় পাঁচ শতাব্দী কালকে 'আইয়্যামে জাহিলিয়াত' বলা হয়।[১২৯] তখনকার সময়ে আরবদের মাঝে জাগতিক যোগ্যতা ও

---

১২৬. আল কুরআন, ৫১ : ৩১

১২৭. আল কুরআন, ০২ : ২১

১২৮. এটি ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হযরত আরকাম বিন আবুল আরকাম প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নির্দেশে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর বাড়িতে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসা পরিচালনা করতেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই। এ মাদরাসার উল্লিখযোগ্য ছাত্র ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) সহ প্রথমস্তরের সাহাবীবৃন্দ। (আবদুল মালেক ইব্ন হিশাম বসরী, *সিরাত-ই ইব্ন হিশাম*, মিশর : তা. বি.), পৃ. ২৪৪

১২৯. ড. আলী মুহাম্মদ আস-সা'লাভী, *আস্-সীরাতুন নববীয়্যাহ্* (বৈরুত : ১ম সংস্ক., ২০০৪ খ্রি./১৪২৫ হি.), পৃ. ২২

দক্ষতার অসাধারণ সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে ইসলামের অভ্যুদয়ের পর তাদের এ অসাধারণ যোগ্যতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মূল্যবান নৈতিক মানসম্পন্ন ও উন্নত মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের সে শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা বা বিদ্যা হিসেবে বিবেচিত হয়নি বরং তা সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্মের প্রতি ধাবিত হতে লাগলো। শতধা বিভক্ত, পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত এবং চারিত্রিক অধঃপতনে চরম বিপর্যস্ত আরব বেদুইনরা সেদিন এ শিক্ষা লাভের ফলে পরিণত হয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে।[১৩০] তৎকালীন যুগে সভ্যতার দাবিদার রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য এদেরই পদানত হয়।

ইসলাম পূর্ব আরবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন খুব একটা ছিল না। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও আল হাদীসে এদেরকে 'উম্মী' হিসেবে অভিহিত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন উল্লিখযোগ্য সংখ্যক ছিল না, তেমনি মুদ্রণ যন্ত্রেরও প্রচলন ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও আরব কবিদের কাব্যশৈলী ও ভাষার উচ্চাঙ্গতার প্রতি দৃষ্টি দিলে যে কেউ অভিভূত হয়ে পড়বে। তাদের সাহিত্য ভান্ডারের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সাধারণ যে কোন বিষয়ের উপর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে শব্দসম্ভার, ভাষা, রূপকথা, সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং উপমা ব্যবহারের দিক বিচারে আধুনিক ভাষা সাহিত্য তাদের সাহিত্য কর্মের কাছে হার মানতে হয়।[১৩১]

সাহিত্যের প্রতি আরবদের আগ্রহ বিস্ময়কর। হীরার অধিপতি নু'মান ইব্‌ন মুনযার আরবদের কাব্যমালা লিপিবদ্ধ করে শুভ্র প্রাসাদের নীচে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘদিন পর ইসলামী যুগে এসে মুখতার ইব্‌ন আলী উবায়দ হীরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে লোকজন আরব্য কাব্যগ্রন্থ পুঁতে রাখা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি প্রাসাদ খনন করে এসব কাব্যমালা আবিষ্কার করে তা দ্রুত বের করে আনার নির্দেশ দিলেন। হীরা, মনি মুক্তার পরিবর্তে কাব্যগ্রন্থের মত মূল্যবান সম্পদ প্রাসাদের নীচে পুঁতে রাখাই প্রমাণ করে সাহিত্য তাদের কাছে কত মুল্যবান।[১৩২]

ইসলাম পূর্বযুগে কিছু বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। সে সময়কার সর্ববৃহৎ 'উকায'[১৩৩] মেলায় সাহিত্য সমাবেশ হতো। বাল্যবয়সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একবার ইয়াহুদীদের একটি বিদ্যালয়ে গমন করেছেন বলে হাদীসে উল্লেখ পাওয়া

---

১৩০. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, ***ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫), পৃ. ১৩

১৩১. পূর্বোক্ত

১৩২. জুরজী যায়দান, ***তারীখুল-লুগাতিল আরবিয়্যাহ*** (তা.বি.) খ. ১, পৃ. ৯৫-১১৬; ড. মুহাম্মদ আব্দুল গফুর, ***আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*** (চট্টগ্রাম : ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৯৬

১৩৩. উকায : আরব জাতি সংস্কৃতমনা জাতি হিসেবেও বিশ্বে পরিচিত। উকায মেলার সাহিত্য আসরই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 'উকায' স্থানটি তাইফ ও নাখলার মধ্যবর্তী একটি খেজুর বাগানের নাম। অসাধারণ বাচনশক্তির অধিকারী প্রাচীন আরবের কবিরা মক্কার অদূরে গিয়ে উকাযের বাৎসরিক মেলায় কবিতা পাঠের আসরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। বিজ্ঞ কবি-সাহিত্যিকদের স্বচ্ছ নির্বাচন দ্বারা মনোনীত কবিদের পুরস্কৃত করা হতো। বিশেষ করে কা'বা শরীফের দেওয়ালে ঝুলন্ত কবিতাগুলোর কবিরাই বিরল সম্মাননার অধিকারী হতেন। আর আরবদের মধ্যে উৎকৃষ্ট, সাহিত্যময় ও প্রাঞ্জলতাপূর্ণ কবিদের রচিত কবিতাগুলোই কা'বা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হত এবং বছরান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের উকায মেলায় বিশেষ সম্মাননা দেয়া হত। (***ইসলামী বিশ্বকোষ***, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪৪৪)

যায়।[১৩৪] তৎকালীন আরবে নামী-দামী কবিদের কবিতা গুচ্ছ দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। আস-সাব'উল মুআল্লাকাত বা 'ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তক' আজও তার জলন্ত প্রমাণ। তখনকার তায়েফের অধিবাসী গায়লান ইব্ন সালমাহ আল-সাকাফী সপ্তাহে একদিন সাহিত্য সভার আয়োজন করতেন।[১৩৫]

চিকিৎসাবিজ্ঞানী হারিস ইব্ন কালদাহ (মৃ. ১৩ হি.)'র চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থ সে সময়েই রচনা করেন। ইব্ন আবি রুমিয়্যাহ আল-তামিমী এবং নযর ইব্নুল হারিছ ও ইব্নুল কালদাহ তখনকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিংবদন্তী ছিলেন। সে সময়ে নারী শিক্ষারও কিছুটা প্রচলন ছিল। উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফ্সা[১৩৬] (রা.) ও হযরত উম্মু সালমাহ[১৩৭] (রা.) লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁদের এ শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না; ব্যক্তি উদ্যোগেই তাঁরা শিক্ষা লাভ করেছিলেন।[১৩৮]

ইতিহাস একথা সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রধানত ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে। এ দা'ওয়াতকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায় :

১. দা'ঈ বা মুবাল্লিগদের মাধ্যমে,
২. আরব বণিকদের মাধ্যমে,
৩. ইসলামের বিজয় অভিযানের মাধ্যমে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদার আমলে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ঘটে। বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব হয় সাহাবা ও 'তাবি'ঈন' তথা আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে। আর এর প্রচার-প্রসার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সূফী-দরবেশগণের মাধ্যমে। ব্যবসায়িক কারণে এদেশে সামুদ্রিক যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের আগমন সহজ ছিল। তাঁরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসলেও দ্বীনের প্রচার-প্রসারেও অবদান রাখেন।

১২০৩ খ্রি. মুসলিম বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর বঙ্গদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামী শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে তখনকার সময়ে বহু মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় রংপুরে যার পূর্ব নাম ছিল নদীয়া। ইখতিয়ার

---

১৩৪. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, ***ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,*** পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১৩৫. প্রাগুক্ত

১৩৬. তিনি হযরত উমার (রা.)'র কন্যা, মাতা যায়নাব বিনতে মায'উন এবং প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মহিয়সী স্ত্রী। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বিবাহ-আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তিনি খানীস ইব্ন হুযাফা আস-সাহমী'র অধীনে ছিলেন। তৃতীয় হি. সনের রমদানুল মুবারকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৪৫ হি. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। (***হায়াত-ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,*** পৃ. ৪০৭; সম্পাদনা পরিষদ, ***হযরত রাসূলুল্লাহ্-ই কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম : জীবন ও শিক্ষা*** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৭৩

১৩৭. তিনি প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সহধর্মিণী। ৫ম হিজরী সালে তাঁর সাথে প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ৫৯/৬১ হিজরী সালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৩৮. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দীন, ***ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*** , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী এ সবের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১৩৯] এভাবে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ্[১৪০] প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোর মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। বাগদাদ ও কর্ডোভার অনুসরণে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মাদরাজ, লুভালী, সোনারগাঁ ও ঢাকাসহ তদানীন্তন ভারতের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ শিক্ষার জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মুসলিম শাসকরা দেশের মোট ভূমির এক-তৃতীয়াংশ লাখেরাজ করে দিয়েছিলেন। এভাবেই খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ থেকে শুরু হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটে।

ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস হলো- কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস। ইসলামী শিক্ষার সূচনাকাল ধরা হয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী নাযিলের পর থেকে।[১৪১] তবে মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) থেকে পরবর্তী সকল নবী-রাসূলের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার ধারা অব্যাহত রেখেছেন।[১৪২] হযরত আদম (আ.) থেকে শেষনবী পর্যন্ত প্রত্যেক নবী (আ.)-ই ওহী লাভ করেছেন। সেই ওহীই ছিল তাদের ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি।[১৪৩]

## ২.২ ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা

ইসলাম (اسلام) আরবী শব্দ। এটি سلم অথবা سلامة থেকে নির্গত। سلم অর্থ আত্মসমর্পণ করা তথা আনুগত্য করা। আর سلامة অর্থ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকা।[১৪৪]

ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা, অনুগত হওয়া, শান্তির পথে চলা, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি।[১৪৫] মুফতী আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদী বলেন, "ইসলাম অর্থ আনুগত্য, বাধ্যতা। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই হলো ইসলাম।[১৪৬]

---

১৩৯. মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, ***রংপুরে ইসলাম*** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৫৬-৭১

১৪০. খানকাহ্ শব্দটি ফার্সী। 'খান'-ফকীর, দরবেশ, 'কাহ' স্থান অর্থাৎ ফকীর দরবেশের স্থান। সূফী-সাধকদের ইবাদত করার স্থান। পার্থিব বিমুখ ফকীর দরবেশরা আধ্যাত্মিকতার উন্নতি লাভের জন্য খানক্বাহ'য় বসে ইবাদতে মগ্ন থাকেন এবং তাঁরা এ স্থান হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। (***বাংলা বিশ্বকোষ,*** খ. ২ ঢাকা : বাংলা একাডেমি, তা. বি.), পৃ. ৭-২৫০

১৪১. মোঃ শহিদুল ইসলাম, ***ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ঝিনাইদাহ জেলার অবদান*** (এম.ফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩ খৃ.), পৃ. ৬৬

১৪২. প্রাগুক্ত।

১৪৩. অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুর রব ও এ.এম. আলাউদ্দিন, ***ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*** (ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশান সোসাইটি, ১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ০৯

১৪৪. রাগিব আল-ইস্পাহানী, ***আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন*** (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, তা.বি.), পৃ. ২৩৯

১৪৫. সম্পাদনা পরিষদ, ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৩শ সংস্ক., ২০১৭ খৃ.), পৃ. ৩৩

১৪৬. মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী, ***কাওয়াইদুল ফিক্হ*** (দেওবন্দ, ইউপি ভারত : আশরাফী বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ৪

মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন আল-আজহারী বলেন, "ইসলাম হলো ধর্মকে অবনত মস্তকে মেনে নেয়া।"[১৪৭]

ড. মুহাম্মদ সিকান্দার আলী বলেন,

> "Islam is the only Din Acceptable to Allah. Allah says : 'Inna aldina Inda Allahi al-Islam'-Verily, the Din before Allah is Islam' That means excepting Islam no Din is accepted by Allah. Here Aldin means code; and Al-Islam means to surrender and submit to the will of Almighty Allah."[১৪৮]

ড. মুহাম্মদ সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী বলেন,

> "Islamic education in the true sense of the term, is a system of education which enable a man to know the precepts of Islam and perform all activities of his life in conformity with the Quran and Sunna."[১৪৯]

ড. আব্দুল ওয়াহিদ বলেন,

> "ইসলামী শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নৈতিক শিক্ষা দান এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা।"[১৫০]

ড. খুরশীদ আহমদ বলেন,

> "ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামোতে শিক্ষার বুনিয়াদী উদ্দেশ্যই হচ্ছে নবীদের দায়িত্বের অনুরূপ লোকদের ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। তাদেরকে এ দ্বীনের দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করা এবং তাদেরকে পূর্ণ বিকশিত জীবনের জন্য তৈরি করা।"[১৫১]

ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন বলেন,

> "ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার শিক্ষাই হলো ইসলামী শিক্ষা। অর্থাৎ যে জ্ঞান বা শিক্ষা দ্বারা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে জানা যায় এবং যে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার নিজেকে ও মহান আল্লাহ তা'আলাকে জানতে ও চিনতে পারে তাই হলো ইসলামী শিক্ষা।[১৫২]

---

১৪৭. মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন আল-আজহারী, ***আরবী-বাংলা অভিধান***, খ. ১ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪ খৃ.), পৃ. ২৯৬

১৪৮. Dr. Sekender Ali Ibrahimi, ***Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal***, Vol.3 (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1985), Introduction P. xxv.

১৪৯. Dr. Sekender Ali Ibrahimi, ***Aforesaid***, P. xxiii.

১৫০. ড. আব্দুল ওয়াহিদ, ***বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*** (ঢাকা : ইসলামি সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০১ খৃ.), পৃ. ২২

১৫১. অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, ***ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি***, অনুবাদঃ অধ্যাপক নাজির আহমদ (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ১৬

১৫২. ড. আ.ন.ম. রইছউদ্দীন ও আব্দুস সালাম খান, ***উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামী শিক্ষা*** (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ০৩

ড. আবু বকর রফিক আহমদ বলেন,

> "একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তখনই শুধু আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হতে পারে, যখন ঐ ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করে একজন শিক্ষার্থীর ঈমান হবে সুদৃঢ়, চরিত্র হবে সুন্দর, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা হবে উন্মুক্ত, সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্বের অনুভূতি হবে তীব্র। পরকালে আপন দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জবাবদিহিতার ভয় থাকবে অন্তরে সদা জাগ্রত।"[১৫৩]

ইসলামী শিক্ষা এমন একটি ব্যবস্থার নাম যার মাধ্যমে মানুষ তার স্রষ্টার সঠিক পরিচয় লাভে সক্ষম হয় এবং প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দীনের অনুসরণের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করতে পারে।

## ২.৩ ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব

জ্ঞানই সম্পদ। সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ তার স্রষ্টাকে চিনতে পারে। জ্ঞানের আলো মূর্খতার অন্ধকারকে দূরীভূত করে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি প্রথম নির্দেশ হলো : اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ.

পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।"[১৫৪]

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র ইরশাদ করেন- اِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓءُ

"বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্‌র বান্দাদের থেকে জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে।"[১৫৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

"পরম করুণাময় আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, শিখিয়েছেন তাকে কথা বলতে।"[১৫৬]

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন-

لا حسد الا فى اثنين اتاه الله مالا فسلّط على هلكته فى الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلّمها -

"দুটি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা বৈধ নয় : ১. যাকে আল্লাহ ধন সম্পদ দিয়েছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন; ২. যাকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন যা দ্বারা সে মীমাংসা করে এবং শিক্ষা দেয়।"[১৫৭]

যেহেতু ইসলাম মানুষের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা সেহেতু এর গুরুত্ব ও পরিধি বিশাল। একে পূর্ণরূপে না জেনে, না বুঝে প্রকৃত মুসলিম হওয়া যায় না। ইসলামকে বুঝতে হলে কুরআন বুঝতে হবে এবং

---

১৫৩. ড. আবু বকর রফিক আহমদ, *'একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখার আলোকে আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার প্রস্তাবনা'*, জাতীয় শিক্ষা সেমিনার-৯৭ (ঢাকা : ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ১০৯

১৫৪. আল কুরআন, ৯৬ : ০১

১৫৫. আল কুরআন, ৩৫ : ২৮

১৫৬. আল কুরআন, ৫৫ : ১-৪

১৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, (বৈরূত : দারু ইব্‌ন কাছীর, ৩য় সংস্ক., ১৯৮৭ খ্রি.), হা. নং-১৩১৯, খ. ১, পৃ. ৩৮

কুরআন বুঝার জন্য হাদীস বুঝাও শর্ত। কারণ, হাদীস হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ। সুতরাং ইসলামী শিক্ষা ছাড়া প্রকৃত মুসলিম হওয়া যায় না।

ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। এ প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে -

كل مولود يولد على الفطرة -

"প্রতিটি মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে ইসলামের উপর।"[১৫৮]

ইসলামের প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করেও সব শিশুই মুসলিম হিসেবে টিকে থাকার সুযোগ পায় না। মুসলিম হয়ে বেঁচে থাকা কোন বংশ বা গোত্রগত অধিকার নয়, এটি সম্পূর্ণ আদর্শগত একটি বিষয়। একজন মানুষকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়ার জন্য যেসব গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক সেসব গুণাবলী অর্জিত হলেই তাকে মুসলিম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ইসলামের আদর্শ তার মধ্যে পাওয়া না গেলে শুধু নাম দিয়ে কাজ হয় না।

তুলনামূলকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য ধর্মে বিদ্যার্জনকে তেমন কড়াকড়িভাবে নেয়া হয় না যেমন ইসলামে রয়েছে বিদ্যার্জনের জন্য বিশেষ তাকিদ এবং কড়াকড়ি। অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বিদ্যার্জন করতে হবে নারী-পুরুষ প্রত্যেককে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

طلب العلم فريضة على كلّ مسلم.

"প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরে বিদ্যার্জন করা ফরয।"[১৫৯]

ড. আব্দুল ওয়াহিদ বলেন,

> "আল্লাহ্র অপার শক্তি, কুদরত, সৃষ্টি কৌশল তথা আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে জেনে এবং তার সৃষ্টির পরিচয় লাভ করে তার কাছে পূর্ণ রূপ আত্মসমর্পণ করার নামই হলো ইসলাম। এটা বিদ্যার্জন ব্যতীত আদৌ আশা করা যায় না।"[১৬০]

প্রত্যেক মুসলমানের উপর ততটুকু বিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্যই ফরয, যতটুকু বিদ্যা শিক্ষা করলে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

পার্থিব জীবনে উত্তমভাবে জীবন যাপন করা এবং পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করাই একজন মুসলিমের ইহকালের সাধনা। এই সাধনা পুরোটাই বৃথা যাবে যদি না সে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান লাভ করতে পারে। কেননা ইসলামী শিক্ষা মানব জাতির জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে এবং জ্ঞান অন্বেষণকারীকে আল্লাহ তা'আলা সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন।
আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

১৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, ***সহীহ আল-বুখারী***, প্রাগুক্ত, হা. নং-১৩১৯, খ. ১, পৃ. ৪৬৫

১৫৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-কাযবীনী, ***সুনান ইব্ন মাজাহ্***, (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি), হা.নং-২২৪, খ. ১, পৃ. ৮১

১৬০. ড. আব্দুল ওয়াহিদ, ***বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি***, (ঢাকা, ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ ২০০১), পৃ. ১৮

“আর যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।”[১৬১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য আল্লাহ জান্নাতের পথ সুগম করে দেন, তার উপর খুশি হন, আর তার পাপরাশি মার্জনা করে দেন ও তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।”[১৬২] শিক্ষা সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি। হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষার কারণেই ফেরেশতাদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অশিক্ষিতের উপর শিক্ষিতের মর্যাদা অনস্বীকার্য। কেননা শিক্ষিত আর অশিক্ষিত কখনই সমান হতে পারে না।[১৬৩] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرِ. “অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান?”[১৬৪]

## ২.৪ ইসলামী শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- ان الدّين عند الله الاسلام (আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম)।[১৬৫] তিনি ইসলামকে গোটা বিশ্বের কল্যাণের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। মানবজাতির কেবল প্রয়োজন সেই পূর্ণতাকে উপলব্ধি করা এবং সম্যকভাবে জানা, জ্ঞানার্জন করা বা শিক্ষা লাভ করা। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা ‘শিক্ষা’ কে সংগীন করে আবর্তিত। অবশ্যই মানব সৃষ্টির প্রথম থেকে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি রহস্য প্রকাশ করেছেন শিক্ষার মাধ্যমে। তবে সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মহানবী হযরত মুহাম্মদকে (সা.)। তাঁকে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলতেন, “আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন একজন শিক্ষক বা মুআল্লিম হিসাবে।”[১৬৬] আর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তাঁর ছাত্র, যারা মহান শিক্ষক থেকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সুশিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে, নৈতিকতা ও আদর্শে, উন্নত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

ইসলামী শিক্ষার উৎপত্তি মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই। মহান আল্লাহ প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ.)-কে সকল কিছুর নামসমূহ শিক্ষা দিয়েছিলেন।[১৬৭] এরপর হযরত আদম (আ.)-এর সময়কাল থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য নবী ও রাসূলগণের প্রতি আসমানী গ্রন্থ সহীফা ও কিতাব অবতীর্ণের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা পরিচালিত হয়েছে।[১৬৮] এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ্ঠ ও শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মক্কায় দারুল আরকামের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার ধারাবাহিক সূচনা হয়[১৬৯] এবং এ ধারা অব্যাহত থাকে খুলাফায়ের রাশিদীনের যুগে, উমাইয়া যুগে, আব্বাসীয় যুগে এবং আধুনিক কালে।

---

১৬১. আল কুরআন, ০২ : ২৬৯

১৬২. শায়খ ওয়ালি উদ্দীন আত-তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (দিল্লী : ফারুকিয়া বুক ডিপো, ২০১০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৩-৩৪

১৬৩. আল কুরআন, ৩৯ : ০৯

১৬৪. আল কুরআন, ১৩ : ১৬

১৬৫. আল কুরআন, ৩ : ১৯

১৬৬. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *ইসলাম পরিচয়*, (ঢাকা, ই. ফা.বা., ২০০৬) পৃ. ৪৫

১৬৭. আল কুরআন, ০২ : ৩১

১৬৮. ড. আব্দুল ওয়াহিদ, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

## ২.৫ যুগে যুগে ইসলামী শিক্ষা

মহানবী হযরত মুস্তাফা (সা.) ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে আরববাসীকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণীই ছিল 'ইক্বরা'। তাই তিনি শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর নবূওয়াত প্রকাশের পর থেকে ইসলামী যুগ শুরু হয়।[১৭০] ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস কুরআন তথা ওহীর সূচনা হয় এসময় থেকেই। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা-ই ইসলামী শিক্ষা। পরবর্তীতে সে শিক্ষা ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করে যুগে-যুগে।

### ২.৫.১ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র যুগে ইসলামী শিক্ষা (৬১০-৬৩২ খ্রি.)

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামাকে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র রমযানের এক বিজোড় রাত্রিতে[১৭১] তাঁর নিকট পবিত্র কুরআনের বাণী প্রথম প্রেরণ করেন। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন- انا انزلناه في ليلة القدر অর্থাৎ- নিশ্চয় আমি কুরআনকে কদর রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি।[১৭২] এরপর থেকে আল্লাহ প্রদত্ত মিশন এর আনুষ্ঠানিক গুরু দায়িত্ব শুরু হয়। মক্কা নগরীর অদূরে হেরা গুহায়[১৭৩] ধ্যানমগ্ন থাকাকালীন ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রথম ওহী (ঐশী প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ করেন-"পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।"[১৭৪]

এটি ছিল প্রথম ওহী, যা আল-কুরআনের প্রথম বাণী। এর পরবর্তী সূরা মুদ্‌দাস্‌সির[১৭৫] এবং কিছুদিন পর সূরা আদ্-দুহা অবর্তীণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পুরোদমে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও তাঁকে প্রদত্ত নবুওয়াত ও রিসালতের প্রচার শুরু করলেন এবং সহধর্মিণী হযরত খাদিজা বিনতে খুয়ায়লিদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল ও নবী হিসেবে প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[১৭৬] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামর শিক্ষানীতি পৃথিবীর সকল মহলে প্রশংসিত হয় এবং তাঁর শিক্ষাকেই ইসলামী শিক্ষা হিসেবে ধরা হয়।

এ প্রসঙ্গে আমেরিকান পণ্ডিত ফ্রান্স রোশদীন বলেন,

> 'The acquisition of knowledge has been a mainstay of Islam faith since its enunciation by the prophet Muhammad (sm) nearly 1400 years ago.'[১৭৭]

---

১৭০. মোঃ শহিদুল ইসলাম, ***ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ঝিনাইদাহ্ জেলার অবদান***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১৭১. রমযানের শেষ দশকের বিজোড় সংখ্যার যে কোন রজনী। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে ২৭ রমযান ক্বদর রজনী। এটিই অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিত (আলেম) গ্রহণ করেছেন।

১৭২. আল কুরআন, ৯৭ : ১

১৭৩. মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে একটি পাহাড়ের নাম "হেরা"। বর্তমানে ইসলামের ইতিহাসে এ পর্বতটিকে 'জবলুন্নুর' বলা হয়।

১৭৪. আল কুরআন, ৯৬ : ১-৫

১৭৫. আল কুরআন, ১৪ : ১-৮

১৭৬. ইব্‌ন ইসহাক, অনু. শহীদ আকন্দ, ***সীরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম***, (ঢাকা : বাতায়ন প্রকাশন, ২০০২ খৃ.), পৃ. ১৩৭ ; স্যার সৈয়দ আমীর আলী, অনু. ড. রশীদ আলম, ***দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*** (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ৮৫

১৭৭. Hamiduddin khan, ***History of Muslim Education,(*** Karachi, 1967), P. 16

ঐতিহাসিক ইব্‌ন হিশাম বলেন,

> "এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অতি সংগোপনে তাঁর নিকটতম লোকদের মধ্য হতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে 'দ্বীন' প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। আল্লাহ্‌ তাকে নবুয়ত দান করে স্বয়ং তাঁর উপর ও সমগ্র মানব জাতির উপর যে মহান অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন তার কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন।"[১৭৮]

মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দা'ওয়াত দিতে লাগলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন আবু বকর ইব্‌ন আবু কুহাফা (ওফাত ৬৩৪ খ্রি.) আলী ইব্‌ন আবু তালেব (ওফাত ৬৬১ খ্রি.), যায়িদ ইব্‌ন হারিসা, উসমান ইব্‌ন আফফান (ওফাত ৬৫৬ খ্রি.), যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ, সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস ও তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ সহ মোট আটজন। পরবর্তীতে আবু উবাইদা ইব্‌ন জাররাহ, আবু সালমা ইব্‌ন আবুল আসাদ, আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকাম সহ প্রথম তিন মাসে ৪০ জন মতান্তরে ৪১ জন ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৭৯] এর আনুমানিক তিন বছর[১৮০] পর আল্লাহ্‌ তাঁর হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে এবং নিকটাত্মীয়দের মধ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দিলেন। ঘোষণা হল, "আপনার পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করে দেন, যে সব অনুসারী আপনাকে অনুসরণ করেছে, সেসব মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হন।"[১৮১]

এরপর মাত্র তিন বছর সময়কালে একশত লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়। ইব্‌ন ইসহাক তার 'সীরাতে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আবিসিনিয়ায় ইসলামের প্রথম হিজরতকারীদের (৬১৫ খ্রি.) মধ্য থেকে ৮৩ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তা থেকে অনুমেয় হয় যে, ৬১০ থেকে ৬১৫ খ্রি. পর্যন্ত সময়কালে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা একশতের অধিক নয়। আবিসিনিয়া হিজরতের পর ইসলাম প্রচারে কিছুটা মন্থর গতি চললেও তা মুহূর্তের জন্য একেবারে স্থবির হয়ে যায়নি; বরং ইসলাম মক্কার গণ্ডি পেরিয়ে আরবের ইয়াসরিব[১৮২]সহ বিভিন্ন শহর-গ্রামে দ্রুত প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। আকাবা[১৮৩] শপথের পর ইয়াসরিববাসীদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণকারী দলটির ব্যাপক প্রচারের ফলশ্রুতিতে তথায় স্বল্প সময়ে একশতাধিক আউস ও খাজরাজ গোত্রীয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা হিজরতকালীন সময়ে আনুমানিক পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[১৮৪]

---

১৭৮. ইব্‌ন হিশাম, অনু. আকরাম ফারুক, ***সীরাতে ইব্‌ন হিশাম*** (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বাদশ সংস্ক., ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫৭

১৭৯. ইব্‌ন হিশাম, ***সীরাতে ইব্‌ন হিশাম***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

১৮০. ইব্‌ন ইসহাক, ***সীরাতে রাসূলুল্লাহ্‌***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

১৮১. আল কুরআন, ২৬ : ২১৪-২১৫

১৮২. রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের পরে ইয়াসরিবের নামকরণ হয় 'মাদীনাতুন্নবী' বা নবীর শহর, ইসলামের ইতিহাসে যা মদীনা শরীফ হিসেবে সুপরিচিত।

১৮৩. মক্কা নগরী থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত বর্তমান মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গায় নাম। এখান থেকে হজ্জের সময় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।

১৮৪. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, ***ইসলাম পরিচয়***, (ঢাকা : ই.ফা.বা ২০০১ খ্রি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে নওমুসলিমদের মধ্যে ঐশী ও নৈতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কারণ ইসলামের প্রধান উৎস যেহেতু আল কুরআন যার ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন : وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ।"[১৮৫]

আরবী 'কারউন' (قرأ) শব্দ থেকে 'কুরআন' শব্দটি উদ্ভূত। যার শাব্দিক অর্থ একত্রিত করা,[১৮৬] পাঠ বা আবৃত্তি করা। সুতরাং সর্বপ্রকার জ্ঞানের সমষ্টির যে শাস্ত্রটি ইসলামের মূল উৎস সে শাস্ত্রটি ইসলামের প্রবর্তক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যাবতীয় নির্দেশনা, আদর্শ ও কর্মকাণ্ড তথা হাদীসগুলো আত্মস্থ করতে পড়া ও লিখার বিকল্প নেই। প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী দলটি নিয়ে সাফা-মারওয়াহ পাহাড়ের পাদদেশ 'দারুল আরকামে'[১৮৭] সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। এটি ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক ইসলামী  শিক্ষা কেন্দ্র।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, এর পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের প্রথম উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছিলেন তার নিজ গৃহে।[১৮৮] সেখানে তিনি উন্মুক্তভাবে নামায পড়তেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন যা দেখা এবং শুনার জন্য কুরাইশ গোত্রের নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে একত্রিত হতো।[১৮৯] ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পবিত্র কুরআন পাঠের জন্য মক্কায় এটি ছিল প্রথম মসজিদভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র। এখানে কাফিরদের ছেলেমেয়েরা কুরআন তিলাওয়াত শুনতো। ইব্‌ন হিশাম হযরত ওমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, খাত্তাবের কন্যা ও হযরত ওমর (রা.)-এর বোন ফাতিমা এবং তার স্বামী সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা নিজ গৃহে একটি ইসলামী উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ইব্‌ন আবদ (রা.) নামক একজন সাহাবী তাদেরসহ নও মুসলিমদের কুরআন শিক্ষা দিতেন।[১৯০]

### ইসলামী শিক্ষার প্রসারে নবী করীম (সা.)'র পদ্ধতিসমূহ

ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। তৎকালীন আরবের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন তথা সার্বিক ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনার জন্য অবস্থার

---

১৮৫. আল কুরআন, ১৬ : ৮৯

১৮৬. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, *বাংলা ভাষার কুরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* (ঢাকা : আল-কুরআন ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৭

১৮৭. এটি ছিল প্রথম নওমুসলিম আরকাম ইব্‌ন আরকামের বাড়ি। এই বাড়িতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামী দাওয়াতের কাজ করতেন এবং সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে কুরআন, নামায ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতেন।

১৮৮. ড. মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৪৩

১৮৯. মাওলানা কাযী আতহার ছাহেব মুবারকপুরী, *খায়রুল কুরুন কী দরসগাহী আওর ওনকা তা'লীম ওয়া তারবীয়ত* (দেওবন্দ : শায়খুল হিন্দ একাডেমি, তা.বি.), পৃ. ২৫

১৯০. ড. মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তাঁর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আয়াত নাযিল হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেগুলো সাহাবীদের (রা:) সামনে আবৃত্তি করতেন। আর সাহাবীরা সাথে সাথে সেগুলো কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। স্মরণ শক্তির মনিকোঠায় এর প্রতিটি শব্দ-বর্ণ সুরক্ষিত করে নিতেন। এ থেকেই শুরু হয় হিফ্য করণ বা কণ্ঠস্থকরণ পদ্ধতি যা অদ্যাবধি প্রচলন আছে। এই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং বর্তমানে এটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। সকল মুসলিম দেশে লক্ষ লক্ষ হাফিযী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যা থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাফিয মহাগ্রন্থ আল কুরআন কণ্ঠস্থ করে যুগ যুগ ধরে বক্ষে ধারণ করে আসছেন। তৎকালীন আরব জাতি তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী ছিল। আরব জাতির স্মৃতিশক্তি প্রকৃত পক্ষেই এক ঐতিহাসিক বিস্ময়। কুরআন ও হাদীস সংরক্ষনে এ পদ্ধতিটি বেশ অবদান রেখেছে। মহান আল্লাহ বলেন- بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ. "বরং এ কুরআন সুস্পষ্ট আয়াত সমষ্টি, এটা জ্ঞানপ্রাপ্ত লোকদের মানসপটে সুরক্ষিত।"[১৯১] তারা স্বাভাবিকভাবেই স্মরণশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করতো।

ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস আল কুরআনের হিফাযত আল্লাহ-ই করবেন। তিনি বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয় আমি এ কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।[১৯২]

মদীনায় আগমনের পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার একটি হলো মদীনা পৌঁছেই তিনি জুমুআর নামাযের বিধান চালু করেন এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান শিক্ষাদানের লক্ষ্যে খুতবা প্রদান বাধ্যতামূলক করেন। কিছুদিন পরে তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ করে একে ইবাদতখানার পাশাপাশি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার করতে থাকেন। তখন মসজিদই ছিল শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। বর্তমান সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকল্প ছিল এ মসজিদ। ব্যক্তি বিশেষের বাড়িও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা হত।[১৯৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়। তিনি সেগুলোতে ইমাম নিয়োগের ব্যাপারে বেশ কড়া নিয়ম আরোপ করেন। তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের বিভিন্ন শাখায় পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারীকে অগ্রাধিকার দিতেন। শিক্ষার্থীগণ এসব শিক্ষকদের নিকট কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করতেন।[১৯৪] মসজিদে নববী ছাড়াও নয়টি মসজিদে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তার মধ্যে কুবার মসজিদ বিদ্যালয়টি গুরুত্বপূর্ণ।[১৯৫]

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বহিরাগত মুহাজির ও মদীনার গৃহহীন শিক্ষার্থীদের অবস্থানের জন্য মসজিদে নববী সংলগ্ন 'সুফ্ফা' নামক একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। এর শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আল আস ও উবাদা বিন সামিত। এই সুফ্ফাই ইসলামের প্রথম জামেয়া। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন

১৯১. আল কুরআন, ২৯ : ৪৫

১৯২. আল কুরআন, ১৫ : ৯

১৯৩. অধ্যক্ষ মো: আব্দুর রব ও এ.এম. আলাউদ্দিন, ***ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*** (ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশান সোসাইটি, ১৯৯৯), পৃ. ১১

১৯৪. ***ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা***, জুলাই-১৯৯৪, পৃ. ২৫

১৯৫. মোঃ শহিদুল ইসলাম, ***ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ঝিনাইদা জেলার অবদান,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

এর প্রধান।[১৯৬] এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীগণ কুরআন, হাদীস, তাজবীদ এবং দ্বীনের বুনিয়াদী বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

অনেক সময় মদীনার স্থায়ী বাসিন্দাগণ সুফ্ফায় এসে পাঠে অংশ গ্রহণ করতেন। এই শিক্ষায়তনে খণ্ডকালীন শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম ছিল না। এভাবে মসজিদে নববীর শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনেক সময় উঠানামা করতো।[১৯৭]

মদীনা হিজরতের পূর্বে হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা:) এর বাসস্থানই ছিল শিক্ষাকেন্দ্র। এটা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই বাড়িটিই 'দারুল আরকাম' নামে পরিচিত।[১৯৮]

পাশাপাশি সুফ্ফা ছিল আবাসিক বিদ্যালয়। এর নিয়ম শৃংখলা এবং শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা দেখাশুনার জন্য 'আরিফ' বা তত্ত্ববধায়ক হিসেবে হযরত আবু বকর (রা:) কে নিযুক্ত করা হয়েছিল বলে জানা যায়।[১৯৯] এছাড়াও বিদেশী ভাষা শিক্ষা করাও পাঠ্যভূক্ত ছিল। কিন্তু সবার জন্য তা বাধ্যতামূলক ছিল না। ইসলামের দ্রুত ও ব্যাপক প্রসারের ফলে বিভিন্ন দেশের রাজণ্যবর্গের সাথে যোগাযোগ ও তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য পারদর্শী লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা:) ছুরিয়ানী, ফার্সী, হাবশী, হিব্রু ও রোমান ভাষায় পারদর্শী থাকায় এ বিষয়ে তাঁকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়।[২০০]

হিজরতের পরে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত হয়। দূর-দূরান্তের নবদীক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সুফ্ফার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে থেকে কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষক প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দেয়া হতো। তাঁরা কুরআন ও হাদীসসহ ইসলামের যাবতীয় কিছু শিক্ষা দিতেন। অনেক সময় শিক্ষার্থীগণ মদীনায় চলে আসতেন এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করে আবার নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতেন। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল হতে আগত আব্দুল কায়স গোত্রের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।[২০১]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইয়ামেনের গভর্নর হযরত আমর ইবনু হাযমের নিয়োগপত্রে জনগণকে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, দীনিয়াত এবং চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষাদানের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরদেরকে প্রাত্যহিক জীবনে শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান শিক্ষাদানের নির্দেশ দেয়া হতো। শিক্ষাদানে নিয়োজিত এসব শিক্ষক ও প্রশিক্ষকগণ তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা তা মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়।[২০২]

---

১৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৯৭. ***ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১৯৮. মোঃ শহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

২০০. মোঃ হাসান আলী চৌধুরী, ***ইসলামের ইতিহাস***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

২০১. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, ***সহীহ্ আল বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ২০; যয়নুদ্দীন, ***তাজরীদুল বুখারী***, অনূ. (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), খ. ১, পৃ. ৩৪

২০২. মোঃ শহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

পরিদর্শকগণ নবনিযুক্ত মুসলিম অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সেখানকার লেখাপড়ার মান সম্পর্কেও মূল্যায়ন করতেন। হযরত মা'আয ইব্ন জাবাল (রা:) এবং হযরত আলী (রা:) পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপদেশের মাধ্যমেও সাহাবাদের শিক্ষা দিতেন। যেমন– হযরত মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যাতে বিরক্ত না হই এদিকে লক্ষ্য রেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দিষ্ট দিবসে উপদেশ দিতেন।[২০৩]

সে যুগে শিক্ষার আরেকটি পদ্ধতি ছিল লিখন পদ্ধতি। আল- কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযিল হলে তা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সামনে তিলাওয়াত করে শুনাতেন এবং সাহাবাগণ সাথে সাথে তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন।

অত:পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য ওহী লেখকদের কাউকে ডেকে কুরআনের যেটুকু যখন নাযিল হতো তখন তা পাথরের টুকরা, উটের হাঁড়, পশুর চামড়া, খেজুরের পাতা অথবা এ জাতীয় যখন যা পাওয়া যেত তাতে লিখিয়ে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক সাহাবীকে হস্তলিপি বিদ্যায় পারদর্শী করার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। এরকম কাতেবে ওহীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ।[২০৪] কারো মতে, বিয়াল্লিশ।[২০৫]

ইসলামী শরী'আর দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হাদীস। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার জীবদ্দশায় নুযূলে কুরআনের সময় হাদীস লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ না থাকলেও তাঁর অনুমতিক্রমে অনেক সাহাবী নিজস্ব উদ্যোগে লিখে রাখতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা:)-এর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্মরণশক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে লিখেও রাখতে চাই। অবশ্য আপনি তা যদি পছন্দ করেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার হাদীস সংরক্ষণ করতে চাইলে তা স্মরণ রাখার সঙ্গে সঙ্গে লিখেও রাখতে পার।[২০৬]

হযরত আনাস (রা:)ও হাদীস লিখতেন এবং তা রীতিমত রাসূলকে শুনাতেনও। হযরত সাঈদ ইবন হেলাল বলেন, আমরা হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা:) কে হাদীস বর্ণনা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করি। তখন তিনি একটি চোঙা বের করে এনে বললেন, দেখ এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা থেকে শ্রুত হাদীস। এগুলো আমি লিখে তাঁকে শুনিয়েছি।[২০৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মক্কা জীবনে ইসলামী শিক্ষার যে উৎকর্ষ-বিকাশ সাধন হয়েছিল তা নিম্নোক্ত পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় : ১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা; ২. উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা; ৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।

---

২০৩. যয়নুদ্দীন, *তাজরীদুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭

২০৪. প্রাগুক্ত, ২৬

২০৫. ইব্ন জারীর তাবারী, *তারিখ তারাবী*, (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী,) খ. ২, পৃ. ৮৩৬; মান্না আল-কাত্তান, *আল মাবাহিছ ফি উলুমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

২০৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল কারী* (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী,), খ. ১, পৃ. ৬৭; মাওলানা আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

২০৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল অনেকটা ব্যক্তি পর্যায়ে। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আর যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে তাওহীদ, রিসালাত, ইসলামের আবির্ভাব, নৈতিকতাসহ ব্যক্তি, সমাজ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ ও নির্দেশ সম্বলিত পবিত্র কুরআনের যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হতো তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে তা জেনে নিতেন এবং নিজেদের মধ্যে তা আয়ত্ত করার চেষ্টা করতেন।[২০৮]

২. দ্বিতীয়টি ছিল ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহে অথবা আঙ্গিনায় মসজিদ বা মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কুরআন তথা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ ও পর্যালোচনার ব্যবস্থা। যেমন হযরত আবু বকরের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হযরত ওমরের ভগ্নি ফাতেমা ও তার স্বামীর গৃহে প্রতিষ্ঠিত মক্তব। যেটিকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ধরা হয়।

৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র, যা সাফা-মারওয়াহ পাহাড়ের পাদদেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পৃষ্ঠপোষকাতায় 'দারুল আরকামে' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পরবর্তীতে হিজরতের পর এ শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়। অনুরূপ শিক্ষা কার্যক্রম ৬২২ খ্রি. মদীনা হিজরতের পরও অব্যাহত ছিল এবং তা বহুমাত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে। হিজরত-পূর্ব মক্কায় 'আকাবা শপথের পর ইয়াসরিবের নও মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য আবদুল্লাহ ইবন উম্মি মাকতুম ও মাসআব ইব্ন উমাইর' নামক দু'জন সাহাবীকে মু'আল্লিম হিসেবে প্রেরণ করার মাধ্যমে মূলত ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।[২০৯]

ড. সেকান্দর আলী ইব্রাহিমীর ভাষায়,

> "Before hijra the Prophet (sm) Abclulluh Ibn sent Ummi Maktum and Mas`ab ibn Umayir to teach the new muslims of Yathrib (later on Madinah) the Holy Quran and train them the Islamic instructions and prohibitions."[২১০]

এর কিছুদিন পর, কুরাইশ নেতাদের যখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ চরমে পৌঁছে গেল এবং হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞা করলো, তখন আল্লাহ তা'আলার ঐশী নির্দেশের প্রেক্ষিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ২৪ সেপ্টেম্বর[২১১] মদীনায় হিজরত করেন। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাত্র দশ বছর সময়কালের মধ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত মিশনকে (ইসলাম) পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম

---

২০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

২০৯. আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২১০. Dr. Sekakdar Ali Ibrahimi, Ibid, XXXII.

২১১. পি.কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস* (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ১২৫; ইব্ন হিশামের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ৫৩ বছর বয়সে ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার মক্কা ত্যাগ করেন এবং ১৬ রবিউল আউয়াল, ২ জুলাই ৬২২ খ্রি. শুক্রবার মদীনা নগরে প্রবেশ করেন; এম কসিন দ্য পার্সিভালও একই মত ব্যক্ত করেন।

হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, "হিজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জীবনে এক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলো। এই পরিবর্তন গোটা আরবজাতির ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এবং একটি অধঃপতিত বর্বর বিশৃংখল, অসভ্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল।[২১২]

হিজরী প্রথম সনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আনসার মুহাজিরদের[২১৩] সহযোগিতায় মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করলেন। উক্ত মসজিদের সাথে দু'টি পৃথক কক্ষ নির্মাণ করা হলো, যার একটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবাসগৃহ হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং অন্য একটিকে 'শিক্ষা নিকেতন' হিসেবে ব্যবহার করতেন। যাকে ইতিহাসে মাদ্‌রাসা-ই সুফ্‌ফা[২১৪] বলা হতো। এ মাদ্‌রাসটি ছিল আবাসিক, যাতে স্থানীয় গরীব, দুঃস্থ, এতিম এবং মুহাজির ও তাদের সন্তানদের থাকা ও পড়ার ব্যবস্থা করা হয়।[২১৫] এখানে যারা থাকতেন, তাদের 'আসহাবে সুফ্‌ফা' নামে আখ্যায়িত করা হতো। 'সুফ্‌ফার' এ মাদ্‌রাসাটিই মদীনার প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র। এখানে পবিত্র কুরআন ছিল প্রধান পাঠ্যপুস্তক। কুরআনের বিশুদ্ধ আবৃত্তির জন্য 'তাজবিদ' এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত বাণী, আদেশ-নির্দেশ ও প্রদর্শিত কর্মকাণ্ডগুলো আলোচনা ও পর্যালোচনার  মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয়া হতো।[২১৬] ঐতিহাসিকগণ এটিকে "জনশিক্ষা কেন্দ্র" হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, এখানে মদীনার আনসার মুহাজির এবং তাদের সন্তানদের যেমন বুনিয়াদি শিক্ষা দেয়া হতো পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামরিক শিক্ষাসহ নৈতিক চরিত্র গঠন এবং ঐশী বাণী লিপিবদ্ধ ও কুরআন হিফযের শিক্ষা দেয়া হতো।[২১৭]এ শিক্ষা নিকেতনের আবাসিক শিক্ষার্থীদের খাবার ও বিবিধ ব্যয় নগরীর বিত্তশালীরা ব্যবস্থা করতেন। অনেক শিক্ষার্থী নিজেরাই নিজেদের ব্যয় ভার নির্বাহ করতেন।[২১৮] হযরত আবু হুরায়রা (রা.), যায়েদ বিন সাবিত (রা.), হযরত আলী (রা.) সুফ্‌ফা মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। পূর্বে আকাবা শপথের পরে যে দু'জন সাহাবী[২১৯] মক্কা থেকে মদীনায় ইসলামী শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন তাদের এবং স্থানীয় নও মুসলিমদের প্রচেষ্টায় হিজরতের পূর্বেই মদীনা নগরীতে তিনটি উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের অস্তিত্ব পাওয়া যা। তা হলো :

**১. মসজিদ-ই বনি যুরায়িক মাদ্‌রাসা :** এটি হিজরতের পূর্বে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদ ও মাদ্‌রাসা। মদীনা নগরীর প্রাণকেন্দ্র 'কলব' নামক স্থানে এর অবস্থান এবং হযরত রাফে বিন মালিক জরকী আনসারী (রা.) এ মসজিদে 'ইমাম ও মুয়াল্লিম' নিযুক্ত হন।[২২০]

---

২১২. পি. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

২১৩. মাওলানা আকবর শাহ্‌ খান ননিবাবাদী, ***ইসলামের ইতিহাস*** (বাংলা অনু.), (ঢাকা : ইফাবা, তা.বি.), পৃ. ১৪৫

২১৪. আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২১৬. ডা. আ.ই.ম নেছার উদ্দীন, ***ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত,*** পৃ. ১৬-১৭

২১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

২১৮. মজীদ আলী খান, *শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম*, বাংলা অনুদিত, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১২৪

২১৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উম্মি মাকতুম ও মাস'আব ইব্‌ন উমাইর (রা.)।

২২০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোস্তফা চরিত* (ঢাকা : পুস্তিকা প্রকাশনী, ১৯৭৫), পৃ. ৪৫১

**২. কুবা মসজিদ ও মাদ্‌রাসা :** এটি মদীনার মসজিদ। যদিও কেউ কেউ মসজিদ-ই বনি যুরায়িককে প্রথম মসজিদ মনে করেন। মদীনা নগরী থেকে ছয় মাইল উত্তর দিকে 'মুকামে কুবায়' মসজিদ'টি অবস্থিত। হিজরতকালীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এখানে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন। হিজরতের পূর্বে মসজিদ-ই বণি যুরায়িক-এ হযরত রাফি বিন মালিক প্রথম জুমা চালু করেছিলেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। এখানেও একটি উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়। নও মুসলিমসহ ইত:মধ্যে অগ্রগামী দলটি মদীনায় হিজরত করেন, তাদের অনেকেই এখানে আশ্রয় নেন আর কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত সালিহ (রা.) ও আবু হুযায়ফা (রা.) উক্ত মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করতেন।[২২১]তৎকালীন মদীনায় চারজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ক্বারী ছিলেন যাদের সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই উচ্চসিত প্রশংসা করতেন তারা হলেন– হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসু'দ (রা.), হযরত সালিম (রা.), হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.)। কেউ কেউ মু'আয ইব্‌ন জাবাল ও যয়েদ বিন সাবিতের নামও উল্লেখ করেছেন।

**৩. উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা :** কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল মদীনা থেকে ৯ মাইল দক্ষিণে হযরত আসাদ বিন যূরারাহ (রা.)'র বাড়িতে। মুসআব বিন ওমায়র ছিলেন এ মাদ্‌রাসার শিক্ষক। এ প্রতিষ্ঠানে মদীনায় বিবাদমান আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যারা আকাবা শপথের পর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন তারা নামায আদায় করতেন এবং কুরআন ও ইসলামী বিধি-বিধান শিক্ষা লাভ করতেন। মুসআ'ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইসলামী শিক্ষা প্রদান করে মদীনা নগরীতে 'ইসলামের' সুবাতাস বয়ে দিয়েছেন বিধায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে **'মুয়াল্লিমুন মশহুর'** (বিখ্যাত শিক্ষক) উপাধিতে ভূষিত করেন।[২২২]

এ সময়ে মদীনা নগরীতে একটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায় আর তা হলো, মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'গামীমে'র তালিমি মাদ্‌রাসা।[২২৩] 'গামীম' মক্কার পরে মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিজরতকালীন সময়ে মদীনা নগরে প্রবেশের পথে এ স্থানে আগমন করলে বরীদ বিন হাসিব (রা.) সহ একদল লোক এসে এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এখানে সবাইকে নিয়ে ইশার নামায আদায় ও পবিত্র কুরআনের সূরা মারয়াম'র প্রাথমিক আয়াতসমূহ শিক্ষা দেন এবং এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাত কাটান।[২২৪]

উল্লিখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কার পরে মদীনাকে যেভাবে ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, অনুরূপ ইসলামী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসেবেও মদীনাকে গড়ে তুলেছিলেন। মসজিদে নববীকে গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও আদর্শ কমপ্লেক্স হিসেবে, যেখানে স্রষ্টার ইবাদত-বান্দেগীর

---

২২১. ড. মোঃ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
২২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
২২৩. আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
২২৪. ড. মোঃ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

পাশাপাশি, শিক্ষাসহ মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আর্থ-সমাজিক বিষয়গুলো প্রশিক্ষণ দেয়া হতো এবং এখান থেকে মদিনা রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র মনোনীত শিক্ষক হিসেবে এ দুনিয়াতে এসেছেন। তাই দুনিয়ার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি অধ্যায়ন করেন নি, আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা দিয়ে তিনি স্বল্প পরিসরে আরবে যে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করেছিলেন তা মাত্র একশত বছরের মধ্যেই পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্যকে আলোকিত করেছিল। পি কে. হিট্টি ঐতিহাসিক ডিউট্‌স এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'কুরআনই একখানি গ্রন্থ যার সাহায্যে আরবগণ মহান আলেকজান্ডারের চেয়ে বিশালতার, রোমের চেয়ে ব্যাপকতর রাজ্য অধিকারভুক্ত করেছিল, তারা দশ বছরে যা সম্পাদন করেছিল, রোমের তা করতে একশ বছর সময় লেগেছিল; কেবল এই গ্রন্থের সাহায্যেই সমগ্র সেমিটিক জাতির মধ্যে তারাই নৃপতি হিসেবে ইউরোপে এসেছিল যখন ফিনিসিয়াগণ বণিক হিসেবে, ইহুদীগণ উদ্বাস্তু বা বন্দী হিসেবে এসেছিল।[২২৫]

ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন,

> 'সংক্ষিপ্ত নশ্বর জীবনে মুহাম্মদ সম্ভাবনাহীন উপাদান থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, যারা আগে কখনও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। আর তাদের মাধ্যমে এমন একটি দেশের সৃষ্টি করেছিলেন, যা আগে কেবল মাত্র একটি ভৌগোলিক সীমানাকেই বুঝাত। কিন্তু তাদের জাতীয় চরিত্র বলতে কিছুই ছিল না। বিশ্ব জুড়ে খ্রি. ধর্ম ও ইহুদী ধর্মের অবসান ঘটিয়ে তিনি একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । মানব জাতির একটি বেশ ভাল অংশ এখনও সেই ধর্ম অনুসরণ করে। মুহাম্মদ এমন একটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখনকার সভ্য দুনিয়ায় সুন্দরতম প্রদেশগুলি শীঘ্রই সেই সাম্রাজ্যের সুদূর উপলক্ষ হয়েছে-গোটা মানবজাতির এক অষ্টমাংশ সে বইটিকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্ম তত্ত্বের মূর্ত প্রকাশ বলে আজও গণ্য করে।[২২৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকী, আবাসিক পরিচালনা ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করেন এবং নিজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যবেক্ষণ বা পরিদর্শনে যেতেন। মসজিদে কুবায় তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার করে পরিদর্শনে যেতেন বলে ইতিহাস সূত্রে জানা যায়।[২২৭] একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বশর্ত নিয়মতান্ত্রিক পাঠ্যসূচী। যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তার প্রধান উৎস আল-কুরআন এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার হাদীস তারপর ইজমা ও কিয়াস। ইজমা ও কিয়াসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ভাষায় 'ফরিযাতুন আদেলা' যাকে

---

২২৫. পি কে. হিট্টি, ***আরব জাতির ইতিহাস***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

২২৬. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, ***দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭

২২৭. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দীন, ***ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

হাদীসের বর্ণিত বিবরণে বলা হয়েছে, 'আওমা আয়েলা ফাহুয়া ফযলুন'। 'ফরিদাতুন আয়েলা'র মধ্যে ফিক্‌হ, আকাইদ, ইবাদতের পদ্ধতি, ইলমুল কালাম, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, জীব বিদ্যা, পরিবেশ ও প্রকৃতি বিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বৈদেশিক ও জন-সংযোগ বিদ্যা, অর্থনীতি, ইসলামী আইন, ইসলামী ঐতিহ্য, দর্শন, সৌরবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, প্রতিরক্ষা ও সামরিক তথা ব্যায়াম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।[২২৮] মূলতঃ বর্তমান আধুনিক সভ্যতার এ যুগে শিক্ষা নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেড় হাজার বছর পূর্বেই স্থির করে দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত শিক্ষার মাধ্যমে একজন সাধারণ মুসলমান, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ইমাম, ভাষাবিদ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও ভাল ব্যবসায়ী হতে পারে। ফলে প্রত্যেকের নিকট ইসলামের মৌলিক জ্ঞান থাকবে। যাদের অন্তরাত্মা ইহজাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধে উন্নীত হবে।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববীর সূফ্‌ফা মাদ্‌রাসায় কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ ও আকাইদ শিক্ষার পাশাপাশি ভাষা শিক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়েও যে শিক্ষা দেয়া হতো তার প্রমাণ হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা:)। তিনি একজন হাফিযে কুরআন ছিলেন। তিনি আরবী ভাষার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নির্দেশে ফার্সী, হিব্রু ও রোমান ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।[২২৯] 'সুফ্‌ফা'র ছাত্র আমর বিন হাজমকে বহুমাত্রিক বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গভর্ণরের দায়িত্ব অর্পণ করে প্রেরণ করা হয় ইয়েমেনে।[২৩০] এখানে তিনি সর্বপ্রথম পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেন এবং পৃথক শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, দ্বীনিয়াত, নৈতিকতা, চিকিৎসা, শারীরিক ব্যায়াম, সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা, সামরিক ও প্রতিরক্ষা বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আরববাসীদের সাহিত্য চর্চা ও কাব্যপটুতা অনস্বীকার্য। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন আরবের বিখ্যাত মুসলিম কবি হাস্‌সান বিন সাবিত (রা:), হযরত কা'ব বিন যুহাইর (রা:) ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা:)-কে সাহিত্য চর্চা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৩১] সুফ্‌ফার সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষার্থী হযরত আবু হুরায়রা (রা:) একজন হাদীস বিশারদ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা:) মুফাস্‌সির (কুরআনের প্রথম ব্যখ্যাদাতা) হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

### ২.৫.২. খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)

ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের সর্ববিধ মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত পথ অনুসারে নিজেদের জীবন ও রাজ্যের শাসন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন খুলাফায়ে রাশিদীন।

---

২২৮. আল কুরআন, ৮৮ : ১৭-২০
২২৯. আল কুরআন, ২ : ১৬৪
২৩০. Dr. Sekandar Ali Ibrahimy, Idlb, P.XXXIII.
২৩১. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, ***ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৬৩২ খৃষ্টাব্দ হতে ৬৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ৩০ বছর ইসলামের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশিদার যুগ। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, "খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে। এরপর মুলূকিয়াতের অধীনে মুসলিম বিশ্ব শাসিত হবে।"[২৩২]

এ যুগের চার খলীফা–হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.), হযরত ওমর ফারুক (রা:) ৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.), হযরত উসমান গনী (রা:) ৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) ও হযরত আলী (রা:) ৬৫৬-৬৬১ খ্রি.) শ্রেষ্ঠ শাসক এবং এ চার খলীফাই ইসলামের ইতিহাসে নিষ্ঠাবান (আল-রাশেদুন) ছিলেন।[২৩৩]

সাহাবী যুগে ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআন হাদীসের পঠন-পাঠন, লিখন-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। কারণ খলীফারা ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে বিশেষ অনুরাগী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বাণী, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً. "আমার একটি বাক্য হলেও তোমরা লোকদের নিকট পৌঁছে দাও"[২৩৪] দ্বারা তাঁরা বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের নিকট নবীর আদর্শ ও ইসলামী শিক্ষার আমানত অন্যের কাছে পৌঁছানো বা শিক্ষা দেওয়া একটি অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে গণ্য হয়। খুলাফায়ে রাশিদীন ইসলামের বাণী ও জ্ঞানের আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।[২৩৫] তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে তথা সার্বিক জীবনে।

এ সময় মসজিদে নববীর কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার শাখা-প্রশাখাগুলো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। এ সময় ইসলামের আহ্বান ও মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার আরবের সীমা অতিক্রম করে পারস্য ও রোম সম্রাজ্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলো, আরব বহির্ভূত অঞ্চলের নও মুসলমানদের সুবিধার্থে ইসলামি শিক্ষার মূল উৎস আল কুরআনকে সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করা হয় এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র হাদীসগুলো সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়। ইজতেহাদের মাধ্যমে ইজমা'র উপর ভিত্তি করে রচিত হয় ফিক্‌হশাস্ত্র, কালাম, তর্ক, অলঙ্কারশাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিবিদ্যা, ফারায়িয, আরবী ও ফারসী সাহিত্য এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখারও ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা:)'র শাসনামলের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার নমুনা ছিল নিম্নরূপ-

০১. কুরআন মজিদ, হাদীস এবং ফিক্‌হ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো।
০২. আল কুরআন ব্যতীত অন্যান্য বিষয়াদি মুখস্থ পড়ানো হতো।
০৩. শিক্ষকগণ কোন বেতন গ্রহণ করতেন না। এমনকি হাদিয়াও গ্রহণ করতেন না।

---

২৩২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, *ঈদে মিলাদুন্নবী বিশেষ সংখ্যা,* ৪৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (ঢাকাঃ ই.ফা.বা, এপ্রিল-জুন ২০০৪) পৃ. ২৬

২৩৩. আল্লামা জালাল উদ্‌দীন সুয়ূতী (র.), *তারিখুল খুলাফা,* উর্দু অনুদিত (দিল্লী : ইতেকাদ পাবলিকেশন্স হাউস, ১৯৮৭), পৃ. ১৯

২৩৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী; *সহীহুল বুখারী,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩২৭৪

২৩৫. মোঃ শহিদুল ইসলাম, *ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ঝিনাইদহ জেলার অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

০৪. কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ ব্যতীত সাধারণ জ্ঞানের বিষয় হিসাবে অন্য কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হতো না।

০৫. 'ইলম' হাসিল করার উদ্দেশ্যে সফর করা জরুরী ছিল। তাই একটি মাত্র হাদীস শুনা এবং সে সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানোর উদ্দেশ্যে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীগণ খোরাসান হতে দামেস্ক হয়ে হিজায পর্যন্ত বিস্তৃত পথ পদব্রজে পরিভ্রমণ করতেন।

০৬. মসজিদসমূহ ও সাহাবায়ে কেরামের আবাসভূমি (খানকাহ্) ও শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[২৩৬]

হযরত ওসমান (রা:) (৬৪৪-৬৫৬) সময়কালে আরব ও বিজিত অঞ্চলসমূহ থেকে জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীগণ দলে দলে মদীনায় আসতেন এবং হযরত উসমান (রা:) এসব জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বিশেষ সম্মেলনের ব্যবস্থা করতেন।

হযরত আলী (রা:) ছিলেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার ভাষায় 'জ্ঞানের দ্বার'। রূপক অর্থে এর দ্বারা 'বেলায়ত' বুঝালেও বাস্তব শিক্ষার প্রতি হযরত আলীর অনুরাগ সুপ্রতিষ্ঠিত। এ সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের কথা জানা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে হযরত আলী ছিলেন একজন 'জ্ঞান তাপস'। বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীপ প্রজ্বলিত করেন, হযরত আলী (রা:) তা লালন করে ইসলামী শিক্ষার জয়যাত্রাকে প্রাণবন্ত করতে সমর্থ হন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সময়কালে অমুসলিমদের সাথে যত সন্ধি-চুক্তি হয়েছে এবং মদীনার বাহিরে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহে দূতের বিনিময়ে যত চিঠিপত্র দেয়া হয়, তার প্রায় সবগুলো হযরত আলী (রা:)'র হাতের লেখা। সাম্প্রতিক তাঁর এ সমস্ত চিঠিপত্র নিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলোতে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে। আরব থেকে হযরত আলীর চিঠিসমূহের একটি সংকলিত গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হযরত আলী (রা.)'র উপদেশসমূহ প্রণিধানযোগ্য[২৩৭]

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট কোন বিভাগ বা শাখা ছিলনা। জনগণ নিজেরা এ কাজ সম্পন্ন করতেন এবং সেনাবাহিনীর মাধ্যমে প্রচার কার্য পরিচালনা করা হত। তাঁদের অতুলনীয় মানবীয় আচরণ, সদয় ব্যবহার, ন্যায় পরায়ণতায় অনেক অমুসলমান মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন। অনেকে আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন।[২৩৮] খলীফাগণ মদীনার মসজিদে ইমামতি করতেন এবং হজ্জ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। খলীফাগণের নির্দেশে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিয়মিতভাবে মসজিদে নামাযের ইমামতি করতেন। ফলে প্রত্যেক প্রদেশে অসংখ্য মসজিদ গড়ে ওঠে। খলীফা ওমর (রা:) এর শাসনামলেই শুধু আরবেই ৪০০০ (চার হাজার) মসজিদ গড়ে ওঠে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রত্যেকটি মসজিদে শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। কুরাআন, হাদীস এবং ফিক্‌হ বিষয়ে সকল

---

২৩৬. ড. মোঃ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

২৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

২৩৮. মো: শহিদুল ইসলাম, *ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ঝিনাইদহ জেলার অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

মসজিদে শিক্ষা দেয়া হতো। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে হযরত ওমর প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো।
কুরআনের ক্বারীগণ খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে শিক্ষা বিস্তার করতেন। জনসাধারণ শিক্ষার প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিল যে, সিরিয়ার একটি বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬০০ জন। কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ ছাড়াও আরবী ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, অংক, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো।[২৩৯]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার ইন্তিকালের পর মাত্র আড়াই বছর বেঁচে ছিলেন। এ সময়টি খেলাফতের দায়িত্ব পালনেই কেটে যায়। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন কুরআন ও হাদীসের আলোকে। তাঁর যুগেও লেখার প্রচলন ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:)'র ইন্তিকালের পর হযরত ওমর (রা:) খলীফা নিযুক্ত হন। তার সুদীর্ঘ দশ বছরের (৬৩৪-৬৪৪) খিলাফতকালে ইসলামী রাজ্যের যেমন বিস্তৃতি ঘটে শিক্ষা-দীক্ষারও তেমন উন্নতি হয়। তিনি বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের কাছে জনগণের মধ্যে তা প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি স্বীয় খিলাফতের যুগে বিজিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু সংখ্যক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি প্রখ্যাত সাহাবীদেরকে মু'আল্লিম ও কারী নিযুক্ত করে বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে হুসাইন, মায়াব ইব্‌ন ইয়াসারকে বসরায় এবং উবাদা ইব্‌ন ছাবিত ও আবু দারদাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। তাঁর সময়ে শিক্ষকদের সরকারি তহবিল হতে নির্ধারিত স্কেলে বেতন প্রদান করা হত।

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা:) কুফায় শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে সেখানকার মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাকে হযরত উমর (রা:) তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন ও নবীর সুন্নত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি যাযাবর বেদুইনদের জন্য কুরআন মাজীদের তালীম গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেন। হযরত ওমর (রা:) এর যুগে কুরআন হাদীসের পাশাপাশি ফিক্‌হশাস্ত্রের ইলমও প্রসার লাভ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আব্দুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (রা:) সিরিয়াতে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মা'কিল (রা:) ও ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা:) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা:) কুফায় এবং হাব্বান ইব্‌ন জাকল (রা:) মিসরে ফিক্‌হ শাস্ত্রের শিক্ষাদান করতেন।[২৪০]

হযরত উসমান (রা:) এর খিলাফতকালের (৬৪৪-৬৫৬) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ইসলামী শিক্ষার প্রধান উৎস আল কুরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলন। যদিও আবু বকর (রা:) আগেই একত্রিত করেছিলেন। হযরত উসমান (রা:) সেটাকে আরো বিস্তৃত করেন। তিনি যায়েদ ইব্‌ন সাবিতের নেতৃত্বে সংরক্ষিত কুরআন কপি করে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। হযরত উসমান (রা:) এর প্রচেষ্টায় কুরআনের ধারাবাহিক সংকলন প্রকাশিত হয় এবং অদ্যাবধি কুরআন সেরূপেই বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআন শরীফ সংকলনের জন্য হযরত উসমান (রা:) চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। হযরত উসমান (রা:)-কে ৬৫৬ খ্রি. ১৭ জুন (১৮ই জিলহজ্জ ৩৫ হিজরী) নির্মমভাবে শহীদ করা হয়।

---

২৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
২৪০. প্রাগুক্ত

হযরত আলী (রা:) এর খিলাফতকালে (৬৫৬-৬৬১) লেখাপড়ার চর্চা আরো বেশি হয়। তিনি কুরআন বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য আরবী ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং হযরত আবুল আসওয়াদ দুয়াইলীকে এর দায়িত্ব অর্পণ করেন। এর ফলে ইরাবুল কুরআনের সৃষ্টি হয়।[২৪১]

এছাড়াও শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হযরত আলী (রা:)'র উপদেশসমূহ উল্লোযোগ্য। যেমন

০১. বিত্তের চেয়ে বিদ্যা ভাল।

০২. বিত্তকে তুমি পাহারা দাও, বিদ্যা তোমাকে পাহারা দেয়।

০৩. বিত্ত খরচ করলে কমে যায়; কিন্তু বিদ্যা খরচ করলে বেড়ে যায়।

০৪. বিত্তের চেয়ে শিক্ষা অন্বেষণকালে যে মৃত্যুবরণ করে সে অমরত্ব লাভ করে।

০৫. বিত্তের চেয়ে শিক্ষা মানব জীবনের অলংকার স্বরূপ।

০৬. বিত্তের চেয়ে বিদ্যার বিষয়ে পারদর্শী মানুষ সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত।[২৪২]

হযরত আলী (রা:) খিলাফতের দায়িত্ব পাবার সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মদীনার মসজিদে হাদীস, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, আরবী ব্যকরণ, কাব্য এবং ইতিহাসের উপর সাপ্তাহিক বক্তৃতা প্রদান করতেন। হযরত আলী (রা:)'র আমলেই সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয়।[২৪৩] হযরত আলী (রা:)'র অসাধারণ গুণাবলীর জন্য কর্ণেল ওসবর্ণ মন্তব্য করেছেন, "আলী ছিলেন সেকালে মুসলমানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাবিশিষ্ট মুসলমান।[২৪৪] ইসলামের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। হযরত আলী (রা:) অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি কবি, সাহিত্যিক, বৈয়াকরণিক ও ন্যায় শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁর লিখিত 'দীওয়ানে আলী' আজও আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর বক্তৃতা ও অভিভাষণ আরবী ভাষার গৌরবের বস্তু।[২৪৫] তাঁরই তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণ সংকলন করেন। যা বর্তমানে আরবী ভাষার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্ব বহন করছে। ধর্মীয় জটিল ব্যাপারে হযরত আলী (রা:) এর সিদ্ধান্তকে হযরত ওমর (রা:) চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতেন। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারী (২০ রমযান, ৪০ হিজরী) তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের সাথে সাথে খুলাফায়ে রাশিদীনের পবিত্র খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

খুলাফায়ে রাশিদার সময়কালে ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে আরব ও আযমের[২৪৬] নব দীক্ষিত মুসলমানদের শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল বা রাজ্য থেকে আগত মুসলমানদের মধ্য থেকে একদলকে 'সুফ্ফা'র বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হতো[২৪৭] এবং তারা নও মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন।

---

২৪১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, ***সহীহ বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ.৯৯

২৪২. ড. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২৪৩. মো: শহিদুল ইসলাম, ***ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ঝিনাইদহ জেলার অবদান***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

২৪৪. ড. আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

২৪৫. মো: শহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

২৪৬. প্রাগুক্ত

২৪৭. আরব সীমান্ত এলাকা বহির্ভূত রাষ্ট্রের নবদীক্ষিত মুসলমানদের 'আযম' বা 'আযমী' বলা হয়।

তাবেয়ীদের শাসনামলে খুলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত ব্যবস্থাবলির মধ্যে পবিত্র আল-কুরআনের তাফসীর, হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।[২৪৮]

পি কে. হিট্টি বলেন,

> তখনকার প্রচলিত নিয়ম মতো কেউ শিক্ষা নিতে চাইলে প্রথমেই তাকে মসজিদে যেতে হতো। মসজিদে কুরআন ও হাদীসের উপর ক্লাস হতো। ইসলামের বিশেষ শিক্ষকরাই ছিলেন কুরআনের শিক্ষক।

এ সময় মক্কা ও মদীনার পাশাপাশি কুফা, বসরা এবং পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কুফায় আল যাহহাক ইব্ন মুজাহিমা (মৃত ৭২৩) একটি আনুষ্ঠানিক ও প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করতেন বলে জানা যায়।

### ২.৫.৩ উমাইয়া যুগে ইসলামী শিক্ষা (৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

খুলাফায়ে রাশিদার খিলাফত (৬৩২-৬৬১) পরবর্তী ইসলামের ইতিহাসে সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে আরবের ঐতিহ্যময় কুরাইশদের দুটি ধারা মুসলিম সম্রাজ্যকে শাসন করে। এদের একটি উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০), অপরটি আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮) নামে পরিচিত।[২৪৯] খিলাফত দু'টির প্রধানত যে বৈশিষ্ট্য ছিল : ০১. রাজ্য বিস্তার-উমাইয়া খিলাফত, ০২. শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন-আব্বাসীয় খিলাফত।

উমাইয়ারা ইসলামী খিলাফতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিহার করে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের মাধ্যমে রাজতান্ত্রিক ধারায় মোট ১৪ জন শাসক দ্বারা প্রায় ৯০ বছর ব্যাপী মুসলিম সম্রাজ্যকে শাসন করেন।[২৫০] তাদের মধ্যে খলীফা মু'য়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (৬৬১-৬৮০), আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (৬৮৫-৭৫৫ খ্রি.) এবং তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও পঞ্চম খলীফা খ্যাত খলীফা ওমর ইবনুল আব্দুল আজিজ (৭০৫-৭১৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠাপোষকতা করেছিলেন।

তাদের শাসনামলে খুলাফায়ে রাশিদিনের গৃহীত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে পবিত্র আল কুরআনের তাফসীর (ব্যাখ্যা), হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, মসজিদ, মক্তব, মাদ্‌রাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।[২৫১] উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলামের শাসননীতি ও আদর্শের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়।[২৫২]

হযরত মু'আবিয়া (রা:) এর বিচক্ষণতার বিষয়ে ঐতিহাসিক P.K.Hitti বলেন,

> "I apply not my sword, where my lash suffices, nor my lash where my longue is enough. And even if there be one hair

২৪৮. ড. মো: আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস* , প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬
২৪৯. আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০
২৫০. প্রাগুক্ত
২৫১. ড. মো. আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
২৫২. মো: শহিদুল ইসলাম, *ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ঝিনাইদহ জেলার অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

> binding me to my fellowmen, I do not let it break; when they pull I loosen, and if they loosen, I pull".[২৫৩]

উমাইয়া খলীফাগণ সম্রাজ্যবাদী হলেও শিক্ষা-সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেনি। আরব সভ্যতার যে জয়যাত্রা সূচিত হয় তারা তা অব্যাহত রাখেন। সম্রাজ্যের মসজিদ গুলিই ছিল শিক্ষা বিস্তারের প্রধানক্ষেত্র এবং কুরআন ও হাদীসকে ভিত্তি করেই শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সে যুগে মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা এবং মিশর প্রধান শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়।[২৫৪] খলীফাগণের বসবাসের জন্য কারুকার্য খচিত বহু সুরম্য অট্টালিকা স্থাপত্য ও চারুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উমাইয়া যুগে পাওয়া যায়। যা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২৫৫]

### ২.৫.৪ আব্বাসীয় যুগে ইসলামী শিক্ষা (৭৫১-১২৫৮ খ্রি.)

আব্বাসীয় খিলাফতের সময়টাকে (৭৫০-১২৫৮) বলা হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগ। রাজ্য বিস্তার বা ধর্ম প্রচার তাদের কর্মসূচীর তালিকায় 'শিক্ষার' সম্প্রসারণের চেয়ে গৌণ ছিল। প্রায় পাঁচ শতাধিক বছরের অধিক (৫০৮ বছর) সময়কাল ধরে আব্বাসীয় খিলাফতকে ৩৭ জন খলীফা এবং তিনটি প্রসিদ্ধ বংশের শ্রেষ্ঠ আমীরগণ, একই সময়কালে স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া আমীর ও ফাতেমীয় খিলাফতের খলীফাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন তাতে ইসলামের উদার নৈতিক মতাদর্শ পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। সৈয়দ আমীর আলী ঐতিহাসিক ডিউট্স এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-

> যখন দশদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন তারই হেলেনীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানকে মৃত অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল, প্রাচ্যের মতো প্রাতিচ্যকেও দর্শন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সঙ্গীতের সোনালী শিল্পকলা শিক্ষা দিয়েছিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ধাত্রীপনা করেছিল। আর গ্রানাডার পতনকালে সেই উজ্জ্বল দিনগুলোর জন্য চিরকাল কাঁদতে আমাদেরকে বিলম্বিত উত্তরসূরী বানিয়ে গিয়েছিল।[২৫৬] এ সময় ইসলামী আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি 'জাগতিক শিক্ষা' (কলা ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের) দ্রুত বিকশিত হতে থাকে।

আব্বাসীয় খলীফা আল মনসুর জ্ঞান চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তি, কৃষ্টি, সভ্যতার যে বীজ বপন করেন তা তাঁর উত্তরসূরী হারুন-অর রশীদের দ্বারা অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে মামুনের রাজত্বে সুস্বাদু ও সুবৃহৎ মহীরূহে পরিণত হয়'।ঐতিহাসিক জোসেফ হেল আব্বাসীয় খিলাফত আমলের শিক্ষা নীতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধরণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশিদার ও পরবর্তী উমাইয়া আমলের অনুরূপ থাকলেও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। আর তা হলো :

১. আরব জাতীয়তবাদে অনুপ্রাণিত শিক্ষা। যেমন- ধর্মতত্ত্ব, (কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, উসুলে ফিক্হ) ব্যবহারিক আইন, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি।

---

২৫৩. পি.কে. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
২৫৪. মো: শহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
২৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
২৫৬. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

২. অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা। যেমন- দর্শন, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ভূগোল প্রভৃতি।[২৫৭]

**প্রাথমিক শিক্ষা :** শিশু-কিশোরদের এখানে আরবী বর্ণমালাসহ আল-কুরআন পাঠ, মুখস্থ, ধর্মীয় প্রাথমিক বিষয়াদির শিক্ষা, কবিতা পাঠ ও রচনার শিক্ষা দেয়া হতো। এ শিক্ষা ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক ছিল। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কোন অর্থ নেয়া হতো না এবং যারা শিক্ষা দিতেন তারাও কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করতেন না। খলীফা মামুন অবশ্যই পরবর্তীতে এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিচালিত করতেন বলে জানা যায়।

**উচ্চতর শিক্ষা :** আরবে এতোদিন উচ্চতর শিক্ষা চালু থাকলেও তা অনানুষ্ঠানিক (নন-একাডেমিক) ছিল। জ্ঞান পিপাসু খলীফা মামুন (৮১৩-৮৩৩) ৮৩০ খ্রি. রাজধানী বাগদাদে 'বায়তুল হিকমা' (House of Wisdom) প্রতিষ্ঠা করে উচ্চ শিক্ষার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। এ প্রতিষ্ঠানটিকে বহুমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এতে তিনটি বিভাগ ছিল– ০১. অনুবাদ কেন্দ্র (Translation Bureau); ০২. শিক্ষায়তন (School); ০৩. গ্রন্থাগার (Library); প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত হুসাইন ইব্‌ন ইসহাক।[২৫৮]

আলেকজান্দ্রিয়া এবং এথেন্স থেকে প্রাচীন গ্রীকের পুস্তকাদি সংগ্রহ করে তা এখানেই আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃতি ভাষায় অনুবাদ করা হতো। কিন্তু আব্বাসীয় খিলাফতের শেষ দিকে সেলজুক আমীরদের বদান্যতায় হারুন-মামুনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উপনীত হয়। আর সেলজুক এটির চূড়ান্ত রূপ দেন আমীর মালিক শাহর উজির পণ্ডিত নিজাম-উল-মূলক (১০৬৫-৬৭) এর 'নিজামীয়া মাদরাসা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[২৫৯]

পি কে. হিট্টির ভাষায় এটি ছিল,

> 'The First real Academy in Islam which made provision its student and physical ends of its student and became a model for later institutions of higher learning was the Nizamiyah.

এটিই প্রথম উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতো। এ প্রতিষ্ঠানে ধর্মতত্ত্ব বিষয়াদি ছাড়াও কলা ও অন্যান্য অনুষদের শিক্ষা দেয়া হতো। এছাড়া কুফায় ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) ও মদীনা শরীফে ইমাম মালিক (রহ.) ব্যক্তিগতভাবে দু'টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কথা ইতিহাস সূত্রে জানা যায়।

**বয়স্ক শিক্ষা :** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সময়কালে সর্বপ্রথম 'বয়স্ক শিক্ষা' কার্যক্রম চালু করা হয়। পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদা, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাগণ এ বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখেন। তাদের এ শিক্ষা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি

---

২৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭

২৫৮. পি.কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা. ৪০৬

২৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২-৪৬৩; সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

ওয়াসাল্লাম'র অনুরূপ অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক দু'পর্যায়ে চালু ছিল। অবশ্যই আব্বাসীয় খিলাফতকালে এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখলায় নিয়ে আসা হয়।[২৬০]

আব্বাসীয় খিলাফতের কিছুকাল পূর্ব থেকে আরবে ধর্মতত্ত্ব দার্শনিক, সুফিতাত্ত্বিক গবেষক ও সূফী-সাধকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের গৃহ, সমাজ ও খানকাহগুলো মূলত একেকটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এসব কেন্দ্রে ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধানসহ কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, উসুলে ফিক্হ, আকাইদ, কালামশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো।[২৬১]

**নারী শিক্ষা :** আব্বাসীয় খিলাফতকালে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ নারীদের ইসলামী শিক্ষা দেয়া হতো। তবে তারা প্রাথমিক শিক্ষা 'মক্তব' বা 'প্রাথমিক শিক্ষা' প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করে উচ্চতর শিক্ষা গৃহে সম্পন্ন করতেন।[২৬২]

ইব্ন খালদুন বলেন "জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষ উৎসাহিত হয় প্রধানতঃ তার নগর পরিবেশের উপর ভিত্তি করে।"তাই আমরা দেখতে পাই আব্বাসীয় খিলাফতের জ্ঞানময় যাত্রা মূলত মনীষীদের ব্যাপক উপস্থিতির কারণে ঘটেছে। এসব মনীষী ও পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধানত উল্লেখযোগ্য হলেন : মাযহাবের চার ইমাম–

১. হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) (৮০-১৫০ হি.)
২. ইমাম মালিক (রহ.) (৭১১-৭৯৫ খ্রি.)
৩. ইমাম শাফেঈ (রহ.) (৭৬৭-৮২০ খ্রি.) ও
৪. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) (৭৮০-৮৫৭ খ্রি.)।

তাছাড়া সিহাহ সিত্তার ছয় ইমামেরও আবির্ভাব ঘটে এ সময় । যেমন- হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রহ.) (৮১০-৮৭০), ইমাম মুসলিম (রহ.) (৮১৭-৮৬৫), ইমাম আবু দাউদ (রহ.) (৮১৭-৮৮৮), ইমাম তিরমিযী (রহ.) (৮২৪-৮৮৬), ইমাম নাসাঈ (রহ.) (৮৩০-৯১৫) ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহ.) (৮২৪-৮৮৬) ।[২৬৩]

এছাড়া আব্বাসীয় যুগে চিকিৎসাবিদদের মধ্যে–আলী আল তাবারী, আলী আল রাজি, বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইব্ন সিনা। দার্শনিকদের মধ্যে- আল-কিন্দি, আল-ফারাবি, আবুল আ'লা-মাআরবী, আবু হায়্যান আল তাওহীদি, আল রাওয়ানদি জ্যোতির্বিদ আবুল-আব্বাস আহমদ আল ফারগানি, আল-বাত্তানি (৮৭৭-৯১৮), আল বিরুনী, উমর আল খাইয়াম, গণিতবিদ আল-খাওয়ারিজমী, রসায়নবিদ জাবির ইব্ন হাইয়্যান, প্রাণী বিজ্ঞানী আল জাহির, ভূগোলবিদ ইয়াকত, ঐতিহাসিক আল তাবারী, আল-মাসউদী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[২৬৪]

উমাইয়া শাসনামল থেকে শিক্ষার স্থান হিসেবে মসজিদ, খানকাহ্ বা কারো অব্যবহৃত বাসগৃহ বা গৃহের চত্ত্বরকে নির্বাচন করা হতো। কিন্তু সেই স্বল্প পরিসরে ছাত্র সংকুলান না হওয়ায় শিক্ষালয় বা

---

২৬০. পি কে হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০
২৬১. সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, *মুসলমানকে আইন্দা তালিম,* (ভারতঃ আযমগড়, মা'আরিফ, সংখ্যা-৪২, ১৯৩৮ খ্রি.) পৃ. ১৯
২৬২. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭২
২৬৩. মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২৬৪. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

মাদ্‌রাসা শিক্ষার পরিবেশের ভৌত উন্নয়নের জন্য আব্বাসীয় যুগে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একই সাথে মাদ্‌রাসার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে স্থায়ী করণার্থে মাদ্‌রাসা শিক্ষার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। মাওলানা রিয়াসাত আলী তার 'ইসলামী নেজামে তালিম' গ্রন্থে আব্বাসীয়দের সংস্কারমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নোক্ত :

ক. আব্বাসীয় যুগে ইসলামী শিক্ষার ধারায় কিছু কিছু নতুন পদ্ধতি সংযোজন ঘটে। যদিও সে যুগে মসজিদসমূহে শিক্ষা-দীক্ষার নিয়ম প্রচলিত ছিল, তথাপি মাদরাসা শিক্ষার গুণগত, মানগত ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য মাদরাসা ভবন নির্মাণের নিয়ম চালু করা হয়।

খ. শিক্ষক ও ছাত্রদের পৃথকভাবে থাকার জন্য আবাসিক ভবন তৈরি করা হয়।

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দায়িত্বানুসারে তাদের বেতন-ভাতা এবং পাঠদানের স্তর বিন্যাস করা হয়।

ঘ. ছাত্রদের জন্য শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা নিয়মিত করা হয়। তাদের জন্য শিক্ষার উপকরণসহ তাদের থাকা-খাওয়ার সাথে পোশাক-পরিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করা হয়।[২৬৫]

আব্বাসীয় যুগে মাদরাসা শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিবেশে উন্নয়নের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় :

১. মাদরাসা নির্মাণ ও মাদরাসার জন্য অনুদান দিতে পারা সে যুগে ধর্মপরায়ণতার একটি নিদর্শনরূপে প্রকাশ পায়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নিকট পরকালীন কল্যাণের উদ্দেশ্যে মাদরাসা এবং ছাত্রাবাস নির্মাণের সাথে সাথে মাদরাসা নির্মাণ করাকে পার্থিব সম্মান ও মর্যাদার বিষয়রূপে গণ্য হয়। যার ফলে আমীর-উমরা এবং বিভিন্ন অভিজাত শ্রেণির লোকেরা মাদরাসা ভবন নির্মাণে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতেন।[২৬৬]

২. শিক্ষাদানের লক্ষ্যে মাদরাসা ভবন এবং ছাত্র শিক্ষকদের আবাসিক ভবন নির্মাণের ফলে ছাত্র-শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৩. আমীর-উমরা এবং ধনিক শ্রেণির বড় বড় অনুদানের ফলে বিশিষ্ট আলিম ও শিক্ষকগণ সচ্ছলতার সাথে অধ্যাপনা করার সুযোগ পান। শিক্ষার্থীরাও বৃত্তি লাভ করে নিশ্চিন্তে ইলম অর্জনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

৪. মুসলিম সাম্রাজ্যের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতিতে অধ্যাপনার পেশাটি এত পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদার আসনে উন্নীত হয়েছিল যে, শিক্ষিত আমীর-শাসক শ্রেণির লোকেরা নিজেদের সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করতেন। তাইতো সে যুগে, আমীর-উমরাদের নির্দ্বিধায় আহলে ইলমের দারসে অংশগ্রহণ করে এবং নিজে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ লোকদের পাঠদানের সুযোগ করে দিতেন।

৫. বিভিন্ন শাস্ত্রীয় জ্ঞানের পৃথক পৃথক মাদরাসা নির্মাণ করা হয়।

---

২৬৫. পি.কে হিট্টি, *এ শর্ট হিষ্ট্রি অব সারাসিনস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭

২৬৬. মাওলানা আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৬৭

৬. আব্বাসীয় শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থায় রচনা সংকলণের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মু'আল্লিম বা শিক্ষকগণ নিজেদের রচিত গ্রন্থাবলী পাঠদান করতেন। তবে সে সময় গ্রন্থাবলী পাঠ এবং শ্রবণের অনুমতি ও সনদ প্রদানের প্রথা প্রথম যুগের তুলনায় অধিক গুরুত্বের সাথে প্রচলিত হয়। তাছাড়া সে সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে কিছু সুনির্দিষ্ট গ্রন্থ নির্বাচনের ধারা প্রবর্তন করা হয়, প্রতিটি বিষয়ে যেসব পুস্তক/গ্রন্থাবলী বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য (othentic) হিসেবে প্রমাণিত হয়, সেগুলোকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই নিয়মে পরবর্তীতে প্রতিটি বিষয়ের পাঠদানের জন্য আবার শ্রেণিভিত্তিক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করে পৃথক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়, তবুও সুদীর্ঘ কালের আবর্তে পাঠ্যসূচির মধ্যে কিছু অপ্রয়োজনীয় পুস্তকাদিরও অনুপ্রবেশ ঘটে যায়। তাই সব যুগেই পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির সংশোধন বা পরিমার্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।[২৬৭]

মক্কা-মদীনা, বাগদাদ, কুফা, বসরার পাশাপাশি ভূমধ্যসাগর, লোহিত ও নীল নদের বিধৌত অঞ্চল স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে এ সময়ে স্বাধীন উমাইয়া আমীরাত ও ফাতেমীয় খিলাফতের শাসন চলছিল এবং এ সময় কর্ডোভা ও কায়রো নগরীতে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক সুতিকাগারে পরিণত হয়েছিল। বিশেষত মিশরের ফাতেমীয়গণ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। এ সময় তারা বাগদাদের 'বায়তুল হিকমার' অনুকরণে 'দারুল হিকমা' প্রতিষ্ঠা করেন। কায়রোতে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এ সময় গড়ে উঠে যা নিজামিয়া মাদরাসার পরবর্তী মুসলমানদের প্রথম স্বতন্ত্র উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে আব্বাসীয় যুগে মুসলমানদের সভ্যতা, কৃষ্টি জ্ঞানানুশীলন ও ইসলামী চিন্তা ছিল শীর্ষস্থানে। ঐতিহাসিকগণ এই যুগকে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন। আব্বাসীয় খলীফাগণ নতুন নতুন রাজ্য বিজয়ের নেশা ছেড়ে জ্ঞান অন্বেষণে বেশি ব্যস্ত থাকতেন।[২৬৮] তারা ধ্বংস ও বিলুপ্ত প্রায় ইরাক, মিশর, পারস্য ও গ্রীসের প্রাচীন সাহিত্য, সভ্যতা ও কৃষ্টিকেই শুধু রক্ষা করেননি; বরং এটাকে জীবনী শক্তিও দান করেছেন। আব্বাসীয় খলীফাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, ফলিত, জ্যোতিষ, গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে এবং বহু নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে মুসলিম মনীষীগণ মানবীয় জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটান এবং দার্শনিক আলোচনার দ্বারা চিন্তার পরিধি বৃদ্ধি করেন। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে প্রভূত উন্নতি ঘটায় তা আব্বাসীয় আমলেই ঘটেছিল।[২৬৯]

আব্বাসীয় আমলে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি দর্শন ও অধিবিদ্যার চর্চা হতো। আল-কিন্দী, আল-ফারাবী, আল-গাজ্জালী ও ইব্ন সিনা ছিলেন আরব দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আল-কিন্দী (৮১৩-৮৭৪ খ্রি.), মুসলিম দর্শনের সামঞ্জস্য বিধান করেন। তিনি ছিলেন একজন সার্বজনীন যুক্তিবাদী। আল-ফারাবী একজন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি বিশ্বের প্রায় সত্তরটি

---

২৬৭. মাওলানা সৈয়দ রিয়াসাত আলী নদভী, *ইসলামী নেজামে তালিম* (ভারত, ইউপি : ১৯৯২), পৃ. ২৮
২৬৮. মোঃ শহিদুল ইসলাম, *ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ঝিনাইদহ জেলার অবদান* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
২৬৯. প্রাগুক্ত, প্র. ৭৯

ভাষা জানতেন। ইউরোপীয়গণ ফারাবীকে 'প্রাচ্যের এ্যারিস্টটল' বলতেন।[২৭০] ইমাম গাজ্জালী দর্শন শাস্ত্রে 'কিমিয়াই সা'আদাত' নামক একখানি পুস্তক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁকে হুজ্জাতুল ইসলাম (ইসলামের রক্ষাকর্তা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। মৌলিক চিন্তাবিদ ইবন সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) একাধারে দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ, জ্যামিতিক, ভাষাবিদ, ধর্মশাস্ত্রবিদ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ইবন সিনা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানীদের অন্যতম ছিলেন।[২৭১]

আব্বাসীয় আমলেই ইসলামী শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্যে আরবী ফার্সী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। আরবী সাহিত্যে আবুল ফারাজ, ইব্‌ন খাল্লিকান, আবু নওয়াস, উৎবী এবং আবু তাম্মাম হাবীব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। পারসিক কবিদের মধ্যে দাকীকী, ফেরদৌসী, ওমর খৈয়াম, সাদী, নিজামী, আনওয়ারী ফরিদ উদ্দীন, জালালুদ্দীন বিখ্যাত ছিলেন।[২৭২] শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য খিলাফতের সর্বত্র ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে আব্বাসীয় খলীফাগণ সম্রাজ্যব্যাপী অসংখ্য মসজিদ, মকতব, স্কুল ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধনী-গরীব সকল শ্রেণির মানুষের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। খলীফা মামুনের প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ কলেজ, খলীফা মুনতাসির প্রতিষ্ঠিত মুস্তানসরীয় কলেজ ও নিযামুল মূলকের নিযামিয়া কলেজ তৎকালীন সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর অন্যতম ছিল। ঐসব কলেজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে শত শত ছাত্রের সমাগম হতো।[২৭৩]

তাই আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শুধু আরব বিশ্বেই নয়; বরং সারা বিশ্বেই শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে আব্বাসীয় খলীফাগণের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

## ২.৫.৫ ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা (৬৩৪-১৯৪৭ খ্রি.)

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় মুসলমানরা যখন পাক-ভারত উপমহাদেশে আসতে শুরু করল, তখন এ দেশের অধিবাসীরা মুসলমানদের জ্ঞানভান্ডার ও শিক্ষার আলো লাভে ধন্য হতে লাগল। আরব ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা এসে এদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল এবং ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সব জায়গায় চালু করে দিল, মাদরাসা কায়িম করল, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে জ্ঞান বিতরণ আরম্ভ করল। এসব মুসলমান শিক্ষাবিদদের জন্য বড় বড় ইমারতের প্রয়োজন ছিল না, জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্রের প্রয়োজন ছিল না। উপদেষ্টা পরিষদ এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিরও দরকার ছিল না। মসজিদগুলো ছিল মাদরাসা, আর জমিন ছিল তাঁদের চেয়ার-টেবিল। আস্তে আস্তে পরবর্তীকালে এই উপমহাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর বিভিন্ন শহর-বন্দর এবং গ্রাম-গঞ্জে মুসলিম শিক্ষাবিদরা ছড়িয়ে পড়ে এবং মক্তব-মাদরাসা গড়ে তোলেন। পৃথিবীর এ অংশে কখন এবং কোথায় প্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তা বলা কঠিন। তবে তারীখে ফিরিশতার বর্ণনানুযায়ী মনে হয় মাদরাসার জন্য প্রথম 'ইমারত তৈরী করেন সুলতান

---

২৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
২৭১. কে.আলী, *ইসলামের ইতিহাস* (আলী পাবলিকেশন্স ১৯৯২), পৃ. ৫১৬
২৭২. প্রাগুক্ত।
২৭৩. মোঃ শহিদুল ইসলাম, *ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ঝিনাইদহ জেলার অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

নাসিরুদ্দীন কুবাচা মুলতানে। যেখানে শিক্ষা লাভ করেন হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রহ.)(জন্ম ৫৭৭ হি.)-এর ন্যায় মনীষী ও ইসলামী শিক্ষাবিদরা।

এ উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বিশেষভাবে আরম্ভ হয় হিজরী ৯৩ সনে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের[২৭৪] সিন্দু বিজয়ের সাথে সাথে মুলতান, মনসূরা, আলোর, দেবল, সিন্দান, কুসদার, কান্দারীল ইত্যাদি স্থানে 'আরবরা উপনিবেশ স্থাপন করেন। কারো কারো মতে তাঁর সঙ্গে ৫০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য স্থায়ীভাবে বর্তমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বহু শিক্ষাবিদ, হাফিয, কারী ও ফকীহ ছিলেন, যাঁদেরকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নির্দেশ দিয়েছিলেন এই বিজিত অঞ্চলে পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও হাদীসের জ্ঞান দান করার জন্য। যোদ্ধা সৈনিক ছাড়াও অনেক বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তি, যাঁরা কুরআন হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁর সাথে প্রেরিত হন। শিক্ষাদান কার্যে তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও যত্নে বিশেষ করে এই অংশে শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে এ সময় বহু সংখ্যক 'আরব মুসলমান' এ দেশে আগমণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁদের সবার জন্য মসজিদ এবং চার হাজার অভিবাসীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন।

আফ্রিকার প্রসিদ্ধ পর্যটক ইবনে বতুতার বর্ণনানুযায়ী খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি ধর্মীয় ও ইসলামী শিক্ষা এত ব্যাপকতা লাভ করে যে, শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বোম্বে প্রদেশের কেরালা ডিষ্ট্রিক্টের হনাবান নামক স্থানে ১৩টি এবং ছেলেদের জন্য ২৩টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলের মেয়েরা ছিল হাফিযা কুরআন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর শাসনামলে (৬৯৫-৭১৫/১২৯৬-১৩১৬) শুধু শামসুদ্দীন ইয়াহিয়া (মৃত্যু ৭৪৭ হি.) হাদীসবিদ ছিলেন। আর সবাই কাযী বা বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্য ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রাধান্য দিতেন।

পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে জানা খুব সহজ নয়। কারণ এই সময়ের ইতিহাসের বেশির ভাগ হল রাজা বাদশাহদের জীবনী, যার মধ্যে বিশেষ করে রয়েছে তাঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রাজ্য জয় সম্বন্ধে। এতদসত্ত্বেও বহু পরিশ্রম এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে এই সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থীদের অবস্থা, শিক্ষার রীতিনীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সিলেবাস এবং বই-পুস্তক সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়-

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় মিসর এবং ভারতের মধ্যে আসা-যাওয়ার সম্পর্ক শুরু হয়। তখনকার এক মিসরীয় গ্রন্থে কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনানুযায়ী শুধু দিল্লীতেই এক হাজার ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা ছিল। তার মধ্যে একটা ছিল শাফি'ঈ মাযহাব অবলম্বীদের, আর বাকী সব

---

২৭৪. তিনি ছিলেন খলিফা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি তাঁর উন্নত চরিত্রের গুণে যুদ্ধ ও শাসন পদ্ধতির কৃতকার্যতার মহিমায় ভারতের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে সমুজ্জল হয়ে আছেন। তিনি শুধু রণনীতি বিশারদ বা যুদ্ধপটু সেনাপতি ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত স্বহৃদ, বহুমুখী প্রতিভাশালী সুশাসকও ছিলেন। তিনি ছিলেন সুনিপুণ ও জনপ্রিয় সেনাধ্যক্ষ। তাঁর অধীনস্থ সেনাবাহিনীর কাছে তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর অল্প বয়সে অদম্য সাহজ, মহান বীরত্ব, যুদ্ধ ক্ষেত্রে অপূর্ব সময় কৌশল তাঁকে মুসলিম ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তাঁর সুনিপুণ শাসন-পদ্ধতি ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমের জন্য তিনি অমুসলিম সিন্ধুবাসীদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি শত্রুর প্রতি কঠোর এবং মিত্রের প্রতি দয়ালু ছিলেন। আল-মরজুবানী মন্তব্য করেন যে, "মুহাম্মদ বিন কাসিম সব যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।" দেখুন: ঈশ্বরী প্রষাদ, ***শর্ট হিস্ট্রি,*** পৃ. ৩৬: চাচ নাম ইলিয়ট ডাওসন।

ছিল হানাফী মতাবলম্বীদের। শহর এবং মহল্লার মসজিদের কামরাগুলো ছাত্রদের বাসস্থান ছিল। প্রাচীনকালে সাধারণত শিক্ষার জন্য তখন পৃথকভাবে বিরাট ইমারত ছিল না। সে সময়ে সমস্ত মসজিদ, মাদরাসা ও বিদ্যালয় এর প্রয়োজন মিটাত। এ কারণে প্রত্যেক পুরাতন প্রশস্ত মসজিদে একটা বড় বিদ্যাপীঠ ছিল। এ জন্য উপমহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত বা ইসলামি শহরগুলোতে অল্প দূরে দূরে অনেক প্রশস্ত শানদার মসজিদ দেখা যায়। দিল্লী, আগ্রা, জৈনপুর, লাহোর, আহমদাবাদ, গুজরাট, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি প্রাচীন ইসলামী শহর ও রাজধানীগুলিতে বিশাল ও আযীমুশশান মসজিদগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং যা এখনও ঐতিহ্য বহন করছে। এ সবের আকৃতি, গঠন ও অবস্থা স্পষ্টভাবে বুঝায় যে, এগুলোর প্রধান অংশ শিক্ষার স্থান বা মাদরাসা রূপে ব্যবহৃত হত। এতদাঞ্চলে এসব মসজিদের আঙ্গিনার চারপাশে এখনও ছোট ছোট কামরার দীর্ঘ ও প্রশস্ত সারি দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলি প্রকৃতপক্ষে ছাত্র-শিক্ষকদের বাসস্থান। এ সবের কিছু কিছু আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন দিল্লীর মসজিদ এবং হিজরী ১০৬০ সনের তৈরী ফতেহপুরী ও আকবর আবাদী মসজিদের আঙ্গীনায় আশ-পাশে বানানো কামরাগুলো বিশেষ করে ছাত্রদের বাসস্থান ছিল। অবশ্য পরের দিকে লিল্লাহ বা ফ্রী বোডিং এবং লজিং-এর নিয়মও চালু হয়। যেমন দিল্লী, লক্ষ্মৌ, শিয়ালকোট, লাহোর, বিলগ্রাম, মুলতান, বিহার, আহমদাবাদ, বেঅিলি, কনৌজ, দেউহ্, মসূলী, খায়েরাবাদ, বাংলাদেশ ইত্যাদি স্থানেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

পুরানো খানকাহ্গুলোকে সাধারণতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। তখনকার Mystic Philosophers বা সূফীগনর এবং আত্মিক উন্নতিসম্পন্ন শায়েখরা যিক্র, অযীফা পাঠ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনাতে শুধু ব্যস্ত থাকতেন না, বরং শারী'আত, ত্বারীক্বত, যাহিরী, বাতিনী (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) উভয় প্রকারের শিক্ষাদানই ছিল তাঁদের সত্যিকার লক্ষ্য। এ কারণে পূর্বের মাশায়িখ এবং অলী-আল্লাহ্র জীবনীতে তাঁদের পঠন-পাঠন, জ্ঞান দান[২৭৫] ও শিক্ষকতার ব্যস্ততাও সাধারণতঃ দেখা যায়। প্রত্যেক খানকাহ্তে তাসাওউফ বা বাতিনী জ্ঞান অন্বেষকদের সাথে সাথে যাহিরী এবং বৈষয়িক জ্ঞানাহরণকারী ছাত্রদেরও বিরাট জামা'আতের খবর পাওয়া যায়। ঐ সব খানকাহ্র জন্য সুলতানদের পক্ষ থেকে যে অনুদান ব্যক্তিগত সম্পত্তি বরাদ্দ ছিল তার বেশীর ভাগ খরচ হত এসব ছাত্রদের জন্য। এ কারণে পুরনো দিনের এ সব খানকাহ্গুলোকে স্বাভাবিকভাবেই মক্তব-মাদ্রাসার মধ্যে গণ্য করা যায়।

বাদশাহ, অলী-আল্লাহ্ এবং বিখ্যাত আধ্যাত্মিক পুরুষদের কবরস্থান এবং মাযারের পাশেও অনেক কামরা শিক্ষাদানের কাজে বা ক্লাস রুম হিসেবে ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হত, যা স্পষ্টতঃই মাদ্রাসা রূপে গণ্য হত। যেমন সুলতান আলাউদ্দীন খলজী এবং বাদশাহ হুমায়ুনের কবরের আশ-পাশের এবং দিল্লী, আহামেদাবাদ, আগ্রা, বিজাপুর ইত্যাদি স্থানের আউলিয়ায়ে কিরামের কবরস্থানের পরিবেশ ও পরিস্থিতি ঐ সব ইতিহাসের সন্ধান দেয়। আমীর ও জমিদারদের দেওড়ীতেও মক্তা-মাদরাসার কাজ বা শিক্ষাদান চলত। ইসলাম নীতিগতভাবে শিক্ষাদান ও বিদ্যার্জনের সর্বদাই বিশেষ প্রেরণা ও তাকীদ দেয় এবং এই জ্ঞানদান ও জ্ঞানাহরণ একটা ধর্মীয় ও

২৭৫. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) মসজিদে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জ্ঞান চর্চা করতেন। নবী (সা.) মসজিদে ঢুকে লক্ষ্য করতেন কোন দলে অধিক ও বেশী শিক্ষিত লোক রয়েছে, তিনি গিয়ে সেই গ্রুপের সাথে বসে পড়েন এবং তাঁদের সাথে জ্ঞান চর্চায় অংশগ্রহণ নিতেন। মিশকাত: কিতাবুল 'ইল্‌ম।

কল্যাণকর কাজ বলে ঘোষণা করে। তালিবে ‘ইল্‌ম বা শিক্ষার্থীদের মদদ বা সাহায্য করা, শিক্ষার প্রচার-প্রসার, কিতাব-পত্র ও শিক্ষা উপকরণের জন্য উদারভাবে সম্পদ বরাদ্দ করা, মাদ্‌রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়িম করা, ‘উলামায়ে কিরাম ও জ্ঞানী-গুণীদের খিদমত ও সহায়তা করা ইত্যাদি ধর্মীয় নির্দেশ এবং ইহ-পরকালের উন্নতি, সফলতা ও মুক্তির কারণ বা উসীলা হিসেবে গণ্য করা হয়।

**উপমহাদেশে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষাবিদদের আগমন ও শিক্ষার প্রসার**

মুসলমানদের বিজয়ের সাথে সাথে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে অনেক জ্ঞানী-গুণী শিক্ষাবিদের বিরাট জামা‘আত এদেশে প্রবেশ করে, এদেশের মর্যাদাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। দিল্লী জয়ের পর একদিকে বাদশাহ’র দরবার নতুনভাবে সাজানো হল, অন্যদিকে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষাবিদের জ্ঞান চর্চার আসর বসে গেল। মুসলমান বাদশাহদের বিদ্যানুরাগ এবং বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে চতুর্দিক হতে ‘উলামা এবং বিখ্যাত শিক্ষাবিদরা দিল্লীতে এসে ভিড় জমান এবং রাজধানীতে বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

বিখ্যাত সূফী সাধক ও পণ্ডিত হযরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র.) সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিসের সময় দিল্লী আগমন করেন এবং মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠান করেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের সময় তিনি বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে চলে আসেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য এখানে বিরাট মাদরাসা স্থাপন করেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত সূফী ও জ্ঞানতাপস হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া আল-মানেরী এই মাদরাসার ছাত্র ছিলেন।[২৭৬]

সুলতান সিকান্দার লোদীর রাজত্বকালে শায়খ ‘আবদুল্লাহ তলবনী দিল্লীতে এবং মাওলানা ‘আযীযুল্লাহ্ ‘সম্বল’-এ তাশরীফ আনেন। উভয়ে প্রথমে মুলতান আসেন। তাঁদের কারণে এদেশে মানতিক এবং ‘ইলমে কালামের ব্যাপক উন্নত সাধিত হয়। তাঁদের পূর্বে এ উপমহাদেশে ‘ইলমে মানতিক ও কালামে শরহে শামসিয়া এবং শহরে সাহায়েফের বেশী পড়ানো হত না। শায়খ ‘আবদুল্লাহ্‌র ক্লাসে বাদশাহ সিকান্দার লোদী স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন। কোন সময় দরস-তা’লীমের ধারা যেন বন্ধ না হয় সেজন্য বাদশাহ নিজে মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদের এক কোণে চুপচাপ বসে যেতেন এবং সহজে স্পষ্টভাবে শায়খের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শুনতেন।

**প্রাথমিক পাঠ্যসুচি ও সিলেবাস**

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে যখন এদেশে ইসলাম পৌঁছে, তখন এদেশের মুসলমানদের শিক্ষার নিসাব বা কারিকুলামে মানতিক এবং ফালসাফা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখানে এসে মুসলমানরা শিক্ষার যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাতে নিয়মানুসারে বাচ্চাদেরকে দেখে দেখে পড়ার জন্য প্রথমে পবিত্র কুর’আন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। যারা পবিত্র কুর’আন শিক্ষা দিতেন তাঁদের বলা হত ‘মুক্‌রী’। কোন গোলাম ইসলাম গ্রহণ করলে হাদীসের শিক্ষানুযায়ী তার মুনীব বা মালিক তাকে আযাদ করে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করে প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত করার তা‘লীম দেওয়া হত। পূর্বে বংশগতভাবে গোলাম নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে উত্তম শিক্ষা লাভের অধিকারী হতেন।

পবিত্র কুরআন শিক্ষার পরেই নিয়ম মোতাবেক ফার্সী কিতাব পড়ানো হত। তখন ফার্সী ছিল সরকারী ভাষা। এমনকি অনেক মুসলমানের সাধারণ ভাষাও ছিল ফার্সী। ফার্সী কিতাবসমূহ মুসলমানদের প্রিয় ভাষা ছিল। দিল্লীতে জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য এক তামাশগীর বাঙ্গালী

২৭৬. Dr Muhammad Ishaq, ***India's Contribution to the Study of Hadith Literature***, D.U.8.53.1971

বাজীকর তামাশা দেখানোর জন্য উপস্থিত লোকদের সামনে তার থলি থেকে একবার ‘কুল্লিয়াতে সাদী শীরাযী”বের করত, আবার থলিতে তা রেখে দিয়ে একই থলি থেকে ‘দীওয়ানে হাফিয’বের করত, আবার ওটা রেখে দিয়ে ‘দীওয়ানে সলমান সাউযী’ বের করত, আবার ওটা রেখে ‘দীওয়ানে আনওয়ারী’ বের করতো। এভাবে বহুবার বিভিন্ন ফার্সী গ্রন্থ থলিতে রাখত আর নতুন করে আরেকটা ফার্সী গ্রন্থ বের করতো। সাধারণ জনগণের মধ্যে ঐসব গ্রন্থ ও ফার্সী ভাষার প্রভাব কত বেশী ছিল, এই ঘটনার দ্বারা তা ধারণা করা যায়। কারণ উপমহাদেশে ইংরেজী ভাষার চর্চা প্রায় দু’শ বছর পর্যন্ত চলছে। এতদসত্ত্বেও সেক্সপীয়ার, মিলটন, টেনিসন অথবা প্রসিদ্ধ অন্য কোন ইংলিশ লেখকের বই এভাবে তামাশা করে দেখানোর দ্বারা কি উপমহাদেশী কোন লোকের মনোরঞ্জন বা আনন্দ দান সম্ভব হবে? মোটকথা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের এক অংশ ফার্সী শিখার জন্য ব্যয় হত।

এরপর শুরু হল ‘আরবী শিক্ষার স্তর’। এ স্তরের শুরুতে মীযান ও সরফ পড়ানো হত। এই স্তর দু ভাগে বিভক্ত ছিল- ১. ‘ইলমি যরূরী’ ও ২. ‘ইলমি ফযল’ বা দরজায়ে দানশমন্দ।
প্রথম স্তরে ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ-এর কিতাব সমূহ পড়ানো হত। এর মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল ‘ইলমী নাহুতে কাফিয়া ও মুফাস্সল। আর ফিক্হতে ছিল কুদুরী এবং মাজমা’উল বাহরাইন। এ সময় শরহে জামী এবং শরহে বিকায়াও পড়ানো হত। ‘আরবী শিক্ষার জন্য ছাত্রদের আগ্রহ সম্বন্ধে বাংলার ‘উসমান সিরাজের দিল্লী পর্যন্ত সফরের ঘটনাই যথেষ্ট। এই সফরে তাঁর সাথে কিতাব আর কাগজ-কলম ছাড়া অন্য কোন আসবাব ছিল না। এ অবস্থায় তিনি হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়ার (র.) খানকাহ্তে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে পড়ায় শরীক হন।

## ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার ধারাবাহিকতা

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার ধারাবাহিকতা কয়েকটি ধাপে বিভক্ত করা যায় :
প্রথমত : এই যুগ হিজরী সপ্তম শতক হতে আরম্ভ হয় এবং হিজরী দশম শতকে ইসলামি শিক্ষার দ্বিতীয় যুগ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দু’শ বছর যাবৎ চলতে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে সরফ, নাহু, বালাগাত, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, মানতিক, কালাম, তাসাওউফ, তাফসীর, হাদীস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা সম্মানের কাজ বলে গণ্য হত।

ফিকহ্ শাস্ত্রে পড়ানো হত হিদায়া, শরহি বেকায়া ইত্যাদি। উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে পড়ানো হত আল মানার এবং উসূলে বাযযাভী এর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ।

তাফসীর শাস্ত্রে-বাযদভী এবং কাশ্শাফ। তাসাওউফ শাস্ত্রে-‘আওয়ারিফ, ফুসুসুল হিকাম।এর এক যুগ পরে খানকাহ্সমূহের পাঠ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে নকদুননুসুস এবং লূম’আত। অন্যান্য মাদরাসাতে পাড়নো হতঃ হাদীস শাস্ত্রের-মাশরিকুল আনওয়ার, মাসাবীহুস সুন্নাহ্ অর্থাৎ মিশকাতুল মাসাবীহ-এর মতন। ‘আরবী সাহিত্যে-মাকামাতে হারীরী। এই গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করতে হত। হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়ার বর্ণনা হতে জানা যায়, তিনি মালিক উসতায শামসুদ্দীন খাওয়ারিযমীর নিকট মাকামাতে হারীরী পড়েন এবং ৪০ মাকামা কণ্ঠস্থ করেছিলেন। মানতিক শাস্ত্রে-শরহি শামসিয়া ইত্যাদি। কালাম বা তর্ক শাস্ত্রেশরহি সাহারিফঃ কোন কোন ক্ষেত্রে আবূশ শুকূর সালিমীর তামহীদ নামক গ্রন্থও পড়ানো হত।

এই স্তরের শিক্ষাবিদদের জীবনী ও অবস্থা হতে জানা যায়, এ যুগে মানতিক এবং ফালসাফায় যেমন গুরুত্ব তেমনি ঐ যুগে ফিক্বহ্ এবং উসূলে ফিক্বহ্ ছিল সম্মানের মাপকাঠি। হাদীসের ক্ষেত্রে শুধু "মাশারিকুল আনওয়ার" গ্রন্থ পাঠ করাই সে যুগে যথেষ্ট মনে করা হত। যদি কোন সৌভাগ্যবান মাসাবীহ পড়ার সুযোগ লাভ করত, তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে বিশ্বের জোড়া নামকরা ইমাম উপাধির যোগ্য মনে করা হত।

প্রকৃত ব্যাপার হল, সে সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় বা সিলেবাসে যে বিশেষত্ব ছিল তাতে উপমহাদেশের বিজয়ী শাসকদের ভাবধারা, চিন্তা ও রুচির ফলাফল ছিল। উপমহাদেশে যাঁরা মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন তাঁরা গজনী এবং ঘুর থেকে এসেছিলেন। ঐসব অঞ্চল এমন জায়গা ছিল যেখানে ফিক্হ এবং উসূলে ফিকহ এসব বিষয়ে জ্ঞানাহরণ করে পারদর্শিতা লাভ করা ছিল মহা সম্মান বা গুণের মাপকাঠি। এ কারণে ফিক্হ শাস্ত্রে শিক্ষাদান এবং তা চর্চায় খুব গুরুত্ব দেয়া হত। হাদীস চর্চার প্রতি কোন বিশেষ নজর দেয়া হত না। এ বক্তব্যের যথার্থতা সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের দরবারের একটি ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। ঘটনা এইরূপঃ

একবার সুলতানের দরবারে বিতর্কের সূচনা হল। একদিকে শায়খ নিযামুদ্দীন আওলিয়া, আর অপর পক্ষে দিল্লীর সমস্ত শিক্ষাবিদ এবং 'আলিমরা রয়েছেন। শায়খ যখন যুক্তি বা দলীল স্বরূপ কোন হাদীস পেশ করতেন তখন বিপরীত দিক থেকে জোর দিয়ে সমস্বরে বলা হত যে, এই শহরে হাদীসের উপর ফিকহ শাস্ত্রের প্রাধান্য রয়েছে। কখনও বলা হত, এই হাদীস-ইমাম শাফি'য়ীর দলীলের স্বপক্ষে; আর ইমাম শাফি'য়ী আমাদের 'আলেমদের দুশমন। তাই এ ধরণের হাদীস আমরা শুনতে চাই না। শায়খ বলেন, যে দেশের 'আলেমদের মধ্যে এরকম গর্ব[২৭৭] আর হিংসা বিদ্যমান, তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত।

যিয়াউদ্দীন বরাণী তাঁর তারীখে ফীরোজশাহী গ্রন্থে 'আলাউদ্দীন খালজী-এর শাসনামলের একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, মাওলানা শামসুদ্দীন তুরক এই উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্র চর্চার জন্য এসে মুলতান পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে যান। যাওয়ার সময় হাদীস শাস্ত্রে উপমহাদেশের 'আলেমদের অমনোযোগিতার বিষয় উল্লেখ করে বাদশাহকে কটাক্ষ হেনে চিঠি লিখেন। কিন্তু দুনিয়াদার মৌলভীরা এই চিঠি বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি।

**দ্বিতীয়ত :** হিজরী নবম শতাব্দীর শেষের দিকে শায়খ আবদুল্লাহ এবং শায়খ আযীযুল্লাহ সেকান্দার লোদীর শাসনামলে মুলতান হয়ে দু'জন যথাক্রমে দিল্লী এবং সম্বল আসেন। সম্রাট তাদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানান। তাঁদের প্রতিভা মর্যাদা আর কিছুটা বাদশাহের যত্নের ফলে অতি শীঘ্রই তাঁদের জ্ঞানের সুনাম ও শিক্ষার প্রভাব সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা পূর্বের তুলনায় এদেশে শিক্ষার মাপকাঠিকে আরও উন্নত করেন। কাযী আয়্যাযের 'মাতালি' এবং 'মাওয়াক্বিফ' গ্রন্থদ্বয় এবং

২৭৭. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, الكبرياء ردائ অহংকার-গর্ব আমার চাদর (আমার জন্য সমীচীন)। তোমরা (মানুষ দুর্বল, অস্থায়ী-ক্ষণস্থায়ী মুসাফির) আমার চাদর নিয়ে টানাটানি করো না। সুফীগণ বলেন, "মুসলিম হলে কাফনে, খ্রিষ্টান হলে কফিনে, হিন্দু হলে চিতায় পুড়ে ছাই, ও মানুষ তো গর্বের কিছু নাই।"

আর হিংসা হলো হাসাদ (حسد) যা হারাম। কিন্তু কারো ক্ষতি না করে প্রতিযোগিতা করা "গিবতা" (غبطة) বৈধ।

সাককাফীর “মিফতাহুল ‘উলূম” গ্রন্থ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করেন। জনগণ এই গ্রন্থগুলোকে সাদরে গ্রহণ করেন।

এই সময়ে মীর সৈয়্যদশরীফের ছাত্ররা “শরহে মাতালি”এবং “শরহে মাওয়াক্বিফ” গ্রন্থগুলো চালু করেন। আর ‘আল্লামা তাফতাযানীর ছাত্ররা ‘মুতাওয়্যাল’ এবং ‘মুখতাসার’-এর ভিত্তি রচনা করেন এবং ‘তালভীহ্’ও ‘শরহে ‘আক্বা’য়িদে নাসাফী’ গ্রন্থদ্বয়ের প্রচলন শুরু করেন।

‘শরহে বিকায়া’ এবং ‘শরহে জামী’ও ক্রমান্বয়ে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সময়ের সর্বশেষ ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আলিম ও শিক্ষাবিদ ছিলেন শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী। তিনি উপমহাদেশ থেকে ‘আরবে যান এবং যেখানে তিন বছর থেকে মক্কা-মদীনার ‘উলামায়ে কিরাম-এর নিকট হাদীস শাস্ত্রে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন এবং সে অবদান ও উপমহাদেশের জন্য নিয়ে আসেন। তিনি এবং তাঁর বংশধররা সর্বদাই তা প্রচার করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তা সার্থক হয়নি। কারণ এই মর্যাদা অপর বুযর্গের ভাগ্যে আল্লাহ তা’আলা রেখে দিয়েছিলেন।

এই দ্বিতীয় যুগে সিলেবাস বা বইয়ের পূর্ণ তালিকা দেওয়া নিস্প্রয়োজন। কারণ প্রথম যুগের কিতাবগুলো তালিকায় উক্ত ‘মালতি’ ‘মাওয়াকিফ’ এবং এগুলির ব্যাখ্যা পুস্তক মুতাওয়্যাল, মুখতাসার, তালভীহ, শরহি ‘আক্বা’য়িদে নাসাফী, শহরি বিকায়া এবং শরহি জামী এই গ্রন্থগুলো বর্ধিত করলে দ্বিতীয় যুগের পাঠ্যসূচী প্রস্তুত হবে। এই স্তরের ‘উলামায়ে কিরামের অবস্থা থেকে জানা যায়  যে, এ যুগে যেমন ‘সদরা’ এবং শামসি বাযিগা’ শেষ স্তরের কিতাব বলে মনে করা হয় সে রকম ঐ যুগে সাককাকীর ‘মিফতাহুল ‘উলূম’ এবং কাযী আয়্যাযের ‘মাতালি’ ও ‘মাওয়াক্কিফ’ শেষ স্তরের পাঠ্য গ্রন্থ ছিল। এ বিষয়ে বাদায়নী ও বিভিন্নভাবে  ইঙ্গিত দিয়েছেন, যেমন মুফতী জামালুদ্দীন এবং শায়খ হাতিমীর অবস্থা উল্লেখের প্রসঙ্গ তিনি বর্ণনা করে গেছেন।

তৃতীয়ত : দ্বিতীয় যুগে পাঠ্যপুস্তকের বা নিসাবের যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয় তাতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনেক বেড়ে যায়। এ সময় নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ডিগ্রী ও শিক্ষা লাভ করা অধিক সম্মানের মাপকাঠি মনে করা হত। শাহ ফাতহুল্লাহ শীরাযী এ উপমহাদেশে আসেন এবং আকবরের দরবারে তাঁকে ‘আবদুল মালিক’ খিতাবে ভূষিত করে সম্মানের উচ্চাসনে সমাসীন করা হয়। তিনি পূর্ববর্তী পাঠ্যসূচী বা সিলেবাসের কিছুটা উন্নতি সাধন করে তাতে অতিরিক্ত গ্রন্থাবলী যোগ করেন। ‘উলামা ও শিক্ষাবিদ এই বর্ধিত গ্রন্থাবলীকে সাদরে গ্রহণ করেন। এখন মাদরাসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নতুনত্ব ও পুনর্জীবন লাভ করে। মীর গোলাম ‘আলী আযাদ তাঁর ‘মা আসারুল কিরাম” গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেন, ‘উলামায়ে মুতাআখ্যিরীন-এর মধ্যে মুহাক্কিকে দাওয়ানী, মীর সদরুদ্দীন, মীর গিয়াসুদ্দীন, মানসূর মির্যা জানিমী-এর গ্রন্থাবলী উপমহাদেশে আনা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চালু করা হয়। অসংখ্য শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী গ্রন্থগুলোর টীকা ও ব্যাখ্যা লিখেন এবং ব্যাপকভাবে উপকারিতা লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে চালু করেন। এ যুগের সর্বশেষ এবং অন্যতম বিখ্যাত ‘আলিম হযরত শাহ অলি উল্লাহ (মৃত্যু ১১৭৪ হি.) তাঁর ‘আল-জুয’উল্ লতীফ’ গ্রন্থে নিজের বিদ্যাপীঠসমূহের পাঠ্য তালিকার বিন্যাস নিরূপন উল্লেখ করেন,

* নাহু শাস্ত্রে ছিল-কাফিয়া, শরহি জামী ইত্যাদি।

* মানতিক শাস্ত্রে-শরহি শামসিয়া, শরহি মাতালি ইত্যাদি।

* দর্শন শাস্ত্রে (ফালাসাফা)-শরহি হিদায়েতুল হিকমত।

* কালাম শাস্ত্রে-শরহি 'আক্বা'ঈদুন নাসাফী ইত্যাদি। এর সাথে সিলহাশিয়ায়ে খিয়ালী, শরহি মাওয়াক্বিফ হিকমত।
* উসূলে ফিক্‌হ শাস্ত্রে-হুসামী এবং কিছু পরিমাণ তওযীহে তালভীহ্।
* বালাগাত শাস্ত্রে-মুখতাসার এবং মুতাওয়্যাল ইত্যাদি।
* হাই'আত ও হিসাব শাস্ত্রে-সংক্ষিপ্তাকারের কিছু বই-পুস্তক।
* চিকিৎসা শাস্ত্রে মুওজাযুল কানুন।
* হাদীস শাস্ত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ্ (পূর্ণ), শামায়িলে তিরমিযী (পূর্ণ) ও কিছু সহীহ্ বুখারী ইত্যাদি।
* তাফসীর শাস্ত্রে-মাদারিক, বায়যাভী ইত্যাদি।
* তাসাউফ ও সুলূক শাস্ত্রে (সূফী পথ প্রদর্শন) আওয়ারীফ-এ নকশবন্দী পুস্তকসমূহ, শরহি রুবাইয়াতে জামী, মুকাদ্দামায়ে শরহি লুম্'আত, মুকাদ্দামায়ে নাকদুননুসূস ইত্যাদি।

এই পরিমাণ শিক্ষা সমাপ্তির পর শাহ 'অলি উল্লাহ (র.) উচ্চ শিক্ষার জন্য 'আরবে তাশরীফ নেন। সেখানে কয়েক বছর থেকে শায়খ আবু তাহির মাদানীর নিকট হাদীস শাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি উপমহাদেশে এসে তা এত ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেন যে, এখানে হাদীসের নিরুৎসাহ এবং মন্দ অবস্থা সত্ত্বেও এ চিহ্ন আজও বাকী আছে। এই সিহাহ্সিত্তার[২৭৮] পঠন-পাঠন ও ব্যাপকভাবে শিক্ষাদান তখন থেকে বিশেষভাবে শুরু হয়। তখন শাহ সাহেব এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য বংশধরা নিজেদের অসীম পরিশ্রমের দ্বারা এই হাদীস শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু করেন এবং নিজেদের মূল্যবান জীবনের এক বিরাট অংশ এর প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেন। শাহ অলি উল্লাহ্ নতুন পাঠ্যসূচী ও সিলেবাসও প্রণয়ন করেন।

তখন শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ-এর পুনরুজ্জীবনের সময় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানতিক এবং হিকমত-এর স্বাদ জনগণকে পেয়ে বসে। ফলে তাঁর হাদীস চর্চা আশানুরূপ সফলতা লাভ করতে পারেনি।

---

২৭৮. প্রসিদ্ধ ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ : ১. সহীহ বুখারী, পূর্ণনাম الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلي الله عليه وسلم وسننه وايامه- এর সংকলক, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইবন মুগীরা ইবনে বারদিযবাহ, আল-জুফী আল-বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম (الصحيح لمسلم), সংকলক আবুল হুসাইন ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র.)। বুখারী ও মুসলিমকে একত্রে الصحيحين বলা হয়। ৩. সুনানে নাসা'ঈ, সংকলক : আবু 'আবদির রহমান আহমদ ইবনে শু'আইব ইবন 'আলী ইবন বাহর ইবন মান্নান ইবন দীনার আন নাসা'ঈ (র.)। ৪. সুনানে আবী দাউদ, সংকলক : সুলায়মান ইবনুল আশ'আস ইবন ইসলাম ইবন বাশীর ইবন শাদ্দাদ ইবন 'আমর (র.) ৫. জামি' তিরমিযী, সংকলকঃ আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাহ ইবন মূসা ইবন যাহহাক আস-সুলামী আত-তিরমিযী আল-বূগী (র.)। ৬. সুনানে ইব্‌ন মাজাহ, সংকলক, আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মাজাহ আল-বারঈ আল-কাযভীনী (র.)। (ড. শামী আরো চৌধুরী, ***ইমাম তাহাভী (রহ.) জীবন ও কর্ম,*** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১), পৃ. ৪২-৫৫; ডাঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ***উলূমুল হাদীস***, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) পৃ. ২৪৭, ২৬৭; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, ***উলূমুল হাদীস*** (রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ), পৃ. ২৫৮-২৬৪

চতুর্থত: এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থার চতুর্থ যুগ দ্বাদশ শতকে আরম্ভ হয়। এ যুগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহালুভী (মৃত ১১৬১ হি.)। তিনি এমন শক্ত হাতে এবং মজবুতভাবে এর ভিত্তি রচনা করেন যে, দীর্ঘকাল বা কয়েক শতাব্দী অতীত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এই শিক্ষা ধারায় কোন সংকীর্ণতা দেখা দেয়নি। মোল্লা নিযামুদ্দীন ছিলেন শাহ অলি উল্লাহ্ (র.)-এর সম-সাময়িক। এই যুগে যেসব অতিরিক্ত গ্রন্থাবলী পাঠ্যসূচীতে চালু ছিল তা হল:

* নাহুশাস্ত্রে ছিল নাহুমীর, শরহি মি'আতে 'আমিল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, শরহি জামী ইত্যাদি।

* সরফ শাস্ত্রে ছিল মীযান, মুনশা'য়িব, সরফে মীর, পাঞ্জেগাঞ্জ যুবদাহ, ফুসূলে আকবরী ইত্যাদি।

* মানতিক শাস্ত্রে সুগরা, কুবরা, ইসাগুজী, তামজীব, শরহি তাহজীব, কুতবী, সুল্লমুল 'উলুম ইত্যাদি।

* হিকমত শাস্ত্রে মাইবুযী, সদরা, শামসি বাযিগাহ্।

* রিয়াযী বা হিসাব বিজ্ঞানে খুসাসাতুল হিসাব, তাহরীরে আকলীদাস (মাকালায়ে উলা), তাশরীহুল আখলাক, রিসালায়ে কোশিজিয়া, শরহে চগমানী (প্রথম অধ্যায়)।

* বালাগাত শাস্ত্রে- মুখতাসার মা'আনী, "মুতাওয়্যাল মা'আনা কুলতু" পর্যন্ত)

* ফিকহ শাস্ত্রে- শরহে বিকায়া, আওয়্যালায়ন (اولين) ও হিদায়া আখেরাইন (اخرين)।

* উসূলুল ফিক্হ শাস্ত্রে নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ্, তালবীহ্, মুসাল্লামুল সুবূত (মাবাদি কালামিয়া)।

* কালাম শাস্ত্রে শরহি 'আকা'য়িদে নফসী, শরহি 'আকা'য়িদে জালালী, মীর যাহিদ, শরহি মাওয়াক্বিফ ইত্যাদি।

* তাফসীর শাস্ত্রে জালালাইন ও বায়যাভী।

* হাদীস শাস্ত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ।

পঞ্চমত : এই যুগ ইসলামি শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবনতির যুগ। এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের দিন ফুরিয়ে আসছিল। তখন মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদানের স্থানগুলোতে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা শুরু হল। এই সময় শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হয় তা ছিল প্রকৃতপক্ষে অতীতের দরসে নিযামীর পরিবর্তিতরূপ, আর ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্যসূচীই আজ পর্যন্ত চালু হয়ে রয়েছে। এই পাঠ্যসূচীতে যে সব গ্রন্থ ও বই পুস্তক অন্তর্ভুক্ত তা নিম্নরূপঃ

- সরফ শাস্ত্রে মীযান ও মুনশা'য়িব, পাঞ্জেগঞ্জ, যুবদাহ্, দস্তূরুল মুবতাদী, সরফে মীর। পরবর্তীকালে ইলমুস সীগা, ফুসূলে আকবরী, শাফিয়া ইত্যাদি।
- নাহু শাস্ত্রে নাহুমীর, মি'আতু'আমিল, শরীহ মি'আতি'আমিল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, শরহি জামী ইত্যাদি।
- বালাগাত শাস্ত্রে মুখতাসারুল মা'আনী (পূর্ণ), মুতাওয়্যাল (মা'আনাকুলতু পর্যন্ত) ইত্যাদি।
- আরবী সাহিত্য নাফতাহুল ইয়ামান, সাব'উ মু'আল্লাকাত, দীওয়ানু মুতানাব্বী, মাকামাতু হারীরী, হামাসাহ্ ইত্যাদি।
- ফিক্বহ্ শাস্ত্রে শরহি বিকায়া (আওয়্যালায়ন) ও হিদায়া (আখিরাইন)।
- উসুলুল ফিক্বহ্ শাস্ত্রে নুরুল আনওয়ার, তাওযীহ্, তালভীহ্, মুসাল্লামুস সুবূত ইত্যাদি। মুসাল্লামুস সুবূতকে যদিও উসূলে ফিক্বহের মধ্যে ধরা হয়েছে, কিন্তু তার পাঠ্যাংশে কালাম শাস্ত্রের বিশেষ অংশ রয়েছে, এ কারণে এটাকে কালাম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত।

- মানতিক শাস্ত্রে সুগরা, কুবরা, ইসাগুজী, কালা-আকূলু, মীযান, মানতিক, তাহ্যীব, শইহ তাহযীব, কুতবী, মীর কুতবী, মোল্লা হাসান, ক্বাযী মুবারক, মীর যাহিদ রিসালা, হাশিয়ায়ে গোলাম ইয়াহ্ইয়া বরমীর যাহিদ, মোল্লা জালাল। কোথাও কোথাও পাঠ্য ছিল বাহরুল 'উলূম, শইহ সুল্লুম হাশিয়ায়ে 'আবদুল 'আলী বরমীর যাহিদ রিসালা, শরহি মুসাল্লাম, মোল্লা মুবীন।
- হিকমত শাস্ত্রে মাইবুযী, সদরা, শামসে বাযিগা।
- কালাম শাস্ত্রে শরহি 'আক্বা'ইদে নাসাফী, খেয়ালী, মীর যাহিদ, উমূরে 'আম্মাহ্।
- হিসাব বিজ্ঞানে তাহ্রীরে আকলীদাস (প্রথম মাকালা), খুলাসাতুল হিসাব, বাসরীহ্, শরহি তাশরীহ্, শরহি চগমনী।
- ফারায়িয[২৭৯] শাস্ত্রে শরীফিয়া।
- মুনাযারাহ্ বা বিতর্ক শাস্ত্রে রশীদিয়া।
- তাফসীর শাস্ত্রে জালালাইন, বায়যাভী (সূরা বাকারাহ)।
- উসূলে হাদীস শাস্ত্রে- শরহে নুখবাতিল ফিক্র।
- হাদীস শাস্ত্রে বুখারী, মুসলিম, মু'য়াত্তা তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্।

পাঠ্যসূচীতে মানতিকের যতগুলো গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত ছিল সবই সাধারণতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হত। আর 'আরবী সাহিত্য ও হাদীসের যতগুলো কিতাব পাঠ্যসূচীতে ছিল তা সব প্রতিষ্ঠানে ঠিকমত পড়ানো হত না।

এমতাবস্থায় কারো যদি 'আরবী সাহিত্য পড়ার আগ্রহ হত তবে সে অন্য সময় 'আরবী সাহিত্যের সুপণ্ডিত পেলে উক্ত কিতাবগুলো পড়ে নিতেন। এসব কিতাব সাধারণতঃ মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা লাভে সহায়তা করত। হাদীস শিক্ষকের অভাবে পাঠ্যপুস্তক ও কিতাবগুলো পড়া শেষ করার পর অবসর হয়ে যেখানে হাদীসের উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যেত পড়ার জন্য সে সব স্থানে সফর করে ছাত্ররা উপস্থিত হত।

'আরবী শিক্ষার মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচীতে সাধারণতঃ যেসব গ্রন্থ চালু ছিল এর মধ্যে হাদীস ও 'আরবী সাহিত্যের গ্রন্থগুলোকে সিলেবাস বহির্ভুত মনে করা হত।

### গ্রন্থের শ্রেণী-বিন্যাস এবং শিক্ষার রীতি-পদ্ধতি

তখনকার শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। তবে শাহ্ অলি উল্লাহ্ (র.)এর "ওসিয়তনামায়'ফার্সী" পুস্তিকায় শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি এ পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ উল্লেখ করেছেন।

### ক্লাস ও শ্রেণী-বিন্যাস (পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র স্তর)

বর্তমানের ন্যায় প্রাচীন যুগে পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র শ্রেণী বিন্যাসের বিশেষ কোন নিয়ম ছিল না। অবশ্য পরবর্তী যুগে দেখা যায় যে, পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলো মুখতাসারাত, মুতাওয়াস্যাতাত্ এবং মুতাওয়্যালাত এই তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১. মুখতাসারাত- মীযান থেকে কুতবী পর্যন্ত গ্রন্থাবলী।

২৭৯. 'ফারায়িয' ফরীযাহ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা শরী'আতের পরিভাষায় ফারা'য়িয শব্দে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে উত্তরাধিকারীগণের জন্য নির্দিষ্ট অংশ সমূহ বুঝায়। পবিত্র কুর'আনে উত্তরাধিকারী আইন বিষয়ক আয়াতগুলো (৪: ১১, ১২, ১৭৬)

২. মুতাওয়াস্যাতাত্- সুল্লুম থেকে যাওয়ায়েদে

৩. মুতাওয়্যালাত- সদরা শামসে বাযিগা এবং বায়যাভী।

এইসব কিতাব ছিল ছাত্রদের বিশেষ শ্রেণী বিন্যাসের মাপকাঠি। নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া বা পদোন্নতির নিয়ম স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য গ্রন্থ পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থী আপনা আপনিই উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হত এবং উক্ত পর্যায়ের পাঠ্য গ্রন্থে অংশ গ্রহণের উপযুক্ত বলে গণ্য হত।

**শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রসমূহ**

পূর্ব যুগে উপমহাদেশের বিশেষ বিশেষ জায়গা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। যে কেন্দ্র জ্ঞানের যে শাখার জন্য বিখ্যাত ছিল সে কেন্দ্র ছাড়া এ বিষয়ে আর কোথাও অধিকতর উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব ছিল না। সে কালে শিক্ষার্থীরা ভ্রমণ করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নানান বিষয়ে জ্ঞান লাভ করত। যে স্থান যে বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল শিক্ষার্থীরা পারদর্শী হওয়ার জন্য সে স্থানে গিয়ে তা হাসিল করত।

**ফার্সী ভাষা ও বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা**

মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ইবতিদা'য়ী মাদ্‌রাসার শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফার্সী। কারণ দেশের শাসকবৃন্দের মূল ভাষা ছিল ফার্সী। এ কারণে তাদের শাসনামলে ফার্সী হয়ে গেল প্রাথমিক শিক্ষা, অফিস-আদালত ও কাজ-কারবারের ভাষা। এর প্রভাবে আজও বিদ্যমান উপ-মহাদেশের মক্তব-মাদ্‌রাসা, ইংলিশ স্কুলগুলো এবং কলেজসমূহে ফার্সী ভাষায় শিক্ষার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আজ থেকে প্রায় শত বছর পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ পত্রালাপ, ফতোয়া (فتاوى) লেখায় এবং পারিবারিক লেখাপড়ায় এই উপমহাদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু-মুসলমান সবাই ফার্সী ভাষা ব্যবহার করতেন।

কিন্তু এ স্থলে উপ-মহাদেশে ফার্সী ভাষা এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার ফলাফল কি ছিল তাও জানা প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেক জিনিসের সফলতা ও বিফলতার সঠিক মাপকাঠি হল তার পরিণাম ও ফলাফল। ফার্সী সাহিত্যের গদ্য-পদ্য উভয় ভাগে যত প্রসিদ্ধ মুসলিম পণ্ডিত সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের মধ্যে এমন বিশিষ্ট কয়েকজন সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি, যাদের পাণ্ডিত্য এই ভাষার শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতরা শুধু যে স্বীকার করেছেন তা নয়, বরং তাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করাকে এবং তাঁদের অনুসরণকে গর্বের বিষয় মনে করতেন। মাসউদ, সা'আদ সালমান, আমীর খসরু, হাসান দেহ্‌লভী, ফয়যী এবং গালিবের ন্যায় মনীষী ও মহাপণ্ডিত এ উপ মহাদেশের গর্বের বিষয়। তাঁদের কবিতা জোশ, বয়ান, ফখর, 'ইশ্‌ক, দার্শনিক বক্তব্য ও মযমূন সমূহ এবং আরও বিভিন্ন প্রকার প্রকাশভঙ্গি অতুলনীয় হয়ে আছে। ফার্সী গদ্য লক্ষ্য করলে প্রথমে আমীর খসরুর 'ই'জাযে খসরুর বিষয় উল্লেখ করতে হয়। এই মূল্যবান গ্রন্থে শিক্ষার্থীদের জন্য গদ্য চর্চা এবং গদ্য লেখার নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি এই প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একটা প্রাচীন গ্রন্থ। এতে প্রাচীনত্বের চিহ্ন স্পষ্টভাবে বিরাজমান। এতে সানা'ই এবং বাদা'ই। এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তার সাথে উল্লেখ করা যায় আবুল ফযলের 'আইনে আকবরী বিষয়ে। আবুল ফযলের ইনশা' বা রচনা, যদিও প্রাচীন নিয়ম থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির তবুও কালোপযোগী; উন্নতভাবে শব্দ প্রয়োগ এবং অন্য দিকে তার গুণ ও মান অনেক উন্নত, যা ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য উত্তম আদর্শ। আবুল ফযলের ভাই আবুল ফয়েয ফয়যীর 'ইনশায়ে ফয়যী' গ্রন্থে রয়েছে সহজ-সরল লেখার নমুনা। এ গ্রন্থে চিঠিপত্রের সংকলন ছিল। তাতে শিক্ষার্থীদের জন্য চিঠিপত্রের মাধ্যমে কোন

ঘটনার বর্ণনার স্থলে উন্নত রচনা লেখা রীতি-পদ্ধতি শিখানোর দিকটা ছিল প্রবল। ফয়যী তাতে শিক্ষার্থীদের জন্য লেখার উন্নতি বিধান, সংশোধনের স্পষ্টতা, সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি, প্রতিবেদন, নিজেদের তাহযীব-তামাদ্দুন, সমাজ-জীবন, শিষ্টাচারিতা, সভ্যতা ইত্যাদি সুন্দর ও সরলভাবে তুলে ধরা ও সবকিছুর উত্তম তা'লীম দেয়া হয়েছে। তারপর একই বিষয়ে নজীরবিহীন গ্রন্থ তুযুকে জাহাঙ্গিরীও উল্লেখযোগ্য। এর সমতুল্য রুক'আতে আলমগীরী মূল্যবান সরল-সহজ ও শিক্ষণীয় গ্রন্থ। এইসব ছাড়াও ফার্সীতে অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে, যেগুলোতে কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গ্রন্থের বিশেষত্বও দেখা যায়।

### ইতিহাস গ্রন্থ

লুববুত তাওয়ারীখ, তারিখে শাহানে হিন্দ, রাজা দিল্লী, হালাতে মারাঠা, খুলাসাতুল হিন্দ, ফুতূহাতে আমলগীরী, তারিখে দিলশা, তারিখে কাশমীর, তারিখে আসফী, গাওয়া লিওরনামা, তারিখে সূরাত, খুলাসাতু তাওয়ারীখ, তারিখে ফরমান রাওয়ানে হনূদ তুহফাতু হিন্দ, নায্যারাতুস্ সিনদ, ওয়ারেদাতে কাসেমী, মাখযানুল 'ইরফান, সুলতানুত্ চাহার গুলশান, কিসতাস ইত্যাদি ফার্সী ভাষায় হিন্দু লেখকদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী। শেষের গ্রন্থগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারিত ইতিহাস, যা চার ভাগে বিভক্ত ছিল প্রথমভাগে হিন্দু দর্শন, দ্বিতীয় ভাগে ইউনানী দর্শন, তৃতীয় ভাগে 'আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, চতুর্থ ভাগে ইউরোপের নতুন বিজ্ঞান। আশ্চর্যের বিষয় যে, 'আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তা দেখলে অবাক হতে হয় যে, এ বিষয়ে তাঁরা এত ব্যাপক এবং বিস্তারিতভাবে লিখতে কিভাবে সফলকাম হয়েছেন।

### ফার্সী অভিধান

গুরুধাবীর লেখা- গাঞ্জেলুগাত, পণ্ডিত গঙ্গা বিশনের- মীর-আশক্কর, সিয়াল কোটীমেল ওয়ারিস্তার- মুসতলাহাতুশ শু'আরা, টেক চান্দ বাহারের-বাহারে আ'যম ইত্যাদি।

উপমহাদেশের হিন্দু লেখক, কবি, সাহিত্যিক সবার পূর্ণ বা বিস্তারিত আলোচনা অনেক দীর্ঘ। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় যে, হিন্দুদের ফার্সী ভাষার জ্ঞান মুসলমান লেখক ও কবি সাহিত্যিকদের তুলনায় একেবারে কম বা নিম্নমানের ছিল না। যে হিন্দুদের পূর্বপুরুষরা দু'একশ বছর পূর্বে এই ফার্সী ভাষাত দূরের কথা এর অক্ষর এবং শব্দের সঠিক উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারত না। হিজরী দশম শতকের শুরু থেকে সেই হিন্দু সম্প্রদায় ফার্সী শিখতে আরম্ভ করে। এই ধারা ত্রয়োদশ শতকের শুরু বা মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই সুফল কি করে সম্ভব হল? এত অল্প সময়ে কি করে ফার্সী ভাষা এবং এর বিভিন্ন বিষয় বিস্তার লাভ করল? হিন্দুরা কি করে দ্রুত এ ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করল? এ সব প্রশ্নের সঠিক জবাব শুধু এই যে, কোন ভাষাকে আয়ত্ত করার সবচেয়ে উত্তম প্রন্থা হলো ঐ ভাষা যাদের মাতৃভাষা সে ভাষাভাষীদের সঙ্গ লাভ করা এবং তাদের সাথে সেই ভাষায় কথাবার্তা বলা। আজকাল অপরাপর ভাষা ভালোভাবে শিখার এটাই সহজ এবং উত্তম প্রন্থা।[২৮০] বস্তুতঃ ঐ সময় হিন্দুরা অনুরূপ সুযোগ পায়। মুসলমানদের সাথে মেলামেশা, বসবাস, চলাফেরা, উঠাবসা এত স্বাভাবিক, উদার এবং পক্ষপাতশূন্য ছিল যে, হিন্দুরা সাধারণভাবে মুসলমান আমীর-'উমারা ও

২৮০. উল্লেখ্য প্যারিসের Medical Science-এর great Scientist Dr. Mauris Bukaily পবিত্র কুরআনকে মূল 'আরবী থেকে বুঝার জন্য পুরো চার বছর 'আরবদের সাথে মিশে চলত (colloquial) 'আরবী ভাষায় প্রচলিত জ্ঞান অর্জন করে তাঁর ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Bible, Qur'an and Science" লিখেছেন।

শাসকমণ্ডলীর মজলিসে সমান অধিকারের ভিত্তিতে বসতে ও শরীক হতে পারত। অন্যদের তো প্রশ্নই নেই; স্বয়ং আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, দারাশিকোহ্ এসব বাদশাহ্দের দরবারে নিশ্চিতভাবে হাকিমের মর্যাদায় স্থান পেত। মুসলমান ও হিন্দুদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যকলাপের যে সব বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মেলামেশার উপক্রম হত সেসব বিষয়ে খুব সহজ ও সাধারণভাবে নির্দ্বিধায় সবাইকে আপন লোকের মত আচরণ করতে দেখা যেত। এই মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান, চালচলন, কথাবার্তা ও অন্তর বিনিময় ছিল একমাত্র কারণ, যা এ উপমহাদেশে ফার্সী ভাষাকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নিকট এত ব্যাপক করেছে। সবার চঞ্চল অধর এই ইরানী শরবতে ভিজে যায়। এসব সুযোগ-সুবিধা শুধু ভাষা শিখার জন্য বেশ সহায়ক ছিল। কিন্তু যখন ফার্সী ভাষায় শিক্ষাদান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ হলো তখন পাঠ্যসূচীও তৈরী হল। সে মোতাবেক তা শিক্ষা দেয়া হত।

## ২.৫.৬ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা (১২০৩-২০১৭ খ্রি.)

ইসলাম পূর্বকাল হতেই ভারত-বাংলার সাথে আরবদের বাণিজ্য যোগাযোগ ছিল। ফলে খুলাফা-ই রাশিদীন[২৮১] এবং উমাইয়া শাসনামলে ভারত ও সিন্ধু উপকূলে ইসলামের আগমণ ঘটে। ৯৩ হি. সনে (৭১২ খ্রি.) মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম সিন্ধু জয় করেন। অঞ্চলটি ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত হয়। মুজাহিদদের একটি দল সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।[২৮২] এদের মধ্যে বহু তাবি'ঈ ও তাব'উ তাবি'ঈন ছিলেন। তারা এখানে কুরআনের শিক্ষা বিস্তারে নিজেদের নিয়েজিত করেন। তাই দেখা যায়, ইসলামের প্রথম তিন দশকের মধ্যেই ভারতে ইলমে হাদীসের আলো প্রতিফলিত হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈনিক ছাড়াও এসময় বহু সংখ্যক আরবীয় মুসলিম অধিবাসী ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে সিন্ধু এলাকায় আগমন করে। ফলে সহজেই সিন্ধু এলাকায় কুর'আন-হাদীস চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠে।[২৮৩] এভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্ষুদ্র দেশগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের শিথিলতার সুযোগে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে।[২৮৪]

দীর্ঘদিন পর ৯৯৭ খ্রি. সনের ৪১২ হিজরীতে সুলতান মাহমূদ গযনভী লাহোর দখল করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে পুরো ভারত দখল করতে আরও ৩০০ বছর লেগে যায়। কিন্তু মুসলমানদের রাজ্য জয়ের জন্য ইসলামের দা'ওয়াত থেমে থাকেনি। সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবি' তাবি'ঈগণের পর

---

২৮১. নবী কারীম (সা)'র জীবদ্দশার পর তাঁরই আদর্শের উপর খিলাফতকাল থাকবে ত্রিশ বছর। তিনি ইরশাদ করেন, 'আমার খিলাফত ব্যবস্থা থাকবে ত্রিশ বছর।' প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর ৪ জন বিশিষ্ট সাহাবী পর্যায়ক্রমে কুরআন-সুন্নাহ্ অনুসারে নিষ্ঠার সাথে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচলনা করেন। তাঁদের পরিচয় ও কার্যকাল নিম্নরূপ: ১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতকাল: দু'বছর তিন মাস নয় দিন। (১৩ রবিউল আউয়াল ২২ হি.-২২ জামাদিউস্-সানী ১৩ হি.) ২. হযরত 'উমার ফারূক (রা) খিলাফতকাল : এগার বছর এগার মাস আটাইশ দিন। (১ মুহররম ২৪ হি.-২৮ যিল-হজ্ব ৩৫ হি.) ৩. হযরত ওসমান গণি (রা.) খিলাফতকাল: ৬৪৪ থেকে ৬৫৬ খ্রি. পর্যন্ত ও ৪. হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) খিলাফতকাল চার বছর আট মাস তেইশ দিন। ৫. ইমাম হাসান (রা.)-এর খিলাফতকাল ২২ রমদ্বান ৪০ হি. ৯ রবিউল আউয়াল ৪১ হি.

২৮২. আব্দুল খালেক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৪

২৮৩. মুফতি আমীমুল ইহসান, *হাদীস শাস্ত্রের ইতিকথা* (ঢাকা : ইসলামী একাডেমি ১৪১১ হি.), পৃ. ১২৯

২৮৪. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

আয়িম্মায়ে মুজতাহিদ বা দীন ও পীর-ফকীররা ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে অমুসলিম পাক-ভারত বাংলায় আল্লাহ্‌র দীন (ইসলাম শিক্ষা) প্রচার করেন।

ভারতের মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পর অন্যান্য মুসলিম দেশের মত এখানকার মসজিদগুলোও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের শিক্ষার ভিত্তি হল তাদের ধর্ম। এ ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রে সরকারের তেমন ব্যয়ভার বহন করতে হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব মাদ্‌রাসা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ও উইলের টাকায় পরিচালিত হতো। ধর্মপরায়ন লোকেরা পরকালীন পূণ্য অর্জনের জন্য এসব শিক্ষা কেন্দ্রিক মাদ্‌রাসার এ অবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত ছিলো। মুসলমানদের জন্য গ্রামের আনাচে কানাচে মক্তব ধরণের প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। এসব মক্তবে গ্রাম্য কৃষক ও অন্যান্য কৃষিজীবী লোকদের ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করে। মুসলমানদের দ্বিতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাটিই ছিল তখনকার দিনের প্রচলিত মাদ্‌রাসা। এসব শিক্ষাকেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেন দেশের আমীর-উমারা এবং নবাব-বাদশাহরা। তারা এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ-সম্পদ দান করতেন। মাদ্‌রাসাকে বেঁচিয়ে রাখায় চেষ্টা করতেন।[২৮৫]

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে শাসকদের উদ্যোগে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কতিপয় মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বখতিয়ার খিলজির মাদ্‌রাসা : একমাত্র মুসলিম জেনারেল মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজিই সর্ব প্রথম বাংলাদেশ জয় করেন। তার বিজিত এলাকা নদীয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাংলাদেশ অধিকার করার পর তিনি নদীয়ার (রাজধানী) পরিবর্তে রংপুর নামে একটি শহরের পত্তন করেন। তিনি বহু মসজিদ মাদ্‌রাসা এবং খানকাহ্‌ স্থাপন করেন। সুলতান গিয়াস উদ্দীন ১২১২ খ্রি. হতে ১২১৭ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার অব্যবহতি পরেই তিনি একটি সুরম্য মসজিদ, একটি মাদ্‌রাসা এবং প্রবাসীদের জন্য লক্ষণাবতীতে একটি সরাইখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে এসব স্থাপত্যের মধ্যে শুধু মাদ্‌রাসা ভবনটির ভগ্নাংশ পাওয়া যায়।[২৮৬]

হোসেন শাহ এবং তার পুত্র নসরত শাহের সাথে বাংলার হোসাইনী বংশের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তারা অনেক মাদ্‌রাসা এবং খানকাহ্‌ স্থাপন করেন। এ মাদ্‌রাসা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ শিক্ষায়তন ছিল। চত্বর ও দেওয়ালে রকমারি পাথর দেখে একথা প্রমাণিত হয় যে, গৌড়ের অন্যান্য প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদ। এ ভবনের দেওয়ালের শিলালিপিতে হোসেন শাহের নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এ খ্যাতিমান মাদ্‌রাসা সুলতান হোসেন শাহ্‌ আল-সালিকুল হোসাইনী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আদেশক্রমে ১৪৯৩ খ্রি. (৯০৭ হি.) ১ রমজান স্থাপন করেন।[২৮৭]

আমিরুল উমরা শায়িস্তাখান ১৬৬৪ খ্রি. হতে ১৬৮০ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকার সুবেদার ছিলেন। এ সময় তিনি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে একটি মাদ্‌রাসা এবং মসজিদের পত্তন করেন। কিছু কাল অব্যবহৃত থাকার পর মাদ্‌রাসা ভবনে হাসপাতাল চালু করা হয়। বর্তমানে নদীর তীরে একটি ভগ্নঘাট ও

২৮৫. আবদুস সাত্তার, '*আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২২
২৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
২৮৭. প্রাগুক্ত

একটি মসজিদ এটার নিদের্শন বহন করছে।[২৮৮] ঢাকার হাকিম হাবিবুর রহমান তার এক নিবন্ধে বলেন যে, ঢাকার উপকণ্ঠের বিশিষ্ট ব্যক্তি শাহ্ নূরী (র) তার "কিবরিয়াতে আহমর" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তিনি রোজ চার মাইল পথ অতিক্রম করে মগবাজার হতে শায়িস্তা খানের মাদ্‌রাসায় পড়তে আসতেন। এ মাদ্‌রাসা মূলত আত্মশুদ্ধির জ্ঞান'র শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে এ আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি ইল্‌মে যাহির শিক্ষা দেয়ার প্রচলন হয়।[২৮৯]

মুসলিম ভারতে মাদ্‌রাসাভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। মুসলিম রাজত্বকালে এশিয়ার মাদ্‌রাসাসমূহ সমাজে প্রত্যাশিত মানে পরিচালিত হতে পারছে না। গৌরবময় মুসলিম শাসনামলে মাদ্‌রাসার সিলেবাস এবং পাঠ্যক্রমের দু'টি ভাগ ছিল। একটি আল-'উলূমুন নাক্‌লিয়া এবং অপরটি আল-'উলূমুল আকালিয়া।[২৯০]

কুরআন-হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞান হল নকল বা নাকলিয়া সংক্রান্ত জ্ঞান। প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায আদায় করেছেন তা অনুসরণ করতে হবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামএর যে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে সে বিষয়ে যুক্তির কোন প্রশ্নই উঠেনা।[২৯১]

ভারতের তাজমহলের নির্মাতা ঈসা আফিন্দী, দার্শনিক আবু হামিদ গাযালী (র.), সমাজতত্ত্ববিদ ইব্‌ন খালদুন, চিকিৎসক ইব্‌ন সীনা, গাযী সালাউদ্দিন আইউবী, গাযী নুরুদ্দীন জঙ্গী এ মাদ্‌রাসারই ছাত্র ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর চৌহদ্দির থেকে তারা জাগতিক উন্নয়নমূলক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতেন এবং আমল ও বিবেক খাটিয়ে অভিনব সূত্র আবিষ্কার করতেন। আল-উলূমুল আক্‌লিয়া মাদ্‌রাসা থেকে বিচ্যুত হয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান করে নিয়েছে।

হিজরী দশম শতকে ইসলামী শিক্ষার দ্বিতীয় যুগ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর যাবৎ চলতে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে সরফ, নাহ্‌ভ, বালাগাত, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, মানতিক, কালাম, তাসাউফ, তাফসীর, হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা সম্মানের কাজ বলে মনে করা হতো।

ফিক্‌হ্‌শাস্ত্রে পড়ানো হত হিদায়া, শরহে বেকায়া ইত্যাদি। উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে পড়ানো হত আল-মানার এবং উসূলে বায়যাভী এর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ। তাফসীর শাস্ত্রে-বায়যাভী এবং কাশশাফ। তাসাওউফ শাস্ত্রে-'আওয়ারিফ, ফুসুসুল হিকাম। এর এক যুগ পরে খানকাহ্‌সমূহের পাঠ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে নকদুননুসুস এবং লূম'আত। অন্যান্য মাদরাসাতে পাড়নো হত হাদীস শাস্ত্রের-মাশারিকুল আনওয়ার, মাসাবীহুস সুন্নাহ্ অর্থাৎ মিশকাতুল মাসাবীহ-এর মতন। 'আরবী সাহিত্যে-মাকামাতে হারীরী। হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়ার বর্ণনা হতে জানা যায়, তিনি মালিক উসতায শামসুদ্দীন খাওয়ারিযমীর নিকট মাকামাতে হারীরী পড়েন এবং ৪০ মাকামা কণ্ঠস্থ করেছিলেন। মানতিক শাস্ত্রে-শরহি শামসিয়া ইত্যাদি। কালাম বা তর্ক শাস্ত্রে শরহি মাওয়াকিফ কোন কোন ক্ষেত্রে আবূশ শুকূর সালিমীর তামহীদ নামক গ্রন্থও পড়ানো হত।

---

২৮৮. প্রাগুক্ত,

২৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৬

২৯০. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *মাদ্‌রাসা শিক্ষা* (চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ, কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ২য় সংস্ক., ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১

২৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১

এ যুগে মানতিক এবং ফালসাফায় যেমন গুরুত্ব তেমনি ঐ যুগে ফিক্বহ্ এবং উসূলে ফিক্বহ্ ছিল সম্মানের মাপকাঠি। হাদীসের ক্ষেত্রে শুধু "মাশারিকুল আনওয়ার" গ্রন্থ পাঠ করাই সে যুগে যথেষ্ট মনে করা হত। যদি কোন সৌভাগ্যবান মাসাবীহ পড়ার সুযোগ লাভ করত, তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে বিশ্বের জোড়া নামকরা ইমাম উপাধির যোগ্য মনে করা হত।

সে সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিশেষত্ব ছিল তাতে উপমহাদেশের বিজয়ী শাসকদের ভাবধারা, চিন্তা ও রুচির ফলাফল ছিল। উপমহাদেশে যাঁরা মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন তাঁরা গজনী এবং গৌড় থেকে এসেছিলেন। ঐসব অঞ্চল এমন জায়গা ছিল যেখানে ফিকহ এবং উসূলে ফিক্হ এসব বিষয়ে জ্ঞানাহরণ করে পারদর্শিতা লাভ করা ছিল মহা সম্মান ও গুণের মাপকাঠি। এ কারণে ফিক্হ শাস্ত্রে শিক্ষাদান এবং তা চর্চায় খুব গুরুত্ব দেয়া হত। হাদীস চর্চার প্রতি কোন বিশেষ নজর দেয়া হত না।

বঙ্গীয় মুসলিম শাসকদের সবাই কম বেশী বিদ্যানুরাগী, বিদ্যুৎসাহী এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার পাশাপাশি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তারা স্ব-স্ব যুগে এ শিক্ষার উন্নতির জন্যে বহু মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাই নয় এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থাও করেন এবং শিক্ষকদের ভাতা রাজকোষ থেকে প্রদান করেন। ফলে বঙ্গে বহু আরবী ইসলামী শিক্ষা চর্চা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

৭১২ খ্রি. আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় এবং সেখানে বসতি স্থাপনের ফলে স্বভাবতই প্রাচ্য ও ভারতের সঙ্গে আরব বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হয়, খ্রীষ্টিয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল আরবীয় বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং এ ধর্ম এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয় তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার অনেক পীর-দরবেশ ও সূফী ইসলাম ধর্ম প্রচারে স্বদেশ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।

পূণ্যাত্মা সূফীর আগমন কাল জনশ্রুতিতে ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গ বিজয়ের পরে যেসব সূফীর আগমন ঘটেছে তাদের অনেকেরই আগমণ সম্পর্কে যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে যে সব সূফী আগমন করে ইসলামের ঝাণ্ডাকে উচ্চকিত করেন তারা হলেন- সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.) (চট্টগ্রাম, ৮৭৫ খ্রি.), সৈয়দ সুলতান মাহী সাওয়ার, প্রথমে ঢাকা জেলার হরিরাম নগরে এবং পরে বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে ইসলাম প্রচার করেন।[২৯২] তিনি ১০৪৭ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। শাহ মুহাম্মদ রুমী ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার মদনপুরে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি ১০৫৩ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। বাবা আদম শহীদ প্রথমে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরে বগুড়ায় দ্বীনের প্রচারকার্য চালান।[২৯৩] ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। খায়রুল বাশার দ্বাদশ শতকের শেষভাগে তথকালীন কুষ্টিয়া জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোলদাড়ী গ্রামে এসে

২৯২. মো: শহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
২৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

দ্বীন প্রচার করেন।[২৯৪] বঙ্গ বিজয় উত্তর আগত সূফীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- শাহ্ মাখদুম শেখ জালাল উদ্দিন তাববীজী। তিনি উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন এবং ১২২৫ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[২৯৫] মাখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ ইয়ামন থেকে পাবনার শাহাদাত পুরের পৌতাজিয়ায় পৌছান। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু রাজার আক্রমনে তিনি ও তার কয়েকজন অনুচর শাহাদাত বরণ করেন।[২৯৬]

মাওলানা তকিউদ্দীন আল-আরাবী ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নওগাঁ জেলার ধামইহাট উপজেলাধীন মাহীসুন সংলঙ্গে এসে ইলমে দ্বীন প্রচার করেন। তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাহীসুনে তার মাজার রয়েছে। শেখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জ-ই-শকর তের শতকের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসেন।[২৯৭]

ফরিদপুর অঞ্চলেও তিনি ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেন। শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে বুখারা থেতে দিল্লীতে এবং ১২৭০ খ্রি: মতান্তরে ১২৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনার গাঁয়ে আসেন। তিনি সেখানে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করে দ্বীন প্রচার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বুখারী ও মুসলিম শিক্ষাদান শুরু করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে হাদীস চর্চার প্রসার ঘটাতে থাকেন। এ জন্য তাকে বাংলায় ইসলামী শিক্ষার পথিকৃত বলা হয়। তিনি ঢাকা জেলার প্রথম ফারসী বই লেখক। তিনি ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

শেখ মানেরী ১৫ বছর বয়সে ১২৭০-১২৭৫ খ্রিষ্টাব্দে শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার ছাত্র হিসেবে সোনারগাঁয়ে আসেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ইন্তিকাল করেন।

'কলিকাতা আলিয়া' মাদ্‌রাসার নিসাবকে মডেল করে বাংলাদেশে 'আলিয়া মাদ্‌রাসার পত্তন হয়। প্রাসঙ্গিক প্রয়োজন অনুভব করে দেশের বিজ্ঞ জ্ঞানতাপসরা এ হিসাবকে আরো পরিমার্জিত করেছেন। যে কারিকুলাম ও নেসাব ছাত্র-ছাত্রীদের ইহকালীন ও পরকালীন জগতে উপকৃত করবে সেটিই অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১৯৭৮খ্রি. বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত কামিল মাদ্‌রাসা ছিল ৪৮ টি, ফাযিল মাদ্‌রাসা ৩৯৯ টি, আলিম মাদ্‌রাসা ৪৩৪ টি এবং দাখিল মাদ্‌রাসা ৭৪১টি, সর্বসাকুল্যে ১৬২২টি ছিল। এতে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৭৬২৪ জন এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ। মাদ্‌রাসা শিক্ষিতের সংখ্যা ধরা হয় আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ।[২৯৮]

## আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস

১২ আগস্ট ১৭৬৫ খ্রি. দিল্লীর বাদশাহ শাহ্ আলম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলার দেওয়ানী (রাজস্ব আদায়কারী) নিয়োগ করলেও মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তাৎক্ষণিক পরিবর্তন ঘটেনি। মোঘল সাম্রাজ্য পতনের পর থেকে মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজ্য ও সম্মানহারা মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার বেসরকারী উদ্যোগ ক্রমান্বয়ে থেকে যেতে থাকে। অবস্থার অবনতি দেখে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, এক সময় রাজকার্য নির্বাহের যোগ্যতাসম্পন্ন

---

২৯৪. শ.ম. শওকত আলী, *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম প্রচার* (ই.ফা.বা.ডিসেম্বর-১৯৯৫) পৃ. ৪০
২৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
২৯৬. এ এ রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২) খ. ২, পৃ.৫৭
২৯৭. মো: শহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
২৯৮. এ. জেড.এম. শামসুল আলম, *মাদ্‌রাসা শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬

লোকের অভাব হয়ে পড়বে।[২৯৯] প্রথম অবস্থায় ভারত-বাংলার জনসাধরণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত না করে শুধু নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির চিন্তা-চেতনা থাকলেও সময়ের চাহিদা তাদের সেই ধারণা পাল্টে দেয়। ফলে তৎকালীন বড়লাট বিচক্ষণ ইংরেজ গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস দেশের প্রশাসনিক এবং সার্বিক ব্যবস্থার প্রয়োজনের বিবেচনায় ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারতে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ এপ্রিল প্রদত্ত একটি বিবরণী বিষয় থেকে বিস্তারিত জানা যায়। তিনি বলেন-

> "১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতঃ আমাকে অনুরোধ করে যে, প্রেসিডেন্সীতে মোল্লা মাজদুদ্দীন নামের জনৈক ব্যক্তিকে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে রাখার ব্যাপারে আমি যেন সচেষ্ট হই। যাতে এখানকার মুসলমান ছাত্ররা প্রচলিত ইসলামি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে। এ প্রতিনিধি দল আমাকে অবহিত করে যে, এ ব্যক্তি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন। এ ধরনের গুণী লোক সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ব্যক্তি বিশেষ যোগ্যতা রাখেন।

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ১৪৭ বছর পর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন শামসুল 'উলামা কামাল উদ্দিন আহমদ, যিনি এ মাদ্‌রাসার প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ। তৎপূর্বে প্রথম অধ্যক্ষ ড. এ স্প্রেঙ্গার হতে আলেকজান্ডার হেমিলটন পর্যন্ত ২৫ জন অধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজ।[৩০০]

১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্‌রাসা স্থাপিত হওয়ার পর ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১০ বছর কলকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা পাঠ্যতালিকায় দরসে নিযামিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল। অতঃপর মাদ্‌রাসা সিলেবাস হতে হাদীস, তাফসীর বাদ দেয়া হয়। আলিয়া মাদ্‌রাসায় ১১৮ বছর পর ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ কলিকাতা মাদ্‌রাসায় হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্র চালু করা হয় এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রীকে 'টাইটেল' নাম দেয়া হয়।[৩০১] মোল্লা মাজদুদ্দীন ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাথমিক অনুমতি পাওয়ার পরেই ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে শিয়ালদা রেল স্টেশনের নিকট ভাড়া বাড়িতে দরসে নিযামিয়া রীতি অনুযায়ী এ মাদ্‌রাসার ক্লাস শুরু করেন।[৩০২]

মোল্লা মাজদুদ্দীন প্রণীত কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষাক্রম ছিল নিম্নরূপ :

১। সরফ : মিযান মুনশা'ঈব, সরফ-ই মীর, পাঞ্জেগঞ্জ, যুবদা, ফসূলে আকবরী ও শাফিয়া।
২। নাহ্‌ভ : নাহুমীর, শরহে মিয়াতে 'আমিল, হেদায়াতুন্নাহু, কাফিয়া ও শরহে জামি।
৩। মানতিক : ছোগরা, কোব্‌রা, ইসাগুযি, শরহে তাহযীব, কিবতী মা'মীর ও সুল্লামুল 'উলূম।
৪। হিকমত : (বিজ্ঞান) মায়বুযী, শামছে বাজেগা।

---

২৯৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৩০০. এ জেড এম শামসুল আলম, *মাদ্‌রাসা শিক্ষা,* (চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. ২০০২ খ্রি.), পৃ. ০৪
৩০১. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলীয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস,* (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৪৩
৩০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০ ও ১২১; এ. জেড.এম শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪

৫। গণিত : খোলাসাতুল হিসাব, তাহরিকে আকলিদাস (মালাকায়ে উ'লা) তা'শরিহুল আখলাক, রেসালায়ে কুশজিয়া, শরহে চগমুনী।

৬। বালাগাত : মুখতাসারুল মা'আনী, (মোতাওয়্যাল)।

৭। ফিক্‌হ : শরহে বেকায়া, হেদায়া (আখিরাইন ও আউয়্যালাইন)

৮। উসূল-ই ফিক্‌হ : নূরুল আন্‌ওয়ার, তাওজিহ, তালবিহ, মুসাল্লামুচ্ছবূত।

৯। কালাম : শরহে আকায়েদ-ই নাসাফী, শরহে আকাঈদে জালালী, মীর জাহেদ ও শরহে মাওয়াকিফ।

১০। তাফসীর : জালালাইন ও বায়দ্বাবী।

১১। হাদীস : মিশকাতুল মাসাবীহ।[৩০৩]

মোল্লা মাজদুদ্দীনের কর্ম তৎপরতা ও আগ্রহ দেখে হেস্টিংস নিজ ক্ষমতা বলে বৌদ্ধপুকুর নামক স্থানে এক খণ্ড জমি ক্রয় করে একটি ভবন নির্মাণ করেন এবং মাদ্‌রাসা পূর্ণ মাত্রায় চালু করেন।[৩০৪] অতঃপর আলিয়া মাদ্‌রাসার সময়ের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব গভর্নর উক্ত কাজের অনুমতি ও ব্যয় অনুমোদনের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন।[৩০৫]

**আলিয়া মাদরাসার উন্নতি ও অগ্রগতি**

সভ্যতার আধুনিকায়নে এবং কালের বিবর্তনে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশের 'আলিয়া মাদ্‌রাসারও প্রভূত উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে। গড়ে ওঠে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অনেক 'আলিয়া মাদ্‌রাসা। ১৯৯৮ খ্রি. কামিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা হয়েছে ২১৭, ফাযিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা ১৪৩৭, আলিম ও দাখিল মাদ্‌রাসা ৪৭৯৫, সর্বমোট ৬৮৪৯। এছাড়া ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসার সংখ্যা ২৩০৬৬, সর্বসাকুল্যে ২৯,৯১৫।[৩০৬] মাদ্‌রাসা শিক্ষার সূচনা হতে ইসলামী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাস প্রণয়ন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া ও বেতন-ভাতা প্রভৃতি বিষয়ে অসঙ্গতি বিদ্যমান।[৩০৭] অন্যদিকে সরকারী পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যার ক্ষেত্রে সরকারী মাদ্‌রাসা খুবই অপ্রতুল। সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে সমগ্র বাংলাদেশে মাত্র তিনটি 'আলিয়া মাদ্‌রাসা রয়েছে। মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা,[৩০৮] সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট[৩০৯] ও মোস্তাফাবিয়া সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা, বগুড়া।[৩১০]

---

৩০৩. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *আলীয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস, প্রাগুক্ত*, (ঢাকা: ই. ফা.বা. ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৪৩

৩০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

৩০৫. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *'আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৩০৬. দৈনিক ইনকিবাল, ১৩/০৭/১৯৯৯ খ্রি.।

৩০৭. মুহাম্মদ আযম সম্পাদিত, *যিকরা*, ( চট্টগ্রাম : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া বিদায়ী স্বারক, ১৯৯৫), পৃ. ৪৩

৩০৮. ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে 'মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা' বাংলাদেশের প্রাচীনতম মাদ্‌রাসা। বৃটিশ রাজত্বকালে ১৭৮০ সনে কলিকাতায় এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ দেশের কতিপয় মুসলিম মনিষীদের বিশেষ উদ্যোগে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ১৭৮১ সনে কলকাতার বৌ বাজারে মাদ্‌রাসাটি কার্যক্রম শুরু হয়; তবে উক্ত এলাকাটি হিন্দু অধ্যুষিত হওয়ায় ১৮২৪ সনে ওয়ালেসলী ট্রীটে স্থানান্তর করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মাদ্‌রাসাটি ৩৮ বছর পর্যন্ত (১৭৮১ খ্রি.- ১৮১৯ খ্রি.) (ইংরেজ পরিচালক কর্তৃক এবং ১৮১৯ খ্রি. থেকে ১৮৫০ খ্রি.), পর্যন্ত ইংরেজ সেক্রেটারী এবং মুসলমান সহকারী সেক্রেটারী দ্বারা পরিচালিত হয়। পাক-ভারত বিভক্তির পর এ দীনি শিক্ষা নিকেতন ঢাকায় ১৯৪৭ সনে স্থানান্তরিত হয়, তখনকার

উল্লেখ্য, সরকার স্বীকৃতি আলিয়া মাদ্রাসা ছাড়াও বাংলাদেশে আছে কয়েক হাজার কওমী মাদ্রাসা (খারেজী মাদ্রাসা) যা তাদের নিজস্ব সিলেবাস ও পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে।"[৩১১]

---

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন খ্যাতমান আলিম-ই দ্বীন ও ইসলামি শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর মুহাম্মদ যিয়াউল হক। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মাদ্রাসা ও লাইব্রেরীর যাবতীয় আসবাবপত্র ১৯৪৯ সনে ঢাকার সদর ঘাটস্থ বর্তমান লক্ষ্মীবাজারের মুসলিম হাইস্কুলের ডাফলীন হলে এর কার্যক্রম শুরু করে। অতঃপর ১৯৫৬ সনে ঢাকার বখশী বাজার মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় জমি খরিদ করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 'আতাউর রহমান খান মাদ্রাসা ভবন ও ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। ১৯৬০ সনে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে মাদ্রাসার স্থায়ীভাবে বখশী বাজারে (বর্তমানে যে স্থানে অবস্থিত) স্থানান্তরিত হয়। মাদ্রাসার বর্তমানে ১টি বিজ্ঞান ভবন, মিলনায়তন, একাডেমিক ভবন, ছাত্র সংসদ কক্ষ, ছাত্রাবাস ভবন এবং ৩০ হাজার মূল্যমানের দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য কিতাবের বিশালাকারে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। তবে যথার্থ তত্ত্বাবধানের অভাবে ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। অতীব আড়ম্বরও মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসার ১৯৮০ সনে দু'শত তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। (ড. আ.ই.ম.নেছার উদ্দীন, ***ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,*** (ই.ফা.বা, ঢাকা, অক্টোবর, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২৪৫)

৩০৯. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত তিনটি আলিয়া মাদ্রাসার মধ্যে 'সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট' নিজ ঐতিহ্যে লালিত একটি দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এ মাদ্রাসা-ই আলিয়ার চেয়েও প্রাচীনতম। পাক-ভারত ১৯৪৭ সনে বিভক্তির পর মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। অথচ সরকারী মাদ্রাসা-ই আলিয়া সিলেট ১৯১৩ সনে সরকারী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১-১৯০২ সনে সিলেট শহরের নাইওরপুর এলাকায় ইসলামি শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি বেসরকারী সংগঠন কর্তৃক "আনজুমান-এ-ইসলামিয়া" নামে একটি প্রাথমিক স্তরের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এলাকার ধর্মানুরাগী মুসলমানদের ঐকান্তিকতায় অতি অল্প সময়ে লেখাপড়ায় অগ্রগতি সাধিত হয় এবং এর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী খানবাহাদুর আব্দুল মজীদসি.আই.ই প্রকাশ কাপ্তামিয়া এক সময় মাদ্রাসাটির পরিদর্শনে আসেন। প্রতিষ্ঠানটির গুণগত মান দেখে ভূয়ঁসী প্রশংসা করলেন এবং ১৯১৩ সন থেকে মাদ্রাসাটিকে সরকারী ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিলেট শহরের কেন্দ্রস্থলে চৌহাট্টা নামক স্থানে মাদ্রাসার জন্য ৭.১৭ একর জমি সংগ্রহ করা হয়। প্রথমদিকে মাদ্রাসাটিতে ইবতেদায়ী, জুনিয়র পর্যায়ক্রমে ১৯১৯ সনে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসার অনুসরণে ফাযিল শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হয়। ১৯৩৫ সনে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ আবু নসর মোহাম্মদ ওহীদ এ মাদ্রাসায় কামিল শ্রেণীর অনুমোদন দান করেন। তখন কামিল হাদীস বিভাগ খোলা হয়। ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে সিলেটের মাদ্রাসা-ই আলিয়া অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। দেশের খ্যাতিমান ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আব্দুস সামাদ আযাদ, বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ এম. সাইফুর রহমান, স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এ মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র। (ড. আ.ই.ম.নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত এবং গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন)

৩১০. 'সরকারী বগুড়া মুস্তফাবিয়া 'আলিয়া মাদ্রাসা : বগুড়ার কতিপয় জনহিতৈষী ও ধর্মানুরাগী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ১৯২৫ সনে ১ জুলাই এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার সময়ে বগুড়া অঞ্চলের এটিই একমাত্র দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হলেন তৎকালীন বগুড়ার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের কৃতী সন্তান দানবীর সাতানী বাড়ীর জমিদার খানবাহাদুর হাফিযুর রহমান। তিনি নিজ তহবিলে থেকে প্রাথমিক উদ্যোগে সকল ব্যয় বহন করেন। অতঃপর উদ্যোগের সাথে সাথে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ব্যয়ভারে অংশগ্রহণ করেন। খানবাহাদুর হাফিযুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দীর্ঘদিন পরিচালনা কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্রাসার জন্য ১৫০ হাত/২০ হাত আকারের প্রাথমিক ঘরটি সাতানী জমিদার বাড়ীর মসজিদ এলাকায় তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে আরও একটি আধাপাকা ভবন নির্মাণ করে একাডেমিক ভবন প্রসার করা হয়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে দাখিল, আলিম ও ফাযিল শ্রেণির কার্যক্রম হয়। ১৯৪৯ খ্রি. সনে কামিল (হাদীস বিভাগ), ১৯৬৫ খ্রি. সনে কারিগরী বিভাগ, ১৯৭৫ খ্রি. সনে দাখিল বিজ্ঞান বিভাগ এবং ১৯৭৮ খ্রি. সনে আলিম বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। এ মাদ্রাসার দালানগুলো বিভিন্ন ব্লকে আকর্ষণীয় দৃশ্যে সুবিন্যস্ত। ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাসাটি ব্যাপক অবদান রাখছে। প্রতি বছর শতাধিক শিক্ষার্থী কুর'আন হাদীসের জ্ঞান আহরণ করে দ্বীন-মাযহাবের খিদমতে নিয়োজিত আছে। (ড.আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, পৃ. ২৫৬-২৫৭, প্রাগুক্ত এবং গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন)।

৩১১. ড. আবদুস সাত্তার, ***আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

**কউমী মাদ্‌রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা**

কউমী মাদরাসা বলতে সমাজ বা কউম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদরাসাকে বোঝায়। এ জাতীয় মাদরাসা সম্পূর্ণ বেসরকারি প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে। ফলে সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত, স্তর ভিত্তিক, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি ইত্যাদিও কোন একক নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয় না। কউমী মাদরাসায় সরকারি কোন অর্থও বরাদ্দ করা হয় না। সমাজের দানশীল ব্যক্তিদের অনুদানে এসব মাদরাসা পরিচালিত হয়ে থাকে। মাদরাসার স্তর ও পাঠ্যসূচি নির্ণয় করে থাকেন শিক্ষক মণ্ডলী। বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ছোট-বড় প্রায় ৪০০০ টি কউমী মাদরাসা আছে।[৩১২]

বাংলাদেশে কউমী মাদরাসা নামে যে শিক্ষা কার্যক্রম প্রচলিত আছে, তা ভারতের দারুল উলুম, দেওবন্দের শিক্ষাধারার উৎস মূল হতে অনুসৃত। বাংলাদেশের কউমী মাদরাসা সমূহ ইসলামিক শিক্ষা ও আকিদাগতভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে লালন করে থাকে। ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক এক নিভৃত পল্লীতে ১৮৬৬ সালের ৩ মে (১লা মুহররম ১২৮৩ হিঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়, দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা। এই মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন, মাওলানা মোহাম্মদ কাশেম নানুতুবী (১৮৩২-১৮৮০)[৩১৩]। একই বছর ৯ই নভেম্বর (রজব মাস ১২৮৩ হিঃ) একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সাহারানপুর জেলা শহরে জামেয়া-ই-মাজহারুল উলুম নামে আরেকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। জামেয়া-ই-মাজহারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেন হযরত সা'দাত আলী[৩১৪]।

কাউমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন : বাংলাদশে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা আসে দারুল উলুম দেওবন্দের চিন্তা-চেতনা থেকে। একদিকে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু শিক্ষার্থী দেওবন্দ মাদরাসার লেখাপড়া শেষে দেশে ফিরে আসে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বি-বাড়িয়া, সিলেট প্রভৃতি স্থানে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বেশ কিছু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামগ্রিকভাবে দেখা যায় কউমী মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়ে লেখাপড়া করে আসলেও সরকারি বিধান অনুযায়ী তারা সরকারি কাজে অংশ নিতে পারে না। ফলে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার শিক্ষার্থী এবং দেওবন্দ থেকে আগত শিক্ষার্থীগণ মিলিত হয়ে দেশের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ চট্টগ্রাম, কুমিল্ল ও সিলেট এলাকা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে কউমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দেশের পশ্চিমাঞ্চল পৌঁছায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকায় ব্যাপকভাবে আলিয়া মাদ্‌রাসার ন্যায় কউমী মাদরাসাও গড়ে উঠতে থাকে। বর্তমানে ঢাকা শহরে দু'টি মহিলা মাদরাসাসহ ১৯ টি মারহালাতুত্‌ তাকমীল বা মাষ্টার ডিগ্রী মানের কউমী মাদরাসা আছে।

সাধারণভাবে মাদরাসাসমূহে দরসে নিজামির পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হয় বলে দাবি করে থাকে। শিক্ষা মূল্যায়নের বিষয়টিও কোন কোন মাদরাসা স্ব স্ব মাদরাসার উস্তাদের এখতিয়ারের উপর

---

৩১২. বাংলাদেশ কউমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

৩১৩. মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব, ***তারিখে দারুল উলূম দেওবন্দ*** (ভারত : ইদারাতে ইহতিমামে দারুল উলুম দেওবন্দ,) খ. ১, পৃ. ১৫

৩১৪. মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া, ***তারিখে মুজাহির*** ( সাহাবানপুর : কুতুব খানা ইশা'আতে খাল্‌ক) পৃ. ৫

নির্ভরশীল। এদিক থেকে বিষয়টি এখনো অতি পুরনো পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। কউমী মাদরাসার পাঠদান পদ্ধতি বা পাঠ পরিকল্পনার সুব্যবস্থার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সমগ্র বাংলাদেশে হাতে গোনা কিছু মাদরাসা ছাড়া বাকি অধিকাংশ কউমী মাদরাসায় অকাট্যভাবে মাদরাসা সমূহের শ্রেণী বা স্তর নির্ধারণ করা যাবে না। অনেক মাদরাসা স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী কিতাবাদি পড়িয়ে থাকেন। ইবতেদায়ী আউয়াল থেকে তাকমিল বা দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত বিভিন্ন মাদরাসায় বিভিন্ন রকম আনুষঙ্গিক কিতাবাদি পড়ানো হয়ে থাকে। প্রতি রমযান মাসের পূর্বেই বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ করা হয়। কউমী মাদরাসাগুলো লেখাপড়া শেষ হলে অনেক মাদরাসা তাদের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিজেরাই সনদ বিতরণ করে থাকে। আবার অনেক মাদরাসা তাদের স্ব স্ব বেসরকারী বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দিয়ে সনদ গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশের বড় বড় অনেক কউমী মাদরাসায় নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করা হয়। উক্ত নয়টি শ্রেণীর ঃ ১. ইবতিদায়ী আউয়াল, ২. ইবতিদায়ী সানী, ৩. উসতানী আউয়াল, ৪. উসতানী সানী, ৫. ছানুবী আউয়াল, ৬. ছানুবী সানী, ৭. নেহানী আউয়াল, ৮. নেহানী সানী ও ৯. তাকমিল।[৩১৫]

কাউমী মাদরাসা শিক্ষা ধারাকে সাধারণ শিক্ষা ধারার অনুরূপ মোট ১৬টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন-

১. প্রাইমারী বা মারহালাতুল ইবতিদাইয়্যাহ, ২. নিম্নমাধ্যমিক বা মারহালাতুল মুহাওয়াসসিতাহ, ৩. মাধ্যমিক বা মারহালা তুল সানুবিয়া, উল্‌ইয়া, ৪. স্নাতক বা মারহালাতুল ফযীলত, ৫. স্নাতকোত্তর বা মারহালাতুত তাকমীল।[৩১৬]

## ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এক অনন্য সংযোজন। ১৯৭৭ খ্রি. পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে অধ্যাপক মুস্তাফিযুর রহমান মুসলিম দেশসমূহে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করেন।[৩১৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন

---

৩১৫. শ্রেণীসমূহের নাম ঢাকার লালবাগ জামেয়া-ই-কুরআনিয়া আরাবিয়ার রুটিন বোর্ড থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ মাদরাসায় শ্রেণীর নাম এবং পাঠ্যসূচি বা কোন প্রসপেক্টাস নেই বলে মাদরাসায় অফিস সুত্রে জানিয়েছে।

৩১৬. *পরিচিতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ কউমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ১৯৮৪), পৃ. ১৫

৩১৭. উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন ড. সাইয়িদ মোয়ায্যিম হোসাইন, ড.এম.এ.বারী, ড.এ.কে.এম. আইয়ুব আলী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোস্তাফিযুর রহমান (ঢাবি) এবং মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহীম। সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিযুর রহমান। উক্ত সম্মেলনে মুসলিম দেশসমূহে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রণীত হয়। এর দু'মাস পর ১৯৭৭ সালের ৩১ মার্চ হতে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত সৌদি আরবের মক্কা শরীফে ওআইসি'র উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ও.আই.সি এবং বিভিন্ন মুসলমান রাষ্ট্রের আর্থিক সহযোগিতায় এশিয়ার তিনটি রাষ্ট্রে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সনের ৯ ফেব্রুয়ারী ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঢাকায় একটি প্রকল্পের অফিস করে লন্ডন প্রবাসী শিক্ষানুরাগী ড.এ.এন.এম মমতাজ উদ্দীন চৌধুরীকে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রথমে গাজীপুর জিলার সালনা, পরে যশোর জিলা শহরের উপকণ্ঠে এবং সবশেষে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ জিলার (তৎকালীন যশোর জিলা) যথাক্রমে ২৪ কি.মি. ও ২২ কি.মি. মধ্যবর্তী শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান চূড়ান্ত করা হয় এবং ১৭৫

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ বাংলা, ১৪০০ হিজরী ১ মুহররম, ২২ নভেম্বর ১৯৭৯ খ্রি. আধুনিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও আইন শাস্ত্রের সাথে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে উচ্চ ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেন।[৩১৮] পরবর্তীতে ১৯৮২ খ্রি. তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ঢাকা শহরের নিকটবর্তী গাজীপুরে এ বিশ্ববিদ্যালয় নতুনভাবে স্থাপন করে। ফলে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৯ খ্রি. এ বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহের মধ্যবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়।[৩১৯] ইসলামী শিক্ষাকে উচ্চ পর্যায়ে স্বীকৃতি দেয়া মাদ্‌রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘ দিনের আশা প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশার বাস্তবায়নই মূলতঃ এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ধর্মতত্ত্ব ইসলামী শিক্ষা, তুলনামূলক আইন শাস্ত্র এবং অন্যান্য শিক্ষণ শাখাসমূহে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ব্যাচেলর ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে জ্ঞানবিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।[৩২০]

**ফাযিলকে ব্যাচেলর ও কামিলকে মাস্টার্স ডিগ্রির মান প্রদান**

বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মত দাখিল ও আলিমকে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি'র সমমান প্রদান করলেও ফাযিল ও কামিল স্তরদ্বয় দীর্ঘ দিন সমমানবিহীন ঝুলন্ত ছিল। মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ সময় অবহেলিত থাকার পর অবশেষে দেশের সব ফাযিল ও কামিল মাদ্‌রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) অ্যাক্ট-২০০৬ নামে জাতীয় সংসদে একটি আইন পাস হয়। এ আইনের ১২ ধারার (১) উপধারায় বলা হয়েছে, এ আইন কার্যকর হবার সঙ্গে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত হিসেবে গণ্য হবে। ১২ ধারার (২) উপধারায় বলা হয়েছে। এ আইন কার্যক্রম হয়েছে, এ আইন প্রবর্তনের পর থেকে ফাযিল ও কামিল শ্রেণীদ্বয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এ আইনের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি (স্নাতক) এবং মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) এ শিক্ষার্থীরা বলে গণ্য হবেন।[৩২১]

**ফাযিল (সম্মান)**

ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধন এবং উচ্চতর ডিগ্রিতে উন্নীত করার লক্ষে বাংলাদেশ সরকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া'র অধীনে দেশের ৩১টি খ্যাতিমান মাদ্‌রাসায় ৫টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করে। বিষয়গুলোর মধ্যে হলো ঃ ক) আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, খ) আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, গ) আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ঘ) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ঙ) দা'ওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ। ২০১২ খ্রি. ইবি'র অধীনে বিভাগগুলোর সর্ব প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।[৩২২] বর্তমান ৫২ টি মাদ্‌রাসায় এই সব বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু আছে।

---

একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। (*ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ২৫ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রজত জয়ন্তী, (স্মারক পত্র ১৯৭৯-২০০৪ খ্রি. ইবি,)* পৃ. ১৯।

৩১৮. দৈনিক ইনকিলাব, ***ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় : প্রত্যাশা প্রাপ্তির ৩৪ বছর,*** , ১৯ নভেম্বর, ২০১২ খ্রি.।

৩১৯. ড. আহসান সাইয়্যিদ, ***বাংলাদেশে হাদিস চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৩২০. প্রাগুক্ত।

৩২১. ***দৈনিক ইনকিলাব*** : ১৯ নভেম্বর ২০১২ খ্রি.

৩২২. অফিস রেকর্ড, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

## ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশ। এ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৬% মুসলমান। এখানে হাজার হাজার সরকারি ও বেসরকারি মাদরাসা তথা ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মাদরাসাগুলো বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। যেমন প্রাথমিক (ইবতেদায়ী), মাধ্যমিক (দাখিল), উচ্চ মাধ্যমিক (আলিম) এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ফাযিল ও কামিল মাদরাসা। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সরকারি এমপিও ভূক্ত মাদরাসার সংখ্যা ১২৯৫ টি। এরমধ্যে ৩২ টি মহিলা ফাজিল ও কামিল মাদরাসা রয়েছে। এসকল মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও ইসলাম প্রিয় সাধারণ মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের প্রাণের দাবী ছিল একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যা বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করবে এবং যুগের চাহিদা অনুসারে বাংলাদেশের ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করবে।

স্কুল-কলেজের শিক্ষা যে ভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসূত্রে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে সেভাবে মাদরাসা শিক্ষাও যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যলয়ের যোগসূত্রে উচ্চমান সম্পন্ন তথা বিশ্বমানে উন্নীত হোক এটাই সবার প্রত্যাশা ছিল। যেমন বাংলাদেশের বেসরকারি কলেজগুলো পরিচালনার জন্য "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" নামে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজন এ ধারার একটি স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। সুদীর্ঘ ৯০ বছর ধরে দেশের প্রথিতযশা আলেম/উলামা/পীর/মাশায়েখ ও মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী মাদরাসা শিক্ষা সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে আন্দোলন করেন। ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ সৃষ্টির পরও এ আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এ আন্দোলনে জোর নেতৃত্ব দেন মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের একক অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন। জমিয়াতুল মোদার্রেছীন দেশের সচেতন নাগরিকদেরও এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে এবং এদেশের আলেম/উলামা ও ইসলাম প্রিয় জনগনের প্রায় শত বছরের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে ২০১৩ সালে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ কর্তৃক ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩ বিল আকারে মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। অত:পর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় সংসদে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বিল ২০১৩ পাশ হয়। জানুয়ারী ২০১৫ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব কার্যক্রম শুরু হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রি. তারিখ থেকে ১২/এ ধানমন্ডি, ঢাকা, শিক্ষাবোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্রের ৪র্থ তলায় অস্থায়ী কার্যালয়ে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু হয়। সর্বশেষ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর অধীনে পরিচালিত ২০১৫-২০১৬ শিক্ষা বর্ষ থেকে ফাযিল স্নাতক (পাস ও সম্মান) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদরাসা সমূহের যাবতীয় কার্যক্রম ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। এ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও এ দেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হয়।

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় একটি  বিশেষায়িত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ এবং ফাযিল স্নাতক (পাস ও সম্মান) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী মান সম্পন্নকরণ, সার্বিকভাবে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা বৃদ্ধিসহ মাদরাসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত।

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আর্ন্তজাতিক মান বজায় রেখে বাংলাদেশের ইসলামি ও আরবি ভাষা শিক্ষা বিস্তারের একটি অনন্য সাধারণ আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণে নিম্ন লিখিত_লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বদ্ধ পরিকর।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

১. বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের মাদরাসাগুলোর (ফাযিল ও কামিল) প্রাথমিক পাঠদান/ অধিভুক্তি/ অধিভুক্তি নবায়ন এবং তাদের একাডেমিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও এতদসংশ্লিষ্ট সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষকণ করা।

২. যুগ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, সৃজনশীলতা ও নৈতিক মুল্যবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে দেশ ও ইসলামের সেবায় যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৪. ইসলামি শিক্ষা ও মূল্যবোধের আলোকে পঠন-পাঠন, গবেষণা ও সমাজের বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিকত্ব ও আধুনিকত্বের সমন্বয় সাধন এবং ইসলামের মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করে একাডেমিক অনবদ্যতা, গবেষণা, আর্ন্তজাতিক যোগাযোগ ও শিক্ষা বিনিময়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামি ও আরবি শিক্ষায় ডিপ্লোমাসহ এম ফিল ও
পিএইচ ডি' ডিগ্রীর মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা বৃত্তি চালু করা।

৭. ইসলামি শিক্ষা ও আরবি ভাষায় দক্ষ আলেম তৈরী করা। যারা কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের দাওয়াত এবং মুসলিম সমাজে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক যাবতীয় সমস্যার সমাধানের যোগ্য হবেন।

৮. মাদরাসার শিক্ষক সংশ্লিষ্টদের আরবি ভাষা, প্রযুক্তি জ্ঞান, আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৯. ইসলামী শিক্ষা ও আরবি ভাষাসহ মুসলিম সমাজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় গবেষণা পরিচালনা এবং শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য পুস্তক ও জার্নাল প্রকাশ করা।

১০. বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইসলামের উদার নৈতিক মধ্যপন্থী মূল্যবোধ ও স্বাতন্ত্র সংরক্ষণ করা।

১১. বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানে একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন রচনা করা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।

১২. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাদরাসার শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের মধ্যে একটি গবেষণা ও জ্ঞান চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১৩. দেশের বিভিন্ন স্থানে আরবি ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত মাদরাসার সংখ্যা মোট মাদরাসা সংখ্যা ১২৯৫ টি।[৩২৩]

**যে সকল বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে-**

ক. আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ খ. আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ গ. আরবি ভাষা ও সাহিত্য ঘ. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ঙ. দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

**যে সকল বিষয়ে কামিল কোর্স (স্নাতকোত্তর) চালু রয়েছে**

ক. তাফসীর খ. হাদীস গ. আরবি সাহিত্য ও ঘ. ফিক্‌হ

**ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা**

ফাজিল (পাস) স্তরে শিক্ষার্থী ১,০৫,৯২৩ জন (২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ)

ফাজিল (অনার্স) স্তরে শিক্ষার্থী ৩,৫৮৫ জন (২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ)

কামিল (২ বছর মেয়াদী) স্তরে শিক্ষার্থী ৫০৬২৫ জন (২০১৫-১৬ ও ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবষ)

**অন্যান্য একাডেমিক প্রোগ্রাম সমূহ (পরিকল্পনাধীন)**

১. ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রে উচ্চতর ডিপ্লোমা

২. ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় উচ্চতর ডিপ্লোমা

৩. ইসলামী অর্থনীতিতে উচ্চতর ডিপ্লোমা

৪. আরবি ভাষায় উচ্চতর ডিপ্লোমা

**প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ**

১. আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স

২. শিক্ষকদের ভাষা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স

বস্তুত, যে মুসলিম প্রজন্ম শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হবে, তাদের মাধ্যমেই দেশ, জাতি ও সমাজ প্রকৃতভাবে উপকৃত হবে। এ মহৎ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩২৪]

---

৩২৩. কামিল মাদরাসা ২২৭ টি ফাযিল মাদরাসা ১০৬৮ টি, মহিলা মাদরাসা ৩২ টি (ফাযিল ২২টি+কামিল ১০টি), অনার্স মাদরাসার সংখ্যা ৫২ টি, মাস্টার্স (১ বছর মেয়াদী) মাদরাসা ১৮টি। (অফিস রেকর্ড, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)।

বর্তমানে বছিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় ৩টি বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে অস্থায়ী ভাবে কার্যক্রম চলছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রাজধানীর অদূরে কেরানীগঞ্জের চর ওয়াশপুরে ২০ একর জায়গার উপর নির্মিত হবে স্থায়ী ক্যাম্পাস। এছাড়াও দেশের ৮টি বিভাগে নির্মিত হবে আঞ্চলিক ক্যাম্পাস।

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জুলাই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কলা অনুষদের অধীনে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে প্রসিদ্ধ হাদীসবিশারদ ও ইসলামী স্কলাররা ইসলামী শিক্ষার উপর পাঠদান করে আসছেন।[৩২৫] ১৯৮০ খ্রি. পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ একত্রে সংযুক্ত ছিল। এ সনের ৭ জুলাই আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়।[৩২৬]

**চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়**

দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রাচীন নগর হিসেবে এর খ্যাতি আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বে এ অঞ্চলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর প্রফেসর  আযীযুর রহমান মল্লিককে উপচার্যের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম শহর থেকে ২২ কি.মি. উত্তরে হাটহাজারী উপজিলার ফতেহপুর এলাকায় এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও অর্থনীতি বিভাগের এম.এ প্রিলিমিনারী ক্লাস দিয়ে ১৯৬৬ খ্রি. ২৮ নভেম্বর এর যাত্রা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৪ খ্রি. প্রাচ্যভাষা সাবসিডিয়ারী কোর্স হিসেবে চালু করা হয় এবং সর্ব প্রথম এ বিষয়ে পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজিলার কৃতি সন্তান ড. এ.এম. 'আব্দুল গফুর চৌধুরীকে। ১৯৭৭ খ্রি. প্রাচ্যভাষা থেকে আরবী ও ফার্সী পৃথক হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৫৫ খ্রি. আরবী ও ফার্সী বিভাগের অধীনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলা হয় এবং নাম দেয়া হয় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।[৩২৭] পরবর্তীতে ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতির লক্ষে এ বিভাগকে পৃথক করার প্রয়োজন দেখা দেয়; ফলে ২০০৫ খ্রি. আরবী বিভাগ থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আলাদা করা হয়।[৩২৮]

---

৩২৪. উপাচার্য- প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ্ (আহসান সাইয়েদ), রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)- জনাব রোশন খান, মাদ্রাসা পরিদর্শক ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)- প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী, উপ-রেজিস্ট্রার- ড. এম আবু হানিফা, সহ-রেজিস্ট্রার-জনাব ফাহাদ আহমদ মোমতাজী সহ মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০ জন।

৩২৫. ড. আহসান সাইয়েদ, ***বাংলাদেশে হাদীস চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৩২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৩২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৩২৮. আরবী বিভাগে দ্বীনি শিক্ষায় যারা অগ্রণী ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ড. প্রফেসর আব্দুল গফুর চৌধুরী, ড. প্রফেসর শরফুদ্দীন, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ড. রফিক আহমদ, ড. প্রফেসর আ.স.ম আব্দুল মান্নান চৌধুরী, ড. প্রফেসর এস.এম রফিকুল আলম, ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল, সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জা'ফর উল্লাহ, হাফিয নূর হোসাইন ও মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান প্রমুখ। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কর্মরত আছেন ড. প্রফেসর হাফিয মুহাম্মদ বদরুদ্দোযা, ড. প্রফেসর আহসান সাইয়েদ, ড.এ.এফ.এম. আমিনুল হক, ড. প্রফেসর এনামুল হক, ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দীন কাদেরী, মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ নুরুল আমিন নূরী, মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন ভূঁইয়া, সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ মুরশেদুল হাক, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রভাষক ড. মানজুরুর রহমান ও মোহাম্মদ আবুল হোসাইন প্রমুখ। (অফিস রেকর্ড, আরবী বিভাগ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চবি।)

**রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়**

রাজশাহী শহর থেকে তিন মাইল পূর্বে নাটোর-ঢাকা মহাসড়কের উত্তর পাশে বিনোদপুরের পাশ্ববর্তী এলাকায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ১৯৫৩ খ্রি. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ খ্রি. শেষের দিকে ১৯৬০ খ্রি. এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিভাগের অধীনে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু করা হয়। ১৯৭৮ খ্রি. ২৫শে আগস্ট আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ ভাষা বিভাগ থেকে পৃথক হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৯৫ খ্রি. ৫ জানুয়ারি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ দু'টি বিভাগে রূপান্তরিত হয়। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এ দু'টি বিভাগ থেকে উঁচু মানের পিএইচ.ডি ও এম.ফিলে ইসলামী শিক্ষার্জন করছে।[৩২৯]

**জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়**

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় উচ্চশিক্ষার ধারাকে আরো অগ্রগতি সাধনে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ দেশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নামে এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মানের ক'টি বিভাগের মধ্য দিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। ইসলামি শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারের জন্য কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু রয়েছে।

**অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়**

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে অন্যান্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও ইসলামী শিক্ষার চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। এ দেশের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা ও ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ক্রমাগত ভীড় এবং ছাত্রসংখ্যার তুলনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও আসন সীমিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২ খ্রি. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে এ যাবৎ ৬২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গুলোতে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।[৩৩০] তাছাড়া এদেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং কলেজ পর্যায়েও ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

---

৩২৯. গবেষকের সরেজমিন পরিদর্শন।

৩৩০. ড. মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, *আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

# তৃতীয় অধ্যায়

## আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) : ধর্মীয়, সমাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা

### ৩.১ ধর্মীয় চিন্তাধারা

মানব জাতির ইতিহাস ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক, প্রাচীন বা আধুনিক জীবনে কোন না কোনভাবে ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সর্ব যুগে সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশের সর্ব স্তরে পৃথিবীর সব দেশের মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম স্বমহিমায় বিদ্যমান ছিল। ধর্মকে মানুষের জীবন থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। তাই ধর্মকে মানব জীবনের অনিবার্য ও অবিভাজ্য বৈশিষ্ট্য বলা যায়। পৃথিবীর সব দেশ ও কালের মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন না কোন ধর্মের অনুশীলন করে আসছে। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) শৈশব কাল থেকেই ধর্মীয় বিষয়ে চিন্তা গবেষনা করতেন। তিনি তাঁর চিন্তা চেতনা ও গবেষণায় বিভিন্ন ধর্মের আকিদা সহ ইসলামের ধর্মের সঠিক রূপরেখা তুলে ধরা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেন।

### ৩.১.১ ধর্মের পরিচয়

#### আভিধানিক অর্থ

ধর্মের আভিধানিক অর্থ হলো : স্রষ্টার উপাসনা পদ্ধতি, আচার-আচরণ, ইহ ও পরকাল সম্পর্কিত নির্দেশ, কর্তব্য, কাজ, বিধান, সুনীতি, সাধনার পথ, স্বভাব ও গুণ।[৩৩১] সংস্কৃতিতে 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি।

ধর্ম শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Religion, শাব্দিক বিবেচনায় Religion হলো, belief in a higher unseen controlling power specially in the existence of God বা অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ শক্তির অস্তিত্বে বিশেষত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। এছাড়াও শব্দটি আরও কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

(ক) any system of faith and worship বা বিশ্বাস ও ইবাদতের যে কোন পদ্ধতি,

(খ) devoted fidelity বা ভক্তি ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য,

(গ) an action that one is bound to do বা এমন কাজ যা করা আবশ্যক।[৩৩২]

আরবী (আদ্-দ্বীন) শব্দটি ধর্মের সমার্থক মনে করা হয়।[৩৩৩] ব্যাপক বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় গবেষণা অনুসন্ধান শেষে প্রমাণিত হয়, দ্বীন এবং ধর্ম সমার্থক নয়। দ্বীন অর্থ জীবন বিধান, জীবন ব্যবস্থা, প্রথা, রীতি-নীতি, বিচার-প্রতিফল বা প্রতিদান। সূরা ফাতিহায় প্রতিফল বা বিচার অর্থেই বলা হয়েছে। "কর্মফল দিবসের মালিক"। দ্বীন অর্থ জীবন ব্যবস্থা এবং এ অর্থে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হল ইসলাম।[৩৩৪]

---

৩৩১. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ,* (কলকাতা : জানুয়রি, ১৯৯৮), পৃ. ৩৫৩

৩৩২. Sailendra Biswas, ***Samsad English-Bengali Dictionary***, (calcuta : August,1997), p. 946

৩৩৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *আল কাওছার আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান*,( ঢাকা : কাওছার পাবলিকেশন্স লি. ১৪০০ হিজরী), পৃ. ৩৩২

৩৩৪. আল কুরআন ৩ : ৯

দ্বীন শব্দটি ধর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে - যেমন; ধর্ম যেখানে স্রষ্টা কেন্দ্রিক বিশেষ কিছু বিশ্বাস ও নীতির সমন্বয় সেখানে দ্বীন হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ প্রদত্ত সেই বিশেষ বিধি-বিধান যা মেনে চলাকে তিনি সব মানুষের জন্য অনিবার্য করেছেন। কাজেই দ্বীন হলো "আল্লাহ্ প্রদত্ত অবশ্য করণীয় নির্দেশাবলী যার প্রতি প্রত্যেককে আত্মসমর্পণ করতে হয়।[৩৩৫] ব্যাপক অর্থে ধর্ম হলো- The belief in the existence of a god or gods and the activities that are connected with the worship of them,one of the system of faith that are based on the belief in the existence of a particular god or gods.[৩৩৬]

অর্থাৎ- এক বা একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তাদের উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যক্রম বিশ্বাসের পদ্ধতি সমূহের একটি বিশেষ পদ্ধতি যা নির্ধারিত এক বা একাধিক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল।

শব্দগত ও পরিভাষাগত বিবেচনায় দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ ও তাঁর ক্ষমতায় সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব দিক ও বিভাগের সম্ভাব্য সব সমস্যার সমাধান প্রদান করে। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে এক বা একাধিক অদৃশ্য সত্ত্বার অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলা হয়। জীবনের সব সমস্যার পরিবর্তে কেবল আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়।

**পারিভাষিক অর্থ**

গবেষণায় দেখা যায়, ধর্মের সর্বজন স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না; বরং ইতিহাসে ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন রকম এবং পরস্পর বিরোধী এত বেশী সংখ্যক অভিমত রয়েছে যে, ধর্মের মৌলিক পরিচয় প্রকাশের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। পৃথিবীর অসংখ্য ধর্মের পাশাপাশি এর সংজ্ঞাও অসংখ্য।

অধ্যাপক ইয়াংগার ধর্মের সব ধরনের সংজ্ঞাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন,

(ক) মূল্যবোধভিত্তিক সংজ্ঞা
(খ) বর্ণনামূলক সংজ্ঞা
(গ) ক্রিয়াবাদী সংজ্ঞা[৩৩৭]

বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে নৈতিক মূল্যবোধভিত্তিক সংজ্ঞার কোন গুরুত্ব নেই। কারণ এক জনের কাছে যেটা উচিত অন্যের কাছে তা উচিত নাও হতে পারে।

বর্ণনামূলক সংজ্ঞায় ধর্মের বিবরণ পাওয়া যায় এবং বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। অবশ্য এতে ধর্মের সংক্ষিপ্ত এমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, যা থেকে পাঠক সহজেই ধর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। ধর্ম কী কাজ সম্পাদন করে তা ব্যাখ্যা করা হয়। এ ধরনের সংজ্ঞা থেকে মানুষ ধর্মের কাজ বুঝতে পারে না।

ধর্ম হলো মানুষের পক্ষে কোন উচ্চতর অদৃশ্য শক্তিকে স্বীকার করে নেয়া, যে শক্তি মানুষের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা মানুষের আনুগত্য, শ্রদ্ধা এবং পূজা পাওয়ার অধিকারী।

---

৩৩৫. মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৯২), খ. ১৩, পৃ. ৪৩৫

৩৩৬. A. S. Hornby, ***Oxford Advanced Learneris Dictionary of Current English***, (London : Oxford University press, 2000), P. 1075

৩৩৭. মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬

**রয়েসের** মতে : "ধর্ম হলো অদৃশ্য মহাশক্তির আনুগত্যের ধারাবাহিকতা"। এ জন্য বলা যায়, প্রত্যেক ধর্ম হলো আনুগত্যের ধর্ম।

**উইলিয়াম জেমসের** মতে, "ধর্ম হলো মহাজাগতিক স্বদেশ প্রীতি। পরমসত্ত্বা যিনি তিনিই পরম মঙ্গল। ধর্ম হলো তার প্রতি হৃদয়ের ইচ্ছার এবং চিন্তার আনুগত্য"[৩৩৮]।

**James G. Frazer-** এর মতে "ধর্ম হলো মানুষের চেয়ে উচ্চতর এমন একটি শক্তিতে বিশ্বাস যা মানব সমাজ ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে"।[৩৩৯]

**Harold Hoffding-** এর মতে, "মূল্যের নিত্যতাই হলো ধর্মের স্বত:সিদ্ধ বৈশিষ্ট্য। কাজেই ধর্ম হলো মূল্যের নিত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিধি-বিধানের সমষ্টি, যার সঙ্গে অনিবার্যভাবে অদৃশ্য জগতের সম্বন্ধ বিদ্যমান"[৩৪০]।

## ৩.১.২ ধর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি

সৃষ্টির আদি হতে মানুষের জীবন-যাপনের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক সৃদূঢ়। এতদ্‌সত্ত্বেও ধর্মের যেমন নির্দিষ্ট করে কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, তেমনি সর্বজন গ্রাহ্যভাবে এর স্বরূপ ও প্রকৃতি নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ধর্ম তত্ত্ববিদ, দার্শনিক ও নৃবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন বিশ্লেষণে ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে রূপায়িত হয়েছে। পরিবেশ, পেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট গবেষক, বিশ্লেষকের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে ধর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতিতেও ভিন্নতা এসেছে। সবার নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি তুলে ধরা হলো।

পৃথিবীর সর্ব কাল ও সর্ব দেশের ধর্মসমূহের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি ধর্ম কোন না কোনভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করে। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই কাজের ভাল-মন্দ ও কী কথা বলা বা শোনা উচিত নয়, সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়ে থাকে ।

ধর্মসমূহের অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জায়গা হলো মানুষের চরিত্রবান হওয়ার প্রতি পৃথিবীর সব ধর্ম সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। চরিত্রহীন মানুষকে পশুর সমতুল্য গণ্য করেছে। চারিত্রিক শুদ্ধতাকে মানবিক উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাধ্যম বলে গণ্য করা হয়েছে।

পৃথিবীর সকল ধর্মেই ধর্মীয় মূলনীতি, মূল্যবোধ, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, মানুষের কর্তব্যপরায়ণতা, মানবিকতা প্রভৃতি বিবেচনায় স্বাভাবিক মানবীয় জীবন-যাপনের জন্য বিভিন্ন রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান পরিবর্তন হয়ে থাকে।

## ৩.১.৩ মানব জীবনে ধর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আগেই বলা হয়েছে ধর্মের সঙ্গে মানুষের জীবনের এ সংযোগ, সম্পৃক্তি কোন অর্থহীন বা তাৎপর্যশূন্য বিষয় নয়। মূলত মানুষের জীবনে ধর্মের সীমাহীন গুরুত্ব ও অপ্রতিরোধ্য প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। কেননা ধর্মীয় বিধান মানুষের সার্বিক নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে থাকে। যেমন-

৩৩৮. সম্পাদনা পরিষদ, ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,*** (ঢাকা : ই.ফা. বা. ২০০৫), পৃ. ৬৮

৩৩৯. Frazer, James G, ***the Golden Bough,*** (London Macmillan, 1967). p.

৩৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

**জীবনে নিরাপত্তা বিধান :** পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মে মানুষের জীবনের সীমাহীন গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি ধর্মের মূল শিক্ষার মধ্যে তাই অন্যের জীবনের নিরাপত্তার বিধানের বিষয়টি অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর সব ধর্মে সাধারণ ভাবে যে কোন অন্যায় হত্যাকাণ্ডকে মহাপাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। হত্যাকারীর জন্য সর্বোচ্চ দণ্ডবিধান মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার রীতি-নীতি অধিকাংশ ধর্মে রয়েছে।[৩৪১] ফলে যুগে যুগে, কালে কালে ধর্ম মানুষের জীবনের রক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে।

**সম্পদের নিরাপত্তা বিধান :** জীবনের পরেই মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় কাঙ্ক্ষিত হলো অর্থ সম্পদ। অমানুষিক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে মানুষ অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে। পৃথিবীর সব ধর্মেই পরধন আত্মসাৎ, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, অবৈধ উপার্জন, ও অযৌক্তিক ভোগ বিলাসকে চরম ঘৃণ্য বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা ও চেষ্টা অগ্রাহ্য করে কেউ যদি অন্যের আর্থিক নিরাপত্তা ভঙ্গের কোন কাজ করে থাকে তাহলে ধর্ম তার বিরূদ্ধে ভয়ংকর শাস্তির ব্যবস্থা করে সম্পদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই নিশ্চিদ্র করে তোল।

**সম্মানের নিরাপত্তা বিধান :** জীবন এবং সম্পদের চেয়ে মানুষের কাছে তার সম্মানের গুরুত্ব কোন অংশ কম নয়। সম্মান রক্ষার জন্য মানুষ অবলীলায় সম্পদ ব্যয় করে। জীবন উৎর্সগ করে। পৃথিবীর সব ধর্মই মানুষের সম্মান রক্ষার শক্তিশালী রক্ষাকবচ। কেউ যেন অন্যের সম্মান ক্ষুণ্ণ না করে সে ব্যপারে প্রতিটি ধর্মেই বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। মানুষকে হেয় করা, ছোট করা বা অসম্মান করার কাজকে জোরালোভাবে নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। কারো বিরূদ্ধে অনুমানের ভিত্তিতে অভিযোগ আনা বা কারো সম্মান ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন বিষয়ের প্রচর করা অধিকাংশ ধর্মেই অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে[৩৪২]।

**ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম :** মানব সমাজ মূলত আলাদাভাবে এক এক জন ব্যক্তির সমন্বিত সমাজ। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ যদি অসৎ হয় তাহলে সমাজও অসৎ হবে। আবার ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ যদি সৎ, দায়িত্বশীল হয়। তাহলে সমাজে তার প্রভাব নিশ্চিতভাবে পড়বে। ধর্ম এ দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ করে এবং ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন বা না পালনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করে। তার মানবিক গুনের বিকাশ ও লালনে বিস্তারিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

**দাম্পত্য জীবনে ধর্ম :** পৃথিবীর সব ধর্মেই নারী-পুরুষের অবাধ যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবার গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে। কেবল তাই নয়, স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে তাদেরকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন এবং একে অন্যের সাথে কাঙ্ক্ষিত আচরণের একটি ন্যূনতম মাত্রা ধর্মে ঠিক করে দেওয়া থাকে[৩৪৩]। যা শান্তির্পূণ দাম্পত্য জীবন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

**সমাজ জীবনে ধর্ম :** পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মে মানব প্রেমের যে শিক্ষা, অন্যকে সহযোগিতা করা, অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের যে ব্যবস্থা, পারস্পরিক সদাচারের যে বিধি-বিধান তার প্রতিটিই

৩৪১. সম্পাদনা পরিষদ, ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,*** (ঢাকা : ই.ফা.বা. ২০০৫), পৃ. ৭০

৩৪২. প্রাগুক্ত

৩৪৩. প্রাগুক্ত

একন্তভাবে সমাজকে সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতিকর আবহে ভরে তোলে। সমাজ জীবনে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে ধর্মীয় শিক্ষা বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

**রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম :** ধর্ম সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত না হলে ও রাজনীতিতে যেন কলুষ-কালিমা না থাকে, রাজনীতিবিদগণ যেন নিতান্তই বৈষয়িক স্বার্থে মানুষের অকল্যাণ ও সর্বনাশ ডেকে না আনেন সে ব্যাপারে প্রতিটি ধর্মই সজাগ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত ইসলাম ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে এক স্বয়ংপূর্ণ রাজনৈতিক মতাদর্শ পেশ করেছে। যা একই সঙ্গে মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করে।

**অর্থনৈতিক জীবনে ধর্ম :** মানবজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অর্থের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ধর্ম এ বিষয়কে উপেক্ষা করেনি। বরং এ ক্ষেত্রে নৈতিকতার সীমা ঠিক করে দিয়ে উপার্জন বন্টন, ভোগ ও ব্যবহারে বৈধতা ও অবৈধতার সীমানা ঠিক করে  দিয়েছে। যা মানুষকে অপচয়, অপব্যয়, অর্থহীন ভোগ-বিলাস থেকে মুক্তি দিয়ে সমন্বিত ও শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক জীবন নির্বাহের পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

**রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্ম :** রাষ্টপরিচালনার দায়িত্বে যারা নিযুক্ত থাকেন, তারা যেন কোনক্রমেই স্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত না হয় ধর্ম বিশেষভাবে সে বিয়য়টি নিশ্চিত করে। ধর্মেই রাষ্ট্রপ্রতি বা রাজাকে প্রজাদের পিতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। যাতে রাজা বা শাসক অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

**আন্তর্জাতিক জীবনে ধর্ম :** সৃষ্টিগত দিক দিয়ে সকল মানুষ এক মা-বাবার সন্তান। তাদের মাতা-পিতা এক, তাদের সৃষ্টিকর্তা এক। তাদের জীবনের উদ্ভব, বিকাশ ও সমাপ্তি এক। ধর্ম একান্তভাবে বিশ্ব মানবকে পারস্পরিক অভিন্নতার এই চেতনায় উজ্জীবিত করে। ফলে পৃথিবীর যে দেশেই অশান্তি-অনাচার তৈরি হোক, ধর্মভীরু মানুষ তা নিরসনে ভূমিকা পালন করে। কেউ কারো উপর অন্যায়, শোষণ ও আগ্রাসন পরিচালনা করে না। বরং বিশ্ব জুড়ে তৈরি হয় ঐক্যের বন্ধন।

**জাতীয় জীবনে ধর্ম :** জাতিগত হিংসা বিদ্বেষ জাতীয় শান্তি, কল্যাণ ও উন্নতিকে বাধাগ্রস্থ করে। মানুষের মধ্যে শত্রুতা অন্যায় প্রতিযোগিতা এনে দেয়। সবাইকে দাবিয়ে রেখে একা শীর্ষে ওঠার অন্যায্য বাসনা তৈরি করে। ধর্ম শক্ত হাতে এসব প্রবণতা রোধ করে। বিশেষত ইসলামে হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করে এক কাতারে দাঁড়ানোর এবং একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে শিক্ষা দেয়। ধর্মীয় জীবন মূলত শৃঙ্খলার জীবন। প্রতিটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সে গুলো নিয়ম শৃঙ্খলার সাথে আদায় করতে হয়। ইচ্ছামত বা যেভাবে  খুশি সেভাবে কোনো ধর্মীয় বিধি বিধান পালন করা যায় না। ধর্মানুষ্ঠানের এই শৃঙ্খলা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ও প্রভাব বিস্তার করে।

### ৩.১.৪ ইসলাম ধর্ম

স্রষ্টা এবং বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থাপনা-ই ধর্ম। অর্থাৎ বান্দা যে স্তরে উপনীত হলে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও তদীয় ক্ষমতা লাভ করতে পারে, সৃষ্টিকুলের উপর তাঁরই প্রতিনিধিত্ব ও কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়, সেই স্তরে উপনীত হওয়ার রীতি-নীতি, দিক-নির্দেশনা-ই ধর্ম। এ ধর্ম

অনুসরণ-অনুশীলন করে বান্দা যখন দেহ-মন তথা বাহ্যিক-আত্মিক পরিশুদ্ধির সকল স্তর অতিক্রম করেন তখন মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনাতে সুস্থ মন-মানসিকতার উন্মেষ ঘটে, পদমর্যাদা উন্নত হতে উন্নতর হয়, মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার সব রঙ মুছে যায়, আল্লাহ্ তা'আলার দ্যুতিতে হারিয়ে যায়, নিজ সত্ত্বাকে তাঁরই রঙে রাঙিয়ে নেয় এবং তারই চরিত্র নির্মাণ করতে থাকে। এ সময় বান্দা প্রাপ্ত হন অপার্থিব আত্মতৃপ্তি, স্বাদে অন্তহীন প্রাচুর্য ও বিস্ময়কর সুখানুভূতি। এই ক্ষমতা ধারন করাই ধর্মের অন্তর্নিহিত মর্ম। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাতে তাঁরই পক্ষ হতে বান্দা এ সুপ্ত ক্ষমতা ধারন করতে পারেন। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত ধর্মই বান্দাকে সঠিক পথে ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এখানে বান্দার কোন ইখতিয়ার নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب

"আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং তাকেই পথ দেখান, যে প্রতিনিধিত্ব করবেন।" [৩৪৪]
মূলত যমীনে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

সাধারণত কোন বক্তার মুখ নিসৃত বক্তব্য বা কথা তার বাণী হিসেবে স্বীকৃত হয়ে থাকে। অথচ মহানবী (সা.)'র পবিত্র মুখ নিসৃত বক্তব্য আল্লাহ্ তা'আলার বাণী রূপে সমাদৃত হয়েছে। কুরআন করীমের এ আয়াত এটাই নির্দেশ করে। তা ছাড়া তিনি যতক্ষণ না তাঁর বক্তব্য স্বয়ং কুরআনের আয়াত হতে পার্থক্য করে দেন নি; এরূপে বলেননি যে, "এটা আমার কথা, এটা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী নয়, এটা লিখ না ইত্যাদি " ততক্ষন কারোর পক্ষে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। এভাবে মহানবী (সা.)'র সান্নিধ্যে ধন্য সাহাবাগণের অবস্থাও বিধৃত হয়েছে আল কুরআনে জায়গায় জায়গায়, বিভিন্ন আয়াতে। যেমন,

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى

"তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের হত্যা করেছেন। আর আপনি নিক্ষেপ করেন নি, যখনই নিক্ষেপ করেছেন, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।"[৩৪৫]

হুদায়বিয়ার প্রান্তরে শপথ গ্রহণের সময় সাহাবাগণের হাতের উপর মহানবী (সা.)'র হাত ছিল অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم

"নিশ্চয় যারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে, মূলত তারা আল্লাহ্র নিকটই বায়'আত গ্রহণ করে। তাঁদের হাতের উপর আল্লাহ্'র হাত রয়েছে।"[৩৪৬]

বাস্তবতা এই যে, দুনিয়াতে টিকে থাকতে বা জাঁকজমক, আরাম-আয়াসের সাথে চলতে বৈধ-অবৈধ সব পন্থা মানুষ প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে; তখন ধর্ম বিশ্বাস থাকে সুদূর পরাহত; যেহেতু সে নৈতিক মূল্যবোধ শূন্য, অনুভূতিহীন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে-অনুষ্ঠানে শতবার অবস্থান করে ধর্মের বাণী শুনেও তা মনের গভীরে পৌঁছে না, কান হতে ফিরে আসে, নিষ্ফল হয়ে পড়ে। বিন্দুমাত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এ জড়দেহের ভোগ ও সুখই সর্বস্ব। ধর্মের সাথে সংস্রব থাকলেও পার্থিব স্বার্থের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মের মুখোশ এঁটে যেভাবে ধর্ম বিক্রীত হয়, তাতে ধর্মই

---

৩৪৪. আল কুরআন, ২৬ : ১৩
৩৪৫. আল কুরআন, ০৮ : ১৭
৩৪৬. আল কুরআন, ৪৮ : ১০

শিহরিত-আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সে কারণে পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থানুগামীগণ পথভ্রষ্ট হয়েছে। পার্থিব ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আল্লাহ্‌র বিধানকে পরিবর্তন করে ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েছে তারা। তাই এ সকল ধর্মে আধ্যাত্মিকতা ক্রমান্বয়ে রহিত হয়। ঐসব ঐশীগ্রন্থে বর্ণিত জীবনবিধান এখন আর ধর্ম নয়। সে সবে আছে ধর্মের প্রলেপ মাত্র। মহান আল্লাহ্‌'র ঘোষণা-

ومن يبتغ غيرالاسلام دنيا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين

"যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, তা তার পক্ষ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অর্ন্তভূক্ত।"[৩৪৭]

মহান আল্লাহ্‌ অসীম, নিরাকার, অদ্বিতীয়। তাঁর তুলনা নেই, তিনি অনন্ত, তাই তিনি সৃষ্টির ধারনারতীত অতীত। তিনি সত্য নতুবা এ জগত সংসার কিছুই সত্য হত না। তিনি অন্তরে-বাইরে সর্বত্র, সবকিছুরই একমাত্র অধীশ্বর। তাঁরই প্রদত্ত জীবন বিধানই প্রকৃত। কেননা, মানব দেহ ও আত্মার ইন্দ্রীয়গুলোর শক্তিকে অটুট রাখতে, উন্নত ও পবিত্র করতে এতে যথাযথ বর্ণনা পূর্ণরূপে বিদ্যমান। অতএব যথার্থ ধর্মমাত্রই অতিপ্রাকৃত, প্রত্যাদিষ্ট; মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন সৃষ্টি করাই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। তখন এ ধর্ম হতে পারে মানব প্রকৃতি ও স্বভাবজাত, সর্বকালের, বিশ্বজনীন, সর্বাধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রযুক্তির মডেল। এখানেই মানুষের পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতার চরম আদর্শ নিহিত। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন-

اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) কে পরিপূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম।"[৩৪৮]

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা ধর্মের বিবর্তনের ধারা সমাপ্তি ঘোষিত হয়, তথাপি এ ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এর ঐতিহাসিক বিশেষত্ব। সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে-

يايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافّة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدومبين

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরন কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩৪৯]

আরো বলা হয়েছে- ان الدين عند الله الاسلام "নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র ধর্ম।"[৩৫০]

এ জন্য এ ইসলাম মানুষের মাঝে লুকিয়ে থাকা আল্লাহ্‌ তা'আলার অন্বেষণ-নৈকট্য অর্জনের সুপ্ত প্রেরণাকে জাগিয়ে তুলে। এটাই ধর্মের প্রকৃতি। পবিত্র কুরআনে তা বিধৃত করা হয়েছে এভাবে-

فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربّه احدًا

"যে কেউ তার প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্খা করে, তার উচিৎ সৎকাজ করা ও তার প্রভুর উপাসনাতে কাউকে অংশীদার না করা।"[৩৫১]

---

৩৪৭. আল কুরআন, ০৩ : ৮৫

৩৪৮. আল কুরআন, ০৫ : ০৩

৩৪৯. আল কুরআন, ০২ : ২০৮

৩৫০. আল কুরআন, ০৩ : ১৯

আল কুরআনে আরো বর্ণনা আছে-

فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وذلك الدين القيم

"আল্লাহ্'র ফিত্‌রাত যেটার উপর তিনি মানবকুলকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্'র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল-সোজা মজবুত ধর্ম।"[৩৫২]

সুতরাং মানুষের প্রধান দায়িত্ব হল- আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত ধর্মানুসারে তাঁরই পরিচয় লাভ করা। যেহেতু তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করে স্বীয় প্রতিনিধির মর্যাদায় বিভূষিত করেছেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কাজেই যাঁর প্রতিনিধিত্ব করবে, তাঁর সম্পর্কে জানা, তাঁর পরিচয় লাভ করা নি:সন্দেহে অপরিহার্য। মানুষ যখন তাঁর এ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়, তখন তার প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত রূপে পরিগনিত হয়। বস্তুত: বান্দা তার স্রষ্টার সন্ধানে যেন নিবেদিত থাকে, সেটাই আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وما خلقت الجن والانس الاَّ ليعبدون

"আমি মানব-দানবকে কেবল এ জন্যেই সৃষ্টি করেছি ; যাতে তারা আমার ইবাদত তথা পরিচয় লাভ করে।"[৩৫৩]

জগতের সব কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্ট, তাই সেগুলো সম্বন্ধে অবগত হওয়াও মানুষের কর্তব্যের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত। এ জন্য পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং মহানবী (সা.)'র অনেক হাদীসে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি মহাবিশ্বের সৃষ্টিরাজির বিষয়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তদ্রূপ অন্তর জগতের ঐশ্বর্যরাজির ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

سنريهم ايتنا فى الافاق وفى أنفسهم حتى يتبيّن لهم انه الحق

"অচিরেই আমি আমার নির্দশনাবলী তাদেরকে দেখাবো সারা বিশ্ব জগতে এবং স্বয়ং তাদের নিজেদের মধ্যেও, শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, নিশ্চয় তা সত্য।"[৩৫৪]

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বান্দার সর্ম্পক স্থাপনে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হল ইসলাম। যুগ জিজ্ঞাসার জবাবে এ ইসলাম শাশ্বত আদর্শ, অজেয় ও ভারসাম্যপূর্ণ। মানবজাতি ইসলামের চিরন্তন প্রাণ-সঞ্চারী ধারণা দ্বারা সুসংঘবদ্ধ গতিশীল জীবন-যাপন, আত্মরক্ষা, ভাগ্যোন্নয়ন ও এমন বিশিষ্ট সত্তা অর্জনের নিশ্চয়তা দিতে পারে; যে সত্ত্বা আল্লাহ্ তা'আলার নূরের বিকাশ স্থলে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন

افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربّه

"তবে কি যার বক্ষ আল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছেন, সেটাই তাঁর প্রভুর নূর।"[৩৫৫]

---

৩৫১. আল কুরআন, ১৮ : ১১০
৩৫২. আল কুরআন, ৩০ : ৩০
৩৫৩. আল কুরআন, ৫১ : ৫৬
৩৫৪. আল কুরআন, ৪১ : ৫৩
৩৫৫. আল কুরআন, ৩৯ : ২২

## ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম মানে শান্তি- এ অর্থটিও কারোর অজানা নয়। তবে ইসলামের প্রকাশ ও বিকাশের আগে এ শব্দটি "আনুগত্যের জন্য গর্দান ঝুঁকে দেয়া" অর্থে আরব্য সাহিত্যিক এবং অভিধানবেত্তাগণ ব্যবহার করে আসছেন। পরে ধর্ম তর্কশাস্ত্রবিদগণ "নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্'র কাছে সপেঁ দিয়ে নিরাপত্তা লাভ করা" অর্থ গ্রহণ করেছেন। যেমন আল্লামা রাগিব আল ইস্ফাহানী (রহ.) বলেন-

الاسلام في الشرح علي ضربين أحدهما دون الايمان وهو الاعتراف باللسان ربه يحقن الدم حصل معه الاعتقاد اولم يحصل واياه قصد بقوله (قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) والثانى فوق الايمان وهو ان يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاه بالفعل واستسلام في جميع ماقض وقدّر كما ذكر عن ابراهيم عليه السلام فى قوله (اذ قال له ربّه اسلم قال اسلمت لربّ العلمين) -

"শরী'আতের পরিভাষায় ইসলাম দু'ধরনের। তম্মধ্যে এক প্রকার -ঈমানের নিম্নস্তরে। সেটা হল, মুখে স্বীকার করা। এ ব্যাপারে বিশ্বাস থাকুক বা না-ই থাকুক এ দ্বারা রক্ত তথা প্রাণের নিরাপত্তা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীতে সেটাই উদ্দেশ্য قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا "আরব্য বলে যে, আমি ঈমান এনেছি; (মাহবুব) আপনি বলুন, 'তুমি ঈমান আন নি; তুমি বল- আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।"[৩৫৬] আর দ্বিতীয়টি- ঈমানের উর্ধ্বতম। সেটা হল, আন্তরিক বিশ্বাসে স্বীকার, কার্যত: পূর্ণ করা এবং আল্লাহ্'র আনুগত্য করা সে সবে; যা তিনি চূড়ান্ত ও নির্ধারণ করেছেন। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর ব্যাপারে তাঁর বাণী اذ قال له ربّه اسلم قال اسلمت لربّ العلمين "স্মরণ কর, যখন তাঁকে তাঁর প্রভু বলেছিলেন- তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি সৃষ্টিজগতের প্রভুর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি[৩৫৭]।"

প্রকৃত অর্থে, প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের মত গুটি কয়েক রীতি-নীতি ও উপাসনাতে ইসলাম সীমাবদ্ধ নয় এবং চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধও নয়; বরং মানুষের চিন্তা-কর্মের নির্দেশনার এক সামগ্রিক নাম। যদিও কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এ সবই ইসলামের রুকন বা মূলভিত্তি। কিন্তু এখানে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগীর নির্দেশনা ও ব্যবস্থা এমন যে, মানুষের প্রতিটি মুর্হূত সেই পবিত্র সত্তার স্মরণ-চিন্তা এবং তাঁরই সন্তুষ্টি অন্বেষায় অতিবাহিত হয়। ফলে মানুষের অর্ন্তনিহিত শক্তির সম্যক স্ফুরণ ঘটে বলে ইসলামকে দ্বীন-ই ফিত্‌রাত তথা স্বাভাবিক বা সহজাত ধর্ম বলা হয়। মানব স্বভাবের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য যা প্রয়োজন, তা-ই ইসলাম বা শান্তির নীতি। জড়ে, চেতনে, চৈতন্যে-সর্বত্র এ নীতি পরিস্ফুটিত। গোটা বিশ্বে এক স্বাভাবিক সংহতি, সংগতি, ঐক্য পরিব্যক্তকরণে এ শান্তি ক্রিয়াশীল। নীতি ও বিশ্বাসের সার্থক রূপায়নের ক্ষেত্রে এটি এক স্বাভাবিক তাগিদ।

উপরন্তু তাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার বাস্তবধর্মী সহজ-সরল পথ ও মত। হযরত মোল্লা জীওয়ান (রহ.) ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

---

৩৫৬. আল কুরআন, ৪৯ : ১৪

৩৫৭. আল কুরআন, ০২ : ১৪

هذا صادق على شريعة محمد ﷺ لانها متواسطة الافراط الذى فى دين موسى عليه السلام والتفريط الذى فى دين عيس عليه السلام وعلى عقائد اهل السنة والجماعة فانها متواسطة بين الجبروالقدر وبين الرفض والخروج وغيرها وعلى طريق سلوك جامع بين المحبة والعقل فلايكون عشقا محضا مفيضا الى الجذب ولا عقلا صرفا موصلا الى الالحاد والفلسفة -

"সেটা ইফরাত (সীমাতিরিক্ত) ও তাফরীত (অপ্রতুল) এর মাঝামাঝি আর এটি হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র শরী'আতের ক্ষেত্রে প্রকাশমান হয় বিধি-বিধান আরোপে; কেননা, এটা প্রকৃতিগতভাবে হযরত মূসা (আ.) এর অনুসারীদের জন্য আরোপিত সাধ্যাতীত বিধান ও হযররত ঈসা (আ.) এর অনুসারীদের জন্য বর্ণিত মামূলী বিধানের মধ্যস্থিত, মূলধারা তথা আকাঈদ বা বিশ্বাসেও; কারণ, ইসলামে আর্বিভূত মতবাদ তথা জাবারিয়া, কাদরিয়া, রাফেযী, খারেজী প্রভৃতি হতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের মতাদর্শ মধ্যখানে অবস্থিত, আচরণ-উপায় অবলম্বনে ভক্তি ও যুক্তিপূর্ণ, কাজেই এটি মত্ততায় প্রবাহমান কেবল ইশ্‌ক এবং নাস্তিকতা; দর্শনে ধাবিতকারী শুধু যুক্তি নির্ভর নয়।"[৩৫৮]

মূলত ইসলামের পূর্ণতা, বাস্তবতা ও সার্থকতা তখনই হবে, যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে সর্ম্পক নিবিড় থাকবে। তাঁকে ছাড়া সবকিছুই অমূলক; বরং তাঁকে কেন্দ্র করেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানদের ইবাদত-বন্দেগী সবকিছুতেই তাঁর সর্ম্পক অতি নিগুঢ়। অর্থাৎ ইসলামে এমন কিছু নেই; যেখানে তাঁর অংশীদারত্ব অনুপস্থিত আছে। ধরা যাক, ইসলামের অন্যতম রুকন নামাযের কথা; কেহ যদি মনে করে, আল্লাহ্ তা'আলা দৈনিক যে পাঁচ ওয়াক্ত  নামায ফরয করে দিয়েছেন, সে শুধু ফরয রাক'আত গুলো আদায় করবে, ঐ সকল রাক'আতের আগে-পরের সুন্নাত-নফল নামাযগুলো আদায় করবে না। তারপরও সে সব ফরয নামাযে তাঁর অংশীদারত্ব ও উপস্থিতি বিদ্যমান। কেননা, এ সকল ফরয রাক্'আতগুলো বর্ণনা করার আগে তিনি নিজেই আদায় করে নেন। যাতে ফরয আদায়ের সাথে সাথে অনায়সে তাঁরই অনুসরণ হয়। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে অনুসরণের মধ্য দিয়ে সত্যায়ন করা-ই প্রকৃত অর্থে ইসলাম। এ কারণে মুফ্‌তী সৈয়্যদ আমীমুল ইহসান (রহ.) বলেন-

فى الدّر المختار هو لتصديق سيدنا محمد صلى الله عيه وسلم فى جميع ما جاء به عن الله تعالى ما علم مجيئه ضرورة اى بداهة

"দুর্‌রুল মুখতার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলাম হচ্ছে- সৈয়্যদুনা মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, যে গুলো নিয়ে আসার ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে জানা হয়েছে, সবকিছুই  সত্যরূপে বিশ্বাস করা ।"[৩৫৯]

অতএব হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে শুধু নবী-রাসূল এটুকু মনে ধারন করার নাম ইসলাম নয়; বরং তাঁর যাত ও সিফাতসমূহ বিনা তর্কে স্বীকার করা, সকল দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত; সর্ব গুণে গুণান্বিত মর্মে আন্তরিক বিশ্বাস করা, সর্বোপরি তাঁরই  নির্দেশনা অনুসরণ-অনুশীলন করাই প্রকৃত ইসলাম।

---

৩৫৮. আহমদ মোল্লা জীয়ন, *নূরুল আনওয়ার*, (ঢাকা : ইমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৬), পৃ. ০২

৩৫৯. সৈয়্যদ আমীমুল ইহসান, ***ক্বাওয়াঈদ আল ফিক্বহ্,*** (ইউ.পি.: আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি.) পৃ. ১৭৭

**ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ**

- আল্লাহ্'র প্রতি এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা, তিনি এক, অদ্বিতীয় স্রষ্টা ; তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি অনন্ত-অসীম, চিরন্তন-চিরঞ্জীব, সর্বশক্তিমান, সকল প্রশংসা ও গুণাবলীর আধার। এভাবে তাঁরই পবিত্র প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ইসলাম।
- এ কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যে,হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং আল্লাহ্'র প্রেরিত রাসুল ও প্রিয় বান্দা। এ নবীর মহত্ত্বই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।
- হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহ পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রতি অকুন্ঠ ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ।
- মানব জীবনের কোন দিক ইসলামের বাইরে নেই। ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে মানুষের ইহ ও পরকালীন মঙ্গল বিধান করে।
- দ্বীন ও দুনিয়া, জাগতিক ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।
- প্রবৃত্তির বিনাশ নয়; বরং পরিশুদ্ধির মাধ্যমে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন বিধান করে।
- মহানবী (সা.)'র যুগে যা অবতীর্ণ ও নির্ধারিত হয়েছে, তা এখনও আগের মত বলবৎ ও জীবন্ত।
- আধুনিক জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে ইসলাম অদ্বিতীয় বিধান। তাই যুগ যুগ ধরে এটি শাশ্বত আদর্শ, অজেয় ও ভারসাম্যপূর্ণ।
- প্রকৃতিগত রূপে ইসলাম মূলত সহজ ও গণতান্ত্রিক। সামান্যতম চিন্তাশক্তি দিয়েই তা হৃদয়াঙ্গম করা যায়। কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি নেই।
- কালিমা-ই তৈয়্যবাহ (كلمة طيبة)'র অন্তর্ভূক্ত বিশ্বাসের দু'টি মৌলিক নীতির স্বীকৃতি ঘোষণাই দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ভ্রাতৃত্বের দ্বার খুলে দেয়, যেখানে সব মানুষই সমান; শুধু তত্ত্বে নয়, প্রচলনেও।
- দ্ব্যর্থকতার সন্দেহ হতে মুক্ত। অকপটতা, অকৃত্রিমতা এবং খাঁটিত্বে অনন্য।
- মানবতা, সভ্যতা ও অধিকার ইসলামে পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত।
- স্বাভাবিকতা এমন যে, একজন শিশুকে নিজের মত ছেড়ে দিলে তার মাঝে তা-ই বিকশিত হবে।
- মানুষের বুদ্ধি, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, উৎসাহ-উদ্দীপনা পূর্ণভাবে স্বীকৃত।
- মানুষের মাঝে নৈতিক চেতনা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে।
- পরমত সহিষ্ণুতার শিক্ষা ও কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। তাই মুসলিম ও ইসলামী রাষ্ট্রে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে পালন পরিদৃষ্ট হয়।
- ইসলামের কোন বিষয় কাল্পনিক ও অযথা নয়; বরং প্রতিটি বিষয় মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বাস্তব সম্মত। অদৃশ্যমান বিষয়াদি প্রকৃতি ও ঐশীগত যুক্তি দ্বারা সাব্যস্ত।

- ইসলামে কোন পৌরহিত্যবাদ-মৌল্লাবাদ নেই, যে কেউ ইচ্ছা করলে ধর্মীয় কর্ম পালন-পরিচালনার পাশাপাশি ইসলামের অনুমোদিত সমাজ-জীবনের সকল কর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারে; বরং সেটাও ধর্ম-কর্মের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ইসলাম চার দেওয়ালে আবদ্ধ নয়।
- ইসলামের বিধান মতে প্রতিটি মানুষ সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের ক্ষেত্রে তার ন্যায্য অংশ লাভ করে।

মোটকথা, প্রচলিত 'ধর্ম' অর্থের উর্ধ্বে 'ইসলাম' শুধু নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ এমন এক সুন্দর, স্বভাবজাত, স্বতঃস্ফূর্ত, প্রকৃতিগত, গতিময়, আধ্যাত্মিক ও বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা, দর্শন ও বিধি-বিধান; যা সর্বকালের সকল মানুষ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে।

**ইসলামের স্বরূপ**

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

ماكان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين-

"ইব্রাহীম ইহুদীও ছিলেন না, খ্রীস্টানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন আজ্ঞাবহ মুসলমান আর তিনি মুশরিকও ছিলেন না।"[৩৬০]

وصّى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله اصفطى لكم الدين فلاتموتن الا وانتم مسلمون-

"ইব্রাহীম সন্তানদের প্রতি এ অছিয়ত করেছেন আর ইয়াকুবও; 'হে আমার সন্তানগণ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ ধর্ম মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃতবরণ কর না"।[৩৬১]

من احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا

"সে ধর্মের দিক দিয়ে উত্তম, যে আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্ট হয়েছে এবং সৎকর্মশীল। এ অবস্থায় যে, সে ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"[৩৬২]

واذ اخذ الله ميثاق النبي لما اتيتك من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلك اصرى قالوا اقررنا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله اسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون -

"আর স্মরণ কর! যখন আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন; আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তোমাদের সাথে যা আছে; তা সত্যায়নকারী একজন রাসূল যখন আসবেন, তোমরা তাঁর প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি স্বীকার কর, এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণ কর! তাঁরা উত্তর

৩৬০. আল কুরআন, ০৩ : ৬৭
৩৬১. আল কুরআন, ০২ : ১৩২
৩৬২. আল কুরআন, ০৪ : ১২৫

দিলেন, আমরা স্বীকার করি। বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী হয়ে যাও, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম। অতঃপর যে সব লোক এই অঙ্গীকার হতে মুখ ফিরে নিবে, তারাই অবাধ্য। তারা কি আল্লাহ্'র দ্বীন ভিন্ন তালাশ করে অথচ আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবই স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তাঁরই অনুগত আর তাঁর দিকে ফিরে যাবেই।"[৩৬৩]

شرع لكم من الدين ماوصّى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصّينا به ابراهيم موسى وعيسى من اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما بدعوهم اليه-

"তিনি তোমাদের জন্য ধর্মের ঐ পথকে নির্ধারণ করলেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছেন আর যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি, যার আদেশ আমি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছি যে- দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর; তাতে ফির্কাবন্দী কর না আর মুশরিকদের জন্য তা-ই খুবই দুরূহ; যার প্রতি তাদেরকে আপনি ডাকেন।"[৩৬৪]

এ সব আয়াতের মর্ম হল এই যে, যুগ যুগ ধরে যত নবী-রাসূল ভূ-পৃষ্ঠে শুভাগমণ করেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান। তাঁরা ইসলাম প্রচারের জন্যই আদিষ্ট ছিলেন। এ ব্যাপারে সবাই ছিলেন একমত। তাঁরা নিজেদের মনগড়া কিংবা উদ্ভাবিত কোন ধর্ম প্রচার করেননি। তাঁদের প্রচারিত মৌলিক বিষয় ছিল একই; আর তা হল:

ক. নবীকুল শিরোমনি শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র শুভাগমনের বার্তা প্রদান ও তাঁর (সা.) আনুগত্যের আহবান। তাঁদের স্ব স্ব গোত্রের লোকেরা যাতে তাঁকে চিনতে পারে, সে লক্ষ্যে তাঁর সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

খ. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র শুভাগমণের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও মতাদর্শ তথা তাওহীদ বা এক আল্লাহ্'র ইবাদত সম্পর্কে অবহিত করা।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সাধারণত আমরা দেখি কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যখন অন্য দেশে যাওয়ার ইচ্ছা করেন; তখন সেখানকার পরিবেশ তাঁর অনুকূলে করার জন্য ঐ দেশে গমনের আগে ধাপে ধাপে কিছু দূত প্রেরণ করে থাকেন। তাঁরা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় রাষ্ট্র-প্রধানের আগমন র্বাতা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মতাদর্শ সম্পর্কে অবহিত করেন। একই সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস পান। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়বন্ধু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে এ ধরায় প্রেরণের আগে প্রত্যেক গোত্র-জাতির মাঝে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেমন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

انا ارسلنك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امّة الا خلا فيها نذير

"নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদ দাতা ও সর্তককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর অবশ্যই সব কটি উম্মতেরই মাঝে একজন সতর্ককারী গত হয়েছেন।"[৩৬৫] তিনি আরো বলেন-

ورسولا قد قصصنا هم عليك من قبل ورسولا لا نقصص عليك

---

৩৬৩. আল কুরআন, ০৩ : ৮১

৩৬৪. আল কুরআন, ৪২ : ১৩

৩৬৫. আল কুরআন, ৩৫ : ২৪

"অনেক রাসূল ; যাদের বর্ণনা আমি ইতিপূর্বে আপনার নিকট দিয়েছি। আরো অনেক রাসূলের বর্ণনা আমি আপনাকে দিই নাই।"[৩৬৬] অন্যত্র বলেন-

ومارسلناك من قبل الا رجالا نوحى اليهم من اهل القرى

"(রাসূল) আপনার পূর্বে জনপদে আমি অনেক লোককে প্রেরণ করেছি; যাঁদের নিকট আমি ওহী নাযিল করেছি।"[৩৬৭]

আরো উল্লেখ আছে-

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون

"(রাসূল) আপনার আগে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নি; হ্যাঁ, তবে আমি ওহী অবতীর্ণ করেছি যে, আমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, কাজেই আমার ইবাদত কর।"[৩৬৮] আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে-

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت

"নিশ্চয় আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছি; যাতে তোমরা আল্লাহ্'র ইবাদত কর এবং শয়তান হতে বাঁচ।"[৩৬৯]

অন্যত্রে আছে- لكل قوم هاد

"প্রত্যেক গোত্রের জন্য হিদায়াতকারী রয়েছেন।"[৩৭০]

পূর্বেকার নবী-রাসূলগণ প্রচারিত ধর্ম ছিল মূলত ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা। যদিও পরবর্তীতে নবী-রাসূলগণের প্রচারিত ঐ সকল ধর্ম বিভিন্ন নামে অবহিত হয়েছে, কম-বেশী রদ-বদলও হয়েছে। তবে গ্রন্থসমুহের মধ্যে এক অখণ্ড যোগসূত্র নির্দেশ করে এবং মৌল ঐক্য স্থাপন করে। সেটা হল তাওহীদের বাণী; যেটা ইসলামেরই মূলমন্ত্র। যেমন: আল কুরআনে উল্লেখ আছে যে-

قل يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولانشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله

"হে রাসূল (সা.) আপনি বলুন! ওহে ঐশী গ্রন্থানুগামীরা, এসো এমন একটি কলেমার দিকে; যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের। (সেটা হল) যেন আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত না করি, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক না করি, তিনি ব্যতীত একে অন্যকে রব (প্রভু) হিসেবে গ্রহণ না করি।"[৩৭১]

কিন্তু যুগে যুগে মানুষের চিন্তা-চেতনার ক্রমবিকাশ ও বোধগম্যতার পরিধি অনুসারে এ ইসলাম ধাপে ধাপে ব্যাপক পরিসরে উদ্ঘাটিত হয় আর শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র নিকট এসে পূর্ণতম রূপে বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব ইসলাম একটা সামগ্রিক জীবনাদর্শ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সে-ই আদর্শের চূড়ান্ত রূপ। যেহেতু তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হন। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

---

৩৬৬. আল কুরআন, ০৪ : ১৬৪
৩৬৭. আল কুরআন, ১২ : ১০৯
৩৬৮. আল কুরআন, ২১ : ২৫
৩৬৯. আল কুরআন, ১৬ : ৩৬
৩৭০. আল কুরআন, ১৩ : ০৭
৩৭১. আল কুরআন, ০৩ : ৬৪

وما ارسلناك الا كافّة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون

"আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সর্তককারী রূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৩৭২] মহান আল্লাহ্ বলেন-

قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعًا

"হে রাসূল আপনি বলুন, ওহে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার নিকট আল্লাহ্'র রাসূল।"[৩৭৩]

এ কারণে হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র শুভাগমনের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে যায়। কেননা, সেগুলো কোন বিশেষ গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখে প্রচারিত হয়েছিল। অতঃপর ইসলাম পূর্ববর্তী সব ধর্মের সব সত্য পরম সত্যরূপে সমন্বিত ও পরিপূর্ণ হয়। ইসলামের ক্রমবিকাশের এ ধারাটি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কেই কেন্দ্র করে রচিত ও প্রতিষ্ঠিত। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। এ ধারা একটি জ্যামিতিক বৃত্ত স্বরূপ। একটি বৃত্ত কতিপয় বিন্দুর সমষ্টি। একটি বিন্দু হতে আরম্ভ হয়ে আবার যখন সেই বিন্দুতে ঘুরে আসে, তখন বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়, তৎপরে আর কোন বিন্দু থাকতে পারে না। এ জন্য মহানবী (সা.)'র পরে কোন নবী-রাসূল নেই। যদিও তিনি হযরত আদম (আ.) এর পরে সকল নবী-রাসূলের শেষে যমীনে আগমন করেছেন, তথাপি তিনি সবার আগে সৃষ্টি হয়েছেন এবং নবীও ছিলেন।[৩৭৪] মহানবী (সা.) এরশাদ করেন- اوّل ما خلق الله نوري

"আল্লাহ্ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা হল আমার নূর।"[৩৭৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে,

ياجابر ان الله تعالى قد خلق قبل الا شياء نور نبيك من نوره

"হে জাবির! আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর আগে তাঁর নূর থেকে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"[৩৭৬]

ইসলামের ক্রমবিকাশের এ ধারাবাহিকতায় যুগে যুগে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল ও ঐশীগ্রন্থের উপর সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামের অপরিহার্য অংশ। তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)'র শুভাগমণের পর পূর্বেকার প্রচারিত কোন ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি মুসলমান নয়। কারণ ঐ ব্যক্তি ঐ সকল ধর্মের উক্ত মৌলিক বিষয় ও মতাদর্শ হতে বিচ্যুত। আবার মহানবী (সা.) কে শুধু আল্লাহ্'র প্রেরিত শেষনবী-রাসূল এবং তাঁর গুণাগুণ সম্পর্কে জানার প্রেক্ষিতে ইসলাম গ্রহণের দাবীও স্বীকৃত নয়; বরং তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের মাঝে প্রকৃতরূপে এ দাবী সাব্যস্ত হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم

---

৩৭২. আল কুরআন, ৩৪ : ২৮

৩৭৩. আল কুরআন, ০৭ : ১৫৮

৩৭৪. আবুল ফদ্বল আবদুল কাদির ইবন আল হুসাইন আল শাযলী, *আল কাওয়াকিব আল যাহিরা ফী ইজতিমাঈ আল আউলিয়া ইয়াক্বযাতান বি সায়্যিদ আল দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম*, (কায়রো: দারু জাওয়ামিউল কালিম, ১৯৯৯) পৃ. ৪৮

৩৭৫. মোল্লা আলী ক্বারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৭

৩৭৬. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, *মাদারিজুন নবুয়্যাত* (লায়েলপুর : মাক্তাবা-ই নূরীয়া রিযভীয়া, তা. বি.) খ. ২, পৃ. ০২

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁর পরিচয় এরূপে জানে; যেরূপে তাদের সন্তানদের তারা জানে।"[৩৭৭]

সুতরাং মহানবী (সা.)'র নির্দেশনা অনুসরণে মহান স্রষ্টার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী জানা ও বিশ্বাস করা মূলত আল্লাহ্'র ইচ্ছার কাছে সর্বতোভাবে নিজকে বিলীন করা বুঝায়। এটাই ইসলামের প্রকৃত মর্ম। এখানে আল্লাহ্'র প্রেম, ঈমান আনয়ন করা ও তাওহীদের দাবীর বাস্তবতা যথার্থ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

ما اتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوه

"যা তোমাদের নিকট রাসুল নিয়ে এসেছেন; তা তোমরা ধর, আর যা হতে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক।"[৩৭৮]

ভাষান্তরে বলা যায়, মহানবী (সা.)'র মাঝেই ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শ নিহিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الاخر وذكر الله كثيرًا

"নি:সন্দেহে রাসূলুল্লাহর মাঝে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের আশা রাখে আর আল্লাহকে অত্যাধিক স্মরণ করে।"[৩৭৯]

সারকথা, মানবের দিক-নির্দেশনা ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ঐশীবার্তা নিয়ে যে সব ধর্ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, ইসলাম তম্মধ্যে সর্বশেষ। কুরআনও সর্বশেষ চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ এবং এক মহান ভাবাদর্শ, মহানবী (সা.) সেই ভাবাদর্শের অভিব্যক্তি আর এ দু'য়ের মহাসম্মিলনের মূল নির্যাস-ই ইসলাম।

এভাবেও বলা যায়, কুরআন ও হাদীস ইসলামের দু'টি মৌলিক ও অকাট্য উৎস আর এ দু'টোর অন্য নাম ওহী; যা একই বক্ষ হতে নিসৃত এবং একই মুখ হতে শ্রুত। এ সবই তাঁর থেকে উৎসারিত। ইসলাম নামটি রাসূল (সা.)'র জীবনাদর্শ মাত্র।

অতএব মহানবী (সা.)'র পবিত্র যাত-সিফাতই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বান্দার সর্বাত্মক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করার মেলবন্ধন। একমাত্র তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সর্ম্পক স্থাপন সম্ভব। এটাই ইসলামের আসল রূপ।

## ইসলাম ও মুসলিম দর্শন

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়; বরং একটি দর্শনও। যদিও ধর্ম এবং দর্শন দু'টো আলাদা বিষয়; লক্ষ্য তবে অভিন্ন, তা অর্জনের উপায়ও আবার এক নয়। ধর্ম নিতান্তই বিশ্বাস ও ভক্তির, অন্যদিকে দর্শন একটি বিশুদ্ধ চিন্তা বা মননশীলতার ব্যাপার।[৩৮০] তাই ধর্ম বিশ্বাসভিত্তিক আচরণ ও অনুশীলন আর দর্শন বুদ্ধিভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে। এ জন্য দর্শন যেখানে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বুদ্ধি-যুক্তি দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করে, সেখানে ধর্ম মেনে নেয় সরল বিশ্বাসে। কিন্তু এ বিশ্বাসের সাথেও জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির যোগাযোগ থাকে সবসময়ই, তবে তা স্পষ্ট নয়। ফলে ধর্ম

৩৭৭. আল কুরআন, ০২ : ১৪৬; ০৬ : ২০

৩৭৮. আল কুরআন, ৫৯ : ০৭

৩৭৯. আল কুরআন, ৩৩ : ২১

৩৮০. ড. আমীনূল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবস্তান, ৫ম প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ০৬

বিশ্বাস ও ভক্তির সাথে যুক্ত আবেগকে দর্শনের যুক্তি প্রসূত চিন্তাধারায় বিচারে পরিস্ফুট ও বোধগম্য করা হয়। কাজেই ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিকে মজবুত করতে দর্শন ধর্মের জন্য একটি বিচারমূলক তত্ত্বাবধান মাত্র।

এ কথা ঠিক যে, দর্শন মানুষের চিন্তাধারাকে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত করে পরিচ্ছন্নতা দান করে। কিন্তু দর্শনের ভূমিকা তখন নিছক চিন্তার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। এ ধরনের দর্শন মানুষকে সুষ্ঠু জীবনদর্শন দান করতে পারে না, নৈতিক মূল্যমানের কোন সুষ্ঠু মাপকাঠিও দিতে পারে না, এমনকি মানুষের সত্ত্বাকে আন্দোলিত করতেও ব্যর্থ হয়। তবে চিন্তার পদ্ধতি হিসেবে দর্শনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।[৩৮১] পক্ষান্তরে মানব প্রকৃতি এমনভাবে সৃষ্ট যে, ভাল-মন্দের ধারণা ও জীবন সত্ত্বা সম্পর্কে বোধ শক্তি মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। এটা তার প্রকৃতিগত। যেখানে মানুষ আছে, সেখানে তার ধর্ম আছে। কাজেই মানব জীবনের বিচিত্র সমস্যার যৌক্তিক নিরসনে যখন অনুসন্ধান করা হয় তখন বিশ্বাস ও বুদ্ধির; প্রত্যাদেশ ও প্রজ্ঞার; এক কথায় ধর্ম ও দর্শনের সেতু বন্ধন রচিত হয়। সে-ই ধরনের জীবন ধারনের উপায় ও দিক-নির্দেশনা হল ইসলাম।

অন্যভাবে বলা যায়, সাধারণত একটা জীবনদর্শনে দু'টো দিক থাকে, একটি হল বাস্তব ও ব্যবহারিক; অন্যটি দার্শনিক। যে জীবন দর্শনের মাঝে বাস্তব ও দার্শনিকের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটে এবং এ দু'টো দিকে যতবেশী আড়ষ্ট হয়; ততখানি জীবন্ত ও সার্থক হয়। কারণ এতে জীবনের বিচিত্র গতি ও অনুভূতি ষোলকলায় পূর্ণ হয়। আর যখন দার্শনিক দিকটা বেশী প্রভাব বিস্তার করে; তখন জীবনদর্শন তার সুষমা আবহ হারিয়ে ফেলে, শুষ্ক মরমীবাদে পর্যবসিত হয়। দর্শনের নিরব নিভৃত কোটায় চলে তার আনাগোনা। কিন্তু সংগ্রামী ও প্রতিশ্রুতিশীল মানুষের জীবনে তা আর কোন প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে না। আবার ব্যবহারিক দিকটা যখন নিয়ম-কানুন ও আনুষ্ঠানিকতার অহেতুক চাপে জর্জরিত হয়, তখন তা কুসংস্কার ও প্রাণহীন আচার-ব্যবহারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। খোলসটুকুই তার অবশিষ্ট থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রচলিত সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই জীবন্ত। দার্শনিক ও ব্যবহারিক; বাস্তবিক ও আধ্যাত্মিক সবকিছুর অপূর্ব সমন্বয়ে জীবনের অনুপম দীপ্তি ইসলামে প্রতিভাত হয়।[৩৮২] এতে সহজাত এমন কিছু নেই যা একে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং আধুনিক যুগের অনুপযোগী করে তুলতে পারে। এ জন্য ইসলাম কালজয়ী; হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও হুবহু আগের মত সার্বজনীন ও বিশ্বব্যাপী তার গ্রহণযোগ্যতা বর্তমান। অবকাঠামোর কোন পরিবর্তন নেই, আকর্ষণেও কমতি নেই। শুধু মুসলিম মনীষীগণ তাঁদের চিন্তা-চেতনা দিয়ে এ ধর্মকে করেছেন পরিস্ফুটিত।

এটি কেবল বিশ্বাস বা কেবল বুদ্ধি নির্ভর নয়; বরং উভয়টির সমাবেশ ঘটেছে এ ধর্মে। সে জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ও ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাসের উপর র্নিভর করে বসে থাকা, বৈরাগী বা সন্নাসী জীবন-যাপন করা ইসলামে সিদ্ধ নয়। আবার ইসলামে এমন কতগুলো বিষয় আছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে শুধু যুক্তি প্রসূত বিচার-বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়; বরং ভক্তি ও বিশ্বাসে মেনে নিতে হয়। যেমন আল কুরআনের মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভূক্ত আয়াতসমূহ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

---

৩৮১. ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০০৭ খ্রি.) ৩য় সংস্ক., পৃ. ৪৭
৩৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

هوالذى انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هنّ ام الكتاب واخر متشابهات فامّا الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الا لباب -

"তিনিই হন, যিনি আপনার উপর এ কিতাব (আল কুরআন) অবতারণ করেছেন, এর কতেক আয়াত সুস্পষ্ট অর্থবোধক; সেগুলো কিতাবের মূল এবং অন্যগুলো হচ্ছে-ঐসব আয়াত, যেগুলো দ্ব্যর্থবোধক। অতঃপর যাদের অন্তরসমূহে বক্রতা রয়েছে, তারা দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে থাকে বিভ্রান্তিতে ফেলার ও মনগড়া ব্যাখ্যা তালাশের উদ্দেশ্যে। বস্তুত এর সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌রই জানা আছে আর পরিপক্ক জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরা বলে, আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি; সবই আমাদের প্রভুর নিকট থেকে। বোধ শক্তি সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।"[৩৮৩]

দেখা যায়-'আল কুরআন কাদীম'- কথাটিতে 'আল কুরআন' হল, যা লওহি মাহফূযে সংরক্ষিত আর " আল কুরআন মহানবী (সা.)'র তাত্ত্বিক রূপ বা চরিত"- কথাটি অর্থ, যে 'আল কুরআন' লওহি মাহফূযে সংরক্ষিত সে-ই আল কুরআনেরই রশ্মি; যা প্রিয়নবীর পবিত্র বক্ষে ঢেলে দেয়া হয়েছে, তাঁর পবিত্র মুখ হতে নিসৃত হয়েছে, আমরা মাসহাফে (গ্রন্থাকারে কাগজে) অবলোকন করি, এটি সৃষ্ট; কিন্তু এ আল কুরআন এবং লওহি মাহফূযে সংরক্ষিত সে-ই আল কুরআন ভিন্ন বা পৃথক কিছু নয়, শব্দ এবং ভাব দু'টোই আল কুরআন। তাই এ আল কুরআনের ন্যায় মহানবী (সা.) কে তা'যীম-সম্মান করা, ভক্তি-শ্রদ্ধা করা ইবাদত রূপে পরিগণিত। বর্ণিত আছে যে, "মহানবী (সা.) কে জমা'আতে শরীক হতে আসতে দেখে তারই সম্মানে হযরত আবু বকর (রা.) নামাযে ইমামতি করা অবস্থায় জায়নামায হতে সরে দাড়াঁন।" [৩৮৪] হযরত আবু বকর (রা.)'র এ অবস্থাটি নামাযে কিরাত তথা আল কুরআন তিলাওয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ করার ন্যায় ইবাদত রূপে পরিগণিত হল। অর্থাৎ নামায একটি ইবাদত আর এ ইবাদতের মাঝে আল কুরআন তিলাওয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ ইত্যাদি ইবাদত অর্ন্তভূক্তির মত মহানবী'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন আরেকটি ইবাদত হল। সুতরাং একটি ইবাদতের মাঝে আরেকটি ইবাদত অর্ন্তভূক্তি শরী'আত সম্মত। অধিকন্তু আল কুরআনের সত্যতা মহানবী (সা.) কে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত। সে জন্যে মক্কার কাফির-মুশরিকদের মনে-প্রাণে যখন তাঁর সত্যতার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্ম লাভ করে এবং এ কথা তাদের বদ্ধমূল হয় যে, মুহাম্মদ (সা.) নি:সন্দেহে 'আল সাদিক আল আমীন' তথা চিরসত্য ব্যক্তিত্ব, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর আল কুরআন অবতীর্ণ করেন। কাজেই মহানবী'র পবিত্র সত্ত্বার নিষ্কলুষতা স্বীকার করার মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী 'আল কুরআনের' সত্যতা বিশ্বাসের বাস্তবতা।

এভাবে ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সমর্থনে ও স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করা এবং বুদ্ধির আলোকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করার চেষ্টা-ই ধর্মতত্ত্ব। এ পর্যায়ে গভীর বিশ্বাস পূর্বগামী আর বিচার-বিশ্লেষণ অনুগামী। তবে প্রণালী বা পদ্ধতিগত ভাবে এর সাথে ধর্মদর্শনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যদিও এ দুটোর বিষয়বস্তু এক। যেহেতু ঐ সব ধর্ম বিশ্বাস ও আচরনের বাস্তবতা এবং

---

৩৮৩. আল কুরআন, ০৩ : ০৭

৩৮৪. মহানবী (সা.)'র জীবদ্দশায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) দু'বার নামাযের ইমামতি করেন। প্রত্যেকবারই এরূপ ঘটেছিল। (আহমদ ইবন শু'আইব আন নাসায়ী, *সুনান-ই নাসায়ী* (দিল্লী : মাকতাবা-ই আশরাফীয়া - তা.বি.) পৃ. ৯০-৯১; মুহাম্মদ বিন ইসমাঈ'ল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

স্বার্থকতা যুক্তির আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা; যাচাই-বাচাই করে দেখার নাম ধর্মদর্শন।[৩৮৫] যা ধর্মকে পরিণত করে রূপ-রসে পরিপূর্ণ। এতে বিচার-বুদ্ধি; যুক্তি-তর্কের প্রাবল্য থাকে কিন্তু ধর্মীয় চেতনাবোধ থেকে স্বতঃ উৎসারিত। ঐ ধর্মে যখন প্রত্যাদেশ থাকে তখন তার অনুসারীদের মাঝে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগরণ ও ভাব জগতের উদ্দীপনা সঞ্চারে সাহায্য করে। ফলে এ রূপ ধর্মই প্রকৃত ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তিএনে দিতে পারে। ইসলাম হচ্ছে সে-রকমই; আর এতে যে দর্শন রয়েছে, সেটা আল কুরআন ও হাদীসে বিধৃত নির্দেশনা অনুযায়ী বলে এটাকে ইসলামী দর্শন বুঝায়।[৩৮৬] যার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম দার্শনিকগণের হতে যাঁরা ইসলামের মূলধারা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা সবাই যুগশ্রেষ্ঠ স্বনামধন্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী (রহ.)'র নাম দর্শন শাস্ত্রে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁরা আল কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে সংগতি রেখে ক্রমবর্ধমানে পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতিতে যুগে যুগে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে তাঁদের চিন্তা সন্নিবেশিত করেন। এরূপে ব্যাপক পরিসরে যা আমরা পাই, তা হল মুসলিম দর্শন। ভাবের সাথে কর্মের; জীবনের সাথে জগতের; সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্মিলনের মধ্যেই মুসলিম দর্শনের মূল সুর অর্ন্তনিহিত।

### ৩.১.৫ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ধর্মীয় চিন্তা ও প্রায়োগিক বাস্তবতা

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের মহান দিকপাল। শৈশব কাল থেকে তিনি ধর্মীয় পরিবেশে লালিত-পালিত হন এবং আধ্যাত্মিক চেতনা ও ছিল তাঁর মধ্যে প্রবল। মায়ের গর্ভের অলি হিসেবে তিনি পৃথিবীতে শুভাগমন করলে ও ইবাদত-বান্দেগীর প্রতি তাঁর নিয়মানুবর্তিতা, তাঁর অনুসারিদের জন্য মডেল ছিল। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, যিকির আজকার মিলমিলার সবক ওয়াজিফা আদায়ের ব্যাপারে নিয়ে যেমন সদা সচেতন তেমনি তাঁর অনুসারীদেরকে দিতেন কঠিন ভাবে তাগিদ। একজন মানুষকে পরিপূর্ণ মুসলমান বানানোর লক্ষে তিনি তা'লিম দিতেন 'উয়হ কাম করেঙ্গে জিস্ সে আল্লাহ্-রাসূল রাজি হোঁ আওর উয়হ্ কাম নেহী করেঙ্গে জিস্ সে আল্লাহ্-রাসূল না-রায হোঁ'[৩৮৭] অর্থাৎ- ওই কাজ করব যে কাজে আল্লাহ্-রাসূল সন্তুষ্টি এবং ওই সমস্ত কাজ করব না যে কাজে আল্লাহ্-রাসূল অসন্তুষ্ট। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ বিভিন্ন ধরণের নফল ইবাদতের মাধ্যমে তিনি সমাজে এক বিপ্লব সাধন সাধারণ মুসলমানকে নবীপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি যে জশনে জুলূছে ঈদে মিলাদুন্নবীর প্রবর্তন করেছিলেন তা বর্তমানে মুসলিম ঐক্যের এক মহান নিদর্শন হিসেবে ইতি:মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ধর্মচর্চার বিশেষ কিছু দিক তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

---

৩৮৫. ড. রশীদুল আলম, ***মুসলিম দর্শনের ভূমিকা***, (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন- ২০০৯ইং) ষষ্ঠদশ সংস্ক., পৃ. ১৫৫; মোঃ আবদুল হালিম, ***মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ***, (ঢাকা : দিব্য প্রকাশনী, ২০০২), ১ম প্রকাশ, পৃ. ২৭

৩৮৬. ড. আমীনূল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

৩৮৭. মাসিক তরজুমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

### পাঞ্জেগানা নামায

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাঁর প্রিয় মুরীদানদের নিয়ে জামাতের সাথে আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এমনকি সফরের সময়ও এর অন্যথা হত না। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর তিনি তাঁর শিষ্যদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাফসীর পেশ করতেন। যা শোনার জন্য আলেম ওলামা সহ পীর ভাইগণ সদা উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। মাগরিব ও এশার নামাজের সময় তিনি সাধারণত সুরা আম্বিয়ার (১৭ পারা) ১০৫৭ নং আয়াত আর সুরা যুমার এর (২৪ পারা) ৭১-৭৫ নং আয়াত তিলাওয়াত করতেন। প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ শেষে তিনি দোয়ায়ে সালাম আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিন কাস সালাম ওয়া ইলাইকা ইয়ারজিউস সালাম। ফাহাইয়ানা রাব্বানা বিস সালাম, ওয়াদখিলনাল জান্নাতা দ্বারাকা দ্বারাস সালাম, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়াতা আলাইতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম” দিয়ে মুনাজাত করতেন। আর অন্যান্য সময়ে মুনাজাতের বেলায় তিনি সাহ্হিল এয়া ইলাহী আলাইনা কুল্লা সাহ’বিন বিহুরমাতি সায়্যিদিল আবরার” এ দোয়া পড়তেন।

### ঈদের নামাজে ইমামতি

সিরিকোট শরীফে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে /১৩৮০ হিজরির ১ লা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের নামাজে ঈমামতি করার জন্য তিনি স্বীয় পিতা হযরত সিরিকোটি (রহ.) কতৃক নির্দেশ প্রাপ্ত হন।[৩৮৮] এভাবে শুরু হয় তাঁর ঈদের নামাজের ইমামতি পর্ব। সিরিকোট দরবার শরীফ মসজিদে সাধারণত জুমা ও দুই ঈদের নামাজের ঈমামতি করতেন হযরত শাহানশাহে সিরিকোটি (রহ.)। পরে এ গুরু দায়িত্ব লাভ করেন আল্লমা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্র (রহ.)। অবশ্য এর আগে তিনি সিরিকোট দরবার শরীফের জামে মসজিদে রমজান মাসে খতমে তারাবীহর নামাজে ইমামতি করেছেন।

বাংলাদেশেও ঈদুল ফিতরের নামাজে তিনি বেশ কয়েক বছর ইমামতি করেছেন। নামাজের পরে হুযূর (রহ.) বলুয়ার দীঘির পাড় খানকায় অবস্থান করতেন। তাঁর ভক্ত মুরীদানরা ঈদের দিনে হুযূর কিবলার (রহ.) জন্য সাধ্যমত ফিরণি-পায়েস-পোলাও-সেমাই ইত্যাদি হাদিয়া স্বরূপ পেশ করতেন। উপস্থিত সকল ভাইদেরকে নিয়ে তিনি সেগুলি খুশী মনে আহার করতেন।

প্রিয় মুরীদান ও ভক্তদের অনুরোধ রাখতে গিয়ে বর্তমান জমিয়তুল ফালাহ মাঠে ঈদের নামাজের ঈমামতিও করেছেন তিনি। জমিতুল ফালাহ্র প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সম্পৃক্ত ছিলেন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্র (রহ.) কতিপয় ধনাঢ্য মুরীদ ও সাগরীদ। প্রয়োজনীয় অর্থেও যোগান ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে এ মহতী ইসলামী স্থাপনার গোড়া পত্তনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন তারাই। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েক জনের নাম এখানে উল্লেখ করছি তারা হলেন জনাব আলহাজ নূর মোহাম্মদ আল কাদেরী, আলহাজ আমিনুর রহমান আল কাদেরী,আলহাজ ওয়াজির আলী সওদাগর আল কাদেরী, আলহাজ আকরাম আলী খান আল কাদেরী, আলহাজ জাকির হোসেন কন্ট্রাক্টার, আলহাজ সিরজুল ইসলাম সওদাগর, আলহাজ সালেহ আহমদ সওদাগর, আলহাজ মুসলিম ভূঁইয়া প্রমুখ।

---

৩৮৮. শাহ্জাহান মোহাম্মদ ইসমাঈল, *নূরে সিরিকোট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

**তারাবীহ নামাজের ইমামতি**

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে শা'বান মাসে পিতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ (রহ.) এর সফর সঙ্গী হিসেবে প্রথম বার বাংলাদেশ সফরে আসেন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)। প্রথম দিকে হযরত সিরিকোটি (রহ.) শাহী জামে মসজিদের পশ্চিমে নজির আহমদ সড়কে আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ভাড়া বাসায় থাকতেন। এর পর হযরত সিরিকোটি (রহ.) আন্দরকিল্লাস্থ আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের রাউজান- (১৮৯৮-১৯৬২) নিজ ক্রয় করা ভবন কুহিনুর মনজিল তথা কুহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসের নীচ তলায় থাকতেন। স্বভাবত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্র (রহ.) এর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল সেখানেই। অদুরেই ছিল আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ। সে যাত্রায় আন্দরকিল্লাস্থ শাহী মসজিদে তরুণ হাফেযে কুরআন হিসেবে অভিষেক ঘটে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)। সুন্দর সুললিত ও বলিষ্ঠ কণ্ঠের তিলাওয়াতে ২০ রাকাত খতমে তারাবীহ নামাজের ইমামতি করে উপস্থিত সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি সেবার। উল্লেখ্য এটাই ছিল এদেশে তাঁর প্রথম ইমামতি। আবার ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে দাদা হুযূর কিবলার সর্বশেষ সফরে পুত্র তাহের (মু.যি.আ.) নিয়ে পুরো এক মাস ছিলেন তিনি বাংলাদেশে।[৩৮৯]

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ইন্তেকালের পর হুযূর খানকাহ শরীফ ঘাট ফরহাদবেগস্থ জনাব আবদুল জলিল চৌধুরী সাহেবের ১৯০৪-১৯৮৯, শিকলবাহা, পাকিস্তান প্রেসের ভবনের নীচ তলায় স্থনান্তরিত হয়। এখানেও আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) বেশ কয়েক বছর খতমে তারাবীহ নামাজের ইমামতি করেছিলেন। এখানেও তাঁর সুললিত দরাজ কণ্ঠের সুমিষ্ট কুরআন তিলাওয়াত বিগলিত করে দিয়েছিল সব শ্রোতা ও মুসল্লিদের অন্তারকে।

এরপর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে বলুয়ার দীঘির পাড়স্থ আলহাজ নূর মুহাম্মদ আল কাদেরী সাহেবের (১৯১৭-১৯৭৮ বাকলিয়া) বাসভবনের দ্বিতীয় তালায় হুযূরের জন্য খানকাহ শরীফ নির্মাণ করা হয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বলুয়ার দীঘির পাড় খানকার ৩য় তলায় হুযূর কেবলার জন্য খাস কামরা ও দরবার নির্মিত হয়। বলুয়ার দীঘির পাড় খানকায় অবস্থানকালে তিনি মুরীদান ও ভক্তদের অনুরোধে নিকটবর্তী কুরবানীগঞ্জ মসজিদ ও খাতুনগঞ্জের হামিদ উল্লাহ্ খান জামে মসজিদে বেশ কয়েক বছর খতমে তারাবীহর নামাজের ইমামতি করেন। বিভিন্ন সময়ে এ মসজিদে হুযূর অনেকবার জুমার নামাজের ইমামতিও করেছেন

**ঈদ**

উৎসবের পরিবেশে রোযার ঈদ, কুরবানির ঈদ, হজ্জ-ওমরাহ্ ইসলামের ইতিহাসের অতি পরিচিত ও পুরানো ঐতিহ্য তথা সাংস্কৃতিক নিদর্শন। আত্মীয়-স্বজন, হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে যুগপথ ইবাদত পালন ও উৎসব মুখর নির্মল আনন্দ উপভোগ করাই এর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে মুসলিম বিশ্বে এটা বহুল প্রচলিত পুণ্যময় সুন্নাতসম্মত আমল হিসেবে পালন করা একটা বিশেষ রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

---

৩৮৯. *মাসিক তরজুমান*, প্রাগুক্ত,এপ্রিল- মে, ২০১৬, ৩৭ তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ৩৩

পবিত্র নগরি মদিনায় আমাদের নূর নবীজির (সা.) ঈদ উৎসব পালনের কথা সুবিদিত। সমাজের ধনী-গরীব সকলের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে তিনি চালু করেছিলেন যাকাত ও সাদাকাতুল ফিতরের প্রথা। শিশুদেরকে তিনি ঈদের দিনে নতুন পোষাক ও খাবার দিয়েছেন বহুবার। সকল সাহাবীদের নিয়ে জামাতের সাথে আদায় করেছেন ঈদের নামাজ। আরাফার মাঠে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষে কুরবানি প্রদান করেছেন নিজ নামে ও প্রিয় উম্মতদের পক্ষ থেকে।

একজন আদর্শ আওলাদে রাসুল হিসেবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই ছিল হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) এর একমাত্র লক্ষ ও উদ্দেশ্য। এ আদর্শ নিজের মুরীদান ও শিষ্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মিশন নিয়েই এদেশে তাঁর কর্মসূচীর শুরু। নিজ পরিবার পরিজনকে প্রায় চার হাজার কিলোমিটার দূরে নিজের দেশে রেখে এসে প্রবাসে জীবন যাপন করা কতটা কষ্টের তা এক ভূক্তভোগী মাত্রই জানেন। অথচ প্রিয় মুরিদানদের আবদার রাখতে গিয়ে সেই চরম কষ্টকর কাজটাই অবলীলায় করে গেছেন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)।

প্রিয় মুরিদানদেরকে খুশী করতে গিয়ে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সুখানুভূতিগুলোকে পায়ে দলে দূর প্রবাসে আত্নীয়-স্বজনহীন পরিবেশে দিনের পর দিন মাসের পর মাস অবস্থান করেছেন তিনি। কাউকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেননি নিজের কষ্ট ও ত্যাগের কথা। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিলসিলার মিশন নিয়ে তাঁর এদেশ সফরের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল যে কর্মসূচী তা ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময়ে বছরে দুবার করে তিনি এদেশে আসতেন তার প্রিয় মুরীদানদের টানে। প্রতিবারে থাকতেন টানা দুই থেকে তিন মাস। অনেক সময় মুরীদানদের অনুরোধ রাখতে গিয়ে পুরো রমজান মাস কাটাতে হয়েছে তাঁকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে।[৩৯০]

**হজ্জ**

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্’র (রহ.) হজ্জের সফরের কথা এবার আলোচনা করবো। ৮৭ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি অনেক বার হজ্জ ও ওমরাহ্ পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪০ বছর বয়সে তিনি তাঁর মাতা সাহেবানীকে সাথে নিয়ে প্রথম বার হজ্জব্রত পালন করেন।[৩৯১]

এরপর ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বারের মত তিনি হজ্জের সফরে যাত্রা করেন। এবারের সফরে অনেক বিত্তবান মুরীদ তাঁর সফর সঙ্গী হবার গৌরব লাভ করেছিলেন। তাঁরা হলেন চট্টগ্রামের বাকলিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব ওয়াজের আলী সওদাগর, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় জনাব নজির আলী সওদাগর এবং জনাব সিরাজুল হক সওদাগর, জনাব নূর মোহাম্মদ সওদাগর, জনাব আমিনূর রহমান সওদাগর, জনাব আকরাম আলী খান সাহেব, পাঁচলাইশের তরুণ প্রতিভাবান শিল্পপতি জনাব জাকির হোসেন কন্‌ট্রাক্টর, নালা পাড়ার বিশিষ্ট ধনবান ব্যক্তিত্ব জনাব আবদুর রহীম, আন্দরকিল্লাস্থ তাজ লাইব্রেরীর মালিক জনাব মোজাফফর এবং ঢাকা নিবাসী রাউজানের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব সিরাজুল ইসলাম সওদাগর সহ আরো অনেকে। বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা জনাব ফযলুল কাদের চৌধুরী ও সে যাত্রায় হুযূর (রহ.) সফর সঙ্গী হয়েছিলেন। সে বছর সবাই ঢাকা

৩৯০. শাহ্‌জাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল, *নূরে সিরিকোট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৩৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

থেকে পি আই এ বিমান যোগে করাচী হয়ে মাত্র ৩৫০০ টাকা ব্যয়ে হজ্জের সফর শেষ করেছিলেন আর জাহাজের ভাড়া ছিল তখন মাত্র ৬০০ টাকা। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিমান যোগে হজ্জের ব্যয় ছিল মাত্র ৭০০০ টাকা। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে তিনি আবার হজ্জের সফরে গমন করেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রায় বিশ থেকে ত্রিশ জন পীর ভাই পরিবারসহ হুযূরের সফর সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকার পীর ভাইদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব সিরাজুল ইসলাম সওদাগর, জনাব হাজী আশরাফ আলী, জনাব চিনু মিয়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা জনাব মতিউর রহমান, হাজী আবদুল আলীম, বাংলাদেশ বিমানের কর্মকর্তা মিসেস শাহানারা রহমান, আর চট্টগ্রামের ভাইদের মধ্য থেকে সর্বজনাব নূর মোহাম্মদ সওদাগর, আমিনূর রহমান সওদাগর, আকরাম আলী খান সাহেব, জনাব হাজী ওয়াজের আলী সওদাগর, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় নজির আলী সওদাগর এবং হাজী সিরাজুল হক সওদাগর, হোটেল ব্যবসায়ী হাজী ইয়াকুব, আইয়ুব আলী সওদাগর, আন্‌জুমানের তৎকালিন সেক্রেটারি জেনারেল জাকারিয়া সাহেব, জনাব মুহাম্মদ মহসীন সাহেবসহ আরও অনেকে। এ বছর সিরিকোট দরবার শরীফ থেকে তাঁর নাতি সাহেবজাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ কাশেম শাহ্ ও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) সাথে হজ্জের সফরে যোগদান করেন।

## কুরবানী

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্‌র (রহ.) তাঁর ভক্ত মুরীদানদের এতটা ভালবাসতেন যে, প্রতি সফরে দুই থেকে তিন মাস তিনি এদেশে অবস্থান করেছেন। নিজের অতি প্রিয় পরিবার পরিজনকে ছেড়ে দূর প্রবাসে মুরীদানদের সাথে কষ্ট করে দিন যাপন করেছেন। বলুয়ার দীঘির পাড় খানকায় থাকাকালীন সময়ে একবার তিনি পবিত্র কুরবানির ঈদও তাঁর ভক্ত মুরীদানদের সাথে উদযাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রথম বার যখন তিনি এদেশে কুরবানীর ঈদ পালন করেন, সে বছর চট্টগ্রামের পীর ভাইদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। কার আগে কে হুযূর কে কুরবানীর পশুর মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করার সৌভাগ্য লাভ করবেন এটা নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এদিকে তিনি বলুয়ার দীঘি খানকায় বসে তাঁর ভক্ত মুরীদানদের কাণ্ড দেখে মিটি মিটি হাসছেন। আর উপস্থিত পীর ভাইদেরকে লক্ষ করে বলছেন, "দেখ তোমাদের মত আমারও ঘর সংসার আছে। আজ আমার বাড়ীতেও কুরবানী হচ্ছে। তাদেরকে ছেড়ে এখানে একাকী তোমাদের সাথে কুরবানীর ঈদ পালন করাতে আমার উদ্দেশ্য ছিল, তোমাদেরকে সঙ্গ দেয়া। আর তোমরা কিনা কুরবানীর পশুর মাংস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ।"[৩৯২]

## পবিত্র মসজিদুল হারামে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) বসার স্থান

মসজিদুল হারামের ভিতরে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ এর মাঝখানের জায়গায় আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) প্রত্যহ আছরের সময় থেকে এশার নামাজের সময় পর্যন্ত অবস্থান করতেন। সকল ভক্ত-অনুরক্ত এখানে এসে দেখা করে দু'আ নিয়ে যেতেন। এ মুবারাক জায়গাটার নাম হল 'বাবে উম্মে হানি'। হারাম শরীফের প্রধান তোরণ বাবে আবদুল আযীয দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে কিছুদূর গেলেই পড়ে 'বাবে উম্মে হানি'। তিনি বলতেন, "এটা হল আউলিয়ায়ে কেরামের রূহ সমূহের জমায়েত ও বসার স্থান। এখান থেকেই নূর নবীজির পবিত্র মেরাজ ভ্রমণ

৩৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

অনুষ্ঠিত হয়েছিল"। তাঁর বসার স্থান থেকে মুলতাজাম, হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবারহিম স্পষ্ট দেখা যেতো। এটা ছিল বায়তুল্লাহ শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। হাজীরা তাই সেখানে কিবলামুখী হয়ে বসতেন।[৩৯৩]

### মসজিদে নববীতে বসার স্থান

মদীনা শরীফে থাকাকালীন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) বেশীর ভাগ সময় যিয়ারত ও ইবাদত বন্দেগীতে কাটতো। মসজিদে নববীর ভিতরে তিনি খুবই আদবের সাথে প্রবেশ করতেন আর বসতেন রিয়াজুল জান্নাহ'র পাশে আসহাবুস্ সুফফার মোকামে। মাঝে-মধ্যে সুযোগ মত একান্ত অনুরক্ত মাওলানা জালালুদ্দীন আলকাদেরী ও মাওলানা মুফতী উবাইদুল হক নঈমী জালাল সাহেব কাছে থাকলে হুযূর তাঁদেরকে মিলাদ শরীফ পড়ার হুকুম দিতেন। গেয়ারভী-বারভী শরীফের অনুষ্ঠানও তিনি সেখানে পালন করেছিলেন বলে জানা যায়।

### মসজিদে নববীতে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়

মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদীনার মসজিদে নববীতে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়ের জন্য শেষ রাতে নিয়মিতভাবে আজান দিয়ে মুসল্লিদের আহ্বান করা হয়। একবার মসজিদে নববীতে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) তাঁর সফর সঙ্গীদের ডেকে বললেন, "তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের পর আপনারা সবাই হুযূর কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে হাজিরা দিবেন এবং সালামী পেশ করবেন। এটা এমনি এক মহান দরবার যে, এখান থেকেই সমগ্র সৃষ্ট জগতে মান-মর্যাদাসহ সব কিছু বণ্টন করা হয়ে থাকে। হুযূর কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন্নবী হাজির নাজির এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ"।[৩৯৪]

মদীনা শরীফে হযরত জিয়াউদ্দিন মাদানী (রহ.) নামে আ'লা হযরতের একজন শিষ্য বাস করতেন। মসজিদে নববীর খুব কাছেই ছিল তার বাসভবন ও খানকাহ্ শরীফ। তাঁর সাথে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র খুব ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। নিজ মুরীদান হজ্জ যাত্রীদের মারফত তিনি হযরত জিয়াউদ্দিন মাদানী (রহ.)'র সাথে তোহফা বিনিময়ও করতেন।

## ৩.২ সামাজিক চিন্তাধারা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মাধ্যমে মানুষ পরস্পর পরিচয় লাভ করে। সমাজিকতার কারণে মানুষ এক অপরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধে তৎপর হয়। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) একজন সমাজ কর্মী ও পরমতসহিষ্ণু ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর জীবদশায় ভারতীয় উপমহাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের যেখানে গমন করেছেন, সেখানেই মানব সমাজের উন্নয়নের কথা বলেছেন এবং সমাজ উন্নয়নে বিশেষ অবদানও রেখেছেন।

---

৩৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৩৯৪. প্রাগুক্ত- ৪২

### ৩.২.১ সমাজের সংজ্ঞা

মানুষের একতাবদ্ধ জীবন যাপনকে সমাজ বলে। সমাজ শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে সমাজ হলো একটি ধারনা। এর কোন নির্দিষ্ট পরিধি নেই। ইহা বিশ্বজোড়াও হতে পারে। যেমন মুসলমান সমাজ, খ্রিস্টান সমাজ বা রেডক্রস। সংক্ষীর্ণ অর্থে সমাজ হলো এমন একটি জনসমষ্টি যারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং উক্ত সম্পর্ক বজায় রাখে।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এর মতে, "সমাজ হলো পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের জাল"।[৩৯৫]

অধ্যাপক গিডিংস এর মতে, "সাধারণ জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উদ্দেশ্য করে যখন এক দল ব্যক্তি সংঘবদ্ধ হয় এবং পরস্পর আালোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করে তখন একে সমাজ বলা হয়"।

প্যারোট এর মতে, "অসংখ্য মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বলিত জনসমষ্টিকে সমাজ বলে"।

লাস্কি এর মতে, "সমাজ বলতে আমি এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝি যারা কিছু সাধারণ স্বার্থ রক্ষার্থে একত্রে বসবাস করে"।

সমাজ বিজ্ঞানী গিসবার্ট এর মতে, "সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত"।

অধ্যাপক এফ.আর.খান এর মতে, "কোন একটি সাধারণ ভূখণ্ডে বসবাসরত এবং নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সমষ্টিগতভাবে সহযোগিতার একই সাধারণ সংস্কৃতির ধারক বাহক এবং স্বতন্ত্র সামাজিক ইউনিট হিসেবে কার্যরত একটি সাংগঠনিক ও যৌথবদ্ধ জনসংখ্যাকে সমাজ বলে"।

সুতরাং সমাজ হলো প্রথা ও পদ্ধতি, কর্তৃত্ব ও পারস্পারিক সাহায্য, বহুগোষ্ঠী-বিভাগ এবং মানবিক আচরণ ও স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রনের পরিবর্তনশীল জটিল ব্যবস্থা। সমাজে ঐক্য-অনৈক্য, সম্প্রীতি-বিরোধ, হাসি-কান্না, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। এক কথায় মানুষের দলবদ্ধতাই হচ্ছে সমাজ। অন্য কথায়, মানুষের সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিকতাকে সমাজ বলে অভিহিত করা যায়।[৩৯৬]

**সমাজের স্বরূপ :** সমাজের সংজ্ঞায় কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কিংসলে ডেবিস বলেন, সমাজ হলো সংঘের এক স্তর মাত্র। যখন ব্যক্তিবর্গ নানরূপ পারস্পরিক উদ্দীপনা ও সাড়ার দ্বারা আবদ্ধ হয় তখন সমাজের উদ্ভব হয়।

সমাজ শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পশুরাও সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে। কিন্তু মানব সমাজের সঙ্গে নিম্নস্তরের জীবজন্তুর সমাজের পার্থক্য দেখা যায়। ইতর প্রাণীর সমাজে সামাজিক চেতনা খুবই অস্পষ্ট এবং সামাজিক সংস্রব ক্ষণস্থায়ী। পরস্পর সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমষ্টিগত বোধ হলো

---

৩৯৫. মুহাম্মদ নুরুল আমিন ও সম্পাদনা কমিটি, *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮) ২য় সংস্ক., পৃ. ৪৬

৩৯৬. এস. এস. মো. নূর নবী ও মো: মাক্সুদুর রহমান খান, *রাজনৈতিক তত্ত্ব ও সংগঠন, লেখাপড়া*, (ঢাকা : ২০১৩), পৃ. ৪৪

মানব সমাজের বৈশিষ্ট্য। ইতর সমাজের সঙ্গে মানব সমাজের মূল পার্থক্য এই যে, ব্যক্তি এক বিশেষ পদ্ধতিতে তার মূল প্রয়োজন পূরণ করে কিন্তু সমাজে তার সদস্যদের মূল প্রয়োজান মিটায় শিক্ষা অর্জিত আচরনের দ্বারা। এটা উদ্ভাবিত হয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষের কাছে এসে পৌছায়। মানুষের প্রভূত জ্ঞান, আবিষ্কার এবং স্বরণ করার ক্ষমতার দরূণ মানুষ 'ভাষা' নামের এক কৃত্রিম সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এ সাংকেতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা মানব সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য যা এসব জন্তু জানোয়ারদের সমাজ থেকে পৃথক করে।

মানব সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হলো আদর্শ। মানব সমাজের দ্বৈত বাস্তবতা আছে একদিকে এটা আদর্শমূলক ব্যবস্থা যা কি হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করে।

আদর্শ ব্যবস্থা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রন করে। শুধু আদর্শ বাস্তব বা প্রকৃত অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বাস্তব অবস্থা আদর্শকে প্রভাবিত করে। আদর্শগত নীতি সমাজের প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর হতে হলে আদর্শ ব্যবস্থাকে প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে যথাযথভাবে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। ধরা যাক, কোন সমাজ নিয়ম করল যে প্রত্যেক পুরুষ তিনটি করে স্ত্রী গ্রহণ করবে কিন্তু দেশের নর-নারীর প্রকৃত অনুপাত যদি এর সমর্থন না করে তাহলে এরূপ নিয়মের কোন অর্থ হয় না। আদর্শ ব্যবস্থা বাস্তব জগতে কার্যকর করার চেষ্টা করে বলে সর্বদাই এটা জাগতিক ঘটনার দ্বারা সংশোধিত হচ্ছে। সুতরাং মানব সমাজে শুধু বাস্তবতাই নেই, নৈতিকতাও আছে এবং উভয়ে পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া করে।

মার্কসীয় তত্ত্বে সমাজের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মার্কস'র মতে সমাজ হলো "পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা গঠিত জনসমষ্টি। কার্য করতে গিয়ে মানুষে মানুষে যে সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাই সমাজ। এ সামাজিক সম্পর্ক নির্ভর করে মূলত উৎপাদন পদ্ধতির উপর"।

সাধারণত সমাজ বলতে আমরা বুঝি-কয়েকটি পরিবার যখন একত্রে একই স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তখন তাদেরকে নিয়ে সমাজ গঠিত হয়। মানব জাতির সূচনাকাল হতেই মানুষ এরূপে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করে আসছে। আজকের মানব সমাজ হাজার হাজার বছরের পরিবর্তিত রূপ। অভিধান বেত্তাদের নিকট সমাজ মানে পরস্পরের সহযোগিতায় অবস্থানকারী মনুষ্য সংঘ।[৩৯৭] কিন্তু কালক্রমে সমাজের পরিচয় আরও ব্যাপক পরিসরে নির্ণীত হয়। এখানে তাদের ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিচার-আচার সবই অন্তর্ভূক্ত। কাজেই বর্তমানে নাগরিক আবাসন উন্নতির ক্রমধারায় একই বিল্ডিং-এ ফ্ল্যাট বাড়ীতে বসবাসরত পরিবারগুলোর সমষ্টির নাম কিন্তু সমাজ নয়। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির চিহ্ন নেই আবার ব্যক্তি সমষ্টির বিমূর্ত ধারণা মাত্র সমাজ নয়। ব্যক্তির দেহের ন্যায় সমাজের দেহ আছে; প্রাণও আছে। যতদিন এ সমাজ বেঁচে থাকে এবং সমাজ-সংহতি বিনষ্ট না হয়, ততদিন সমাজ বেঁচে থাকে।

### ৩.২.২ ইসলামী সমাজ

ধর্ম থেকে সমাজ ও জীবন পৃথক কিছু নয়। অতীতে এবং বর্তমানে বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শন ব্যতীত মানব সমাজের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম ব্যতীত সমাজ কখনও ছিল না। এ জন্য মানব সমাজে

৩৯৭. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, (ঢাকা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫), পৃ. ৬৬৭

ধর্ম প্রভাবশীল। এরই ধারাবাহিকতায় মানব সমাজের চূড়ান্ত ধর্ম হিসেবে মহানবী (সা.) ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তখন থেকে একটি সুসংহত সমাজের সুষ্ঠু রূপ পরিগ্রহ হয়। "বিশ্বাস কর এবং কাজ কর"- এ নীতিতে ইসলাম কার্যকর গণতান্ত্রিক এমন এক সমাজের ব্যবস্থা করে, যেখানে প্রতিটি মানুষ সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের ক্ষেত্রে তার ন্যায্য অংশ লাভ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র সৃষ্টি একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার পরিবার। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধন ও সামাজিক উন্নয়ন পরিবর্তন ইসলামের মূল কথা। ব্যক্তিসত্ত্বা ও সামাজিক কল্যাণ উভয়ে পেয়েছে তার নিজ নিজ স্থান। কাজেই মানুষ ও সমাজ জীবন সম্পর্কে ইসলামে যে দিক-নির্দেশনা রয়েছে, সে আলোকে গঠিত সমাজকে আমরা ইসলামী সমাজ বলতে পারি।

উল্লেখ্য,'পার্থিব জীবন আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ আর আধ্যাত্মিক জীবন পার্থিব জীবনের নৈতিক গাঁথুনী'-এ অফুরন্ত প্রেরণায় ব্যক্তিসত্ত্বাকে আন্দোলিত করা-ই ইসলামী সমাজের কার্যকারিতা। যেখানে স্বতঃসিদ্ধ নীতি হল- এ পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব শুধু একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার; মানুষ তাঁর প্রতিনিধি মাত্র। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন সম্পদ কেবল প্রয়োজন মত ভোগ করতে পারে বা ভোগ দখলে রাখতে পারে। মানুষ প্রকৃত মালিক নয়। যেমনটি সরকারি যমীন লীজ নিলে হয়। তাই একদিন প্রত্যেক কিছুর হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহি করতে হবে। মহানবী (সা.) এরশাদ করেন-

الا كلكم راع كلكم مسئول عن رعيته الامام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع فى اهله وهو مسئول عن رعيته والمراة راعية في بيت زوجها ومسؤلة عن رعيتها والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته قال وحسبت ان قد قال والرجل راع فى مال ابيه وهو مسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعتيه.

"তোমরা প্রত্যেকে তত্ত্বাবধায়ক। আবার প্রত্যেকেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম তত্ত্বাবধায়ক আর তার দায়িত্ব সম্বন্ধেও প্রশ্ন করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারের তত্ত্বাবধায়ন করে থাকে; তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। খাদেম তার মালিকের সম্পদের দেখা-শোনাকারী আর তার দেখা-শোনার ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি যে- তিনি অবশ্য বলেছেন, লোক তার পিতার সম্পদের রক্ষাকারী, সে সেটার হিসাব দিবে। কাজেই তোমরা প্রত্যেকে অন্যের ব্যাপারে দেখা-শোনা করবে এবং জবাবদিহি করবে।" [৩৯৮]

এ কারণে "বুঝে নাও; বুঝিয়ে দাও"- এ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু সমাজ গঠন; তা-ই হয়ে উঠেছে সব সময়েই ইসলামের বিশেষ লক্ষ্য। সাধারণত: ইসলামী সমাজ পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের মত ব্যক্তি, পরিবার ইত্যাদি সামাজিক অবকাঠামো নিয়ে গঠিত। ইসলামী আদর্শে সমাজ ব্যবস্থা বলে এটাকে ইসলামী সমাজ বলা হয়। এখানে পরিবার, প্রতিষ্ঠান, ধনভাণ্ডার, নেতৃত্ব এবং সংস্কৃতি-অর্থনীতির অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহও অর্ন্তভূক্ত। ইসলামী সমাজ মানে কেবল মুসলমানের সমাজ নয়- ইসলামের মূলভাবের ওপর ভিত্তি করে যেখানে বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, মানুষ হিসেবে মানুষ যেখানে তার

৩৯৮. মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল বুখারী, ***সহীহ্ আল বুখারী***, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২২

অধিকার পেয়েছে- সেই সমাজই ইসলামী সমাজ। অর্থনীতি ও বিজ্ঞান থেকে শুরু করে ইসলাম প্রগতিশীল ও মানবিক পথ নির্দেশ করে, পাস্পরিক বিশ্বাসবোধ ও দায়িত্বরোধ জাগরণের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। 'বুদ্ধির চেয়ে বোধের, তর্কের চেয়ে কাজের' উপর নির্ভর এ ইসলামী সমাজ। এভাবে ইসলামের বুনিয়াদে ভারসাম্যময় সমাজ গড়ে তোলার জন্য এ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

## ইসলামী সমাজের ভিত্তি

ক) **তাওহীদ বা একত্ববাদ :** আল্লাহ্ একমাত্র স্রষ্টা, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি; তিনিও কাউকে জন্ম দেননি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।[৩৯৯] তিনি চিরঞ্জীব; চিরস্থায়ী। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি সবকিছুই প্রতিপালন করেন এবং বিবর্তনও করেন। তাঁর তন্দ্রা-নিদ্রা আসে না। ভূ-মণ্ডল, নভোমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মাঝে যা রয়েছে, সবকিছুর একমাত্র অধিশ্বর তিনি। সব কিছুই তাঁর ইচ্ছাধীনে। তিনি সব কিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতা ও উত্তম গুণাবলীর অধিকারী।[৪০০] সৃষ্টির প্রত্যেক কিছুর অণু-পরমাণু সম্পর্কে তিনি অধিক অবগত। কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাতে ঘটে না। তিনি সকল অংশীদারত্ব, অপারগতা, ঘৃণ্য-সংশয়যুক্ত কার্যকলাপ ও দোষ-ত্রুটি হতে পূতঃপবিত্র। তিনি যাত ও সিফাত উভয় দিক দিয়ে অনন্য ও অদ্বিতীয় সত্তা। তিনি সব কিছুই সৃষ্টি করেন। তিনি সৃজনের ইচ্ছা করা মাত্রই সব কিছু হয়ে যায়। তাঁর কোন তুলনা নেই। তিনি নিরাকার, অনাদি, অনন্ত-অসীম, প্রেমময় ও সর্বশক্তিমান। সব কিছু ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।[৪০১]

এ ভূ-পৃষ্ঠে মহানবী (সা.)'র শুভাগমণের পর তাঁর অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে উক্ত রূপ বিশ্বাস করে স্বীকৃতি দেয়ার নাম প্রকৃত অর্থে তাওহীদ। কেননা, কোন আহলি কিতাব যদি উপর্যুক্ত বিষয়াদি বিশ্বাস করে এবং স্বীকারও করে; কিন্তু মহানবী'র প্রতি কোন তোয়াক্বা করল না; বরং এড়িয়ে চলল, কেবল স্বীকার করল যে- তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের নবী, তাকে মুমীন বা তাওহীদী বলা যাবে

---

৩৯৯. قل هوالله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. و لم يكن له كفوا احد (রাসূল!) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ পরমুখাপেক্ষী নন, না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন এবং না তাঁকে কেউ জন্ম দিয়েছে আর না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার। (আল কুরআন, ১১২ : ০১-০৪)

৪০০. الله لا اله الا هو الحى القيوم. لا تاخذه سنة ولا نوم. له ما فى السموات و ما فى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات و الارض ولايؤده حفظهما وهو العلى العظيم .
"আল্লাহ; তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি নিজেই জীবিত এবং অন্যদের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, না নিদ্রা। আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁরই। সে কে ? যে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে। তিনি জানেন যা তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তাদের পিছনে। তারা তার ইলম (জ্ঞান) হতে কিছুই আয়ত্ব করে না; কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীন ব্যাপী। তাঁর জন্য ভারী নয় এ গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ। তিনি সর্বোচ্চ, মহামর্যাদাসম্পন্ন।"(আল কুরআন, ০২ : ২৫৫)

৪০১. انا نعلم ما يسرون و ما يعلنون
"নিশ্চয় আমি জানি যা তারা গোপন কর আর যা তারা প্রকাশ কর।" (আল কুরআন, ৩৬ : ৭৯)
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون
"তাঁর কাজ তো এ যে, যখন কোন কিছু করতে চান; তখন সেটার উদ্দেশ্যে বলেন, 'হয়ে যা'। তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়।" (আল কুরআন, ৩৬ : ৮২)

না। কেননা, ঈমানের প্রথম স্তর তাওহীদের প্রতি তার বিশ্বাস যথাযথ হয়নি। অনুরূপ তাঁকে কেউ স্বীকার করল এবং স্বাক্ষীও দিল; অথচ তাঁর কার্যকলাপে সংশয় পোষন করল; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে উল্লেখিত বিষয়ালোকে বিশ্বাসও করল, তারপরও সেই তাওহীদী নয়। এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তাওহীদের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরই মাধ্যমে এভাবে-

قل هو الله احد - الله الصمد

"(রাসূল!) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ্ এক; আল্লাহ্ পরমুখাপেক্ষী নন।"[৪০২]

সুতরাং যে সমাজের সম্পর্ক মহানবীর সাথে নিবিড় থাকবে, কোনরূপ সংশয় থাকবে না; বরং বিনা তর্কে তাঁর মান-মর্যাদা মেনে নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস রাখবে, সেটাই মূলত ইসলামী সমাজের অর্ন্তভূক্ত; প্রকৃত তাওহীদ।

**খ) রিসালত :** হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত নবী ও রাসূল। তিনি সৃষ্টির সেরা, তাঁর মত কেউ নেই।[৪০৩] তিনি শেষনবী; তাঁর পরে কোন নবী দুনিয়াতে আর আসবে না। সকল নবীর নুবুয়াতের মধ্যে তিনি ঐক্য ও বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন;[৪০৪] তিনি দুনিয়াতে যেমন জীবিত ছিলেন; সব কিছু অবলোকন করতেন; পরিচালনা করতেন এবং সকল সমস্যা সমাধান করতেন, তেমনি স্বীয় রওযাতে এখনও জীবিত আছেন।[৪০৫] তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত; সমস্ত দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত। এমনকি তাঁর মা-বাবা পর্যন্ত বংশধারায় যাদের নিকট তাঁর পবিত্র নূর আমানত ছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন পাপ-পঙ্কিলতা হতে মুক্ত ও তাওহীদের উপর বিশ্বাসী। তাঁর সাথে যা কিছু দেখা-অদেখা ছিল এবং তিনি যা কিছু অদৃশ্য খবর দিয়েছেন, প্রত্যেক কিছুর প্রতি বিশ্বাস করা; এ জন্যে যে, সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সত্য, হিদায়ত ও নূরসহ তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত প্রিয়তম বন্ধু। তিনি যা কিছু বলেন; করেন সবই আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যাদেশ নিরিখে। পবিত্র কুরআন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী। তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৪০৬] তাঁকে সম্মান করা; ভালবাসা এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী, ঈমানের পূর্ণতা।[৪০৭] আর এ পূর্ণতাই মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার

---

৪০২. আল কুরআন, ১১২ : ০১

৪০৩. عن انس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال لاتواصلوا قالوا انك تواصل قال لست كاحد منكم
"হযরত আনাস (রা.) নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা (একটি রোযার সঙ্গে অন্য রোযাকে ইফতার-সেহ্রী না করে) মিলাইও না অর্থাৎ সাওমে বিছাল তথা লাগাতার রোযা রেখ না। তারা জানতে চাইল 'আপনিও তো লাগাতার রোযা রাখেন! উত্তরে তিনি বলেন, আমি তোমাদের হতে কারোর মত নই।" (মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, ***সহীহ আল বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৩ )

৪০৪ . ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبين و كان الله بكل شئ عليما
মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের হতে কারোর পিতা নন; কিন্তু আল্লাহ্'র রাসূল ও নবীদের মধ্যে সর্বশেষ আর আল্লাহ্ সবকিছু জানে। (আল কুরআন, ৩৩ : ৪০)

৪০৫. জালালুদ্দীন আবদুর রহমান সুয়ূতী, ***শারহু আল সুদুর বি শারহি হালিল মাউতা ওয়াল কবূর,*** (লিবানন: দারুল কুতুব আল ইলমিয়া-১৯৮৪) পৃ. ১৮৭; ৩১৬; জালালুদ্দীন আবদুর রহমান সুয়ূতী, ***তানভীর আল হালাক ফী জাওয়াযি রূইয়াতি আন নবী ওয়াল মালাক*** (কায়রো: দারু জাওয়ামি'উল কালিম-২০০৩) পৃ. ৩৪

৪০৬. ذالك الكتاب لاريب فيه " ঐ কিতাব; তাতে কোন সন্দেহ নেই।"(আল কুরআন, ০২ : ০১)

৪০৭. عن انس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و ولده و الناس اجمعين.

নিকটতর পর্যায়ে নিয়ে যায়। কাজেই যদি কেউ তাঁকে কেবল নবী-রাসুল এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতাকারী রূপে মেনে নিল; কিন্তু তাঁর অন্যান্য গুণাবলী ও মর্যাদা হতে কোন একটা অস্বীকার করল, যেমন, তাঁকে শেষনবী মানল না, এ অবস্থায় সে তাঁর রিসালতকে অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হবে। মূলত তাঁরই প্রেমাস্পর্শে উজ্জীবিত হয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিকে সমভাবে, বিধায় সমাজের ভিত মজবুত করতে তাঁর প্রতি পূর্ণবিশ্বাস অপরিহার্য।

**গ) আধ্যাত্মিকতা :** তাওহীদের মাধ্যমে রাসুল (সা.)'র জীবনে জাগতিক ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধিত হয়। আল কুরআনের সেই বাণী 'সাধনা ছাড়া জাতির উন্নতি হয় না'[৪০৮], হযরত মুহাম্মদ (সা.) অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। আত্মশুদ্ধির সাধনাতেই ইসলামে আত্মসমর্পন যথাযথ পরিস্ফুটিত হয়। সেই সাধনা বন-জঙ্গলে গিয়ে করতে হবে তা নয়; আবার একেবারে দুনিয়া দারীতে লিপ্ত হয়েও নয়, বিশ্ব নিখিলে শান্তিনির্যাসে অবগাহন করে আধ্যত্মিক জ্ঞান লাভ করে হয়। ধর্মবিশ্বাসে, চিন্তায়, কর্মে ও আদর্শে যখন সমাজ জীবনে ঐক্য ঘটবে; তখন শান্তি আসবে; সমাজ জীবন অমৃতপ্রসূ হয়। এ ঐক্যের মূলে ইসলামের আধ্যাত্মবাদ-ই একমাত্র কার্যকর। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায় তখনই সার্থক; যখন বান্দার অধিকার রক্ষিত হয়। প্রতিটি মানুষের উপর তার মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং দেশ-দশের নির্ধারিত দায়িত্ব রয়েছে। রাসূলের আদর্শে ঐ সব দায়িত্ব পালনের প্রতিটি মুহূর্ত-ই ইবাদত। দায়িত্ব পালনের আত্মোপলব্ধির মাঝে আত্মার নির্বাণ বর্তমান আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভবে আল্লাহ্'র প্রেমিকদের ভালবাসার বিকাশ ঘটে। ইসলামে আধ্যাত্ম্য ও মানবাত্মার মাঝে সুপ্ত অনুভব ও উপলব্ধি শক্তির জাগরণ করে; মানবতা পূর্ণরূপে বিকাশিত হয়। ফলে ইসলামী সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়; সমাজ জীবন হয় আধুনিক ও প্রগতিশীল। বস্তুত আধ্যাত্ম্য বা আত্মোপলব্ধি জ্ঞান ছাড়া কখনো সত্যিকারের সমৃদ্ধি ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন অথবা স্রষ্টার নৈকট্য লাভ হয় না। আর সংসার জীবন-যাপনের মাধ্যমে আধ্যাত্ম্য চর্চার নির্দেশনা কেবল ইসলামে স্বীকৃত। কাজেই এ আধ্যাত্মবাদ ইসলামী সমাজের প্রাণশক্তি; কিন্তু ইসলামের আধ্যাত্মিক নিয়মগুলো অন্যান্য ধর্মের ভাববাদী ও দর্শননীতি হতে পৃথক।

**ঘ) বিশ্ব মানব-ভ্রাতৃত্ব** : আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان الله عليم خبير.

**"হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি; যাতে তোমরা একে অপরকে জানতে ও চিনতে পার, সে জন্যে জাতি ও গোত্রে গড়ে তুলেছি।**

---

"হযরত আনাস (রা.) নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের কারোর ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন হবে না; যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান, বাবা-মা এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে সর্বাধিক প্রিয়জন হব। (মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ ১ম, পৃ. ০৭)

৪০৮ وان ليس للانسان الا ما سعى "মানুষ পায় না কিন্তু সে যা চেষ্টা করে"। (আল কুরআন, ৫৩ : ৩৯)

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে অধিক সম্মানী; যে অধিক ভয় করে। অবশ্যই আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন,খবর রাখেন।"[৪০৯] অন্যত্র বলা হয়েছে-

يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذى تسأءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبًا-.

"ওহে মানবকুল! স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন আর তাঁর থেকে তাঁর জোড়া (সঙ্গীনী) সৃষ্টি করেছেন। এ দু'জন থেকে বহু নর-নারী (ভূ-পৃষ্ঠে) বিস্তার করেছে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর; যাঁর নাম নিয়ে একে অন্যের হতে কামনা কর। আত্মীয়তার প্রতি সজাগ থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন।"[৪১০]

ইসলাম এক সহজ-সরল মতাদর্শের নাম। "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই; হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্'র রাসুল"- যে কেউ এই নীতি গ্রহণ করবে, সে এমন এক ভ্রাতৃত্বের সদস্য হয়; যেখানে বর্ণ, রক্ত, পারিপার্শ্বিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার কোন মূল্য নেই। যেখানে চরিত্র ও ব্যবহারের সততাই অগ্রাধিকারের একমাত্র মাপকাঠি। যেখানে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন প্রত্যেকের জন্য করণীয় আর এই ধরণের জীবন-যাপন পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশুদ্ধ ইবাদতে গণ্য। এই বিশ্ব মানব ভ্রাতৃত্বের আদর্শ বর্ণ, জাতি, শ্রেণী, ভাষা ও পরিবারের সংকীর্ণগন্ডী অতিক্রম করে গেছে; ছোট-বড়, রাজা-প্রজা নেই, সবাই একই বস্তুর উপাদান, মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতই।[৪১১]এক অঙ্গে আঘাত হলে সর্বাঙ্গে হয় ব্যাথা ও ঘোর অস্থিরতা। সবাই একই প্রাচীরতুল্য।[৪১২] ইসলামী সমাজ গণতান্ত্রিক, তাই ইসলাম সম্পদ ও সম্পত্তির সুষম বন্টন, অধিকার ও সুবিধার ন্যায্য অংশ প্রদান করে একটি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। উত্তরাধিকারী নয়; এমন আত্মীয়, অভাবগ্রস্থদেরও ন্যায়ানুগ অর্থ-সম্পত্তি লাভের নিশ্চয়তা দিয়েছে। একই সাথে সম্পদ পরিশুদ্ধি ও দূষণ সর্ম্পকে নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামের এই ভ্রাতৃত্বসংঘটি মূলত মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

**ঙ) সাম্য** : সাম্য বলতে সুযোগের সমতাকে বুঝায়; কর্মক্ষমতার সমতা নয়। এ দিক বিচারে ইসলাম নর-নারীর সমতা বিধান করেছে সুনিপুণভাবে। তাদের দেহ-মন ও হৃদয় সৃষ্টি করা হয়েছে নিজ নিজ কর্তব্যের উপযুক্ত করে। নারী যা সহ্য করতে পারেন তা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয় আবার পুরুষ যা সহ্য করেন তা নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেকের কর্তব্য-কার্য ভিন্ন ভিন্ন। একে অন্যের কর্তব্য-কাজ সাময়িক গ্রহণ করতে পারে বটে; কিন্তু তাতে দুনিয়ার ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং দু'শ্রেণীরই চরম অধোগতি হবে নিঃসন্দেহে। ইসলামের মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধ মানুষে মানুষে

৪০৯. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

৪১০. আল কুরআন, ০৪ : ০১-০২

৪১১. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ترى المؤمنين فى تراحمهم و توادهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر و الحمى

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তুমি মু'মীনগণকে দেখবে যে, পারস্পরিক দয়া, মায়া ও সহমর্মিতায় যেমনটি মানব দেহ। যখন সেটার কোন অঙ্গে ব্যথা হয়, তবে সেটার অন্যান্য অংশ সে কারণে জ্বর ও অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। (মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, ***সহীহ্ আল বুখারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ৮৮৯)

৪১২. ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সে সকল যোদ্ধাকে পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে। যেন তারা মজবুত প্রাচীর। (আল কুরআন, ৬১ : ০৪)

সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের বিচারে মানুষের সামাজিক মর্যাদা তার নিজ চারিত্রিক গুণ ও সমাজের উপকারার্থে তার অবদানের উপর নির্ভর করে। কোন কলঙ্কের চিহ্ন আত্মায় ধারণ করে বা দূষিত আত্মা নিয়ে কোন মানুষের জন্ম হয় না; বরং তার জন্মকালে এমন এক সুষম আত্মা নিয়ে জন্ম নেয়; সেখানে কোন সহজাত দুর্বলতা নেই। আল কুরআনে বলা হয়েছে-

ونفس وما سوّاها. فالهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكّٰها وقد خاب من دسّاها

"সেই আত্মা এবং যিনি সেটাকে সৌষম্য দান করেছেন তাঁর শপথ! অত:পর তিনি সেটাতে অসৎ ও পরহেযগারী অনুপ্রবিষ্ট করেছেন। যে কেউ সেটাকে (আত্মা) বিশুদ্ধ রেখেছে; অবশ্যই সে-ই সফল হয়েছে আর যে সেটাকে পাপে আচ্ছন্ন করেছে; সে নিরাশ হয়েছে।"[৪১৩]

সুতরাং ইসলামে মানুষের মর্যাদা তাঁর কর্ম অনুসারে। ইসলামে সকল মানুষ জন্মগত ভাবে সমান। জাতি-বর্ণ-গোত্র ভেদে কেউ কারোর উপরে নয়। প্রত্যেকের জন্য শরী'আত মতে সকল কাজ করার সুযোগের নিশ্চয়তা দিয়েছে ইসলাম। বস্তুত: আত্মিক উৎকর্ষ ও ধনবৈষম্য লাঘবের মাধ্যমে মানব সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের লক্ষ্য।

## ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য

১. ইসলামী সমাজের গোড়া মজবুতকরণ ও সুপ্রাসাদের দৃঢ়ায়নের মূলে রয়েছে মহানবী (সা.)'র সঙ্গে নিশ্ছিদ্র বিশ্বস্তা। এরূপ সম্পর্ক ছাড়া ইসলামের কর্মনীতির কল্পনা করা যায় না। একেবারে নিখাদ-নিটোল, কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।
২. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা আধ্যাত্মিক অনুশাসনের উপর নির্ভরশীল। সে জন্যে সমাজের সকল সদস্যকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করে তাঁদের চরিত্র ঐশ্বরিক পবিত্র আভায় প্রতিষ্ঠা করে।
৩. মানবতার ঐক্য-সম্প্রীতিকে সমৃদ্ধ করে।
৪. প্রতিটি সদস্যের মাঝে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টি করে এবং সচল রাখার ব্যবস্থা করে।
৫. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পরিবেশকে সদা নিয়ন্ত্রণ করে। তা এভাবে যে, যা সংক্রামক বা ক্ষতিকারক তা কঠোরভাবে প্রতিহত করে আর যা নয়; সেটাকে আনুকূল্য প্রদান করে।
৬. জীবনাচরণের মর্যাদাকে বাস্তবরূপে চিত্রায়িত করে; সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সজ্জিত করে এবং উন্নয়ন মূলক অবকাঠামোরও পরিপূরণ করে থাকে।
৭. সমাজ জীবনের প্রতিটি ধাপে মানব প্রকৃতি অনুসারে নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল করে গড়ে তুলে।
৮. কার্যকারিতার দিক দিয়ে প্রতিটি অবকাঠামোর ন্যায্য অংশ নিশ্চিত করে।
৯. যাবতীয় কার্য পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সমাধান করার তাগিদ দেয়।
১০. পার্থিব জীবনকে সুন্দর করার পাশাপাশি পরকালের মঙ্গলের জন্য ক্ষেত্র তৈরী করে।
১১. আধিপত্য ও স্বেচ্ছাচারিতা মূলে কুঠারাঘাত করে।
১২. অবৈধ পন্থায় অর্থ রোজগারের সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেয়।
১৩. নিঃস্ব লোকদের স্বাবলম্বী করার জন্য অর্থ উপার্জনের পুঁজি সরবরাহ করে।
১৪. সামাজিক ন্যায় বিচর প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়।

---

৪১৩. আল কুরআন, ৯১ : ০৪-০৫

### ৩.২.৩ উপমহাদেশে মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা

উপমহাদেশের জনগণ যখন বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল তখন সারা ভারতে স্বাধীন রাজ্য ও ইংরেজ বিরুধী শক্তি পদানত হওয়ার পর বৃটিশদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কায়েম করে। এ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। তাদের ক্ষমতার মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। এ দেশের শাসন ক্ষমতা বৃটিশ সরকারের নিকট চলে যায়। স্বাধীন দেশ উপনিবেশে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই তারা অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হয়ে উঠে। মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে তারা খুবই সচেতন ছিল। তাই গোড়া থেকেই মুসলমানরা তাদের চক্ষুশূল ছিল। ক্ষমতার দর্পে শুরু হয় শাসনের নামে শোষণ, শান্তিস্থাপনের নামে দমন নীতি। ইংরেজদের বিমাতাসুলভ আচরণে মুসলিম-স্বার্থ দারুনভাবে ক্ষুন্ন হতে থাকে। ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে কাল মেঘের ঘনঘটা দেখা দিল। ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক তথা প্রতিটি স্তরে মুসলমানদের জীবনের গতিধারা প্রতিকূল পরিবেশের দিকে মোড় নিল। সমাজে তারা অপাংক্তেয় হয়ে রইল। এ পতনাবস্থা মূলতঃ মোঘল শাসনামলে মুসলিম সমাজে হিন্দু আচার-আচরণ প্রবেশ, হিন্দু নারীদেরকে ধর্মান্তরিত না করে মুসলিম শাসকদের স্ত্রীর মর্যাদা প্রদান, তাদের মাত্রাতিরিক্ত হিন্দু প্রীতি ও দীন-ই ইলাহীর প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সূত্রপাত ঘটে। সে সময় হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (১৫৬৪ খ্রি.-১৬২৪ খ্রি.) মুসলমানদের পুণ:জাগরনের আন্দোলনের বীজ বপন করে ছিলেন। অত:পর মোঘলদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশদের প্রণীত বিধি-বিধান মুসলিম সমাজে সর্বস্তরে সমান শক্তিতে আঘাত হানে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানরা অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হন। [৪১৪] এ সময়কার নিরীহ ও সর্বহারা মুসলিম রায়তবর্গের করুণ চিত্র ভেসে উঠে। মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব ইংরেজদের সৃষ্ট নতুন স্বার্থভিত্তিক ফ্যাসিবাদী সমাজের কালমেঘে চাপা পড়ে যায়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। সেখানে মুসলিম ছাত্রদের পড়ার কোন সুযোগ ছিল না। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন জারি করা হয়। ফলে এ সব সম্পদের আয়ের মাধ্যমে পরিচালিত মাদ্রাসা-মক্তব, খানকাহ, এতিম ও মুসাফিরখানা ইত্যাদির অস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়।

এভাবে ইসলামী শিক্ষা বন্ধের চক্রান্তের পাশাপাশি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার, খৃষ্টধর্ম প্রচার ও উপমহাদেশের অমুসলিমদেরকে সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় আর মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধার সকল উৎস মূলোৎপাটনের মাধ্যমে কোণঠাসা করা হয়। সেই সময়ে ইংরেজদের চিন্তানুযায়ী ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ছিল মূলত মুসলমানদেরকে অর্থহীন কর্মকাণ্ডে প্রণোদিত করা। কারণ ইতোপূর্বে প্রচলিত ভাষা ছিল ফার্সী। এ ভাষাতে ধর্মীয় গ্রন্থাদির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। এরই প্রেক্ষাপটে মুসলমানগণ এ ভাষা চর্চাতে অভ্যস্ত ছিল। ইংরেজী ভাষা ছিল তাদের জন্য একেবারে নতুন। অধিকন্তু যাতে মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে বিস্মৃত হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অমুসলিমদের মানসিকতায় পরিণত হয়- এ লক্ষ্যে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে আদালতে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয় এবং ১৮৪৪

---

৪১৪. শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পাদিত *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০০৩), পৃ. ২০৭

খ্রিস্টাব্দে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পাস করা শিক্ষার্থীদের সরকারী চাকুরীতে প্রাধান্য প্রধানের সার্কুলার প্রচার করা হয়।[৪১৫] ফলে মুসলমানরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কেননা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইংরেজরা মুসলিম শাসকদের হতে রাজ্যক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার প্রেক্ষিতে সাধারণ মুসলমানগণ ইংরেজ বিরুধী ভাবাপন্ন ছিল। তদুপরি একশ্রেণীর অদূরদর্শী আলিম ইংরেজী ভাষা গ্রহণ এবং শিক্ষাদানকে হারাম ফাত্ওয়া দিয়ে আসছিল।[৪১৬] ফলে তাদের মনে-প্রাণে সৃষ্ট ঘৃণার কারণে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ হতে সিংহভাগ মুসলমান বিরত ছিল। এ কারণে মুসলমানগণ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকে। বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাতন্ত্রের কারণে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আইন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়। তারা প্রচলিত মুসলিম আইনের স্থলে বৃটিশ আইনও প্রবর্তন করে। সে সময় গোটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ও ইংরেজ শাসকদের দমননীতি-ষড়যন্ত্রের নীলনকশা বুঝতে পেরে আধুনিক কালের প্রারম্ভে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১৭০৩ খ্রি.-১৭৬২খ্রি. র:) যে ফর্মূলায় আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, তা আধুনিককালের মুসলমানদের জন্য দিশা পাবার আলোকবর্তিকা রূপে কাজ করেছিল। উল্লেখ্য, এ সময় ভারতবর্ষে মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকেয়ে রাখতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা সময়ের দাবী হয়ে উঠে ছিল-

ক) ঈমান-আক্বীদা রক্ষার জন্য তৎসম্পর্কে খুঁটি-নাটি বিষয়ে অবগত হওয়ার পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি অর্জন করা।

খ) স্থানীয় অমুসলমানদের সাথে সমান তালে এগিয়ে চলা এবং

গ) উপনিবেশক ইংরেজদের সাথে আলোচনার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

তাই শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (রহ.) মধ্যযুগীয় মনোভাব পরিহার করে সেকেলে অস্ত্র-শস্ত্রের পরিবর্তে কলমের মাধ্যমে জিহাদের গুরুত্বারোপ করেন ও মুসলমানদেরকে আত্মশুদ্ধির উপদেশ প্রদান করেন,[৪১৭] যাতে তারা জ্ঞানার্জন করে ঈমান-আক্বীদা হিফাজত ও আমল সংশোধনে সক্ষম হয়, সত্যিকার অর্থে মুসলমান হিসেবে নিজ অস্তিত্ব ঠিকিয়ে রাখতে পারে।

অত:পর এ মূল্যবোধ ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন তদীয় পুত্র হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ.) (১৭৪৬ডখ্র.-১৮২১খ্রি.)। তাঁর প্রচেষ্টায় যখন এ নীরব আন্দোলন তুঙ্গে উঠে, তখন ইংরেজরা নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এমনিতে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল- মুসলমানরা কখনও স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকবে না, তাই শুরু থেকেই তারা গোয়েন্দা নজরদারিতে তৎপর ছিল। এ কারনে মুসলমানদের এ নীরব আন্দোলনের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল না। তারা মুসলমানদেরকে বৃটিশ শাসনের নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে দেখল। তাদের প্রণীত বিধানগুলো ছিল বস্তুত স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের মাঝে উস্কানিমূলক। এ

---

৪১৫. ড. আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব,* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০০৪), পৃ. ১৩৩-১৩৫

৪১৬. শেখ তোফাজ্জল হোসেন, *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান,* প্রাগুক্ত, পৃ.২০৮

৪১৭. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৫), পৃ. ৯

সময় তারা মুসলমানদের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ জাগ্রত করতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখল। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের মাঝে আন্দোলন প্রক্রিয়াতে অন্তবিরোধ সৃষ্টি হল। তারা রাজনৈতিকভাবে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। যেমন,

১) হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ.)'র শিক্ষায় উজ্জীবিত তাঁর শিষ্যদের একাংশ শাসকদের প্রবর্তিত ব্যবস্থার সাথে খাপ-খাওয়ায়ে রাজনৈতিক-সামাজিক অঙ্গনে সরকারী-কোম্পানীর বিভিন্ন স্তরে মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য জোগাড়ে তৎপর হন, বৃটিশ আনুগত্য ও মধ্যযুগীয় অস্ত্র-শস্ত্রের জিহাদ পরিহার করেন। তাদের কর্মকাণ্ড আক্রমণাত্মক ও শাসক গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় কিম্বা প্রভাবে প্রভাবিত ছিল না বলে ঐতিহাসিকদের নজর কাড়েনি এবং আলোচ্য বিষয় হয়েও উঠেনি। ফলে তাঁদের তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় খুবই অপর্যাপ্ত, তারা হন ইতিহাসে উপেক্ষিত। মূলত তাদের অবস্থান ছিল মধ্যমপন্থা। তারা কথায় ও কলমে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা গ্রহণে এবং ইংরেজদের অধীনে চাকুরী করতে ইসলামী শরী'আতে কোন বাধা নেই; বরং বৈধ মর্মে ফাত্ওয়া প্রদান করেন। একই সাথে ঈমান-আকীদা রক্ষা ও তরীকত র্চচার মাধ্যমে কার্যত আত্মশুদ্ধি ও আমল সংশোধনে সাধারণ মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেন। এরূপ স্নায়ুযুদ্ধে যারা অবতীর্ণ হন, তাঁদের হতে ইমাম ফযলে হক খায়রাবাদী[৪১৮] ও তাঁর অনুসারী হযরত ফদ্বলে রাসূল বাদায়ূনী, আহমদ রিযা খান এবং সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ পেশোয়ারী[৪১৯] (রহ.) প্রমুখের নাম; তাদের জীবনাচারে লক্ষ্য করা যায়।

২) আধুনিক শিক্ষিত কিছু শহরবাসী মুসলমান; যারা বৃটিশ শাসকদের আনুগত্য, সহযোগিতা ও সদ্ব্যবহার করে মুসলমানদের সামাজিক উন্নতি অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেন। তারা ছিলেন উদারপন্থী। তারা সরকারেরও আনুকূল্য লাভ করেন। তাদের নিকট ঈমান- আক্বীদা ও আত্মশুদ্ধির চেয়ে আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভই গুরুত্ব পায় বেশী। তাদের দ্বারা রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের কিছুটা উন্নতি হয় বটে; তবে এ সব মুসলমানদের মন-মানসিকতা হয়ে পড়ে ইংরেজদের ইচ্ছানুকূল। তাদের মাধ্যমে সে সময় প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের আন্দোলনের প্রক্রিয়ার পরিণতিতে সৃষ্টি হয় আজকের সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞানের করুণ অবস্থা। এভাবে যারা আন্দোলন করেছিলেন, তাদের মধ্যে স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান[৪২০] ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

৪১৮. তিনি ছিলেন হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ.)'র শিষ্য। বৃটিশ সরকার তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে শ্রীলংকার আন্দামানে নির্বাসন দেয়। (ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ, *জঙ্গে আযাদী মে আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী কা কিরদার*, (পাকিস্তান : নূরী মিশন মালীগাঁ, ২০০৫, পৃ. ০২)

৪১৯. তিনি ছিলেন আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.)'র প্রধান খলীফা। তখন তিনি 'পেশোয়ারী সাহেব হুযূর' নামে খ্যাত ছিলেন। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পেশোয়ার শহরের সিরিকোট গ্রামে তাঁর জন্ম। এ কারণে এ দেশে তিনি 'সিরিকোটি সাহেব হুযূর' নামেও পরিচিত হন।

৪২০. তিনি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরীতে যোগদান করেন এবং ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি পাশ্চাত্যবাদী মনোভাবের কারণে বৃটিশদের আস্থাভাজন হন। তিনি ইংরেজ শাসনের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য দাবী করতেন। তিনি তাদের তুষ্ট করতে গিয়ে ইসলামের কতগুলো মৌলিক বিশ্বাসকে অস্বীকারও করেন। (ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৮৭)

৩) মুসলমানদের আরেকটি অংশ; যারা বিপ্লবী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। তারা হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ.)'র ভাবধারা ও শিক্ষা হতে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে সেকেলে অস্ত্র-শস্ত্রের জিহাদে অবতীর্ণ হয়। তাদের বিপ্লবী-জঙ্গী তৎপরতায় ইংরেজদের কুটিল ইচ্ছা পূরণ হয় সবচেয়ে বেশী। তাদের এ বিপ্লব ছিল মূলতঃ জ্বালাও-পোড়াও, ধর-মার নীতিতে; অবস্থাভেদে গেরিলা আক্রমণে। তারা একদিকে সাধারণ মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতিকে পূঁজি করে রাজনৈতিক ইস্যুগুলোকে ধর্মীয় ইস্যুতে রূপদান করে আবার ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের খুঁটি-নাটি বিষয়ে সংস্কারের নামে মনগড়া-ভ্রান্ত ফাত্ওয়া দানে প্রবৃত্ত হয়। এ সকল বিপ্লবী নেতা শাহ ওয়ালী উল্লাহ'র উক্ত ফর্মূলাকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে বৃটিশ বিরুধী আন্দোলনে নয়, কথিত সংস্কার আন্দোলনে; শিরক-বিদআত, হারাম-নাজায়েয ফাত্ওয়া দানে। এ প্রেক্ষাপটে সাধারণ মুসলমান বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয় এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীগত আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। ফলে ঐতিহাসিকগণ ঐ সব বিপ্লবীদের সংস্কার আন্দোলনকে জনসাধারণের আঞ্চলিক আন্দোলনের সাথে এক করে 'বৃটিশ বিরুধী আন্দোলন' নামে উপস্থাপন করতে থাকেন।

বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইতিহাসখ্যাত শেষোক্ত বিপ্লবীদের আন্দোলন সবই ছিল কপট শ্রেণী ও মুসলিম বিদ্বেষীদের নীলনকশা মাত্র। কারণ, বৃটিশদের আধুনিক বিশাল সমরাস্ত্র, গোলা-বারুদের মোকাবিলায় গাছ-বাঁশের লাঠি-সোটা, তীর-তলোয়ার দিয়ে লড়াই করা যে নির্ঘাত পরাজয়; মুসলমানদের সমস্যা নিরসন তো হবেই না; বরং ইংরেজ সরকার চরমভাবে যে আঘাত হানবে, অবস্থা দৃষ্টে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। তখন তারা ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের নামে ত্রাস সৃষ্টি করে, ইংরেজদের আগ্রাসনের পথ উন্মুক্ত করে দিল। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানবান মাত্রই স্বীকার করবেন যে, তাদের এ সব কর্ম মুসলমানদের ভাগ্যে কখনও সুফল বয়ে আনতে পারে নি। ঐ সকল বিপ্লবীরা সমকালীন বিশ্বকে তাক লাগিয়েছে বটে; কিন্তু এ সবের অন্তরালে ছিল তাদের আত্ম প্রচার ও বীরত্ব প্রদর্শন। তাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে তারা বৃটিশদেরই ক্রীড়নকে পরিণত হয়। তারা মুসলিম শক্তিকে সুসংগঠিত করার পরিবর্তে চিরতরে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত করে দেয়। তাদের এ সমস্ম কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপের ফলে মুসলমানগণ ভারতীয় সমাজে অবাঞ্ছিত ও চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়, বিপ্লবোত্তরকালে শাসকগোষ্ঠীর রোষানল ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ঐ সকল বিপ্লবীদের আন্দোলন কার্যত মুসলমানদের ভাগ্যে কোন কল্যাণ আনল না; বরং বৃটিশ শাসকদের অত্যাচার-উৎপীড়ন-লাঞ্ছনা এনে দিয়েছে বেশ। তাদের এরূপ আন্দোলনে নিরীহ মুসলমানদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় অনেক। বস্তুত: ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় কূটনৈতিক পর্যায়ে সংলাপের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনায় এ কথা প্রতিভাত হয়।

অধিকন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, বৃটিশদের সাথে উঁচু শ্রেণীর হিন্দু জনগোষ্ঠীও কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় মুসলিম নিধনের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল সমানতালে। তারা সমাজের প্রতিটি স্থানে একদিকে নিঃস্ব মুসলিমদের উপর প্রচণ্ড যুলুম-নির্যাতন করতে থাকে, অপরদিকে ইংরেজদের সাথে সহযোগিতামূলক নীতি অবলম্বন করে প্রায় এক হাজার বছর আগে মুসলমান কর্তৃক বিজিত তাদের পূর্বপুরুষদের হারানো রাজ্য পুণরুদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখল। ফলে তারা ইংরেজদের আস্থাভাজন হতে থাকে এবং রাষ্ট্রে তাদের অবস্থানও দিন দিন উন্নতি হতে থাকে। এ দিকে শিখরাও

ইংরেজদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে লাগল। উপমহাদেশের অমুসলিমদের বৈষম্য, নির্যাতন ও ইংরেজদের সঙ্গে তাদের আঁতাতের প্রেক্ষিতে অব্যাহত নানা দুর্ভোগ মুসলমানদেরকে সামাজিকভাবে দ্রুত অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়।

মোটকথা উপমহাদেশে মুসলমান ভিন্ন সকল গোষ্ঠী এক মেরুতে অবস্থান করে। বলতে গেলে মুসলমানদের হতে সকল ক্ষুদ্র বিপ্লবী-জিহাদী জনগোষ্ঠীর কারণে মুসলমানগণ ইংরেজদের একমাত্র প্রতিপক্ষ ও টার্গেটে পরিণত হয়। ফলে উপমহাদেশের ইসলামী উম্মাহ ঘাত-প্রতিঘাতে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও সামাজিক দুরবস্থায় জর্জরিত মুসলমানগণ বঞ্চনা ও হতাশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। তবে যারা সাধারণ শিক্ষায় বিদ্বান ছিলেন, তাদের কেউ কেউ লিখনী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি বের করার চেষ্টা করেন এবং ইংরেজদের সাথে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেও ইংরেজী ভাষা চর্চার প্রতি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেন এবং পশ্চাদপদতা ও স্থবিরতা কাটিয়ে তোলার প্রয়াস পান। যার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের সাথে ইংরেজদের যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, তা ক্রমশঃ কমিয়ে আসল বটে, কিন্তু ঐ সকল মুসলমান উদার নৈতিকতাবাদে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদ গ্রহণ করলো বেশী। ধর্মকে আবদ্ধ করলো চার দেয়ালের মধ্যে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আসল সত্য, তবে সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা দূর হল না। দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম জাতির গরীব-দুঃখী মেহনতী মানুষের শোষণ-বঞ্চনা বন্ধ হল না।

### ৩.২.৪ মুসলিম সমাজের উন্নয়নে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র অবদান

বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে মুসলমানদের পুণর্জাগরণ ও উন্নয়ন কোন একক ঘটনা বা ব্যক্তির অবদান প্রসূত ফল নয়, বরং বিভিন্ন অঙ্গন থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও সামাজিক ভাবেই এই আন্দোলনের সুচনা হয়েছিল। সে সময়ে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) যে অবদান রেখেছেন, তা স্বমহিমায় ভাস্বর। তার ধারাতে না ছিল অতিরঞ্জন-উগ্রতা, আবার না ছিল কৃচ্ছতা সাধনে উদারনৈতিকতা। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, পার্থিব সুখ-শান্তি লাভের আশায় আধুনিক জ্ঞান ও সম্পদ অর্জনে তৎকালে মুসলিম সমাজে যেভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শৈথিল্য পরিদৃষ্ট, তাতে এ পশ্চাদপদ জাতির উন্নতি যে সুদূর পরাহত; তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তাদের নিকট ধর্মের বাহ্য রীতি-নীতি পালনের আনুষ্ঠানিকতাই যথেষ্ট। আবার যারা আত্মিক উন্নতিতে মশগুল থাকতেন, তাঁরা ছিলেন সমাজ জীবনস্রোত হতে বিচ্ছিন্ন; অনেকে ছিল কুসংস্কার আচ্ছন্ন আবার অনেকে ঐসব কুসংস্কার হতে ইসলামী সমাজকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজেরাও ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। সামগ্রিক জীবনবোধ মুসলমানদের মাঝে ছিল একেবারে অনুপস্থিত। আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) উপলব্ধি করতেন, আত্ম প্রচারের উম্মাদনায় ফাতওয়াবাজীতে লিপ্ত ও অশিক্ষা-কুসংস্কারে জর্জরিত এ জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারবৃত্তে আবর্তিত। এ জন্য মুসলিম জন-জীবনে একদিকে ধর্মীয় চেতনা স্রোত ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সৃষ্টির তাগিদে সূফীবাদ তথা ত্বরীকত চর্চা যেমন অতীব জরুরী ছিল, তেমনি উপমহাদেশের অমুসলিম সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনে অগ্রসরমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার

মত দক্ষতা-সক্ষমতা অর্জন ছিল সময়ের দাবী। তাই শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক মর্যাদায় পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের উন্নতির জন্য তিনি তাঁর সমসাময়িক এবং ইত্যকার সকল মুসলিম চিন্তাবিদ-দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর সমন্বয় সাধন করেন, তাঁদের ভাবনা সমূহের ভাল দিকগুলো গ্রহণ পূর্বক ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপটি প্রকাশ করেন এবং তা সাধারণ মুসলমানদের অনুসরণের উপযোগী করে রূপায়িতও করেন। সময়ের প্রয়োজনে ও চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও অবস্থাসমূহের আলোকে তাঁর প্রচেষ্টা ও প্রয়োগ পদ্ধতি ছিল অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। কেবল আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিই এরূপ দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন। মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁর নির্দেশনা নির্ণয় ছিল অত্যন্ত দূরহ ও কঠিন; কিন্তু তা অনুসরণ ও পালন পদ্ধতি ছিল একেবারে সহজ-সরল এবং বাস্তবানুগ।

উদাহরণ হিসেবে ইমাম আযম আবু হানিফা (রা.) ও তাঁর নির্দেশিত হানাফী মাযহাবের মাস'আলাসমূহ উল্লেখ করা যায়। এ সব মাস'আলা শরী'আতের উসূল সমূহ হতে নির্ণয় বা প্রণয়ন করা বাহ্য:দৃষ্টিতে বোধগম্য নয়; কিন্তু মাসআলাসমূহ পালন সহজতর; অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র সম্মানের প্রতি রয়েছে যথোচিত গুরুত্ব। আবার সংসার ত্যাগ বা বৈরাগ্যবাদকে করেছে নিরুৎসাহিত। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নত ওয়াল জমা'আতকে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠা; এ কাঠামোতে সূফীবাদের সুসঙ্গত রূপায়ণ এবং মুসলমানদের নিরাপদ বসবাসের স্থায়ী ব্যবস্থা করা। যদিও তাঁর জীবনাচারে এবং লেখনীতে সূফীবাদ এক অভিনব মহিমায় প্রদীপ্ত। ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মাচরণকে তিনি আচারের শুষ্ক মরুবালি হতে ইশক্বের সরস যমীনে সঞ্জীবিত ও প্রাণবন্তকরেন। আল কুরআনের মাঝে লুকিয়ে থাকা আধ্যাত্মিকতার ঝর্ণাধারার উৎস মুখ সেই 'মহানবীর পবিত্র সত্তা' উম্মুক্ত করার চেষ্টা করেন এবং ধর্মকে তুলে ধরেন রূপে-রসে পরিপূর্ণ। ফলে নষ্ট স্বপ্নে বিভোর উপমহাদেশের মুসলমানগণ তাদের বিস্মৃত ঐতিহ্য সহসা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, দুর্বার নবীন শক্তিতে পরিণত হয় এবং ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের সাথে নতুনভাবে পরিচিত হয়।

বস্তুত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) বঞ্চিত ও সর্বহারা মুসলমানদের উন্নতির জন্য মানবজাতির শাশ্বত আদর্শের বাস্তব নমুনা হিসেবে আল কুরআনের স্বীকৃত মহানবী (সা.)'র সেই জীবনাদর্শকে একমাত্র অবলম্বন রূপে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, তাওহীদবাদে উজ্জীবিত মানব সত্ত্বা মহানবী'র পবিত্র আদর্শ অনুসরণেই হতে পারে একজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, মুসলমানদের এ অধঃপতনের মূল কারণ, মুসলমানগণ মহানবী (সা.)'র আদর্শ হতে দূরে সরে গিয়েছে। যে আদর্শ অনুসরণ করে মুসলমানগণ ১৫০০ বছরের ইতিহাসে ৮০০ বছর দুনিয়া শাসন করেছিল।[৪২১] তাই মুসলমানদেরকে এ আদর্শ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করতে মহানবী'র সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা ও জানানো দরকার। আর জানার জন্য তাঁর প্রতি অগাধ প্রেম-ভালবাসা সঞ্চার করে, এমন আনুকূল্য থাকা প্রয়োজন। যা দুরূদ শরীফ চর্চার অভ্যাসের মাধ্যমে সম্ভব। এ জন্য তিনি দুরূদ শরীফ চর্চাকে পথ্য-পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেন আর প্রচার-প্রসারে যথাযথ ব্যবস্থারও সার্থক রূপায়ন করেন। সাধারণত দুরূদ শরীফের গুরুত্ব-ফযীলত-উপকারীতা

---

৪২১. আলী আকবর আব্বাসী, *ফরূগ-এ ইলম মে মুসলমানোঁ কা কিরদার, পাঞ্জাব প্রাদেশিক চতুর্থ কনফারেন্স প্রকাশিত সীরাত-ই রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা* (লাহোর : উলামা একাডেমী, ১৯৮৪) পৃ. ২৬৬

সম্পর্কে আল কুরআন-সুন্নাহ'র অসংখ্য বর্ণনা তো আছে-ই, তদুপরি মুসলমানদের এহেন মুসীবত-দুর্দশা হতে পরিত্রাণের জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত নিঃসন্দেহে অপরিহার্য।

তাই আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের শোষণ-বঞ্চনার মূলোচ্ছেদের উদ্দেশ্যে যারা তাঁর নিকট নানা তদবীরের জন্য আসত, তাদেরকে দুরূদ শরীফ পাঠের নসীহত করতেন। আর যারা নিজ নিজ পেশায় জাগতিক উন্নয়নে ব্যতিব্যস্ত কিম্বা ধর্ম-কর্মে উদাসীন, তাদের নিকট প্রত্যন্ত অঞ্চলে খলীফা প্রেরণ করে তাসাওউফ তথা তরীকত চর্চার ব্যবস্থা করতেন এবং দুরূদ শরীফ পাঠের নির্দেশ দিতেন। অধিকন্তু এ সকল লোককে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। আবার অনেককে তিনি চিঠি-পত্রের মাধ্যমেও দুরূদ শরীফ পাঠের পরামর্শ দিতেন। এভাবে তিনি দুরূদ শরীফের মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতকে বাস্তবে রাসূল প্রেমের দহনে ঈমানী শক্তিতে মহিয়ান-গরিয়ান করে তোলার ও তাদের মুক্তির প্রয়াস পেয়েছেন।

### গাউসিয়া কমিটির প্রবর্তন

তিনি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা এবং ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য সচেতন মুসলিম মিল্লাতের সমন্বয়ে বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তম্মধ্য 'গাউসিয়া কমিটি' অন্যতম। সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়া তথা তরীকতের চর্চার জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি, সাংগঠনিকভাবে বাতিলের মোকাবেলা, ধর্মীয় ও তরীকতের কার্যাদি সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে তাঁরই নির্দেশে পীরানে-পীর দস্তগীর হযরত আবদুল কাদির জীলানী (রহ.)'র নামানুসারে সর্বপ্রথম পাকিস্তানে মজলিসে গাউসিয়া গঠিত হয়, যা পরবর্তীতে একটি বিখ্যাত সংস্থায় পরিণত হয়। এ সংস্থা ধর্মীয় ভাবাদর্শের ভিত্তিতে ধর্মীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়। এ সংস্থার মাধ্যমে পাকিস্তানে তরীকতের অনুসারীদের মধ্যে মাসিক খতমে গেয়ারভী শরীফ, বারভী শরীফ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 'আনওয়ারে মুস্তফা' নামে একটি ষান্মাসিক পত্রিকা মজলিসে গাউসিয়ার কমিটির তত্ত্বাবধানে বের হয়। তাছাড়া, মুহররমের ১০ তারিখ দিবাগত রাতে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র স্মরণে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। তাঁরই নির্দেশে বাংলাদেশে 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' নামে একটি আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক ধর্মীয় সংগঠন গঠিত হয়, যা তরীকত চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন ছাড়াও ঈমানী শক্তিকে জোরদার করার দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, বার্মা, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, ব্রিটেন, সৌদী আরব, আরব আমিরাত, ওমান, জর্ডান, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে তাঁর ভক্ত-অনুরক্তরা গাউসিয়া কমিটি, খানকাহ্ শরীফ ও ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথা কল্যাণমূলক সংস্থা-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।[৪২২]

## ৩.৩ রাজনৈতিক চিন্তাধারা

রাসূল (সা.), খুলাফা-ই-রাশিদীন, সাহাবা কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন সহ প্রত্যেক মুসলিম মনীষীই নিজের যুগে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সমাজ চিন্তা ও রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন।

৪২২. মোসাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি* (আজমীর এ্যাড এন্ড প্রিন্টার্স, ২০১২) পৃ. ১৩

মধ্যযুগে কয়েক শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তবে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বিদ্যমান ছিল। ফলশ্রুতিতে পরোক্ষভাবে তারা ইসলামী বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। এ ধরনে বাস্তবতার ঐতিহাসিক উপমা সুস্পষ্ট। খাজা মাঈন উদ্দীন চিশতি (রহ.) এর আধ্যাত্মিক নির্দেশে ও ফয়েযে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরি তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করেন, যা পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেছিল। গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে হযরত শাহ্-জালাল ইয়ামনী (রহ.) প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে বিজয়ী হয়েছিলেন।

### ৩.৩.১ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র রাজনৈতিক চিন্তাধারা

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনেও ছিল তাঁর পদচারনা। তিনি তৎকালিন বৃটিশ বিরোধী পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। আধ্যাত্মিক সাধনা তার মানসিক শান্তির খোরাক হলেও বাল্যকালে হতেই তাঁর অন্তরে রাজনৈতিক প্রতিভার উন্মেষ ঘটে তীব্রভাবে। তাঁর এ রাজনৈতিক ও সমাজ চিন্তার অন্তরালে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল ড. আল্লামা ইকবালের কাব্য। কেননা আল্লামা ইকবালের কাব্যে তৎকালীন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ভাবধারা ছিল প্রবল। আর ড. ইকবালই ছিলেন তাঁর প্রিয়কবিদের অন্যতম। তিনি পাকিস্তানের স্বাধীনতার বৃহত্তর আন্দোলনে প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা ও স্থাপতিদের সাথে মিলে বহু কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। তিনি পাকিস্তানের অস্থিত্বকে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। তিনি প্রায়ই স্বীয় ভক্ত-অনুরক্তদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে বলতেন অমুসলিম শক্তি পাকিস্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তার পারস্পরিক আলোচনা, জনসমাবেশ, সামাজিক ও রাজনীতি কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্রিকায়। তাঁর ইন্তিকালের পর পাকিস্তানের একটি দৈনিক পত্রিকায় ভাষ্য ছিল- "মরহুম নে তাহরীকে পাকিস্তানের মে ভী নামা-য়া খেদমাত আঞ্জাম দী থী" (মরহুম সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) পাকিস্তান আন্দোলনে সুন্দর গঠনমূলক খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেলেন। তিনি সর্বদা পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও মুসলমানদের আজাদীর পক্ষে কথা বলতেন। তাঁর রাজনৈতিক চর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক একটি সমাজ ব্যবস্থা তথা মুসলিম দেশ সমূহে নিজামে মুস্তাফা প্রতিষ্ঠা করা। রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকার ভাষ্য ছিল- "মরহুম সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) তাহরীকে পাকিস্তান আউর নাজনিয়ায়ে পাকিস্তান কে হামী তে আউর মুসলামানু কি আজাদী কো সবছে আহম্ম সমজ্তে থে" (মরহুম সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) পাকিস্তান আন্দোলন ও পাকিস্তান চিন্তাধারা সহযোগী ছিলেন। তিনি মুসলমানদের স্বাধীনতাকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী হলে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ পাকিস্তানের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ শাহ্ আহমদ নুরানী (জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলামের প্রধান)কে তৎকালীন সামরিক প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট পাঠিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি

দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) অত্যাচার বন্ধ করুন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করুন। পাকিস্তানকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করুন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তানের নওশেরায়ের বন্দী শিবিরে আটক সেনাবাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যদের দেখতে যান এবং তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে সহায়তা করেন।

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) সর্বদা নির্যাতিত মানুষের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হতেই পিতার সাথে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এ সফরের মাধমে তিনি বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছেন। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি বাংলাদেশ, ভারত, বার্মা (মায়ানমার) ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, যুক্ত রাষ্ট্র, আফ্রিকা, বৃটেন, সৌদি আরব, রাশিয়া (আটঘন্টা) প্রভৃতি রাষ্ট্রে সফর করেন। এসব রাষ্ট্রে তার সফরের উদ্দেশ্য ছিল -

ক. ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসার করা।

খ. শরী'আত-তরীকত ও দ্বীনি সেবা দান করা।

গ. ইসলামী ভাবধারার উন্নয়নকল্পে প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কায়িম করা।

ঘ. সামাজিক অবদান কল্পে জনকল্যাণমূলক সংগঠন-সংস্থা গড়ে তোলা।

ঙ. ইসলামী ভাবধারার পরিবেশ সৃষ্টি করে সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

তিনি পীর-মাশায়িখ, উলামা-বুদ্ধিজীবি, ইসলামী চিন্তাবিদ ও নবীপ্রেমিক মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সুন্নী উলামা ও বুদ্ধিজীবিদের সমন্বয়ে সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীতার ওপর গুরুত্বারোপ করতেন।

তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখলেও ইসলামী জীবনাদর্শ ও রাজনীতি চর্চায় কখনো পিছিয়ে ছিলেন না, যার বাস্তবতা তাঁর পারিবারিক সদস্যবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যায়। তার দু'ছেলের মধ্যে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.) হচ্ছেন সহজ সরল ও নম্র স্বভাবের একজন বিজ্ঞ ও সুদক্ষ আলেমে দ্বীন এবং মুর্শিদ কর্তৃক তরীকতের দায়িত্ব প্রাপ্ত উঁচু পর্যায়ের শায়খ। অপরজন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ (মু.যি.আ.) হচ্ছেন জেহাদী ভাবাপন্ন এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি বেনজীর সরকারের আমলে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিরোধীদলীয় একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে মসলিম লীগ (নওয়াজ শরীফ)'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) কোনদিন ছেলে সাবের শাহ্কে রাজনীতিতে বাঁধা দেননি, বরং রাজনীতি চর্চায় উৎসাহিত করেছেন। তার পারিবারিক সদস্যদের জীবন কাঠামোতেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শুধু একজন তরীকতের আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ ছিলেন না, বরং রাজনীতির মহান শিক্ষকও ছিলেন। তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকর পরিচিত ঘটে তার ইন্তিকালের পরই। তার ইন্তিকালের খবর দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকার সহ মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, বহির্বিশ্বের ইসলামী ব্যক্তিগণ ৮ই জুন ১৯৯৩ খ্রি. তাঁর নামাযে জানাযায় উপস্থিত হন। নেতৃবর্গ মরহুমের দ্বীনি ও তরীকতের খেদমতের পাশাপাশি পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর কর্ম ও অবদানের কথা স্বীকার করেন।

# চতুর্থ অধ্যায়

## আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ও সমসাময়িক ভারতীয় উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুসলিম মনীষী

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে দেশ-বিদেশে অনেক ভূমিকা রেখেছেন। এ সুবাধে তাঁর পরিচিতি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সমসাময়িক কালে আরো অনেক বিখ্যাত উলামা-মাশায়িখ ও বুদ্ধিজীবী ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে কাজ করেছেন। তাঁদের অনেকের সাথে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র গভীর সম্পর্ক ছিল। এখানে ভারতীয় উপমহাদেশের সমসাময়িক কয়েকজন মুসলিম মনীষী উলামা-মাশায়িখের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করছি :

### ৪.১. আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী (রহ.)

হাকীমুল উম্মত মুফাস্সিরে কুরআন, আল্লামা মুফতী [৪২৩] আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী (রহ.) হিন্দুস্তানের বাদায়ুন [৪২৪] জিলার উজানী মহল্লায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ মোতাবিক ১৩২৪ হিজরীর ৪ জুমাদাল ঊলা জন্মগ্রহণ করেন।[৪২৫] তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ ইয়ার, যিনি একজন দ্বীনদার ইবাদত-পরায়ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন 'ইউসুফ যাঈ' বংশীয় পাঠান। তাঁর পূর্বপুরুষদের কিছু সংখ্যক লোক মুঘল শাসনামলে আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে হিন্দুস্তান চলে এসেছিলেন। তাঁর দাদা মরহুম মুনাওয়ার খান (রহ.) 'ঊজাহানী' (বদায়ূন, হিন্দুস্থান)- এর শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত লোকদের মধ্যে গন্য ছিলেন। তিনি সেখানকার পৌরসভার সম্মানিত সদস্যও ছিলেন।[৪২৬]

মুফ্তী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী (রহ.) এর শিক্ষাজীবন ছিল শোভামণ্ডিত ও বর্ণাঢ্য। তাঁর শিক্ষা জীবনের হাতেকড়ি হয় তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা মোল্লা মুহাম্মদ ইয়ার খানের হাতে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বয়স যখন ৬ বছর তিনি তাঁর পিতার শিশু নিকেতনে ভর্তি হন। ১৯১১ খ্রি.-১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত মোট পাঁচ বছর সেখানে পিতার তত্ত্বাবধানে পড়া-লেখা করে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১১ বছর।[৪২৭]

---

৪২৩. 'মুফ্তী' শব্দটি আরবী। 'ইফআল' সমুচ্চারণে ইসম-ই ফায়িল, যা কর্তৃবাচ্যের রূপান্তরিত রূপ। অর্থ-ইসলামী শরী'আতের বিষয়ে সিদ্ধান্তদাতা, ফিক্হ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। [সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ***আরবী-বাংলা অভিধান*** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২০০৬ খ্রি.), ১ম প্রকাশ, খ. ২, পৃ. ৮০৩] মুফতী আমীমুল ইহসান, ***মাজমু'আহ কাওয়ায়িদ আল-ফিক্হ***, করাচী : কুতুবখানা আরামবাগ, ১৯৮৬, ১ম সংস্ক., পৃ. ৪৯৮

৪২৪. 'বাদায়ূণ' ভারতের উত্তর প্রদেশের এক ঐতিহাসিক শহর। এটি শিক্ষা সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি এলাকা। নিযামুদ্দীন আউলিয়াসহ সুবিখ্যাত অলী-বুযুর্গের জন্মস্থান এটি। একে মদীনাতুল আউলিয়া তথা অলীদের শহর বলা হয়। (সাক্ষাৎকার : সাংবাদিক জুলফিকার খান না'ঈমী ও স্থানীয় ছাত্র আরশাদ সাকলা'ঈন বাদায়ূন, তারিখ: ২৬/০৫/২০১৫খ্রি.)

৪২৫ . কাযী আব্দুন্নবী কাউকাব, ***হায়াত-ই সালিক*** (লাহোর : রেয়া একাডেমি, ১৯৭১ খ্রি.) ১ম সংস্ক., পৃ. ১৭; ***ফায়যানে মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী***, মাকতাবাতুল মাদীনা, করাচী, উইকিপিডিয়া; ঢাকা: আল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ***তাফসীরে না'ঈমী*** (বাংলা অনুবাদ) খণ্ড-১, পৃ. ৩৫; ***নুরুল ইরফান*** (চট্টগ্রাম: ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী), ২০০৪, খণ্ড-১, পৃ. ২৪

৪২৬. নযীর আহমদ না'ঈমী, ***সাওয়ানিহ্-ই ওমরী*** (পাকিস্তান : না'ঈমী কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৫

৪২৭. কাযী আব্দুন্নবী কাউকাব, ***হায়াত-ই সালিক*** (লাহোর : রেয়া একাডেমি, ১৯৭১ খ্রি.) ১ম সংস্ক., পৃ. ১৭

মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী'র ছাত্রজীবনকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়।১. উজাহানী, ২. বদায়ূন শহর, ৩. মীগু, ৪. মুরাদাবাদ ও ৫. মীরাঠ।[৪২৮]

মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী (রহ.) ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ছাত্র জীবনের সমাপ্তি টেনে তাঁর শিক্ষাগুরু সৈয়্যদ না'ঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.)'র আহবানে উক্ত প্রদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'আ না'ঈমীয়ায় শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তাঁকে দারুল ইফতার ফতাওয়া বিভাগের দায়িত্বও দেয়া হয়। এরপর তিনি ধুরাজির মাদ্‌রাসা-এ-মিসকিনিয়্যায় শিক্ষকতা ও ফাতওয়া প্রদানের দায়িত্ব নিয়ে চলে যান। এ মাদ্‌রাসার পরিচালনা কমিটির সদস্যরা সৈয়্যদ না'ঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.)'র নিকট শিক্ষকতা ও ফাতওয়া দানে পারদর্শী একজন যোগ্য আলিম চেয়ে আবেদন করলে, তিনি মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী (রহ.)কে এ পদের যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করে ধুরাজির মাদ্‌রাসায়ে মিসকিনিয়্যায় তাঁকে পাঠিয়ে দেন। নয় বছর শিক্ষকতা ও ফাতওয়া দানের দায়িত্ব পালন শেষে তিনি আবার জামি'আ না'ঈমীয়ায় চলে এসে এখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর উত্তর প্রদেশের ফায়যাবাদ জেলার কাসূসা শরীফের জামে আশরাফ এ যোগদান করেন। সেখানে তিন বছর শিক্ষকতার পর তিনি পাকিস্তানের সৈয়্যদ জালালুদ্দীন দারুল উলুমে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। এরপর পাকিস্তানের গুজরাটে অবস্থিত দারুল উলুম খুদ্দামুস সূফিয়্যাহ মাদ্‌রাসায় বার বছর শিক্ষকতা করেন।

---

৪২৮. জন্মস্থান উজাহানীতে তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার নিকট কুরআন মজীদ পড়েন। এরপর ফার্সী ভাষার পাঠ্য পুস্তকগুলো, দ্বীনিয়াত এবং 'দরসে নিযামী'র প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবাদিও তাঁর নিকট পড়ে নেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে অতি ছোট বয়সেই তিনি দ্বীনি শিক্ষা লাভের খাতিরে জন্মভূমি থেকে বের হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে ও মীগুতে 'দরসে নেযামী'র উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। তাঁর ছাত্র জীবনের দ্বিতীয় সোপান বদায়ূন শহরে অতিবাহিত হয়। সেখানে তিনি এগার বছর বয়সে (১৩৩৫ হিজরী/১৯১৬ খ্রি.) এসে 'মাদ্‌রাসা-ই শামসুল উলূম'-এ ভর্তি হলেন। এ মাদ্‌রাসায় তিনি তিন বছর যাবৎ (অর্থাৎ ১৩৩৫ হিজরী থেকে ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত) শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। বদায়ূনের পর মুফতী সাহেবের ছাত্র জীবনের তৃতীয় পর্যায় মীন্ডু রাজ্যে অতিবাহিত হয়। এখানে রাজ্য প্রধানদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি 'দারুল উলুম' (মাদ্‌রাসা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে ভালো অভিমতই পাওয়া যায়। মুফতী আযীয আহমদের বর্ণনানুসারে, এই মাদ্‌রাসাটি তখন দেওবন্দী ভাবধারায় পরিচালিত হতো। এ মাদ্‌রাসায়ও মুফতী সাহেব ১৩৩৮ হিজরী থেকে ১৩৪১ হিজরী পর্যন্ত, মোতাবেক ১৯১৯ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত তিন/চার বছর লেখাপড়া করেন। এর ফলে তিনি দেওবন্দী ভাবধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার সাথে আ'লা হযরত ও সদরুল আফাযিলের অধিকতর জ্ঞান-গভীরতার তুলনামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করারও সুযোগ পান। উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী (রহ.) ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'আ না'ঈমিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি ১৯২২ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দু'বছর কাল লেখাপড়া করেন। এ প্রতিষ্ঠনে তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন আল্লামা সৈয়্যদ না'ঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) (১৮৮৩-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে) ও মুশতাক আহমদ কানপুরী (রহ.) (১৮৭৯-১৯৪০ খ্রি.)। এরপর তিনি প্রিয় শিক্ষক মুশতাক আহমদ কানপুরীর সাথে মীরাঠের একটি মাদ্‌রাসায় চলে যান। সেখানে তিনি ১৯২৪ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ বছর বয়সে তিনি সফলতার সাথে শিক্ষা জীবনের ইতি টানেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন খ্যাতিমান আলিম ও বুযূর্গ ব্যক্তিত্ব মুফতী সৈয়্যদ না'ঈমুদ্দীন মুরাদাবাদীর হাত থেকে সনদ ও পাগড়ী পেয়ে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করেন। (কাযী আব্দুন্নবী কাউকাব, *হায়াত-ই সালিক* (লাহোর : রেয়া একাডেমি, ১৯৭১ খ্রি.) ১ম সংস্ক., পৃ. ১৭)

পাক-ভারত-বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পাঠাগার, সাধারণ পাঠাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার ও পুস্তকালয়ে তাঁর লিখিত ত্রিশটি গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যায়।[৪২৯] ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভীর পর মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হলেন আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের জন্য অতি গৌরবোজ্জ্বল লেখক। একথা বলা যায় যে, আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভীর পর মুফতী সাহেব সর্বোপেক্ষা বড় লেখক, বেরলভীর দ্বীনি লিটারেচারের মান হচ্ছে 'আলিমানা ও মুহাক্ব ক্বিক্বা-না (অর্থাৎ গভীর জ্ঞানও গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে বহু উঁচু) তিনি বিশেষ করে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে নিজের লেখনীগুলোতে উচ্চ শিক্ষাগত মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। আলিম সমাজ ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জাগরণের জন্য একান্ত জরুরী ও বুনিয়াদী দ্বীনি বই-পুস্তকগুলো আ'লা হযরতের কলম থেকে বের হয়েছিলো। এরপর প্রয়োজন ছিলো সরল-সহজ ও সাদাসিধে হৃদয়গুলোকে প্রভাবিত করার মতো লেখনীর। সুতরাং এ অঙ্গনে মুফতী সাহেব তাঁর মহান মসি দ্বারা এমনই প্রজ্ঞা দেখিয়েছেন এবং তিনি এমন সব যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছেন, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

মুফতী সাহেব যে কোন বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও সহজভাবে বর্ণনা করার জন্য দৈনন্দিন জীবনের বহু উদাহরণ চয়ন করে নিতেন। তিনি তাঁর লেখনীগুলোতে বিশেষ শ্রেণীর ও সাধারণ মানুষের এতোই নিকটবর্তী হয়ে যেতেন যে, তাঁর ও পাঠকদের মধ্যখানে কোন অন্তরাল বা দূরত্বই অবশিষ্ট থাকে না। বিগত অর্ধ শতাব্দি থেকে 'তাফসীর-ই কুরআন'র পরম্পরায় আ'লা হযরতের 'তরজমা'ও সদ্‌রুল আফাযিলের 'খাযাইনুল ইরফান কেই যথেষ্ট বলে মনে করা হতো। মুফতী সাহেব প্রায়শই বলতেন, "আহা ! আমি যদি আ'লা হযরতের নিকট থাকতে পারতাম, তবে তাঁর খিদমতে আরয করতাম, "কুরআন-ই করীম-এর তফসীরও আপনার কলম থেকে বের হওয়া দরকার। উল্লেখ্য যে, সদরুল আফাযিল অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে বিস্তারিত তাফসীরের কাজে হাত দিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত মুফতী সাহেব আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

---

৪২৯. ইলম-আল-মীরাছ- (১৩৩১ হি./ ১৩৫২ হি.), ২. ফাতওয়া-ই না'ঈমীয়া- (১৩৫৭) হি., ৩. দিওয়ান-ই সালিক- (১৩৫৭) হি., ৪. শানে হাবীবুর রহমান মিন আয়াত-আল কুর'আন- (১৩৬১) হি., ৫. জা'আল হক ওয়া যাহাক্ব-আল বাতিল (খ. ১)-(১৩৬১ হি./ ১৩৬৫ হি.), ৬. আশরাফ আল তাফাসীর (এগার খণ্ড) (প্রকাশ -তাফসীর-ই না'ঈমী)- (১৩৬৩ হি / ১৩৬৫ হি.), ৭. ইসলামী যিন্দিগী- (১৩৬৩ হি.), ৮. যামীমা-ই শান-ই হাবীবুর রহমান- (১৩৬৫ হি.), ৯. সালতানাতে মুস্তাফা দার মামলাকাত-ই কিবরিয়া- (১৩৬৭হি.) ১০. আসরার-আল-আহকাম- (১৩৬৭ হি.) ১১. রাহমাত-ই খুদা ব-ওয়াসীলা-ই আউলিয়া- (১৩৭১হি.) ১২. ইলমুল কুর'আন লি-তারজামাতিল ফুরকান- (১৩৬৭ হি.) ১৩. সফর নামা-ই হাজ্ব ওয়া যিয়ারত (১ম ভাগ) - (১৩৭৩ হি.) ১৪. রিসালা-ই নুর- (১৩৭৫হি.) ১৫. আমীর-ই মু'আবিয়া পর এক নযর- (১৩৭৫ হি.) ১৬. এক ইসলাম- (১৩৭৫ হি.) ১৭. জ'আল হক ওয়াযাহাক্বাল বাতিল (২য় খণ্ড)- (১৩৭৬ হি.) ১৮. নুরুল ইরফান ফী হাশিয়াতিল কুর'আন (১৩৭৭হি.) ১৯. মির'আতুল মানাজীহ শরহ-ই-মিশকাতিল মাসাবীহ (৮ খণ্ড)- (১৩৭৭ হি.) ২০. সফর নাম হিজায- (১৩৮১হি.) ২১. সফর নামা-ই ক্বিবলাতাইন- (১৩৮৪হি.) ২২. সফর নামা-ই হাজ্ব ওয়া যিয়ারত- (১৩৮৩ হি.) ২৩. ইসলাম কী চার উসূলী ইসতিলাহ- (১৩৮৪ হি.) ২৪. আল-কালাম আল মাকবুল ফী তাহারাত-ই নাসাব-আল রাসূল- (তা.বি) ২৫. যমীমা-ই জা'আল হক্ব ওয়া যাহাকাল বাতিল- (তা.বি.) ২৬. দরসুল-কুরআন- (তা.বি.) ২৭. নয়ী তাক্বরীরী - (২০০০ খ্রি.) ২৮. মু'আল্লাম-ই তাত্বরীর- (তা.বি) ২৯. না'ঈমী সফর নাম - (২০০৮ খ্রি.) ৩০. ইজমাল ফি তারজামা-ই ইকমাল (রিজাল শাস্ত্র)- (১৯৬৮হি.)

ওয়াসাল্লাম'র রূহানী ফয়যের বদৌলতে এ মহান কাজ সমাধা করেন। সুতরাং তিনি 'তাফসীর-ই না'ঈমী' লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রথম ১১ পারায় উর্দূ ভাষায় ১১ টি বিরাটাকার খণ্ড সম্পন্ন করলেন। এ 'তাসফীর-ই না'ঈমী' অসাধারণ জনপ্রিয় হলো। লক্ষ-কোটি মানুষের জন্য কুরআন বুঝার দ্বার খুলে গেলো। এ বিষয়েও (অর্থাৎ কুরআন বুঝা) তিনি লিখেছেন 'ইলমুল কুরআন'। [৪৩০] 'তাফসীর-ই না'ঈমী' ছাড়াও তিনি 'তরজমা কানযুল ঈমান' এর উপর বিস্তারিত 'হাশিয়া' (তাফসীর) লিখেছেন, যা 'তাফসীর-ই্ নুরুল ইরফান' নামেই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত। এ গ্রন্থটি সারল্য ও সহজবোধ্যতার কারণে গ্রহণযোগ্যতার একেবারে শীর্ষে পৌছেছে।

তিনি সহীহ বুখারী শরীফের উপরও আরবী 'হাশিয়া' (টীকা) সংযোজন করেছেন, যার নাম 'ইনশিরাহ্-ই বোখারী' প্রকাশ 'না'ঈমুল বারী'।[৪৩১] হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাব 'মিশকাতুল মাসাবীহ'র উর্দু অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা, আট খণ্ডে সমাপ্ত বিরাটাকার গ্রন্থ 'মিরআ-তুল মানাজীহ্' হযরত মুফতী সাহেবেরই আরেকটি অসামান্য অবদান।

মুফতী সাহেব বিদ্যার্জন শেষ করা মাত্রই বিভিন্নস্থানে শিক্ষাদানের মহান ব্রত পালনে আত্মনিয়োগ করেন। হযরত সদরুল আফাযিল তাঁকে 'জামেয়া না'ঈমিয়া, মুরাদাবাদ-এ শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনিও নিজেকে একজন 'উপযুক্ত শিক্ষক' হিসেবে প্রমাণ করে দিলেন। মুরাদাবাদে শিক্ষক থাকাকালে ধুরাজীর কাঠিয়াওয়ারে প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্‌রাসা-ই মিসকীনিয়া'র পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সদরুল আফাযিলের দরবারে ধুরাজীতে এমন একজন বহুগুণে গুণী ও উঁচু মানের আলিমে দীন পাঠানোর জন্য দরখাস্ত করা হলো, যিনি শিক্ষাদান, ফাত্ওয়া ও খোতবা প্রদানসহ যাবতীয় ধর্মীয় দায়িত্বাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনে সক্ষম হন। সদরুল আফাযিল মুফতী সাহেবকে ধুরাজী চলে যাবার কথা বলা হলে তিনি তাই করলেন।

মুফতী সাহেবের ব্যক্তিত্বের অনন্য দিক এটাই ছিলো যে, তিনি সময়ের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। প্রতিটি কাজ খুবই সুন্দরভাবে নিজের নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করে নিতেন। এমনকি, তাঁর নিত্য-নৈতিত্তিক কাজগুলো সম্পন্ন হতে দেখে মানুষ সময় নির্ণয় করে নিতে পরতেন। সব সময় সঠিক সময়ে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। বলাবাহুল্য, তিনি ওই সব লোকের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, শরীয়ত যাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। নামায, কুরআন তিলাওয়াত, দুরুদ শরীফ পাঠ এবং হজ্ব ও যিয়ারতের প্রতি তাঁর অসাধারণ আগ্রহ ছিলো। তিনি কয়েকবার হ্জ্ব করেছিলেন এবং যিয়ারতের জন্যও তাশরীফ নিয়ে যান। তিনি সফররত থাকাকালেও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করতেন।[৪৩২]

৩রা রমযানুল মুবারক, ১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ২৪ আক্টোবর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুফতী সাহেব কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর আপন স্রষ্টার সাথে মিলিত হন। তাঁর ইন্তিকালের কারণে ইসলামী বিশ্ব এক অতি উঁচু মানের দ্বীনি ব্যক্তিত্ব ও গৌরবময় লেখককে হারালো বটে, কিন্তু তাঁর জ্যোতিষ্মান প্রদীপ সব সময় আলো বিকিরণ করতে থাকবে। প্রতি বছর ২৪ ও ২৫ শে অক্টোবর

৪৩০. নযীর আহমদ না'ঈমী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭-৮ ; শায়খ বিলাল আহমদ সিদ্দীকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
৪৩১. কিতাবটি এখন মুদ্রণের জন্য যন্ত্রস্থ রয়েছে
৪৩২. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান বঙ্গানুবাদিত *মিরআতুল মানাজীহ শরহ-ই মিশকাতুল মাসাবীহ* (চট্টগ্রাম : ইমাম আহমদ রিযা রিসার্চ একাডেমী, ২০০৯ খ্রি.), ১ম সংস্ক. খ. ১, পৃ. ৩৯

তাঁরই মাযার শরীফে, মুফতী আহমদ ইয়ার খান রোড, চক পাকিস্তান, গুজরাটে, অতি জাঁকজমকপূর্ণ ভক্তি সহকারে শরীয়তের আলোকে তাঁর ওরস[৪৩৩] অনুষ্ঠিত হয়।

**পর্যালোচনা :** আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী (রহ.) ছিলেন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সতীর্থ। তাদের আকীদা, দর্শন এক ও অভিন্ন। মসলকে আ'লা হয়রত কে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষে উভয়ে আপন আপন অবস্থান থেকে কাজ করেছেন নিরলস ভাবে। আজকের প্রজন্ম তাদের কাছে ঋণী।

## ৪.২ আল্লামা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (রহ.)

আল্লামা মুফতী সৈয়্যদ আমীমুল ইহসান (রহ.) ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী সোমবার প্রত্যুষে ভারতেন মুঙ্গীর সৈয়্যদ জেলার পাঁচনা গ্রামে মাতামহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়্যদ আবদুল মান্নান। [৪৩৪] তাঁর বংশ তালিকা মহানবীর কন্যা হযরত ফাতিমার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌছে। এ কারণে তাঁর পূর্ব পুরুষণগ নামের পূর্বে সৈয়্যদ শব্দ ব্যবহার করতেন। তিনি বারাকাত আলী শাহের নিকট তারীকতে বায়'আত গ্রহণ করেন বিধায় তাঁর নামের শেষে আল-বারাকাতী তাঁর প্রধান সিলসিলা নকশবন্দী মুজাদ্দদী হওয়ায় নকশবন্দী ও আল-মুজাদ্দেদী এবং ইমাম আবু হানীফার অনুসৃত মাযহাব অনুসরণ করার কারণে আল হানাফী লিখতেন। তাঁর পরিপূর্ণ নাম মুফতী আমীমুল ইহ্সান প্রকৃত নাম সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান আল-মুজাদ্দেদী আল-বারাকাতী আল-হানাফী।

মুফতী সাহেবের পিতার নাম সৈয়্যদ আব্দুল মান্নান, মাতার নাম সায়্যিদা সাজেদা। পিতামাতা উভয় সূত্রেই তিনি মহানবীর অধঃস্তন পুরুষ তিনি সুন্নী মত অনুসরণ করতেন। আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সারাজীবন তিনি হানাফী মাযহাবসম্মত ধর্মীয় বিধানানুযায়ী ফাত্ওয়া চর্চা করেন।[৪৩৫]

তাঁর পূর্বপুরুষ আরব হতে ভারতে আগমন করেন। সুলতান তুঘলকের শাসনামলে (১২২৫-৫১ খ্রি.) তাঁরা জাজ্নীর (সিরিয়া ও হিজাজের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) হতে দিল্লীতে হিজরত করেন। ভারত প্রত্যাগত তাঁর পূর্বপুরুষের নাম সৈয়্যদ আহমদ আল-জাজনীরী। তিনি একজন পুণ্যবান সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁকে বসতি স্থাপন করে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সুলতান তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার কথা অবহিত হয়ে মুগ্ধ চিত্তে তাকে বিহারের মুঙ্গীর জিলার চৌদ্দটি বিশেষ সমৃদ্ধ গ্রাম জায়গীর হিসেবে দান করে পুরস্কৃত করেন। বর্তমানে এ গ্রামগুলো বারাহ্গিয়া নামে পরিচিত।

আল্লামা মুফতী সৈয়্যদ আমীমুল ইহসানের শৈশবকাল তাঁর মায়ের সাথে মাতামহের বাড়ীতে। পঞ্চম বর্ষে উপনীত হওয়ার পর তিনি তাঁর পিতা-মাতার সাথে কলকাতা শহরে চলে যান এবং

৪৩৩. মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী, *ইসলামী যিন্দিগী* ( দিল্লী : ফারুকীয়া বুক ডিপো, ২০০৪ খ্রি.) ১ম সংস্ক. পৃ. ৫

৪৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৪৩৫. মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, *মুফতী সৈয়্যদ আমীমুল ইহছান মুজাদ্দেদী (রহ.)'র গ্রন্থাবলী*, (চট্টগ্রাম : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ২০১৩), পৃ. ১৬

সেখানে প্রতিপালিত হন। শৈশব হতেই তাঁর আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রে ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের ছাঁপ পরিলক্ষিত হয়। ধ্যান-ধারণা ও চাল-চলনে তিনি অন্যান্য সাধারণ শিশু অপেক্ষা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। খেলা-ধুলায় লিপ্ত হয়ে অযথা সময় নষ্ট করা তাঁর পছন্দ হত না। তাঁর জন্মগত পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের মনস্তাত্বিক প্রভাব তাঁর ব্যক্তিত্বে ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করতে থাকে। এ ধারা অবলম্বন করেই তাঁর বাল্য, কৈশোর ও শিক্ষাজীবন ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকে।[৪৩৬]

আমীমুল ইহসান প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন বাবা ও চাচার নিকট। তাঁর চাচা সৈয়্যদ আব্দুদ দাইয়ানের যত্নের অধীনে থেকে তিনি মাত্র তিনমাস সময়ের ব্যবধানে পূর্ণ ত্রিশ পারা কুরআনা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র পাঁচ বছর। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁর নিকট উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় প্রাথমিক পাঠও গ্রহণ করেন।[৪৩৭] তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় **১৯২৬** খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে। এ সময়ের পূর্বে তিনি সে সময়কার কিছু বিখ্যাত আলিম ও ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার হেড মৌলভী মাওলানা মাজেদ আলী জৌনপুরীর নিকট আরবী ব্যাকরণ, ফিক্‌হ ও যুক্তি বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ, আব্দুল মজিল আল-মুরাদাবাদীর নিকট কিছু আরবী কিতাব, আব্দুল রহমান আল-কাবুলীর নিকট যুক্তি বিদ্যা ও উসূল বিষয় গ্রন্থাবলী এবং আল্লামা কারামাত আলী শাহ্ পাঞ্জাবীর নিকট ফিকহ্ ও মানতিকের প্রাথমিক জ্ঞান হাসিল করেন। নিজ চাচার নিকট সুন্দর হস্তলিপি বিদ্যা অনুশলীন এবং সে সময়কার প্রখ্যাত ক্যালিগ্রাফার যথাক্রমে আব্দুর রহমান খাঁ ও সৈয়্যদ ফযদূলর রহমানের যত্নে সুন্দর হস্তলিপি এবং পাথরের গায়ে লিখন শৈলী রপ্ত করেন।

**১৯২৬** খ্রিস্টাব্দে পনের বছর বয়সে আল্লামা আমীমুল ইহ্‌সান কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় আলিম (lower standard) প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত ও পূণ্যবান ব্যক্তিগণের নিকট দারস-এ নিযামীর অনুমোদিত বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন। মাদ্‌রাসার আভ্যন্তরীণ প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথমস্থান এবং মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীনে গৃহীত কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়ে কৃতকার্য হন। তিনি **১৯২৯** খ্রিস্টব্দে ফাযিল এবং **১৯৩৩** খ্রিস্টব্দে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি আলিম পরীক্ষায়ও হাদীস বিষয়ে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। তৎকালিন বিশ্ববরেণ্য যে সমস্ত শিক্ষক মণ্ডলির তত্ত্বাবধারে তিনি ইলমে দীন অর্জন করেছিলেন। [৪৩৮]

---

৪৩৬. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ২২

৪৩৭. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১৩

৪৩৮. তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যথাক্রমে- ১. আবুল হুফ্ফায মুহাম্মদ ফাসীহ (১৯০১ - ১৯৭৪ খ্রি.), ২. আব্দুস সাত্তার (১৯০৮), ৩. ইসমাঈল বিহারী (১৮৭৮-১৯৩৭), ৪. ইসমাঈল সাম্ভুলী (১৯৪৪), ৫. ইয়াহইয়া সাহসারামী (১৮৮৬ - ১৯৫১), ৬.ওসমান গণী (১৯০৬), ৭. ওয়াসী উদ্দীন (১৩০০/১৮৮২-১৩৬৮/১৯৪৮), ৮.জামিল আনসারী (১৩০৯/ ১৮৯১- ১৩৬৭/১৯৪১), ৯. নাযিরুদ্দীন (মৃ. ১৩৭৩/১৯৫৩), ১০. নূরুল্লাহ সন্দ্বীপী (১৩১৭/১৮৯৯- ১৩৭১/১৯৫১), ১১. বিলায়েত হোসাইন বীরভূমি (১৮৮৭-১৯৮৪ ), ১২. মাওলানা মুম্‌তায উদ্দীন আহমদ (১৩০৭/ ১৮৮৯ - ১৩৯৪/১৯৭৪), ১৩. মাজিদ আলী জৌনপুরী (মৃ : ১৩৫৫/ ১৯৩৬), ১৪. মাওলানা মুহাম্মদ মাযহার (১২৮২/১৮৬৫- ১৩৭৬/১৯৫৬), ১৫. মুশতাক আহ্‌মদ-

প্রতিষ্ঠানিক জ্ঞান ও সনদ অর্জনের পর আল্লামা কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তাঁর ঘটনাবহুল কর্মজীবন কলকাতা ও ঢাকার ভিত্তিতে বিন্যস্ত।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পিতার জীবিত সন্তানগণের মাঝে তিনি ছিলেন সবার বড়। তাঁর পিতা মৃত্যুর দু'মাস আগে তাকে নিজ জুব্বা পরিয়ে দেন এবং পূর্বপুরুষ পরম্পরায় প্রাপ্ত সব কল্যাণ ও বরকতময় বস্তু প্রদান করেন। এভাবে তিনি তাঁকে নিজ স্থলাভিষিক্ত করে যান, পিতা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাই তাঁকে পিতৃপরিত্যাক্ত সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। মাত্র বছরখানেক আগে তিনি মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। নিয়মিত পড়া-লেখা অব্যাহত রেখে বিধবা মায়ের সেবা-যত্ন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই-বোনদের প্রতিপালন, পিতার ডিসপেনসারী সচল রাখা, মসজিদের তত্ত্বাবধান, ইমামতি, মক্তব পরিচালনা এবং পারিবারিক ছাঁপাখানা দেখাশোনা ইত্যাদি দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর কাধে। কিন্তু এসব দায়িত্ব তাকে লেখাপড়া হতে দূরে সরাতে পারেনি। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের পাশাপাশি নিজ বাসভবনে হাদীস, ফিকহ ও বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানে মনোনিবেশ করেন। কালক্রমে তাঁর মেধা ও গভীর পাণ্ডিত্বের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ, পাক-ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলিম ও জনসাধারণ ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ লাভের প্রতি আকৃষ্ট হন।[৪৩৯]

মসজিদের সাথে একটি মাদ্‌রাসা এবং মাদ্‌রাসার দারুল ইফতা (ফাত্‌ওয়া বিভাগ) রয়েছে। কালক্রমে এ মসজিদ ও দারুল ইফতা সারা বাংলার ধর্মীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে রূপান্তরিত ও স্বীকৃত হয়। প্রতিষ্ঠানটি অবিভক্ত বাংলার ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি রূপেও গড়ে ওঠে। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মুফতী সাহেব উক্ত মসজিদের সহকারী ইমাম ও মাদ্‌রাসার দারুল ইফ্‌তার প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মাদ্‌রাসার দারুল ইফতার প্রধান মুফতীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তখন হতে তিনি জ্ঞান প্রসারের পাশাপাশি ব্যাপক ফাতওয়া দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মাদ্‌রাসায় তিনি হাদীস, ফিকহ ও সাহিত্যের পাঠদান করতেন। এ সময় উক্ত মাদ্‌রাসায় উপমহাদেশের দু'জন শিক্ষাব্রতী, সমাজ চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা ও শীর্ষস্থানীয় আলিম মাওলানা হুসায়ন আহমদ আল-মাদানী (মৃ. ১৯৫৭) এবং আবুল কালাম আযাদ (মৃ. ১৯৫৮)।[৪৪০]

ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা সমাধানকল্পে মুফতী সাহেবের অসংখ্য ফাত্‌ওয়া প্রদান করেন। কারো মতে, এ সংখ্যা লক্ষাধিক, এ প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে প্রদত্ত ফাতওয়া হতে তিনি ১২০০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি বৃহৎ পাণ্ডুলিপি রেখে যান। এ পাণ্ডুলিপিতে প্রায় ৪০,০০০ ফাত্‌ওয়া রয়েছে। নাখোদা মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও দারুল ইফতার কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি তাঁর প্রখ্যাত হাদীস সংকলন ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার সম্পাদনা করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন ধর্ম হতে ইসলামে

---

কানপুরী (১২৯৫/১৮৭৯-১৩৫৯/১৯৪০), ১৬. মুহাম্মদ হোসাইন সিলেটী (১৩০৮/১৮৯০ - ১৩৯২/১৯৭২), ১৭. সাদাত হোসাইন বিহারী (১২৫৭/১৮৪২ - ১৩৬০/১৯৪১), ১৮. সফী উল্লাহ সারহদী (মৃ. ১৯৪৮ - ১৩৬৮/১৯৪৮), ১৯. সিদ্দিক আহমদ ইসলামাবাদী (১২৯৪/১৮৭৭ - ১৩৮৯/১৯৬৯), ২০. মাওলানা হাবীব উল্লাহ (১৩২১/১৯০৩ - ১৩৭৯/১৯৫৯), ২১. মাওলানা হিদায়েত হোসাইন (১৩০৫/১৮৮৭ - ১৩৬৩/১৯৪৯)

৪৩৯. ড. এ এফ. এম. আমীমুল হক, ***মুফতী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪৪০. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ২৫

দীক্ষিত নও মুসলিমগণের পার্থিব ও ধর্মীয় শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্বসহ ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় চার সহস্রাধিক নর-নারী ইসলামে দীক্ষিত হন। [৪৪১]

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার মুফতী সাহেবকে মধ্য কলকাতায় কাযী পদে নিয়োগ করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় সরকারের উপদেষ্টা মনোনীত হন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আমান-ই-কুররা- বাংগাল (নিখিলবঙ্গ কারী সমিতি)-এর সভাপতি নিযুক্ত হন। সরকার সময় সময় তাকে বিচার বিভাগীয় জুরীতে যোগদানের জন্য আহবান করতেন। এভাবে প্রায় এক যুগ ধরে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামী ও জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করে বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের সমূহ কল্যাণ সাধন করেন।

কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ খান বাহাদুর আলহাজ্জ যিয়াউল হকের (মৃ. ১৯৫৮) অনুরোধে সাড়া দিয়ে মুফতী সাহেব ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে উর্দূ প্রভাষক পদে মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। এ পদে থেকেও অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্য এবং যোগ্যতা বলে তিনি কামিল শ্রেণীতে তাফসীরে বায়যাবী ও বুখারী শরীফ ১ম খণ্ডের দার্‌স এবং ফিক্‌হ বিভাগে পাঠদান করেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করে যান।
এ সময় তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেন।[৪৪২]

তাঁর তৎকালীন রচনাবলী খুব সমাদর লাভ করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর আলিয়া মাদ্‌রাসার বাংলা আরবী বিভাগ ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন তিনি কর্মরত অবস্থায় অপরাপর সহকর্মীর সাথে ঢাকায় চলে আসেন এবং স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন। [৪৪৩]

মাদ্‌রাসা আলিয়া ঢাকায় মুফতী সাহেব একই পদে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর মাওলানা জাফর আহমাদ ওসমানী হেড মৌলভী পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর (১৯৫৫) তিনি অস্থায়ীভাবে উক্ত পদে মনোনয়ন লাভ করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১লা জুলাই তাঁর পদ স্থায়ী হয়। তখন হতে পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষা বিষয়ক দফতর পরিচালনার দায়িত্বও লাভ করেন। এসব দায়িত্ব তিনি কর্তব্য ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। এসময় তিনি তাঁর অবশিষ্ট রচনাকর্মের অধিকাংশই সমাপ্ত করেন। তাঁর কর্তব্য ও নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ নিয়মিত চাকরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সরকার তাকে আরো অতিরিক্ত তিন বছর উক্ত পদে বহাল রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এতে সম্মত হননি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রণয়ন এবং ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজে প্রচুর সময় দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সালের ১ অক্টোবর সরকারী চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পুরানো পল্টন ময়দানে (বর্তমানে আউটার স্টেডিয়াম) অবস্থিত পূর্বপাকিস্তানের জাতীয় ঈদগাহের ইমামতির দায়িত্ব মুফতী সাহেবের ওপর ন্যস্ত হয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে জাতীয়

---

৪৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৪৪২. উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-আত্‌ তাশাররুফ লি আদাবিত্‌ তাসাউওফ, শারহু মুকাদ্দামাতিশ্‌ শায়খ, লব্বুল উসূল, আদাবুল মুফ্‌তী, তা'রিফাতুল ফিক্‌হিয়া, মিন্নাতুল বারী, ইল্‌মে হাদীস ক মাবাদিয়াত, মুকাদ্দামা সুনানে আবী দাউদ, মারসীলে আবী দাউদ ইত্যাদি প্রধান।

৪৪৩. মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, *মুফতী সৈয়্যদ আমীমুল ইহছান মুজাদ্দেদী (রহ.)'র গ্রন্থাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

মসজিদ বায়তুল মুকাররম মসজিদ কমিটি সর্বসম্মতভাবে তাকে খতীব মনোনীত করেন। কালক্রমে এ মসজিদ পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ধর্মীয় মিলনাকেন্দ্রে রূপলাভ করে। একে কেন্দ্র করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার এবং বিভিন্নমুখী ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যেই এ প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। কালক্রমে এ সংস্থা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান বিতরণ ও গ্রন্থ প্রকাশের কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ লাভ করে। মুফতী সাহেব প্রতি শুক্রবার ও ঈদের দিন বায়তুল মুকাররমে খুতবা দিতেন। খুতবা দেওয়ার আগে আলোচ্য বিষয়ের সরল বঙ্গানুবাদ পড়ে  শোনানো হতো। তাঁর খুতবাগুলো প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় খুব হৃদয় স্পর্শী ছিল। এগুলো মান ও গুণগতভাবে ছিল খুব বিন্যস্ত ও উন্নত।

মুফতী সাহেব স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত এক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ সবাই ছিলেন আধ্যত্মিক সাধনায় মশগুল, তাই বলা যায় যে, তিনি বংশসূত্রে সূফীমত ও আত্মশুদ্ধির অনুপ্রেরণা লাভ করেন। মুফতী সাহেব সর্বপ্রথম সূফী মতে দীক্ষা লাভ করেন ১২২১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পিতা মুর্শিদ আবু মুহাম্মদ বারাকাত আলী শাহ্ তাকে সর্বপ্রথম এ মতে দীক্ষিত করেন। তাঁর তিরোধানের পর ১৯২৬-৩০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যবর্তী সময় তিনি পাঞ্জাবের কুন্দিয়ানের পীর মাওলানা সা’দ আহ্মদ শাহের হাতে দ্বিতীয় বার বায়‘আত হন। তাঁর চাচা সৈয়্যদ আব্দুদ দাইয়ানের হাতেও তিনি আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। এসব দীক্ষাগুরুর নিকট তিনি মুজাদ্দেদিয়া নক্শেবন্দিয়া সূফী মতে দীক্ষিত হন। তাঁর অনুসৃত সূফীমত “সিলসিলা-এ খাজেগা” নামেও অভিহিত। এ ধারাটি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও প্রসিদ্ধ সাহাবা সাল্মান ফারসী হতে উদ্গত হয়ে খাজা বাহা উদ্দীন নক্শে বন্দী পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে।[৪৪৪]

তিনি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও সদালাপী ছিলেন। তাঁর হৃদয় ছিল স্বর্ণের মতই দুর্লভ ও দুর্মূল্য। আমাদের হতাশাগ্রস্ত ও পরশ্রীকাতর সমাজে এমন সৎ নির্লিপ্ত সচেতন ও বিবেকবান মানুষ বিরল। তজ্জন্য তিনি অনায়াসে সবার প্রাণের শ্রদ্ধা কেড়ে নিতেন। সত্যপ্রিয় ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। সত্যপ্রিয়তা ছিল তাঁর মজ্জাগত, তাঁর সত্যপ্রিয়তা ও স্পষ্ট ভাষণ এমন ছিল যে, নিজ অনুসৃত মাযহাবের অভিজ্ঞ ব্যক্তির ভ্রান্ত মত পরিহার এবং অন্য মাযহাবের কোন আলিমের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও কুণ্ঠিত হতেন না। যা বর্তমানে অনেকের মাঝে পাওয়া দুস্কর। তিনি সব ধরণের পক্ষপাতমুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক স্বীকৃত মাযহাবের আলিম ও বিশেষজ্ঞগণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তবে ইমাম আবূ হানীফার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি তাঁর (ইমাম আবু হানীফা) পাণ্ডিত্য ও শ্রেষ্ঠত্বে গভীর আস্থা রাখতেন। তাঁর সম্বন্ধে তিনি বলেন, তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ আবিদ, সর্বাধিক তাহাজ্জুদ গুজার এবং সবচেয়ে বেশী কুরআন পাঠকারী ছিলেন। তিনি সর্বাধিক লজ্জাশীল ও বৈধ উপার্জনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নম্র, দানশীল ও খোদাভীরু ছিলেন। তিনি সর্বাধিক ফিক্হ জ্ঞানের

৪৪৪. নক্শবন্দ শব্দের আভিধানিক অর্থ চিত্রকর। এ তরীকায় সাধনার মাধ্যমে মানব হৃদয়ে এক আল্লাহ্র  চিত্র খোদাই হয়ে যায় বিধায় তরীকাটির এ নামকরণ সার্থক হয়েছে। এ তরীকায় সাধনা করলে সাধকের হৃদয়ে সত্যের পূর্ণ ছাপ বসে যায়। এটার উদ্ভাবক মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ বাহা উদ্দীন আল-বুখারী (১৩৩১-১৩৮৯)। এ সূফীমত সমরকন্দ ও বুখারায় পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সম্রাট আকবরের শাসনামলে খাজা বাকী বিল্লাহ (মৃ. ১৬০৩) সর্ব প্রথম ভারতবর্ষে উক্ত সিলসিলা প্রবর্তন করেন। এর পূর্বে ভারতে চিশ্তিয়া ও কাদেরিয়া তরীকা বিকাশ লাভ করেছিল। তবে নক্শে  বন্দিয়া তরীকার প্রবর্তন বিলম্বে ঘটলেও খাজা সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় ফলে অল্প সময়ে এ দেশে এর ভিত সুদৃঢ় হয়।

অধিকারী, ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইমাম, মহানবীর শরী'আতের মুজ্তাহিদ, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান হাসিলকারী ও তদনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তি ছিলেন।

ইসলামি শিক্ষার তিনটি মৌলিক বিষয় :- ১. আল কুরআন ২. আল-হাদীস ও ৩. আল-ফিক্হ।

ক) তাফসীর : মুফতী সাহেব পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ রচনার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে বরং তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি রচনা করেন। তাঁর মত গভীর পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর রচনা করা দুঃসাধ্য বিষয় ছিল না। অথচ এ বিষয়ে অগাধ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি উক্ত কাজে মনোযোগী হননি। কেন যে তিনি এরূপ করলেন সে বিষয় রহস্যাবৃত রয়ে গেল। তাঁর কোন ভক্ত ও অনুরক্ত বিষয়টির প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেও তাঁরা অনুকূল সাড়া লাভে ব্যর্থ হন। কোন সময় কেউ এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করলে তখন খুব অল্প কথায় বলতেন, 'বাজারে বহু ভাল তাফ্সীর আছে। তাই এ কাজে সময় ব্যয় করা ঠিক হবে না। কারণ এতে তাফসীর শাস্ত্রের কলেবর অযথা বৃদ্ধি পাবে, এমন করা আমি সমীচীন মনে করি না।[৪৪৫]

খ) হাদীস : মুফতী আমীমুল ইহসান একজন শীর্ষ স্থানীয় মুহাদ্দিস। পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীস-চর্চার শীর্ষ যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর হাতে এ যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইল্ম হাদীস সব ইসলামী জ্ঞানের মূল এবং কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্বীকৃতি পায়। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর শিষ্য মাওলানা মুজদুদ্দীন আল্-মক্কী কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। উক্ত মাদ্রাসা হতে মুফতী আমীমুল ইহ্সান হাদীস শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন। উক্ত মাদ্রাসা হাদীস শিক্ষক মুশতাক আহমদ কানপুরীর সনদের ধারাবাহিকতায় মুফতী সাহেব শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হন। উক্ত ধারাটি নিম্নরূপ ;

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ → শাহ্ আব্দুল আযীয → শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক →আবদুল গনী →শায়খ হাসবুল্লাহ → মুশতাক আহমদ → আমীমুল ইহ্সান ।

গ) ফিকহের শিক্ষা : মুফতী আমীমুল ইহসান পাশাপাশি ফিক্হ শাস্ত্রেও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ফিক্হ শাস্ত্রে তিনি দু'ধরনের অবদান রেখে যান। ১. গ্রন্থ প্রণয়ন ও ২. ফাতওয়া প্রদান। নিম্নোক্ত দু'বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

মুফতী সাহেব ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন, টীকা সংযোজন এবং সংকলন সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কলকাতা নাখোদা মসজিদ সংলগ্ন দারুল ইফতার প্রধান মুফতী নিয়োজিত হবার পর হতে তাঁর নিকট নানা বিষয়ে ফাতওয়ার তাগিদ আসে। ফাতওয়া দানের নিমিত্তে তাকে রাত-দিন বহু নির্ভরযোগ্য ফিক্হ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হয়। এ কঠোর পরিশ্রম ও ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমে ফিকহ্শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পায়।[৪৪৬] তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, ইতিহাস, উসূলসহ বিভিন্ন বিষয়ে সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী ২০০ এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৪৭]

---

৪৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৪৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৪৪৭. উল্লেখযোগ্য গুলো হলো-১. ইতহাফুল আশরাফ বি হাশিয়াতিল কাশশাফ ,২. আল ইহসানুস সারী বিত তারযিহ ই তাফসিরই সহীহিল বুখারী, ৩. আত তানবীর ফি উসূলিত তাফসির, ৪. আত-তাবশীর ফি শরহিত তানবীর ফি উসূলিত তাফসির, ৫. আল ফিকহুস সুনান ওয়াল আসাব, ৬. আল আরবাঈল ফিস্ সালাতি

মাসআলা-মাসায়িল নিরূপণের ৪২৬টি সাধারণ নিয়ম-রীতি ও বিধি-বিধান বিবৃত করে তিনি 'কাওয়ায়িদুল ফিক্‌হিয়া' শিরোনাম দিয়ে একটি সংকলন সম্পাদনা করেন। উক্ত গ্রন্থে বিবৃত নিয়ম-রীতি ও বিধি-বিধানগুলোর নিয়ম, শরীআতের বিভিন্ন বিধান, দৈনন্দিন জীবন-যাপন পদ্ধতি, সামাজিক সমস্যা ও ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। আলোচ্য গ্রন্থে ফিক্‌হবিদ ও উসূল বিশারদগণের পরিভাষা এবং ধর্মীয় বিশষজ্ঞদের বিখ্যাত গ্রন্থাবলীতে ব্যবহৃত জটিল শব্দসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। এতদ্ব্যতীত তিনি ফিক্‌হশাস্ত্র বিষয়ক ছয়টি পুস্তক রচনা করেন।[৪৪৮]

সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান মুফতী নামেই সর্বাধক পরিচিত। বিশেষ ধর্মীয় বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনকারী ব্যক্তিকে মুফতী বলা হয়। তিনি উক্ত (ফাতওয়া) বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন বিধায় এ নামে খ্যাত হন। তাঁর ওস্তাদ প্রথিতযশা ফিক্‌হবিদ্ কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার ফিক্‌হ বিভাগের প্রধান মাওলানা মুশতাক আহম্‌দ কানপুরী তাকে উক্ত উপাধিতে ভূষিত করেন আমীমুল ইহসান মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মুশ্‌তাক আহমদ কানপুরীর নিকট ফাতওয়া লিখন শৈলী অনুশীলন করেন। এ অনুশীলনে দক্ষতার্জন করার পর তাকে সমাবর্তনের মাধ্যমে ফাতওয়া প্রদানের সনদ প্রদান করে মুশতাক আহ্‌মদ সাহেব মুফতী উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে রামাযান মাসে মুফতী সাহেবের শারীরিক অবস্থা কিছুটা খারাপ হয়। সে সময় তিনি তাসবীহখানায় প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রদত্ত ভাষণ ও আল কুরআনের দারস দেয়ার প্রাক্কালে মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে থাকেন। মনে হয় যেন তিনি অতি সংগোপনে নিজের জীবনাবসানের কথাই ব্যক্ত করেছেন। ১৩৯৫/১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ১০ শাওয়াল ২৭ অক্টোবর রোজ শনিবার মাগরিবের নামাযের পর তিনি দীর্ঘক্ষন তাসবীহ- তাহলীল পড়ার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুনাজাত করেন। অতঃপর উপস্থিত ভক্ত-অনুরক্তগণের সাথে নানা প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান।[৪৪৯]

আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) ছিলেন অদ্বিতীয় আশেকে রাসূল। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একনিষ্ঠ খাদিম হিসেবে লিখনীর মাধ্যমে সারাজীবন ইসলামের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। একই ভাবে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন সুন্নী আলিম তৈরীর কারখানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার মাধ্যমে।

---

আলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৭. মানাহিজুস সুআদা, ৮. আল আরবাঈন ফিস্ সালাহ, ৯. জামে জাওয়ামেউল কালাম, ১০. ফিহিরস্তত কানযুল উম্মাল, ১১. মুকাদ্দামায়ে সুনানে আবু দাউদ, ১২. লাইন ওয়ান নাহার, ১৩. মীযানুল আকবার, ১৪. মিয়ারুল আসার, ১৫. হাশিয়ায়ুস সাদী, ১৬. তোহফাতলি আখিয়ার, ১৭. তালিকাতুল বারকতী, ১৮. তালখীসুল মারাসিল, ১৯.আসমাউল মুদিল্লীন ওয়াল মুখতালিতীন, ২০. কিতাবুল ওয়ায়েযীন।

৪৪৮. ১.লুব্বুল্ উসূল : হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুসৃত মূলনীতি এ পুস্তকে বিবৃত, ২. মা লা বুদ্দা লিল-ফকীহ : শরীআর মাসআলা নিরূপণ করার সময় ফিক্‌হ বিশারদগণ যেসব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন সে সব বিষয় নির্দেশ করত তা থেকে উত্তরণের পন্থা এ পুস্তকে বিবৃত, ৩.হাদিয়াতুল মুসাল্লীন : নামায ও নামায বিষয়ক মাসআলা-মাসায়িল এবং নামায়ের সঠিক সময়সূচীর তালিকা সংযোজন করে এ পুস্তক রচনা করা হয়েছে। ৪. তরীকা-এ হজ্জ : হজ্জ বিষয়ক বিধি-বিধান এবং হজ্জের ব্যবহারিক নিয়ম-পদ্ধতি এ পুস্তকে বিবৃত আছে। ৫. মাশ্‌কে ফারায়িয : উত্তরাধিকার ও সম্পদ বন্টন বিদ্যা বিবৃত আল-সিরাজী গ্রন্থের সরল ব্যাখ্যা, ৬.তারীখে ইল্‌মে ফিক্‌হ : ফিক্‌হ শাস্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস, বাংলাদেশে তিনি এ ধরনের ইতিহাস রচনায় পথিকৃৎ বলে স্বীকৃত।

৪৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

## ৪.৩ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আযিযুল হক শে'রে বাংলা (রহ.)

আল্লামা আযিযুল হক শে'রে বাংলা (রহ.) হিজরী ১৩২৩ মোতাবেক ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের কোন এক শুভ মুহূর্তে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার 'মেখল' গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত 'সৈয়্যদ' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়্যদ আব্দুল হামীদ আল-কাদেরী (রহ.) এবং দাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ হাশমত উল্লাহ্ উভয়ই ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম-ই দীন ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। তাঁর মাতা সায়্যিদা মায়মুনা খাতুনও ছিলেন বিদূষী, পুণ্যবতী ও রত্নগর্ভা। মাতা-পিতা উভয়ের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আওলাদে রাসূল।[৪৫০]

আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) তাঁর পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি হাটহাজারী "মুঈনুল ইসলাম" মাদারাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি "দাওরা-ই হাদীস" পাশ করার পর ভারতের প্রসিদ্ধ ফতেহ্পুর মাদারাসা থেকে হাদীস ও ফিক্হ সহ ইসলামী উলুমের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।[৪৫১]

আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.)'র দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, তিনি জ্ঞানাস্ত্র দ্বারাই সত্য প্রতিষ্ঠা এবং সব ধরনের বাতিলের মোকাবেলা করতেন। তাই তিনি প্রথমে প্রাতিষ্ঠানিক ও পুঁথিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হন। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে  ইলমে লাদুনী দ্বারাও সমৃদ্ধ করেছিলেন। এক শুভ মুহূর্তে তিনি হযরত খাজা খিযির আলায়হিস্ সালাম'র সাক্ষাৎ লাভ করেন আর তাঁর সাথে আলিঙ্গন করেন। তখন খাজা খিজির আলায়হিস্ সালাম তাঁকে পবিত্র হাদীস থেকে দু'চারটি সবক পড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যান।[৪৫২] ফলে তাঁর মধ্যে জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটে।[৪৫৩]

---

৪৫০. ডা. সফিউল আলম ***আল্লামা গাজী সৈয়্যদ আযিযুল হক শে'রে বাংলা (রহ.) জীবনী গ্রন্থ*** (চট্টগ্রাম:আল-হাসনাইন একাডেমী, ১৯৯৬ পৃ. ২০ ; সম্পাদন পরিষদ : ***সুন্নীয়তের আওয়াজ*** (ইমাম সৈয়্যদ শে'রে বাংলা (রহ.)'র পবিত্র বার্ষিক ওরস স্মারক, আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা (রহ.) স্মৃতি সংসদ, (চট্টগ্রাম : ২০০৬) পৃ. ২৪; বদিউল আলম রিযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন*** (চট্টগ্রাম : রেযা ইসলামিক একাডেমী, তৃতীয় সংস্ক, পৃ. ১৬৮

৪৫১. ডা. সফিউল আলম, ***জীবনী গ্রন্থ***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৪৫২. আব্দুল মান্নান, ***দিওয়ান-ই আযীয*** (বঙ্গানুবাদ), (চট্টগ্রাম : আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা দরবার শরীফ, ২০০৯) পৃ. ১৫

৪৫৩. আল্লামা সৈয়্যদ আব্দুল হামীদ বাগদাদী (রহ.) হযরত বড়পীর আব্দুর কাদির জিলানী (রহ.) এর বংশধর ছিলেন। তিনি বাগদাদেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়্যদ মাহমুদ (রহ.)। তিনি নয় বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফ্জ করেন। অতঃপর বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে কুরআন-হাদিস, তাফসীর ও ফিক্হের জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীতে মিশর আল আযহার থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। মিশর থেকে স্বদেশ বাগদাদে ফিরে আসার পর তাঁর পিতা সৈয়্যদ মাহমুদ (রহ.) বাগদাদের বিশিষ্ট ওলামা-মাশায়েখের উপস্থিতিতে বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানীর দরবারে তাঁকে দস্তারে ফযীলত দান করে কাদেরিয়া তরীকার খিলাফত ও ইজাযত প্রদান করেন। সে সাথে দেশ-বিদেশে দ্বীন ইসলামের প্রচার এবং শরীয়ত-তরীকতের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগের নির্দেশ প্রদান করেন। সম্মানিত পিতার এ আদেশ পালন করতে গিয়ে ইরাক, ইরান, সিরিয়া, আরব এবং ভারতের প্রায় অঞ্চলে সফর করেন। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে তিনি চট্টগ্রামে আগন করেন এবং চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লাহ্ শাহ্ী জামে মসজিদে ইমামত ও খিতাবতের দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময় চট্টগ্রামসহ দেশের অনেক আলিম-ওলামা ও বিশিষ্টজন তাঁর হাতে তরিকতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। আল্লামা গাযী শে'রে বাংলা (রহ.) ও ওই সময় তাঁর হাতে কাদিরীয়া তরিকায় বায়'আত গ্রহণ করেন। আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) কে তিনি তরীকতের খিলাফতও প্রদান করেন। চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লাহ শাহ্ী জামে মসজিদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। শেষ বয়সে তিনি স্বদেশ ইরাকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। (নুরুল ইসলাম হাশেমী,কাযী, ***তাযকেরাতুল কেরাম***, (আল্লামাা হাশেমী মিশন, পৃ. ৯০; সফিউল আযম ডা: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮)

আরবী, উর্দূ ও ফার্সি ভাষায় ছিল তাঁর অসাধরণ পাণ্ডিত্য। ফার্সী ও উর্দু ভাষায় তিনি উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর রচিত দিওয়ান-আজিজ-ই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) বাগদাদ নিবাসী হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.)'র বংশধর হযরত আব্দুল হামীদ বাগদাদী (রহ.)'র হাতে তরীকতের বায়'আত গ্রহণ করেন।[৪৫৪] তিনি তাঁকে কাদেরিয়া তরীকার খিলাফত দানে ধন্য করেন। তবে, তিনি পীর-মুরিদীকে নিজের একান্ত পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। কেউ তাঁর নিকট মুরীদ (তরীকতের দীক্ষা) হবার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করলে তাকে মুরীদ করাতেন; অন্যথায় কোন কামিল পীরের নিকট মুরীদ হতে উৎসাহিত করতেন। আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) ভারত থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে দেশে ফিরে দ্বীন ও মাযহাবের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কর্মজীবনে দেখা যায় যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পালনের জন্য তিনি বিয়ে-শাদী করেছেন সত্য, কিন্তু যাবতীয় যোগ্যতাকে পুঁজি করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছেন-মাইতো বীমারে নবী হোঁ" (আমি তো নবীর প্রেমরোগেই ভুগছি)।[৪৫৫] এ জন্য তিনি ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বিশ্বাস ও আমলকে বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন:

১. দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা।
২. ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট মানুষকে সুপথে পরিচালিত করা।
৩. মুনাযারা (তর্কযুদ্ধ)'র মাধ্যমে ইসলামের নামধারীদের পরাস্ত করে তাদেরকে সুপথে পরিচালিত করা।
৪. রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।
৫. লেখা-লেখির মাধ্যমে সত্যকে জনসম্মুখে তুলে ধরা।

প্রথমত আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) তাঁর কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্বীন ও মাযহাবের প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের দিকে মনোযোগ দেন। তিনি **১৯৩২** খ্রিস্টাব্দে নিজ গ্রাম মেখলের ফকিরঘাটে এমদাদুল উলুম আযিযিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি অনেক দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করেন।[৪৫৬]

এ ছাড়া বর্তমান এশিয়ার অন্যতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া চট্টগ্রাম এবং সোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম'র মতো শীর্ষস্থানীয় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৪৫৭]

দেশের সর্বস্তরের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.)'র জোরালো বক্তব্য সময়োচিত পদক্ষেপ ছিল। প্রকৃতপক্ষে ওয়ায-নসীহত' সর্বস্তরের মুসলমানদের

---

৪৫৪. ডা. সফিউল আলম, ***জীবনীগ্রন্থ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৪৫৫. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ৪০
৪৫৬. তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা- ১.হাটহাজারী জামেয়া আযিযিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ২.ফতেহনগর অদুদিয়া সুন্নিয়া, রাউজান ৩. চন্দ্রঘোনা তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া, রাঙ্গুনিয়া ৪.হামিদিয়া হুসাইনিয়া রাযযাকিয়া মাদরাসা, লালিয়ারহাট, চট্টগ্রাম। (ডা. সফিউল আলম, ***জীবনীগ্রন্থ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০)
৪৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

প্রশিক্ষণের জন্য এক অন্যতম প্রাচীন পদ্ধতি, যা সর্বযুগে সমাদৃত হয়ে আসছে। ওয়ায-নসীহতে ঈমান, আক্বীদা, আমল-আখলাক ও শরীয়তের জটিল কঠিন বিষয়ে শ্রোতাদের সম্মুখে নির্ভূল সমাধান পেশ করতে হয় বিধায় ওয়ায়েয-আলিমের সঠিক বিষয়ে কুরআন-হাদীস ও ফিক্হ ফাতোয়ার উপর গভীর জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) এ ক্ষেত্রে অভাবনীয় যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের আলোচ্য বিষয়কে কুরআন-হাদীস ফিক্হ-ফাতোয়া ও শরীয়তের নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাত দিয়ে উপস্থাপন করতেন। তাঁর মাহফিল গুলোতে লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। এতে বেশিরভাগ উলামা-ই কিরাম অংশ গ্রহণ করতেন অনেক অজানা বিষয় জানার উদ্দেশ্যে।

আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) সামাজিক, সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও বিভিন্ন অবদান রাখেন। তাঁর অবদানগুলো এ দেশের সুন্নী জামা'আতকে গৌরবান্বিত করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য, সততা, একনিষ্ঠতা, মানুষের প্রতি ভালবাসা, ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞান গভীরতা ইত্যাদি কারণে তিনি ছিলেন আপন-পর সবার নিকট গ্রহণযোগ্য। নিজ ইউনিয়নে তিনি ছিলেন দীর্ঘস্থায়ী অপ্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান। আক্বীদাগত বৈরীভাবাপন্ন লোকেরাও তাঁকে একজন বিশ্বস্ত, সমাজপতি হিসেবে মানতেন।[৪৫৮]

আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংগঠন জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান'র পূর্বাঞ্চলের সভাপতি ছিলেন। দেশের সরকার পরিবর্তনের একমাত্র স্বীকৃত মাধ্যম নির্বাচনের মুহূর্তে তিনি ন্যায় ও সত্যের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখতেন। তিনি ১৯৬৫ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'ফাতেমা জিন্নাহ্‌র বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইসলামী দর্শনের পক্ষে জোরালো প্রচারণা চালিয়ে যান। তা'ছাড়া তিনি "আনজুমানে এশা'আতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত" নামে একটি সুন্নি সামাজিক সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৫৯]

আল্লামা গাযী শে'রে বাংলা (রহ.) সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি প্রতিদিন কমপক্ষে দু'এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ ধরে ওয়াজ মাহফিল করতেন। এতো ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি লেখালেখির ক্ষেত্রেও সফলভাবে বিচরণ করেছেন। কারণ, তিনি যে সব মাস'আলা নিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে মোকাবেলা করেছেন, ওই বিষয়গুলোর দলীল সমূহ তাঁর উত্তরসূরীদের জ্ঞাতার্থে ও সুবিধার্থে লিখে যাবার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।[৪৬০]

আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ফার্সী ভাষায় লিখিত তাঁর দিওয়ান-এ আযীয গ্রন্থটি ফার্সী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বিংশ শতাব্দীতে এদেশে ফার্সী উর্দু চর্চার ইতিহাসে এ গ্রন্থটি তাঁকে চির স্মরণীয় করে রাখবে নিঃসন্দেহে। এ ফার্সী কাব্য গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, এ দেশের সুন্নী আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও সূফীয়া-ই কিরামের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার

---

৪৫৮. ডা. সফিউল আলম, ***জীবনীগ্রন্থ,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৪৫৯. আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪৬০. তাঁর রচিত গ্রন্থ- ১.দিওয়ানে-ই আযীয, (ফার্সী) ও উর্দূ ভাষায় কাব্য সম্ভার (প্রকাশিত)। ২.ফাতওয়া-ই আযীযীয়া, (প্রকাশিত) ৩. ইযাহুদ দালালাত ফাতওয়ায়ে মুনাজাত। ৪. আস্ সুয়ূফুল হিন্দীয়্যাহ আলা আ'নাকিল ওহাবীয়্যাহ। (*আল্লামা শে'রে বাংলা(রহ.), দিওয়ান-ই আযীয,* (চট্টগ্রাম : ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, তা. বি.)

অর্ঘ্য পেশ করার মাধ্যমে ইসলামের জন্য তাঁদের ত্যাগ ও পরিচিতিকে তুলে ধরা। বাংলার পীর-আউলিয়া, সুফী-দরবেশ ও বিদগ্ধ আলিম-উলামা ও জ্ঞানী-গুনীজনের ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকগণ তাঁর এ গ্রন্থে অনেক মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত খুঁজে পাবে বলে আমার বিশ্বাস। পাকিস্তানের বিশিষ্ট উর্দু-ফার্সী সাহিত্য সমালোচক মাসিক মা'আরিফে রিযা পত্রিকার সম্পাদক আল্লামা সৈয়্যদ ওয়াজাহাত রাসূল কাদেরী এই দিওয়ান গ্রন্থের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন–

> "ভাষা ও বর্ণনাশৈলী, উপমা এবং পরিভাষার যথাযথ ব্যবহার ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর গভীর দক্ষতা এবং কবিতা ও কাব্যে তাঁর গভীর সম্পর্কের পরিচয় বহন করে। তাঁর ভাষার সকল প্রবাহমানতা দেখে এমন মনে হয় যে, এটা কোন ফার্সী ভাষাভাষী কবির কবিতা। তাঁর কবিতায় ইসলামী বিদ্যাসমূহ ছাড়াও সমাজ বিজ্ঞান, ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও তাঁর সুগভীর চিন্তাকর্ষের ইঙ্গিত বহন করে। বস্তুত দিওয়ান-ই আযীয বিষয়বস্তু ও কবিত্বের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ইতিহাস সৃষ্টিকারী গুরুত্বপূর্ণ দিওয়ান"।[৪৬১]

মূলতঃ আল্লাহ্‌র হামদ, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র না'ত এবং প্রায় ৮৭০ জন আল্লাহ্‌র পুণ্যত্মা বান্দা আউলিয়া-ই কিরাম, পীর-মাশায়েখ,

আলিম-উলামার শানে রচিত A/4 সাইজের ১২৫ পৃষ্ঠার এ বিশাল গ্রন্থ ফার্সী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ বলা চলে।[৪৬২]

আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) স্বীয় জীবনে দু'বার পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফ যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার হজ্জের সময় তাঁর বিরুদ্ধবাদী কিছু লোক ষড়যন্ত্র করে সৌদি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করে বলে যে, এ মাওলানা আযিযুল হক মুসলমানদেরকে কাফির বলে, তাই তাঁর বিচার করা হোক। ফলে সৌদি পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে তৎকালীন সৌদি গ্রান্ড মুফতি সৈয়্যদ আলাভী ইবনে আব্বাস মালেকী মক্কী সাহেবের নিকট নিয়ে যায়। তিনি আল্লামা শে'রে বাংলাকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য কিনা জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেন, আমি কোন মুমিন মুসলমানকে কাফির বলি না; কিন্তু মুসলমান নামধারী লোককে কাফির বলি। উদাহরণস্বরূপ তিনি ওহাবীদের লিখিত গ্রন্থ থেকে তাদের কুফরী আকীদাগুলো তুলে ধরেন। অতঃপর আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.)'র সাথে ইসলামী আকীদার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উক্ত গ্রান্ড মুফতি সাহেবের সাথে তাঁর দীর্ঘক্ষণ আলোচনায় মুফতীয়ে মক্কা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ প্রত্যাহারসহ তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হজ্জ পালন করার অনুমতি প্রদান করেন এবং সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে শে'রে ইসলাম ওরফে শে'রে বাংলা

---

৪৬১. ওয়াজাহাত রসুল কাদেরী, *আপনে দেশ বাংলাদেশ মে মা'আরিফ-ই রিযা* (সাময়িকী) জানুয়ারী ২০০৫ (পাকিস্তান: করাচি) পৃ. ২৮

৪৬২. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, *আল্লামা গাযী শে'রে বাংলা ও দীওয়ানে আযীয, মাসিক তরজুমান*, চট্টগ্রাম (২০০৬), পৃ. ৩২

উপাধিতে ভূষিত করে লিখিত সনদপত্র প্রদান করেন। উপহারস্বরূপ একটি মূল্যবান পাগড়ি ও ছড়ি প্রদান করে বিশেষ রাজকীয় মেহমান হিসেবে তাঁকে অভিনন্দন ও সম্মান জানান।[৪৬৩]

ইসলাম নামধারী বাতিল পন্থিদের ওয়াজ নসীহত বক্তব্য ও রচনাবলীর ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ফলে সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান আক্বীদা যখন সর্বগ্রাসী হুমকীর সম্মুখীন, তখন আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.) এসব আক্বীদার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন এবং বাতিল অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। সম্মুখ মুনাযারার মাধ্যমে তাদেরকে পরাস্ত করেন। ১৯৩০-১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৃহত্তর চট্টগ্রামসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার দীপ্ত শপথে ওহাবী-মওদুদী বাতিলের সাথে অসংখ্য মুনাযারায় লিপ্ত হন। প্রতিবারই এই বীর মুজাহিদ বাংলার সিংহ পুরুষ, বাতিলের আতংক, সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তৎকালীন সময়ের প্রখ্যাত ওহাবী আলেম মুফতী মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ, মাওলানা মোহম্মদ তাজুল ইসলাম চৌ. ও মাওলানা সিদ্দিক আহমদ প্রমূখ তাঁর সাথে মুনাযারায় লিপ্ত হন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন।[৪৬৪] জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আ'লা মওদুদী চট্টগ্রামে আমন্ত্রিত হলে লালদিঘী ময়দানের সভাস্থলে বক্তব্য রাখতে উপস্থিত হওয়া মাত্র দুরন্ত দুর্বার বীর সাহসী আশেকে রাসূল গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাত আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) মঞ্চে উঠে মওদুদী সাহেবকে তার ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং বলেন, আপনার প্রণীত গ্রন্থাবলীতে যেসব ঈমান বিধ্বংসী কুফরী উক্তি লিখেছেন সেগুলোর এখানেই উত্তর দিন অথবা আপনার বক্তব্য প্রত্যাহার করুন। মওদূদী সাহেব বললেন, আমি ঢাকায় গিয়ে উত্তর দেব। তৎক্ষণাৎ আল্লামা শে'রে বাংলা (রহ.) গর্জে উঠলেন, আপনার ইলম কি ঢাকায় রেখে এসেছেন ? পরবর্তীতে মওদুদী সাহেব ঢাকায় গিয়েও কোন উত্তর দিতে সক্ষম হননি।[৪৬৫]

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন কর্মবীর সাধক পুরুষ, রাহবারে শরীয়ত, হাদীয়ে দ্বীনো মিল্লাত আল্লামা আজিজুল হক শে'রে বাংলা আল কাদেরী (রহ.) ১৩৮৯ হিজরির ১২ রজব ১৯৬৯ সনে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৩৭৬ বাংলার ৮ আশ্বিন ৬৩ বৎসর বয়সে রোজ বুধবার দিবাগত রাত্রে সুবহি সাদেকের সময় লক্ষ-কোটি সুন্নি জনতাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে জান্নাতবাসী হন।[৪৬৬] হাটহাজারীর ঐতিহ্যবাহী কলেজ ময়দানে শুক্রবার লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ইমামে আহলে সুন্নাত ওস্তাজুল ওলামা হযরতুল আল্লামা ক্বাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব (মু.যি.আ.) নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন। হাটহাজারী কেন্দ্রস্থ সড়কের পার্শ্বে এ মহান অলীয়ে কামেল চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। ইন্তিকালের পর সুদৃশ্য সবুজ গম্বুজ বিশিষ্ট সুরম্য শানদার মাজার নির্মিত হয়। প্রতিবছর নির্দিষ্ট তারিখ ১৪ রজব সারারাত ব্যাপী অনুষ্ঠিত বিশাল মাহফিলে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত সুন্নী ওলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীসের আলোকে মূল্যবান তাকরীর পেশ করেন।[৪৬৭] প্রতিনিয়ত যিয়ারতকারীদের গমনাগমনে দরবার শরীফ থাকে মুখরিত।

---

৪৬৩. ডা. সফিউল আলম, *জীবনী গ্রন্থ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৪৬৪. মাওলানা আব্দুল মান্নান, *দীওয়ানে আযীয, বাংলা অনূদিত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৪৬৬. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, *আল্লামা গাযী শে'রে বাংলা ও দীওয়ানে আযীয,* (চট্টগ্রাম ২০০৬) পৃ. ৩৩

৪৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

**পর্যালোচনা :** আল্লামা সৈয়্যদ আযীযুল হক শেরে বাংলা (রহ.) ছিলেন সুন্নীয়তের বীর মুজাহিদ এবং বাতিলের বিরোধ্যে আপোষহীন ব্যক্তিত্ব। ক্ষুরধার লিখনীর পাশাপাশি ওয়ায মাহফিল তর্ক-মুন্যারার মাধ্যমে ইসলামের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। একই পদ্ধতিতে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)ও ওয়ায -নসীহত, গ্রন্থ প্রকাশনা ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

## ৪.৪ আল্লামা শাহ্ আবু জা'ফর মুহাম্মদ ছালেহ্ (রহ.)

উপমহাদেশের প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মহান দিকপাল শাহ্ সূফী আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক বাংলা ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রোজ বৃহস্পতিবার পিরোজপুর জেলার অন্তর্গত নেছারাবাদ উপজেলাধীন ছারছীনা গ্রামে প্রসিদ্ধ আকন বংশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৬৮] তাঁর পিতা ছিলেন তৎকালীন সময়ের ইসলামী তাহযিব তমদ্দুন ও আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ সাহেব (রহ.)। তাঁর মাতার নাম বেগম আফছারুন্নেছা। তিনি একজন উন্নতমনা ও ধর্মভীরু রমণী ছিলেন। মা-বাবার সান্নিধ্যে শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.)'র শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।[৪৬৯]

তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় পারিবারিক পরিমণ্ডলেই। পারিবারিক পরিবেশে শাহ্ মোহাম্মদ ছালেহ্ এর কুরআন শিক্ষার সাথে পরিচয় ঘটে। জন্মগ্রহণের পর থেকেই শিশু শাহ্ সাহেব উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন একটা সুন্নতে নববীর আদর্শ পরিবেশ। শিশুকাল থেকে সুন্নতী পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত হন। পরিশুদ্ধ ভাবে কুরআন শিক্ষা সমাপ্ত করে মক্তবের সিঁড়িতে পা রাখেন শিশু শাহ্ ছাহেব। অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন বলে অল্প সময়েই পাঠ আয়ত্ব করে ফেলতেন। বিশুদ্ধ কুরআন পাঠ সমাপ্ত করে স্বীয় পিতা কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.)'র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। উক্ত মাদ্‌রাসায় প্রতিটি শ্রেণীতে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে জামায়াতে উলা পর্যন্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন।[৪৭০]

তখনকার সময়ে ছারছীনা শরীফ ছিল দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। কলিকাতা ছাড়া এ বাংলায় আর কোথাও টাইটেল মাদরাসা ছিল না। দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাহ আলিয়া মাদরাসার শিক্ষা সমাপ্ত করে আরো উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য, ভারতের সাহারানপুরে মাজাহেরুল উলুম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন।[৪৭১] এখানে তিনি কুরআন হাদীসের জ্ঞানে সর্ব্বোচ্চ সনদ লাভ করেন। এবং ভারতবর্ষের বিখ্যাত মনীষীগণের কাছে দ্বীনি ইল্‌ম অর্জন করেন।

---

৪৬৮. অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোঃ ইসমাঈল হোসেন, ***বীর মুজাহিদ পীর শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.)*** (পিরোজপুরঃ ছারছীনা মাদরাসা মুসলিম স্টোর,২০১১), পৃ.৭; আ. খ. ম. আবু বকর ছিদ্দীক সম্পাদিত, ***মাসিক নতুন বিকাশ,*** (ঢাকা: দারুন নাজাত সিদ্দীকীয়া কামিল মাদ্‌রাসা, বর্ষ-১৩, সংখ্যা-০২, ফেব্রুয়ারি-২০১৩), পৃ. ২৮

৪৬৯. *মাসিক নতুন বিকাশ,* প্রাগুক্ত, বর্ষ-১৬, সংখ্যা-০২, ফেব্রুয়ারী, ২০১৬, পৃ. ৭২

৪৭০. অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোঃ ইসমাঈল হোসেন, ***বীর মুজাহিদ পীর শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ:),*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৪৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

জাহেরি জ্ঞানের সনদ অর্জনের পর ইলমে বাতেন বা এলমে মা'রেফাত[৪৭২] অর্জন করার জন্য আল্লামা শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) ছিলেন প্রবল আগ্রহী। ছোট বেলা থেকে কুতুবুল আলম ফুরফুরা শরীফের পীর আ'লা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রহ.) এর সোহবত লাভ করেন। তিনি শিশুকালে শাহ্ ছাহেবের গলায় যে তসবীহ পরিধান করিয়ে শাহ্ খেতাব দিয়েছিলেন তারই প্রভাবে তাঁর মধ্যে ছোটবেলা থেকেই এক অবর্ণনীয় ভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। তিনি সর্বদা গভীর চিন্তাশীল থাকতেন। তাঁর কথাবার্তায় মা'রিফতের গভীর তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ পেত যা তাঁর বয়সের সাথে সামঞ্জস্য ছিল না। অধিকাংশ সময় মোরাকাবা[৪৭৩] মোশাহ্দায় বসে জিকির-আজকার করতেন আগত লোকজনকে নিয়ে, মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে আলোচনা করতেন। যৌবনে পদার্পন করার পর পরই আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.), ফুরফুরার হুযূর হযরত শাহ্ আবু বকর সিদ্দীক (রহ.)'র হাতে বায়আত গ্রহণ করে তা'লীমে মা'রিফত অনুশীলন করতে থাকেন। তবে এক পর্যায়ে তাঁকে ফুরফুরার হুযূর স্বীয় প্রধান খলীফা ছারছীনা শরীফের পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) এর নিকট থেকে তা'লীম ও তলকীন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ মোতাবেক শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) স্বীয় পিতার নিকট থেকেই তা'লীম ও তালকীন গ্রহণ করে ছাত্রাবস্থায়ই চার তরীকায়[৪৭৪] কামালিয়্যাত হাসিল করেন।

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার কুশলা গ্রামের স্বনামধন্য এক সময়ের জমিদার বংশের বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব তোফায়েল আহমদ চৌধুরীর পুত্র জনাব মৌঃ মোহাম্মদ তাইয়্যেবুর রহমান ছিলেন জনাব শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেব এর শ্বশুর। তাঁর প্রথমা কন্যা মহতারাম মনোয়ারা বেগম এর শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হয়েছিল জনাব হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেব এর সঙ্গে।[৪৭৫]

---

৪৭২. এটি এমন দীপ্তি; যা ইশ্ক তথা প্রেমোচ্ছাসকে আলোকিত করে, আধ্যাত্মিক জগত; আল্লাহ'র পবিত্র সত্ত্বা এবং তৎসংশিষ্ট সুব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিচয় করে দেয়। যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে স্বীয় মা'রিফাত দান করেন, তখন সে তাঁর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তথায় বিলীন করে দেয়। যদি কারোর মা'রিফাত অর্জন হয়, তা হলে তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন বা অভাব থাকে না, এ পথযাত্রীর আধ্যাত্মিক অবস্থা স্থিত ও নিরাপদে থাকে। (ইউসুফ সেলিম চিশ্তী, প্রফেসর, তারিখ-ই তাসাউফ, (লাহোর : দারুল কিতাব-তা.বি.) পৃ. ২৯২, হুসাইন ইবন মুহাম্মদ রাগিব ইস্ফাহানী, মুফরাদাত আল কুরআন, শামসুল হক কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত (লাহোর: ইসলামী একাডেমী-তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৬৯০)

৪৭৩. গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া, পরস্পর অবলোকন করা। অর্থাৎ বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া লাভের উদ্দেশ্যে কায়মনোবাক্যে ধ্যানে নিমগ্ন থাকা-ই মুরাকাবা। যখন বান্দার মনে ভাবোচ্ছাস জাগে,তখন এটাকে হাল-ই মুরাকাবা নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময় অলসতা ও অবহেলা করার কারণে এ অবস্থা পরির্বতনও হয়ে থাকে। আর যখন আল্লাহ তা'আলার কৃপায় স্থির থাকে, তখন তা মক্বাম-ই মুরাকাবা রূপে পরিগণিত হয়। মূলত এটি সূফীগণের নফসের এমন অবস্থা; যার মাধ্যমে তাঁরা অদৃশ্যভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও ভাব বিনিময় করে থাকেন। সাধারণ অর্থে মুরাকাবা হল, উপবেশন করে গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া; যেন পরস্পরকে অবলোকন করছে। (হযরত শিহাব উদ্দীন সোহরাওর্য়াদী, আওয়ারিফুল মা'আরিফ, (শামস সিদ্দীকি কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত, দিল্লী : ইরশাদ ব্রাদাস, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ. ৬৩১; আবদুল মালেক নূরী, সূফীবাদ, (চট্টগ্রাম : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৪ পৃ.১২৩।)

৪৭৪. প্রধান চার তরীকা হল- কাদেরিয়া, চিশতীয়া, নকশ্বন্দীয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া। (ড. গোলাম ইহ্ইয়া আনজুম, তারিখ-ই মাশায়িখে কাদেরিয়া (দিল্লী : কুতুব খানা আমজাদিয়া, ২০০৩, খ. ১, পৃ. ১২০)

৪৭৫. অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোঃ ইসমাঈল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮

হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) ৮০ বছর বয়সে ইংরেজী ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সাল মোতাবেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ৯.৪৫ মিনিটের ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বহু লোক সমবেত হয়েছিল। তখন মরহুম হুযূর গদ্দীনশীন হবার জন্য হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেব (রহ.)'র নাম প্রস্তাব করায় মেঝ ছাহেবজাদা সহ উপস্থিত সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। সে সময় উপস্থিত জনতা আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে ভীষণ শোকের মধ্যে একটু আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। উপস্থিত লোকজন শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেব (রহ.) এর হাতে তাজদীদে বায়'আত গ্রহণ করেন।[৪৭৬]

হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) এর হেদায়েত ও দ্বীন প্রচার কার্যক্রম এতদাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং এর কার্যক্রম পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই নয় কেবল দেশের বাইরেও তাঁকে ভক্তদের ডাকে সাড়া দিয়ে ওয়াজ বক্তৃতা করতে হয়েছে শত শত মাহফিলে। ভারত, পাকিস্তান, ইরাক, সউদী আরব, মিশর সহ মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তিনি মহাসম্মানিত শায়েখের মর্যাদা পেতেন। মক্কা মদীনায় হজ্জ ও যিয়ারতে গেলে তাকে দেখার জন্য মানুষের ভীড় জমে যেত। সেখানে তাঁর পরিচয় ছিল শায়েখে বাংলা।

ভারত ছিল হুযূরের নিকট নিজ দেশের মতন। কারণ সাহারানপুর, দেওবন্দ, ফুরফুরা, হুগলী, আসাম, পশ্চিম বঙ্গ, কলিকাতা, দিল্লী, এ সকল স্থানে হুযূর বহুদিন ছিলেন। হুযূরকেও এ সকল এলাকার অনেক লোকজনেই চিনতেন। হুগলী জেলার ফুরফুরা দরবার শরীফের সংশ্লিষ্ট সকলেই হুযূরকে ভালবাসতেন। ভারতের বহু এলাকা তিনি সফর করেছেন। ওয়াজ বক্তৃতা করেছেন বহু স্থানে। প্রতি বছর ছারছীনা মাহফিলে হাজার হাজার মুরীদ ভারত থেকে আসত।

তিনি প্রথম হজ্জ্ব করেছিলেন হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.)'র সাথে ১৩৫৬ বাংলা সনে। তখন আল্লামা শাহ্‌সূফী হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.)'র সাথী ছিলেন কয়েকজন খলীফা ও অনেক ভক্ত-মুরীদ। তিনি প্রায় প্রতি বছরই হজ্জ ও যিয়ারতে গমন করতেন। বহু কষ্ট করে হজ্জ্ব ও ওমরাহর কাজ সম্পাদন করতেন। দেখলে মনে হত হৃদয়খানি যেন বেধে রেখেছে মক্কা ও মদীনার ইশকের মালায়। মক্কা ও মদীনা শরীফের আদব রক্ষার্থে তিনি যেভাবে চলাফেরা করতেন তা সবার জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। মদীনা শরীফে তাঁর বিনয় নম্রতা দেখে মনে হত রাসুলে পাক (সা.) যেন তাঁর সামনেই রয়েছেন। তিনি যখন রওজা পাকে যিয়ারতে দাড়াতেন তখন দেখা যেত দু'চোখ বেয়ে দর-দর করে অশ্রু ঝরছে। আর ছোট্ট শিশুর ন্যায় কি যে বলতেন তা তিনিই জানেন।

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এদেশে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন অসংখ্য দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন তার মধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মাদরাসার পরিচয় পাশাপাশি পৃষ্টাপোষকতা দিয়েছেন অনেক দ্বীনি মাদ্‌রাসা হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার পারিচালনার দায়িত্ব ন্যাস্ত হয় গদ্দীনশীন পীর হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেব (রহ.) এর উপর। মরহুম পীর নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেব (রহ.) এর স্বপ্ন

৪৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার অদম্য উৎসাহ নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন কর্মক্ষেত্রে। তাঁর কর্মতৎপরতা, আদর্শ, নিষ্ঠা ও বুলন্দ হিম্মতের ফলে ছারছীনা মাদরাসার উন্নতির নব অধ্যায় শুরু হল ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র ছারছীনা মাদরাসা কর্মবীর শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেব (রহ.) এর পরিচালনায় উন্নতির সোপান বেয়ে এগিয়ে চলেছে সামনে আরো সামনে। ইতিপূর্বে ছারছীনা মাদরাসার কামেল জামায়াতে শুধু হাদীস অনুষদ ছিল। সেখানে তিনি ফিক্হ ও তাফসীর বিভাগ খুলেছেন।[৪৭৭]

জমিয়াতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সাথে যার নামটি সর্বাগ্রে জড়িত তিনি হলেন জমিয়াতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছারছীনা মরহুম পীর হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেব (রহ.)। মাদরাসা শিক্ষকদের তথা দেশের সর্বস্তরের আলেমদের ইসলামী শিক্ষাবিদদের পরস্পরের শত্রু করে ধ্বংসের পথে নামিয়ে দিলে মাদরাসা তথা ইসলামী শিক্ষার বিদায় ঘন্টা বাজবে ভেবে হযরত পীর ছাহেব কেবলা এগিয়ে এলেন এর প্রতিবাদে। পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন। বিবৃতি প্রকাশ হলে ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেল জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সংগঠন। হযরত পীর ছাহেব কেবলা মহামান্য প্রেসিডেন্টকে ও খোলা চিঠি দিয়েছিলেন এ বিষয়ে।[৪৭৮]

তিনি বাংলার আনাচে-কানাচে শুধু হাজার হাজার মাদরাসা, মসজিদ, মক্তব, খানকা প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন নি বরং স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলামান ছাত্র ছাত্রীরা যাতে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায় তাঁরও আপ্রাণ চেষ্টা করেন। শিক্ষা সম্প্রসারণ ও দীনি শিক্ষা বাস্তবায়নে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিক্ষা বিস্তারে হুযূর কেবলার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮০ সনে তাকে শিক্ষামোদী জাতীয় পুরস্কার স্বর্ণ পদক প্রদান করেন।[৪৭৯]

রচনা ও প্রকাশনা জগতেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু ইসলামী গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুদিত, রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বহু শিক্ষিত মুরীদ ও খলীফাগণকে তিনি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। যার ফলে শত শত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে ছারছীনা দরবার ও এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায়। তরীকুল ইসলাম গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ইসলামী আইনের এক বিস্ময়কর সংযোজন। তাফসীরে নেছারী, মাসায়েলে আরবা'আ, ফতোয়ায়ে সিদ্দিকীয়া, তালিমে মা'রিফত, দাড়ি ও ধুমপান, নারী ও পর্দা প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থরাজী ছারছীনার পীর কেবলাদ্বয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও বহু পরিশ্রমে প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) বাংলা ১৩৫৭ সালের ১৯শে আশ্বিন প্রথম পাক্ষিক "তাবলীগ" পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এ পত্রিকা প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.)। অনেক সময় কাগজের দুর্মূল্য এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘূর্ণাবর্তেও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে 'তাবলীগ' পত্রিকা প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন। পত্রিকাটি সাধারণ পাঠকের মাঝে ব্যাপকভাবে

---

৪৭৭. অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মো ইসমাঈল হোসেন, ***বীর মুজাহিদ পীর শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ:)*** পৃ. ৬৪; আ. খ. ম. আবু বকর ছিদ্দীক সম্পাদিত, ***মাসিক নতুন বিকাশ,*** প্রাগুক্ত, বর্ষ-১৩, সংখ্যা-০২, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৯

৪৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৪৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

সাড়া জাগিয়েছে। তৎকালীন সময় দেশে ইসলামী পত্রিকা ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। পরবর্তীতে তাবলীগ পত্রিকার অনুকরণে অনেক ইসলামী সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। এটাও তাবলীগ পত্রিকার একটি সাফল্য বলে ধরা যায়। তারই তত্ত্বাধানে ষাটের দশকের শেষ দিকে "এশায়াত" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়েছিল। পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা লাভ করলেও বৈষয়িক কারণে ৭০ এর দশকে উক্ত প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সময়ের জনপ্রিয় ইনকিলাব পত্রিকাও তাঁর অনুপ্রেরণা, দাবী ও পরামর্শে মাওলানা এম. এ. মান্নান ছাহেব প্রকাশ করেন।[৪৮০]

**কারামত**

ইমাম আজম আবু হানীফা (রা), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) প্রমুখ আউলিয়ায়ে কেরাম কারাবরণ করেছিলেন তাদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে কারাগারে। এরই ধারাবহিকতায় মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) এর কারাবরণের দৃষ্টান্ত অনুকরণে হযরত পীর ছাহেব কেবলা জেল অভ্যন্তরে প্রবেশের সাথে সাথে প্রহরীসহ সকল বন্দীরা একত্রিত হলে সকলকে উদ্দেশ্য করে, "হাজেরীন! আল্লাহ পাক দ্বীনের খাদেমদের কাউকে বাক্সে পুরে, কাউকে আগুনে ফেলে, কাউকে মাছের পেটে পুরে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। তাই খেয়াল রেখে আপনারা চলবেন।" এক বাক্যেই সকলের অন্তরে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভীতির সঞ্চার হয়। হযরত পীর ছাহেব ২৩ মাস কারাগারে থাকতে হয়। দীর্ঘ এই ২৩ মাসের ইতিহাস এক বিস্ময়কর ইতিহাস। জেল জীবনে তিনি কারাবসীদের কে দীনের দাওয়াত সহ-আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্ধুত্ব করতে থাকেন।

জেল জীবনে তিনি কারাবাসীদেরকে দীনের দাওয়াত সহ-আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্ধুত্ব করতে থাকেন। কায়েদে আজম'র সব ঘটনাবলী যুবক শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) ছাত্রাবাস্থায় কাছাকাছি থেকে প্রত্যক্ষ করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) ছাহেব ছিলেন সবসময় সরব।

হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) সক্রিয় রাজনীতি বা দলীয় রাজনীতি করতেন না কিন্তু বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহ নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনা করতেন। যে দল বা সংগঠনের মাধ্যমে তিনি এক দিকে ব্যক্তির ধর্মীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ণ সাধন করতেন অন্য দিকে সামাজিক সংস্কার ও রাজনৈতিক সংশোধনী প্রয়োজনে হুঁশিয়ারী আরো প্রয়োজনে আন্দোলন করে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও কার্যক্রমে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতেন।[৪৮১] এ জন্য জমইয়াতে হিযবুল্লাহর ব্যানারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মিটিং, মিছিল আন্দোলন সব কিছু করতেন, কিন্তু গদী দখলের রাজনীতি করতেন না। তিনি জমইয়াতের সপ্তমূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য সারা জীবন আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। এজন্যই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তা'লীমী জলসা, খানকাহ,

৪৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
৪৮১. অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোঃ ইসমাঈল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

মাদরাসা, মক্তব ও মসজিদ। ওয়াজ–নসিহত, মিটিং-মিছিল, শোভাযাত্রা, স্মারকলিপি প্রদান ইত্যাকার যাবতীয় কাজ তিনি আঞ্জাম দিতেন।

আল্লামা শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) ছিলেন একজন মহান সমাজ সংস্কারক। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন শ্রেষ্ঠতম নেতা, শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক, অপরদিকে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সূফী। মানুষ সাধারণত পীর ছাহেব বলতে যা বুঝে থাকেন তা থেকে তিনি ছিলেন উর্ধ্বে। বৃহত্তর জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন শুধু মাত্র দু'আ–ফুঁক দেয়া পীরের কাজ নয়, পীরের কাজ হচ্ছে কলবের বিমার দূর করা, পথভোলা মানুষদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আনয়ন। সাহাবায়ে কেরাম, সলফে ছালেহীনের সংগ্রামী আদর্শের অনুসারী ছিলেন তিনি।

আল্লামা শাহ আবু জ'ফর মুহাম্মদ ছালেহ্ (রহ.) তাঁর ওয়াজে প্রায়ই বলতেন "আমলছে যিনদেশী বনতি হায় জান্নাত ভী জাহান্নমাভী।" আমলের উপরই জান্নাত জাহান্নাম নির্ভর করে। 'লিমা তাকূলূনা মা লা তাফআলূন' আল কুরআনের নির্দেশ, "তোমরা উহা বল কেন যাহা তোমরা করনা"।[৪৮২] আমলহীন আলেমকে আলেম বলা হয়না বরং এই জাতীয় আলেম ইসলামের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর। তাই হযরত পীর ছাহেব কেবলা তাঁর ব্যক্তিগত আমল আখলাক দ্বারা, তাঁর ওয়াজ নসীহত বাস্তবে রূপায়ন করে গেছেন। ফরজ ওয়াজিবের ব্যাপারে কোন কথাই নেই বরং সুন্নাত এমনকি মোস্তাহাব আমলও তিনি পদত্যাগ করতেন না।

১৯৯০ খ্রি. ১০ ফেরুয়ারী শরীয়তপুরের এক মাহফিলে আল্লামা শাহ্ সূফী আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাথে সাথে তাঁকে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনদিন অবস্থানের পর ১৩ ফ্রেরুয়ারী মঙ্গলবার অগণিত ভক্ত-অনুরক্তকে শোক সাগরে ভাসিয়ে মহান প্রভূর সান্নিধ্য চলে যান। ইন্না নিল্লাহি ওয়াইন্না ইলায়হি রাযিযূন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার সকাল নয়টায় ঢাকার হাইকোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে আল্লামা শাহ্ সূফী আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) এর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।[৪৮৩]

আল্লামা শাহ্ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (রহ.) ছিলেন একদিকে বিখ্যাত আলিমে দ্বীন অন্যদিকে ছিলেন প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। মুসলিম মিল্লাতকে ইলমে শরী'আতের পাশাপাশি তরীকতের দীক্ষা দিয়ে তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে রাখেন ব্যাপক ভূমিকা। পক্ষান্তরে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) সুদূর পাকিস্তান থেকে বাংলার যমীনে এসে আধ্যাত্মিক শক্তিবলে দিকভ্রান্ত মানুষকে হিদায়তের মহান দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একদিকে সিলসিলার কার্যক্রম পরিচালনা করেন, অপর দিকে অসংখ্য দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়িম করে ইসলামের ব্যাপক খিদমত আঞ্জাম দেন।

### ৪.৫ আল্লামা সরদার আহমদ লায়েলপূরী (রহ.)

মুহাদ্দিসে আ'যম (পাকিস্তান) আল্লামা আবুল ফজল মুহাম্মদ সরদার আহমদ কাদেরী রেযভী (রহ.) পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত তাহসীল বাটালা, দেয়ালগড় কসবায় জন্মগ্রহণ

৪৮২. *মাসিক নতুন বিকাশ, প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৩
৪৮৩. প্রাগুক্ত

করেন।[৪৮৪] হযরত সূফী মুহাম্মদ হোসায়ন সাহেব চিশতী সাবেরী (রহ.) এর স্বনামধন্য খলীফা সিরাজুল মাশায়েখ সৈয়্যদুনা শাহ্ মুহাম্মদ সিরাজুল হক কাদেরী চিশতী সাবেরী (রহ.) তাকে দেখা মাত্রই বলে উঠেন–"মাশাআল্লাহ ! সরদার আহমদ নামক এ সন্তানটি একদিন আজিমুশশান হবেন। লাখ-লাখ লোক তাঁর দয়া ও দানের ফয়েজপ্রাপ্ত হবেন"।[৪৮৫]

তিনি দেয়ালগড়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ইসলামিয়া হাই স্কুল, বাটালা থেকে তিনি কৃতিত্বের সহিত মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি লাহোরে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেয়াল সিঙ্গলালে ভর্তি হন, কিন্তু মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্র ইচ্ছা তাঁর জন্য অন্যরূপ মঞ্জুর ছিল।[৪৮৬] হযরত সদরুশ শরীয়াহ (রহ.) যেখানে সেখানেই উলুমে আকলিয়া ও নাকলিয়ার শিক্ষা দান করতেন, যেখানে সেখানে বিভিন্ন বাতিল- ফেরকা সমূহের আক্বীদা খণ্ডন করতেন এবং ছাত্রদেরকে তিনি ইলমে মুনাজারায় পারদর্শী করে তুলতেন। যেমন একদিন হযরত মুহাদ্দিসে আযমে পাকিস্তান স্বীয় সহপাঠী এক সাথীর সাথে মুনাযেরা করার অনুশীলন করেছিলেন, এ সময়ে হযরত সদরুল আফাযিল, ফখরুল আমাছিল আল্লামা সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাবাদী (রহ.) তাঁর এ তর্ক চর্চা শুনেন এবং নীরবে তাঁর এ মুনাযেরার দৃশ্য অবলোকন করেন। মুহাদ্দিসে আযমে পাকিস্তান আল্লামা সরদার আহমদ লয়েলপুরী (রহ.) এর বর্ণনাভঙ্গি, বাকশক্তি, উপস্থাপনার পারদর্শিতা দেখে সদরুল আফাযিল, মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং তাঁর উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করেন।

হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম অন্যান্য সকল শিক্ষার্থীগনের বিপরীত তাকে স্বীয় দৌলতখানায় নিয়ে আসেন। প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থসমুহ থেকে শুরু করে শরহে জামী পর্যন্ত সকল গ্রন্থাবলী তিনি মুর্শিদে কামেল, ইমামুল ফোকাহা, মুফতীয়ে আ'যম (রহ.) এর নিকট অধ্যয়ন করেন। মুফতীয়ে আ'যম তাকে খুব আন্তরিকতার সহিত পাঠদান করেন। আবার কখনো তিনি হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম (রহ.) এর নিকট হতে ও কিছু কিছু কিতাবের পাঠ গ্রহণ করেন।[৪৮৭] কিন্তু বিশেষ করে হযরত মুফতীয়ে আযমে হিন্দ আল্লামা মোস্তাফা রেযা খান (রহ.) এর তা'লীম ও তারবিয়াত তাঁর প্রতি মনযোগী ছিল। মুফতীয়ে আযম (রহ.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন– "যখনই আমি তাকে দেখেছি, আমি তাকে কিতাব অধ্যয়নে মনোনিবেশ দেখতে পেয়েছি। সব সময়ে তাঁর হাতে যে কোন ইলমী কিতাব থাকত কিংবা তিনি ওজীফা পাঠে রত থাকতেন। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ও ইলম হাসিলের আগ্রহ দেখে আমি তাকে পাঠদানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি"।[৪৮৮]

যে সময়ে সদরে শরীয়ত, বদরে তরীকত, ফকীহে আযম আবুল উলা হাকীম মুহাম্মদ আমজাদ আলী সাহেব আজমীর শরীফ'স্থ জামেয়া ইসলামিয়া মুঈনিয়া এর প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে সময়ে তিনি (মাওলানা সরদার আহমদ) হুযূর মুফতীয়ে আযমে হিন্দ আল্লামা মোস্তাফা রেযা খান ও হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা হামেদ রেযা খান এর অনুমতিক্রমে হযরত সরদরুশ শরীয়াহ মুফতী

---

৪৮৪. মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, *মুহাদ্দিসে আ'যমে পাকিস্তান* (চট্টগ্রাম : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার,২০০৭), পৃ. ৫
৪৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৪৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৪৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৪৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

আমজাদ আলী এর সঙ্গে আজমীর শরীফে আগমন করেন এবং দরসে নেযামীর পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থাবলীর পাঠ সম্পন্ন করার পর দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন।

হযরত মুহাদ্দিস আ'যমে পাকিস্তান আল্লামা সরদার আহমদ লায়েলপুরী (রহ.) এর সম্মানিত বন্ধুমহলের মধ্যে প্রত্যেক সাথী স্বীয় যুগের চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় আলোকোজ্জল ছিল। তাঁর কয়েকজন সাথী ও বন্ধুগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলঃ–

১. মুজাহিদে মিল্লাত হযরাতুল আল্লামা মুফতী শাহ্ আলহাজ্ব হাবীবুর রহমান, রয়ীছে আযম উড়িষ্যা।

২. হাফিযে মিল্লাত, মুহাদ্দিসে আযমগড় আল্লামা শাহ্ আবদুল আযীয মুরাদাবাদী (রহ.)।

৩. সদরুল উলামা, ইমামুন নাহু হযরাতুল আল্লামা সৈয়্যদ গোলাম জিলানী মীরাঠী সাহেব।

৪. শামশুল উলামা হযরত মাওলানা মুফতী কাযী শামশুদ্দীন জৌনপুরী সাহেব।

৫. হযরাতুল আল্লামা মুফতী রেফাকত হোসায়ন সাহেব।

হযরত সদরুশ শরীয়াহ (রহ.) বলেছেন, "আমার জীবনের শিক্ষকতাকালীন সময়ে এমন একটি দল আমি পেয়েছি যাঁরা মনে প্রাণে পাঠ্য অনুশীলনে অভ্যস্ত ছিল। এ দলটি ইলম ও ফজলের কুতুব হিসেবে সাব্যস্ত ছিল"।[৪৮৯] সদরুশ শরীয়াহ এ সম্ভ্রান্ত দলটিকে তাঁর সর্বস্ব দান করেছেন। যার ফলে এ দলটির প্রতিটি সদস্য যুগ শ্রেষ্ঠ 'উস্তাজুল উলাম' শায়খুল হাদীস' ও 'সদরুল মুদাররেসীন' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

আল্লামা সরদার আহমদ লায়লপুরী (রহ.) যে কোন বিষয় ও শাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর অগাধ জ্ঞানের পারদর্শিতা থাকার পাশাপাশি পাঠদানের যে পদ্ধতি ও ধরণ ছিল তা অতুলনীয় ও অসাধারণ। তাঁর পাঠদানে কোন ধরণের ক্রটি ও অলসতা ছিল না। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা তিনি দিবা-রাত্রিতে পাঠদানে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণ পাঠ্যর্ভূক্ত কিতাবাদি ব্যতীত বহু দুর্লভ পাণ্ডুলিপি, হস্তলিপিসমূহ, নতুন ও প্রাচীন গ্রন্থাবলীর হাশিয়া সমূহ, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থাবলীর পাঠদান করতেন তিনি। তাই তাঁর শিষ্য ও ছাত্রগণের মধ্যে প্রত্যেকই বহুমুখী জ্ঞান ও গুণের অধিকারী হন। তাঁরা বিবিধ জ্ঞান–বিজ্ঞানে অসাধারণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

মুহাদ্দিসে আ'যমে পাকিস্তান (রহ.)-এর ওয়াজ ও বক্তব্যের নিয়ম পদ্ধতি সাধারণ বক্তগণের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ছিল। তিনি স্বীয় বক্তব্যের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতেন। বিষয়বস্তু অনুসারে এর সমর্থক আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করতেন। আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীরকারগণের বিভিন্ন মতামত ও বরাত সমুহ উদ্ধৃত করতেন আয়াত সমূহের সমর্থনে পবিত্র হাদীস সমূহ ও ইমামগণের উক্তি ও বাণী সমূহ ধারাবাহিকভাবে পেশ করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। তাঁর বক্তব্য শুনে উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতেন। যে কোন বুজুর্গ লোকের সহিত তাঁর সম্পর্ক এমন ছিল যে, মনে হতো তিনি তাঁর নিকটতম আত্মীয় ও প্রিয়মত ব্যক্তিত্ব।

৪৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

তিনি তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সমূহের অপূর্ব সমন্বয়ক ছিলেন। ইলম ও আমলের অধিকারী ছিলেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশেষ করে ইলমে হাদীস শাস্ত্রে ছিল তাঁর অতুলনীয় পারদর্শিতা। তিনি হাফেযে হাদীস ছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি হযরত সদরুশ শরীয়াহ মুফতী আমজাদ আলী (রহ.)'র যোগ্য উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তাঁর দরস ও তাদরীসের পদ্ধতি ছিল অন্যান্যদের চাইতে আলাদা। তাঁর প্রতিটি পাঠই ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞান সম্মত। যে পাঠরীতিতে তিনি ছাত্রদে কে দরস পেশ করতেন, ছাত্ররা শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।[৪৯০] মুহাদ্দিসে আ'যমে হিন্দ আল্লামা আবুল হামেদ সৈয়্যদ মুহাম্মদ আশরাফী জিলানী কচৌচভী (রহ.) এর নিকট একদা মৌলভী গোলাম সরওয়ার (রহ.) আবেদন জানান- হযরত! আমি পাকিস্তানে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করতে চাই, সেখানে কার নিকট দরস গ্রহণ করব। হযরত মুহাদ্দিসে আযমে হিন্দ আল্লামা কচৌচভী (রহ.) উত্তরে বললেন- আপনি পাকিস্তান আল্লামা সরদার আহমদ কিংবা মাওলানা আবুল বরকাত সৈয়্যদ আহমদ সাহেবের নিকট দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করুন।

জামেয়া রেজভীয়া মুজাহেরে ইসলাম সংলগ্ন একটি সুন্নী রেজভী জামে মসজিদ নির্মান করেন তিনি। প্রতি সপ্তাহে জুমাবারে এ মসজিদে খুৎবা পেশ করতেন এবং নামায পড়াতেন। তিনি পাকিস্তানে এসে তাঁর দৈনন্দিন রীতি ছিল ফজরের নামাযের পর নাশতা করতেন অতঃপর না'ত ও দোয়া দরুদ শুরু করতেন। বারটা কিংবা একটা পর্যন্ত এ আসর চলত। অতঃপর দুপুরের খাবার ও নামাযের জন্য বিরতি হতো। অতঃপর সবক ও পাঠদান এর আসর শুরু হতো। মাগরিবের নামাযের পর থেকে ঈশার নামায পর্যন্ত শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা ও ফতোওয়া সমূহের জবাব লিখতেন। মুফতী মুহাম্মদ আমীন, মুফতী নবাব উদ্দিন ও মুফতী মুখতার আহমদ প্রমুখগণ ফতোয়ার জন্য নিয়ে হাযের হতেন। তিনি এ সব ইস্তেফতা সমূহের উত্তর লিখতেন। ঈশার নামাযের পর শহরের মধ্যে কোন না কোন স্থানে আহলে সুন্নাতের জলসা ও মাহফিলে যোগদান। মীলাদ মাহফিল ও গিয়ারভী শরীফ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে তিনি শরীক হতেন। দিনের বেলায় তাঁর দরস ও তাদরীস ও রাতের বেলায় ওয়াজ তাবলীগের ধারা অব্যাহত ছিল। তিনি যেই পথ বেয়ে গমন করতেন, প্রায় প্রতিটি স্টেশনে তাকে শানদার সংবর্ধনা জানানো হতো। জামেয়া মুজহেরে ইসলামের মাঠে প্রতি মাসে আড়ম্বর পূর্ণভাবে তিনি গিয়ারভী শরিফ উদযাপন করতেন। তেলাওয়াতে কুরআন, না'ত খানি, মানকাবাত খানি, কসীদায়ে বোরদাহ, কসীদায়ে গাউছিয়া ও শাজরায়ে তৈয়্যবা প্রভৃতি পাঠ করা হতো। তিনি মাদারেছে দ্বীনিয়া আরবীয়া রেজভীয়া[৪৯১] প্রতিষ্ঠার

৪৯০. হাদীস শাস্ত্রে তাঁর নিপুন অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা দেখে হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম (রহ.) স্বীয় সাহেবজাদা হযরত মাওলানা ইব্রাহীম রেযা খান জিলানী মিয়াকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। হযরতুল আল্লামা তাহসীন রেযা খান বেরেলভী (রহ.) বর্ণনা করেছেন- 'হযরত মুহাদ্দিসে আযমে পাকিস্তান (রহ.) মুফাসসিরে আযমে হিন্দ ইব্রাহিম জিলানী মিয়াকে নিজের সঙ্গে নিজ আসনে উপবিষ্ঠ করে পাঠদান করতেন'। এভাবে হযরত মুফাসসিরে আযমে পাকিস্তান (রহ.) স্বীয় সাহবজাদা মাওলানা রায়হান রেযা খাঁনকে এবং আল্লামা হাসনায়ন রেযা খান (রহ.) স্বীয় সাহেবজাদা হযরত তাহসীন রেযা খানকে ইলম হাসিলের জন্য হযরত মুহাদ্দিসে আযমে পাকিস্তান এর নিকট লায়েলপুরে প্রেরণ করেন। মাওলানা রায়হান রেযা খান[৪৯০] ও উস্তাদুল ওলামা আল্লামা তাহসীন রেযা খান[৪৯০] সাহেব উভয়েই লায়েলপুরে তাঁর অধীনে তিন বৎসরে যাবৎ জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত থাকেন। শিক্ষা সম্পন্ন করার পর আয়োজিত দস্তারে ফযীলত অনুষ্ঠানে হযরত হাসনায়ন রেযা খান শরীক হন।

৪৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

ব্যপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। হাজার হাজার যোগ্য আলেম, মুদাররিস, মুনাযের, মুবাল্লিগ, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও খতীব-বক্তা এ সব মাদরাসাসমূহ থেকে বের হয়েছেন। তিনি স্বীয় জীবদ্দসায় (নব্বই)'র এরও অধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন দেশের বিভিন্ন স্থানসমুহে। ইমাম আহমদ রেযা খান, মুফতীয়ে আযমে হিন্দ (রহ.) ও অন্যান্য সুন্নী ওলামাগণের রচিত গ্রন্থাবলীর সহিত উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে পরিচিত করে গড়ে তোলার জন্য সুন্নী রেজভী কুতুবখানা কায়েম করেন। তিনি আ'লা হযরতের বিভিন্ন রচনাবলী, কানযুল ঈমান ও হাদায়েকে বখশিশ প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। তিনি স্বীয় শিষ্যদেরকে কুতুবখানা ও মাদরাসা রেজভীয়া আহলে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুধু পরামর্শ দান করতেন না বরং তিনি তাদেরকে আর্থিক সহায়তাও প্রদান করতেন। এমনকি তিনি নিজ শহর লায়েলপুরে স্বীয় প্রচেষ্টায় ৮টি মাদরাসা গড়ে তোলেন।

তিনি ছিলেন অতিথি পরায়ন। প্রতিদিন আগত শত-শত  মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করাতেন। অসংখ্য লোক দেশ–বিদেশ থেকে তাঁর যিয়ারতের জন্য আগমন করতেন। তিনি তাদেরকে বিনা মেহমানদারিতে ফিরিয়ে দিতেন না। কারো নজরানা ও উপহার লাভের লোভ তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর অতিথি পরায়নতার সকল কাহিনী ও ঘটনাবলী উল্লেখ করলে একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ গ্রন্থে পরিণত হবে।

৭ই শা'বান ১৩৯০ হিজরী মোতাবেক ১৯ অক্টোবর, ১৯৭০ খ্রি: তিনি স্বীয় প্রভুর ডাকে সাড়া দেন। দারুল উলুম আমজাদিয়ায় তাঁকে গোসল দেয়া হয়। শাহ্জাদায়ে হযরত সদরুশ শরীয়াহ আল্লামা আবদুল মোস্তাফা আজহারী তাঁর নামাযে জানাজা পড়ান। অতঃপর শাহীন এক্সপ্রেসের মাধ্যমে তাঁর জানাজা মুবারক লায়েলপুরে, ফয়সালাবাদে আনা হয়। অগণিত ভক্ত-অনুরক্ত ও উলামা তাঁকে এক নজর দেখার জন্য সমবেত হন। রেযভী জামে মসজিদের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

## ৪.৬ আল্লামা সৈয়্যদ আবুল হাসান আলী নদভী

ইসলামী সাহিত্য জগতের কিংবদন্তি, আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা সৈয়্যদ আবুল হাসান আলী নদভী, ১৩৩৩ হিজরীর ৬ মুহররম, মোতাবেক ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ৫ ডিসেম্বর,শুক্রবার ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেঅেলি জেলাধীন তাকিয়া কেলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নাম আবুল হাসান আলী। সংক্ষেপে আলী মিয়াঁ।[৪৯২] পিতার নাম সাইয়েদ আবদুল হাই এবং মাতার নাম সাইয়েদাহ খায়রুননেছা। ডাক্তার সাইয়েদ আবদুল আলী তাঁর বড় ভাই। আমাতুল্লাহ তাসনীম ও আমাতুল আযীয তাঁর বড় দু'বোনের নাম। সম্মানিত মাতা কুরআন মজীদের হাফেযা ছিলেন।[৪৯৩]

মাতার নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অত:পর  মাওলানা সাইয়েদ আযীযুর রহমান হাসানী এবং মাওলানা মাহমুদ আলীর নিকট কুরআন মজীদ, উর্দু ও ফার্সী পড়েন।

শায়খ খলীল আরব আনসারীর ইয়ামনী ও ড: তাকী উদ্দীন হেলালী মারাকেশীর নিকট নিয়মতান্ত্রিক আরবী শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁদেরই দীক্ষায় আরবী  ভাষা ও সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেন।

৪৯২. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী জীবন ও কর্ম*, (ঢাকা: আল ইরফান পাবলিকেশন, ২০১২), পৃ. ২৫

৪৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

শায়খ খলীল আরব আনসারী নিকট নির্বাচিত সুরাসমূহের তাফসীর এবং শায়খুত তাফসীর আল্লামা আহমাদ আলী লাহোরী (র.) এর নিকট ১৩৫১ হিজরীতে লাহোরে অবস্থান করে পূর্ণ কুরআন কারীমের তাফসীর পড়েন।[৪৯৪] ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাখনৌ ইউনিভাসিটির উলূমে শারকিয়্যাহ (প্রাচ্যবিদ্যা) বিভাগে ভর্তি হন। তখন তিনি ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব কনিষ্ঠ ছাত্র। তিনি সেখানে থেকে সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শায়খুল হাদীস মাওলানা হায়দার হাসান খানের হাদীসের দরসে শরীক হন এবং তাঁর নিকট থেকে সহীহাঈন, আবু দাউদ শরীফ ও সুনানে তিরমিযী পড়েন। অতঃপর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন এবং সেখানে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী এর হাদীছের দরসে অংশগ্রহণ করেন। দারুল উলূম দেওবন্দে মাওলানা এ'জায আলী সাহেব থেকে তিনি ইলমে ফিকহ্'র দরস গ্রহণ করেন। ক্বারী আসগর আলী সাহেবের নিকট তিনি কেরাআতে হাফয পড়েন। সাইয়েদ সুলায়মান নদভী নিকট দর্শন পড়েন। তাছাড়া তিনি আল্লামা শিবলী (র.) এর বক্তৃতা শৈলীর শুধু মূল্যায়নই করতেন না, বরং তাঁর যথাযথ অনুসরণও করতেন।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামাতে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং তাফসীর, হাদীছ, আরবী আদব, ইতিহাস ও তর্কশাস্ত্রের কিতাবাদি পড়ান। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বীনি মারকাজসমূহ সম্পর্কে জানার জন্য সফর করেন। এই সফরে হযরত শাহ আবদুল কাদের রায়পূরী ও মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্দলভী এর সাথে পরিচয় হয়। ঐ সময় থেকে তাদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সাক্ষাতের পূর্বে এই দুই বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সাক্ষাতের পরে তাদের সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও দ্বীনের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা আজীবন পেতে থাকেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি আঞ্জুমানে তা'লীমাতে কুরআন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এতে কুরআনে করীম ও সুন্নাতে নববীর দরসের ধারাবাহিকতা চালু হয় এবং তা খুব সমাদৃত হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে নদওয়াতুল উলামার ব্যবস্থাপনা পরিষদের রোকন নির্বাচিত হন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা সুলায়মান নদভী এর অনুমতিতে সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা সুলায়মান নদভী এর ইন্তিকালের পর সর্বস্মাতিক্রমে শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়্যাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বড় ভাই ডাক্তার আবদুল আলী সাহেবের ইন্তিকালের পর নদওয়াতুল উলামার নাযেম বা মহাপরিচালক নিযুক্ত হন।[৪৯৫]

সাউদ ইবনে আবদুল আযীয ও লিবিয়ার হাকীম ইদ্রিস সান্নসীও এতে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারা প্রতিষ্ঠার সময় তাকে মজলিসে শূরার সদস্য বানানো হয়। মজলিসে শুরা কায়েম থাকা পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে সমাসীন ছিলেন। মরক্কোর রাবাতে অনুষ্ঠিত রাবেতায়ে জামেয়া ইসলামিয়ার সম্মেলনে রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারীর নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন। অত:পর নদওয়াতুল উলামার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি স্বতন্ত্র সদস্য ছিলেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে জর্দানের মাজমাউল

---

৪৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৪৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

লুগাতিল আরাবিয়ার (জর্দানের আরবী একাডেমীর) সদস্য করা হয়। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে তাকে সাহিত্যে সম্মানসূচক পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার সময় তাকে আজীবন সভাপতিরূপে মনোনীত করা হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে রাবেতায়ে আদবে ইসলামী আল আলামী প্রতিষ্ঠার সময় তাকে আজীবন সভাপতি মনোনীত করা হয়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে সৌদী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দা'ওয়াতে শরীয়াহ অনুষদের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতি তৈরী করার জন্য রিয়াদ তাশরীফ নেন। তখন রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় ও কুল্লিয়াতুল মুআল্লেমিন (টিচার্স ট্রেনিং কলেজ) বক্তৃতা দেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে নদওয়াতুল উলামা থেকে আরবী পত্রিকা 'আয-যিয়া' ও ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে উর্দু পত্রিকা 'আন-নদুওয়া' বের করার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আঞ্জুমানে তা'লীমাতে ইসলামের পক্ষ থেকে 'তামীরে হায়াত' নামে উর্দু ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। ১৯৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে দামেশক থেকে প্রকাশিত 'আল-মুসলিমুন' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অত:পর 'নয়া তুফান আওর উসকা মুকাবালা' নামে উর্দু তরজমায় তা প্রকাশিত হয়। এছাড়া উস্তাদ মুহিব্বুদ্দীন খতীবের পত্রিকা 'আল-ফাতাহ'তেও কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে লাক্ষ্ণৌ থেকে নেদায়ে মিল্লাতে প্রকাশ হওয়া শুরু হলে তিনি এর পৃষ্ঠপোষক হন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে নদওয়া থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা البعث الاسلامى ও ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা 'আর রায়েদ এবং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে উর্দু পত্রিকা পাক্ষিক তা'মীরে হায়াতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য ইলমী ও আমলী খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী রিয়াদে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে আল্লামা নদভীকে শাহ ফয়সাল এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। সৌদি আরবে এ সম্মানীর মূল্যমান দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার রিয়াল। ভারতে যার মূল্যমান চল্লিশ লক্ষ রূপি। তিনি ফয়সাল এওয়ার্ডের অর্ধেক অর্থ আফগান উদ্বাস্তুদের মাঝে এবং বাকী অর্ধেক মক্কা মুকাররমার দুটি প্রতিষ্ঠান-এদারায়ে হিফযুল কুরআন ও মাদরাসায়ে সওলাতিয়াতে বন্টন করে দেন। আল্লামা সুলায়মান নদভী (র.) রচিত সীরাতুন্নবী ৫ম খণ্ডের ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন। উক্ত কিতাব যখন পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয় তখন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক হযরত মাওলানাকে একলাখ রূপী সম্মানী প্রদান করেছিলেন। হযরত মাওলানা অর্ধেক অর্থ দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়ে এবং বাকি অর্থ আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর স্ত্রীকে প্রদান করেছিলেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে দুবাইয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ইসলামী বিশ্বের মহান ব্যক্তিত্বের এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ হযরত মাওলানা উপমহাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করে দেন। এর মূল্যমান ছিল প্রায় এক কোটি বিশ লাখ রূপি। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড ইসলামী সেন্টারের পক্ষ থেকে তারিখে দাওয়াত ও আযীমাত সম্পর্কিত আলোচনা সভায় সুলতান হাসান বলখিয়্যা হযরত মাওলানাকে ব্রুনাই ইন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত করেন। এ অর্থও তিনি দুস্থদের মাঝে বণ্টন করে দেন।[৪৯৬]

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে দূর পথের প্রথম সফর করেন লাহোর। সেখানে ইলমী ও দ্বীনি বুযূর্গদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। কবি ডঃ ইকবালের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তাঁর লিখিত উর্দূ কবিতা 'চান্দ' এর আরবী অনুবাদ তাকে পেশ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে হজ্জ উপলক্ষে প্রথম সফর করেন এবং কয়েকমাস

৪৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

হেজায়ে অবস্থান  করেন। এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে হজ্জের দ্বিতীয় সফর করেন। এ বছর মিসর,সুদান, সিরিয়া ও জর্দান সফর করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে মিসরে প্রথম সফর ছিল। মা-যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন বা ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানু কে উরুয ওয়া যাওয়াল কা আছর-মাওলানার এ কিতাব তাঁর পৌছার পূর্বেই তাঁকে পরিচয় করে দিয়েছিল। উক্ত সফরে ফিলিস্তিন, বায়তুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে আকসা যিয়ারতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে জর্দানের আমীর শাহ্ আবদুল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম তুরস্ক সফর করেন। এ বছর লেবাননও সফর করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বার্মা সফর করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কুয়েত সফর করেন। অতঃপর উপসাগরীয় দেশসমূহ সফর করেন। জর্দান ও ইয়ামেনও সফর করেন। এসব সফরের বিভিন্ন স্থানে তিনি দ্বীনি দাওয়াতের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে প্রথম সফর করেন। এ সফরে তিনি লন্ডন, প্যারিস, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড ও স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো সফর করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মসজিদে আকসা সফর করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় প্রথম সফর করেন। এখানে দুই মাস দশ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে যান এবং দাওয়াতী ও দ্বীনি বক্তব্য প্রদান করেন। এ সফর তিনি চোখও অপারেশন করান। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক ও লেবানন সফরে রাবেতা আলমে ইসলামী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।[৪৯৭]

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে দামেশক ইউনিভার্সিটিতে শরীয়া বিভাগ খোলা হলে, প্রথম বিভাগীয় প্রধান হন উস্তাদ মোস্তাফা সুবায়ী। ডঃ মোস্তাফা সুবায়ী মুসলিম  বিশ্বের খ্যাতনামা উলামা ও মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত করার প্রবল আকাঙ্খা রাখতেন। ভারত উপমহাদেশ থেকে এ পদের জন্য হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী কে দাওয়াত দেওয়া হয়। হযরত মাওলানা তাঁর বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে স্থায়ীভাবে অধ্যাপনার পরিবর্তে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দাওয়াত কবুল করেন। কোন ভারতীয় আলেমের জন্য আরব দেশের ইউনির্ভসিটিতে প্রফেসর হিসেবে যোগ দেয়াটা শুধু তাঁর জন্য নয়; বরং উপমহাদেশীয় আলোয় সমাজের জন্যও এক বিরল সম্মান বয়ে এনেছিল। ইউনিভর্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যেসব ইসলামিক স্কলারকে এ ভার্সিটিতে অধ্যাপনার জন্য আহবান জানান হয়, তাঁর মধ্যে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী ছিলেন উল্লেখযোগ্য।
১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ১১ই মার্চ তিনি ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে মদীনা ভর্সিটিতে উপস্থিত হন এবং 'আন-নবুওয়াহ ওয়াল আম্বিয়া ফি যুওইল কুরআন' শীর্ষক আলোচনাসহ ৮ টি বক্ততা পেশ করেন। ৩০ শে মার্চ থেকে তাঁর বক্তব্য শুরু হয়। শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী জীবদ্দশায় বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও দেশী  পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন। ভারত সরকারের দেয়া একটি পুরস্কার তিনি গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী হতে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁকে মরনোত্তর শাহ ওয়ালী উল্লাহ এওয়ার্ড দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য আরো যে কটি পুরস্কার লাভ করে ছিলেন তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল শাহ্ ফয়সল পুরস্কার। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে হযরত আবুল হাসান আলী নদভীকে ডক্টর অব লিটারেচারের সম্মানজনক ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ১৬ই অক্টেবর ১৯৮১ হযরত মাওলানা যখন হজ্ব

৪৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

ও রাবেতার সভা থেকে দেশে ফিরে আসেন তখন তিনি এ সংবাদ পান। ডিগ্রি প্রদানের তারিখ ছিল ২৯শে অক্টোবর ১৯৮১। এ ব্যাপারে জম্মু কাশ্মীরের গভর্ণর বি.কে নেহেরু কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অহীদুদ্দীন মালিক ও প্রফেসর আলী আহমদ সরওয়ারের পক্ষ থেকে মাওলানার নিকট পত্র ও টেলিফোন আসে এবং অবিলম্বে সম্মতি জ্ঞাপনের অনুরোধ জানানো হয়। হযরত মাওলানা বলেন আমার জন্য এ আকস্মিক সংবাদ ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তাই তিনি দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে যান। অতঃপর নিজের ঘনিষ্ঠজনদের সাথে পরামর্শের পর এ শর্তে সম্মত হন যে, অনুষ্ঠনাটি হতে হবে নিছক একাডেমিক ও সাহিত্যকেন্দ্রিক। কোন প্রকারের রাজনীতির সাথে দূরতম সম্পর্কও থাকতে পারবে না। ইতিপূর্বে সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, নওয়াব সদর ইয়ার জঙ্গ, মাওলানা হাবিবুর রহমান খান শিরওয়ানী ও আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীকে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে এরূপ ডিগ্রী দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা তা গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মাওলানা এসব নজীব স্মরণ করেই সম্মত হয়েছিল। তাছাড়া তিনি চিন্তা করলেন, এই সুযোগে তিনি আধুনিক শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী এবং দেশের কর্মকর্তাদে পেশ করতে পারবেন। একজন দায়ী হিসাবে এ সুযোগ হাতছাড়া করা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। ২৯শে অক্টোবর ১৯৮১ কনভোকেশন হল সভাপতি ছিলেন গভর্ণর বি.কে. নেহেরু এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর মাধূরী আরশগও উপস্থিত ছিলেন তাকেও ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হয়েছিল। বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে এমন যুবকরা বের হবে, যারা নিজেদের জীবনকে ন্যায়, সততা, জ্ঞান ও সৎপথের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তত থাকবে। যারা অন্যের জন্য উপোস থাকতে তেমনই আনন্দ অনুভব করবে, কেউ কেউ উদরপূর্তিতে যেমনটি অনুভব করে থাকে। যারা তাদের যৌবনের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য মস্তিস্কের সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোত্তম দান (যা তাদের ঝুলিতে ভরে দেওয়া হয়েছে) মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যয় করবে।[৪৯৮]

উন্নত মানবীয় জীবনযাপনের মৌলিক উপায় হল খোদাভীতি, মানবপ্রেম, আত্মসংবরণের সাহস ও যোগ্যতা, ব্যক্তিস্বার্থের উপর সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া অভ্যাস, মানবতাঁর সম্মান, মানবীয় জীবন, সম্পদ, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় উদ্যম, প্রাপ্ত দাবীর চেয়ে দায়িত্ব পালনকে অগ্রাধিকার নিপীড়িত ও দুর্বলদের সাহায্য-সহযোগিতা, অত্যাচারী ও শক্তিমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাহস, যেসব মানুষের সম্পদ ও পদবী ছাড়া কোন পুঁজি নেই তাদের প্রতি নির্ভয়, সর্বক্ষেত্রে এবং নিজ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সত্য কথা বলার সাহস, নিজের ও অপরের সাথে আচরণে সমতা ও ন্যায় বিচার কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা শক্তির তত্ত্বাবধানের বিশ্বাস এবং তাঁর নিকট জবাবদিহিতা ও হিসাবের আশংকা এই হল বিশুদ্ধ সুস্থ, নিরাপদ ও সফল জীবন যাপনের মৌলিক শর্ত এবং একটি সুখী সুন্দর সমাজ ও একটি শক্তিশালী সার্বভৌম সম্মানিত রাষ্ট্রের প্রকৃত চাহিদা।[৪৯৯]

---

৪৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৪৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক মাওলানা নদভী কে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। মাওলানা তাঁর পুরানে চেরাগ" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বাদশাহ ফয়সল ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের মত অন্য কোন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল না। মাওলানা পাকিস্তান সফরে গেলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। এমনকি কোন কারণে মাওলানা যদি ইসলামাবাদে যেতে না পারতেন, তাহলে প্রেসিডেন্ট নিজেই এগিয়ে এসে সাক্ষাৎ করতেন। আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (র.)-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ সীরাতুন্নবী (সা.)- এর সপ্তম খণ্ডের ভূমিকা লিখেছেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এ ভূমিকা পাঠ করে খুবই অভিভূত হন এবং হযরত মাওলানার জন্য পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এক লাখ রূপিয়া পুরস্কারের ঘোষণা দেন। কিন্তু হযরত মাওলানা তাঁর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী প্রেসিডন্ট জিয়াউল হককে পত্র লিখে জানান যে, মেহেরবানী করে এ অর্থের অর্ধেক এ গ্রন্থের প্রকাশক দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়কে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক করাচীতে অবস্থানরত আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (র.) এর পরিবারের সদস্যদের দিয়ে দিন। অতঃপর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে করাচীতে হযরত মাওলানার সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সাক্ষাৎ হলে তিনি হযরত মাওলানাকে বলেন- আপনি যদি পুরস্কারের অর্থ গ্রহণ করতেন, তাহলে আমি খুব আনন্দিত হতাম। হযরত মাওলানা পুনরায় তা অস্বীকার করেন।[৫০০]

বহুমূখী প্রতিভাবান বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ১৪২০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার জুম'আর পূর্বে সূরা ইয়াসিন এর ১১নং আয়াত তেলাওয়াত করার সময় ইন্তিকাল করেন। এই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তাঁকে রায়বেরেলিতে দাফন করা হয়।[৫০১]

## ৪.৭ আল্লামা মুফতী শফী উকাড়ভী (রহ.)

ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত শেখ করম নামক জায়গায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী শেখ করম ইলাহী (রহ.)'র ঔরসে ১৯২৯ খৃস্টাব্দে এ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আল্লামা শফী' উকাড়ভী (রহ.)'এ জন্ম।[৫০২] স্কুলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ার পর দরসে নিযামীতে সম্পূর্ণ দাওরায়ে হাদীস, তাফসীর অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে আশরাফুল মাদারেস দারুল উলুমের হাদীস ও তাফসীর বিভাগের প্রধান আল্লামা গোলাম আলী আশরাফী উকাড়ভী, মাদরাসায়ে আরাবিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মুলতানের শায়খ, উস্তাদুল উলামা গাজ্জালিয়ে যমান আল্লামা সৈয়দ আহমদ সা'ঈদ কাযেমী (র.)'র নাম উল্লেখযোগ্য।[৫০৩] শে'রে রাব্বানী মিয়া শে'র মুহাম্মদ (রহ.)'র সহোদর শায়খুল মাশায়েখ পীর মিয়া গোলামুল্লাহ্ শরকপুরী (র.) প্রকাশ 'সানী ছাহেব' এর পবিত্র হাতে সিলসিলায়ে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ায় দীক্ষিত হন। হযরত মিয়া শে'র মুহাম্মদ শরকপুরী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে হাজী শেখ করম ইলাহীকে পূর্বেই সুসংবাদ দিয়েছিলেন। পিতা-মাতা উভয়েই তাঁর শুভ আবির্ভাব

---

৫০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৫০১. http://nadwi.net.in/e/main.htm

৫০২. মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান, *শামে কারবালা (বঙ্গানুবাদ)* (চট্টগ্রাম : আলা হযরত ফাউন্ডেশন, ২০০৬) পৃ. ৫

৫০৩. মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন হাশেমী, *যিকরে জামীল*, বঙ্গানুবাদ (চট্টগ্রাম : জান্নাত প্রকাশনী, ২০০৪) পৃ. ৬

প্রাক্কালে বহু নেক স্বপ্নও দেখেছিলেন।[৫০৪]স্বীয় পীর মুর্শিদ হযরত সানী ছাহেব কেবলা (রহ.) সহ অপরাপর ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে পাকিস্তানের উকাড়ায় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। জামে মসজিদ মন্টগোমারী (সাহী ওয়াল)'র জুমার খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। পাশাপাশি উকাড়ার বিরলা হাই স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত হন।[৫০৫]১৯৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'খতমে নবুওয়াত' আন্দোলনে সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'শেষ নবী' হওয়ার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার মহান লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শুধু এ কারণে রাজরোষের শিকার হয়ে মন্টগোমারী কারাগারে দশ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর দু'জন ছেলে তানভীর আহমদ (৩ বছর) ও মুনীর আহমদ (১ বছর) ইন্তিকাল করেন। এ ঘটনায় প্রভাবশালী কিছু লোক সাহী ওয়ালের ডেপুটি কমিশনারকে তাঁর কারামুক্তির জন্য সুপারিশ করেন। ডেপুটি কমিশনার তাঁর সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘‘দুই জন ছেলের মৃত্যুতে আপনার পরিবারের অবস্থা শোচনীয়। অনেক লোক সুপারিশ করার দরুণ আমার পরামর্শ হল, আপনি ক্ষমা চেয়ে একটি আবেদন পত্র পেশ করুন। আজই মুক্তি পেয়ে যাবেন। আপনার আবেদনের বিষয় গোপন রাখা হবে।'' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘‘আমি বিশ্বাস করি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। আমার এ পবিত্র আকীদা এবং নবীজির মর্যাদার পক্ষে আমি কাজ করেছি। সুতরাং ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমার সন্তানরা আল্লাহ্‌র  প্রিয় সান্নিধ্যে চলে গেছে। আমার নিজের জীবনও যদি চলে যায় তথাপি আমি এ আক্বীদা বিশ্বাস থেকে এক চুলও নড়বো না, ক্ষমাও চাইব না।''পরিণামে তাঁর মুক্তির পরিবর্তে আরো নির্দয় ব্যবহার শুরু হয়। কারো সাথে তাঁর সাক্ষাতও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু তিনি ধৈর্য্যের  সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে যান।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে করাচী মাযহাবী সংস্থাগুলোর বারংবার আবেদনের প্রেক্ষিতে করাচীর সর্ববৃহৎ কেন্দ্রীয় মেমন মসজিদ (বোল্টন মার্কেট) এ খতীব নিযুক্ত হন। সর্বান্তকরণে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীন ও মসলকের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। এই ফাঁকে তিন বছর ঈদগাহ্ ময়দান জামে মসজিদে, দুই বছরাধিক কাল আরামবাগ জামে মসজিদে, বার বছর নূর মসজিদে খতীবের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। এ সকল মসজিদে কুরআন পাকের দরস ও তাফসীর প্রদান করতেন। প্রায় ঊনত্রিশ বছরে নয় পারার মত তাফসীর বর্ণনা করেন।[৫০৬] ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে পি,আই,সি এইচ সোসাইটিতে মসজিদে গাউসিয়া ট্রাস্ট সংশ্লিষ্ট দারুল উলুম হানাফিয়া গাউসিয়া নামে একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। ১৯৭২ খ্রি.গুলিস্তানে শফী উকাড়ভী (সোলজার বাজার) করাচীতে এক খণ্ড জমিতে তিনি একটি মসজিদ ও ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন ; যার নাম গুলজারে হাবীব (সা.) ট্রাস্ট। চল্লিশ বছর ধরে তিনি অবিরাম দ্বীন ও মাযহাবের খেদমতে তাকরির বয়ান চালিয়ে যান। অনর্গল বর্ণনা ও ভাষার সাবলীলতা, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা ও সুগভীর তত্ত্ব সমৃদ্ধ আলোচনা ও সুমধুর কণ্ঠের জন্য তিনি 'খতীবে পাকিস্তান' হিসাবে শুধু স্বীকৃতই ছিলেন না; তাঁর আকাশচুম্বী

---

৫০৪. মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান, শামে কারবালা (বঙ্গানুবাদ), প্রাগুক্ত- পৃ. ৬

৫০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৫০৬. মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন হাশেমী, *যিকরে জামীল (বঙ্গানুবাদ)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

জনপ্রিয়তাকে এখনও পর্যন্ত কোন বাগ্মী বক্তা ম্লান করতে পারেন নি। রাতের পর রাত সহস্র শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি মোহাবিষ্ট করে রাখতেন। এ মুগ্ধ সমাবেশ থেকে হাজার হাজার মানুষের ভ্রান্ত আক্বীদা তিনি পরিশুদ্ধ করেছেন। তিন সহস্রাধিক অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। দ্বীন ও মাযহাবের প্রচার প্রসারের জন্য তিনি ছুটে গেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। মিল্লাতের মুখপাত্র হয়ে তিনি সফর করেছেন মধ্যপ্রাচ্য, উপসাগরীয় দেশসমূহ, ফিলিস্তিন, আফ্রিকার বহুদেশ, এশিয়া ভারত ও বাংলাদেশে।[৫০৭]

সাংগঠনিক দক্ষতার স্বাক্ষর হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বহু সংগঠন। কেন্দ্রীয় জমা'আতে আহ্‌লে সুন্নাত ও জাতীয় সীরাত সংস্থার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার আন্‌জুমানে আহলে সুন্নাত পাকিস্তানের সুন্নী তাবলীগী মিশন, আনজুমানে মুহিব্বানে সাহাবা ওয়া আহলে বাইত, তানযীমে আয়িম্মা ও খুতাবায়ে আহলে সুন্নাত ইত্যাদি তাঁর সাংগঠনিক প্রজ্ঞার ফসল। [৫০৮] ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের শাসনামলে মজলিসে শুরা'র অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। এ সুবাদে আহলে সুন্নাতের স্বীকৃত আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা রাখতে সমর্থ হন। এ ছাড়া ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন কমিটিতেও তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। ওফাতের কিছুকাল আগেও তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ওয়াক্‌ফ বিভাগের প্রধান পরিদর্শক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী বিভাগের সদস্য। এ ছাড়া জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল গঠন, দুর্যোগ মোকাবিলাসহ আফগানের মজলুম মুজাহিদদের জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল অবর্ণনীয়।[৫০৯]

অমিত বাগ্মিতা সম্পন্ন 'খতীবে পাকিস্তান' এর ইমেজ নিয়ে দ্বীন ও মাযহাবের মুখপাত্র হিসাবে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তাঁর লেখনী বিস্ময়করভাবে তিনি সচল রেখেছেন। ওয়াজ-বক্তৃতার মতো ইসলামী আকায়েদ ও আদর্শের আলোকে তাঁর লেখা অজস্র কিতাব-পুস্তক মুসলিম মিল্লাতকে উজ্জীবিত করেছিল। [৫১০]

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ২০ এপ্রিল "গুলযারে হাবীব ট্রাস্টের" জামে মসজিদে তাঁর আখেরী খুৎবাহ্ প্রদান করার পর সে রাতেই তৃতীয় বারের মত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। তিনদিন পর ২৪ এপ্রিল মোতাবিক ২১ রজব ১৪০৪ হিজরী মঙ্গলবার ফজর নামাযের আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে সরবে দরূদ সালাম পাঠ করতে করতে

---

৫০৭. প্রাগুক্ত- পৃ.৭

৫০৮. প্রাগুক্ত,

৫০৯. প্রাগুক্ত,

৫১০. পাঠক নন্দিত তাঁর লেখাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১. দর্‌স-তাদরীস ২. রাহে আক্বীদত ৩. রাহে হক্ব ৪. নামায মুতারজাম ৫. সাওয়াবুল ইবাদাত ৬. মুসলমান খাতুন ৭. আনওয়ারে রেসালত ৮. আখলাক ও আ'মাল ৯. আয়েনায়ে হাকীকত ১০. জিহাদ ও কিতাল ১১. বরকাতে মীলাদ ১২. সফীনায়ে নূহ্ ১৩. যিকরে জামীল ১৪. যিকরে হাসীন ১৫. শামে কারবালা ১৬. ইমামে পাক আওর ইয়াযীদে পলীদ ১৭. তা'আরুফে উলামায়ে দেওবন্দ ১৮. নুগমায়ে হাবীব ১৯. মীলাদে শফী' ২০. মাস্‌আলায়ে তালাকে সালাসা ২১. মাসআলায়ে সিয়াহ্ খিদ্বাব ২২. মাস্‌আলায়ে বীস তারাভীহ্ ২৩. মকালাতে উকাড়ভী এবং ২৪. নজূমুল হিদায়াত ইত্যাদি। (মুহাম্মদ আনিসুজ জামান, শামে কারবালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯)

তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৫১১] তাঁর হাতে গড়া গুলজারে হাবীব জামে মসজিদের পাশে তাকে দাফন করা হয়।[৫১২]

## ৪.৮ আল্লামা খাজা আবদুল মজীদ শাহ্ (রহ.)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এলাকায়[৫১৩] যে কয়জন মনীষীর বিভিন্ন অবদানে ধন্য, যাঁদের পদচারণায় ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় এ এলাকায় গণমানুষ অশিক্ষা ও সামাজিক, ধর্মীয় কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে শিক্ষা ও সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকিত পথের সন্ধান লাভ করে খাজা আবদুল মজীদ শাহ্ (র.)[৫১৪] ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন আলিমে-দ্বীন, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্য সাধক এবং সর্বোপরি নিবেদিত প্রাণ একজন দাঈ ইলাল্লাহ।[৫১৫] তিনি ১৩১৬ বাংলা সাল মোতাবেত ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক ঝড়ের ৫ দিন পর নওয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

মাতৃহীন অবস্থায় খাজা আবদুল মজিদ শাহ্ পিতার ঘনিষ্ট সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয় নোয়াপাড়াতেই। তাঁদের নিজস্ব জমিতে একটি সরকারী স্কুল ছিল।[৫১৬] প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিটি স্কুলের সাথে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকত। প্রথম পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত এবং ২য় পর্যায়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল। এ ছাড়া পবিত্র কুরআন পাঠ, নামাযের জন্য প্রয়োজনীয় সূরা-শিখেন পিতার স্নেহময় সাহচর্যে। এ সময় তিনি পরিবারিক পরিমণ্ডলে আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও বাংলা ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা লাভেরও সুযোগ পান।

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর ইলমে দ্বীনর বুৎপত্তি অর্জনের জন্য তাঁকে দিল্লীতে পাঠানো হয়।[৫১৭] সেখানে দিল্লি জামে মসজিদে তিনি এক বছরের অধিককাল ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তাঁকে দিল্লী থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর পিতা তাঁকে প্রখ্যাত আলেমে-দ্বীন

---

৫১১. প্রাগুক্ত

৫১২. প্রাগুক্ত- পৃ. ৮

৫১৩. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বলতে বৃহত্তম যশোর (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুড়া) খুলনা (খুলনা সাতক্ষীরা, বাগেরহাট) ফরিদপুর ( ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর) ও বরিশাল ( বরিশাল, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী) কে বুঝনো হয়েছে।

৫১৪. খাজা নক্শবন্দীয়া তরীকার সিলসিলা হতে প্রাপ্ত। পারিবারিক সূত্র হতে জানা য়ায়, আবদুল মজীদশাহ্ যখন খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তী (র.)-এর তরীকতের একজন যোগ্য শিষ্য হিসেবে মনোনয়ন পান তখন থেকে তাঁর নামের সাথে ‘খাজা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

৫১৫. আহমদ গালুশ-এর মতে “দাঈ ইলাল্লাহ হল, মহান আল্লাহ এবং তাঁর শিক্ষা ও বিধি বিধানের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। ইসলামী দাওয়াহ এমন একটি দ্বীন যা আল্লাহ তায়ালা সমগ্র জগতের জন্য মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের শিক্ষা ও বিধানগুলোকে রাসূল (সা.)-এর উপর নাযিল করেছেন যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্তে সংরক্ষিত। সংরক্ষিত এ দ্বীনের প্রতি দায়িত্ববোধের কারণে যারা আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করেন মূলত তারাই দা‘ঈ ইলাল্লাহ’ দ্র. আহমদ গালুশ, আদ-দাওয়াতুল ইসলামীয়্যা উসূলুহা ওয়া ওয়াসাইলুহা (কায়রো : দারুল মিসরী, ১৩৯৩ হি.) পৃ. ১২

৫১৬. আকরামুজ্জামান, খাজা আবদুল মজীদশাহ্ পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৩ আকরামুজ্জামান ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সাতক্ষীরা জিলার তালা থানাধীন তেতুঁলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বড় বোনের সাথে খাজা আবদুল মজিদ-এর বিবাহ হয়। এর পর থেকে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ভগ্নিপতি মজীদ শাহ্-এর সাথে কাটান।

৫১৭. এম. কামারুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

ওয়ালীয়ে কামিল মাওলানা সফি উল্লাহর[৫১৮] তত্ত্বাবধানে কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায়[৫১৯] ভর্তি করে দেন। সেখানে মুহাম্মদ আলী শাহ্ এর এক ভক্তের বাসায় লজিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এ পরিবারে বসবাস কালে তাঁকে খুব কষ্ট সহ্য করতে হয়। মজিদ শাহ্ পোষাক-আশাকেও ছিলেন অনাড়ম্বর। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক বিচারে একজন উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও অতি সাধারণ ঘরের সন্তানের ন্যায়ই তাঁকে কায়িক পরিশ্রম করে লেখাপড়া করতে হয়েছে। এটা ছিল তাঁর পিতার অভিপ্রায়। যাতে জীবনের প্রারম্ভেই বালক মজিদ শাহ্ সমাজের দরিদ্র লোকদের বাস্তব অবস্থা দেখে তাদের প্রতি সহযোগিতা দেখানোর মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠতে পারেন।[৫২০] অবশ্য কেউ কেউ বলেন, মুহাম্মদ আলী শাহ্ নওয়াপাড়া ঈদগাহের পার্শ্বে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাদ্‌রসায় শিক্ষকতা করতেন কাজী আবদুর রব ও মাওলানা আবুল কাসেম। মজিদ শাহ্ এ মাদ্‌রাসতেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন।[৫২১]

খাজা আবদুল মজিদ শাহ্ যখন ২০ বছরের পরিণত যুবক তখনই তাঁর পিতা তাঁকে প্রথম বিবাহ দেন। নওয়াপাড়া থেকে তিন মাইল দক্ষিণে খুলনা-যশোর সীমান্তের মাঝামাঝি স্থানে ফুলতলা থানাধীন যোগীনিপাশা গ্রামের আবদুর রহমান মোল্লার জৈষ্ঠ কন্যা মোছাম্মৎ সখিনা খাতুনের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এ স্ত্রীর গর্ভজাত তিন কন্যা ও দুই পুত্র। বড় মেয়ে ফরিদার বিবাহ হয় বর্তমান ভারতের হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া গ্রামে। তাঁর স্বামীর নাম ছিল সুলতান আহমদ। পাকিস্তান হবার পর যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যা যথাক্রমে খালেদা ও আবেদা অপ্রাপ্ত বয়সেই মারা যায়। ছেলে শাহ্ কামারুজ্জামান (জন্ম: ১৯৩৬ খ্রি.) বর্তমানে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। প্রথম স্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্ হাদী উজ্জামান (জন্ম : ১৯৩৯ খ্রি.) একজন সমাজ সেবক ও রাজনীতিবিদ[৫২২]।

প্রথমা স্ত্রী সখিনা বেগমের মৃত্যুর পর তাঁরই ছোট বোন হালিমা বেগমকে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরপর তিনি তৃতীয় বিবাহ করেন সাবেক খুলনা জেলার সাতক্ষীরা, মহকুমার (বর্তমান জেলা) তালা থানার তেতুঁলিয়া গ্রামে।

শ্রদ্ধেয় পীর সাহেবের ইন্তিকালে সকলের মাঝেই শোকের ছায়া নেমে এল। কলিকাতাতে অগণিত ভক্ত মুরীদের উপস্থিতিতে প্রথম জানাযা হওয়ার পর ট্রেন যোগে ইরানী শাহের কফিন নওয়াপাড়ায়

---

৫১৮. মাওলানা সফি উল্লাহ প্রখ্যাত আলেমে দীন ও আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন। তিনি আলীয়া মাদ্‌রাসা কলিকাতার মুহাদ্দিস ছিলেন। মাদরাসা পরিচালনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতেও তাঁকে অন্তভূক্ত করা হত। দ্র. আবদুস সাত্তার, আলীয়া মাদ্‌রাসা ইতিহাস, মোস্তাফা হারুন অনুদিত,( ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ২১০।

৫১৯. ১৭৮০ খৃ. প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীবৃন্দ ভারত সচিব লর্ড হেস্টিংস-এর সাথে সাক্ষাত করে সরকারীভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করেন। সে মোতাবেক ১৭৯০ খৃ. অক্টোবর মাসে শিয়ালদহের কাঝে বৈঠকখানার একটি বাড়ীতে আলীয়া মাদ্‌রাসার উদ্ধোধন করা হয়। প্রথমে মুল্লা মজদ্দীনেকে মাসিক তিনশত টাকা বেতনে মাদরাসার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং ৪০ জন ছাত্রের মাসিক পাঁচ ও সাত টাকা হারে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। (আবদুল হক ফরিদী, মাদ্‌রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ. ৩২-৩৩; আবদুস সাত্তার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪।

৫২০ . আকরামুজ্জামান, খাজা আবদুল মজীদশাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৫২১ . আবদুস সাত্তার মাষ্টার, ***খাজা আবদুল মজীদশাহ্ (র.) সাহেবের জীবনী***, পাণ্ডুলিপি, বর্তমান গবেষকের কাছে সংরক্ষিত আছে, পৃ.২১

৫২২. অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালিব, ***যশোর জেলায় ইসলাম***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

আনা হয়। নওয়াপাড়াতে সর্বশেষ বিশাল জানাযার জামাত হয়। এতে ইমামতি করেন তৎকালিন শাহী মসজিদের ইমাম হযরত মাওলানা নূরুল হক সাহেব। অতঃপর সৈয়দ নওশেদ আলী সাহেব শোকাহত পরিবার বর্গ, উপস্থিত অগণিত মুরীদ ভক্তবৃন্দ ও সর্বস্তরের মুসলিম জনতার সামনে এক মর্মস্পর্শী ভাষণের পর মরহুম পীর সাহেবের নয়নমনি শাহজাদা আবদুল মজিদ শাহ্ সাহেবের হাতে সকলকে বাইয়াত নেয়ার আহবান জানান।[৫২৩] আর বিশিষ্ট শিষ্য মাওলানা কাসেম সাহেব মরহুম ইরানী শাহের পাগড়ীটি নতুন গদ্দীনশীন পীর আবদুল মজিদ শাহের মাথায় পরিয়ে দেন। সৈয়দ নওশের আলী সাহেবের আহবানে সাড়া দিয়ে সকলেই আবদুল মজিদ শাহ্ (র.)'র নিকট বাইয়াত গ্রহন করেন। খানাকায়ে মুহাম্মদীয়াহ-এর সকল দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করে সকলেই মহান আল্লাহ্‌র কাজে নতুন গদ্দীনশীন পীরের জন্য দু'আ করেন।

খাজা আবদুল মজিদ শাহ্ (রহ.)-এর সারাটি জীবনই ছিল কর্মমুখর। সাধারণ ভাবে লেখাপড়া শেষে কর্মজীবন শুরু, তারপর একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবসর নেয়ার যে প্রচলিত রেওয়াজ মানব সমাজে প্রচলিত আছে; তিনি এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে উজাড় করে দেন। কেননা তাঁর পরিপূর্ণ আদর্শ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। যিনি দ্বীনের প্রচারে ও প্রসারে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সুতরাং বলা যায় বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে সারাটি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি কর্মের মধ্যে ডুবে ছিলেন।

খাজা আবদুল মজিদ শাহ্ (রহ.) এর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের [৫২৪] সদস্য পদের মধ্যে দিয়ে। তিনি ত্রিশের দশকের কোন এক সময় কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফরোয়ার্ড ব্লকের বৃটিশ বিরোধী ব্যক্তিত্ব নেতাজী সুভাষ বসু[৫২৫] নড়াইল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে নওয়াপাড়ায় যাত্রা বিরতি করেন।[৫২৬] খাজা আবদুল মজিদ শাহ্ (র.) তাঁকে নওয়াপাড়ায় অভ্যর্থনা জানান এবং এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। এতে তিনি সভাপতিত্বও করেন।

---

৫২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৫২৪. ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দেসর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাত্মা গান্ধী এ সংগঠনের হাল ধরে একে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠনে রূপান্তরিত করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এ সংগঠনের সভাপতি নিযুক্ত হন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বে বৃটিশ খেদাও আন্দোলন সফল হয়। কংগ্রেস উপমাহাদেশের সবচে প্রাচীন দল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। দ্র. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যয়, আধুনিক ভারত, খ. ১, ( কলিকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯২) পৃ. ২০-২১ ; এম. এ. মুহাইমেন, ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ, পৃ. ১৯৬-১৯৯।

৫২৫. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। নেতাজী সুবাস বসু ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের অন্তর্গত কটকে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই সিপাহসালারকে বৃটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে এবং ১৯২৭ সালে মুক্তি দেয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আন্দোলন প্রশ্নে গান্ধীর সাথে বিরোধ বাঁধে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দেতিনি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে আবারো গ্রেফতার হন এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দেমুক্তি পান। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। দ্র. সৈয়দ মাকসুদ আলী, ***রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপ-মহাদেশ,*** (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮) পৃ. ১৭৮

৫২৬. আবদুস সাত্তার মাষ্টার, খাজা আবদুল মজীদশাহ্। বর্তমান পীর রফিকুজ্জামান শাহ্ কর্তৃক প্রাপ্ত, পৃ. ৬০

খাজা আবদুল মজিদ শাহ্ (রহ.)-এর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৮টি।[৫২৭]

**খাজা আবদুল মজিদ শাহ্ (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহ:**
১.শাহাবাদ মাজীদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা ২. জামেয়া আরাবিয়া মুহিউল ইসলাম ৩. পাজিয়া দারুল উলূম কওমী মাদ্‌রাসা ৪. পায়রা ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা ৫. উলা মাজীদিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ৬. ডুমুরিয়া মাজীদিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ৭. নূরানিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ৮. শাহাবাদ মাজীদিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা ৯. আড়ুয়া মাদ্‌রাসা, কেশবপুর ১০. ফুলবাড়িয়া গেট ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ১১. পশ্চিমা ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ১২. ঢাকুরিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ১৩. সুবাসিনী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা ১৪. জামেয়া আরাবিয়া সুন্দর মহল দাখিল মাদ্‌রাসা ১৫. খাজা আবদুল মজিদ শাহ্ (র.) প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মাদ্‌রাসা।

খাজা আবদুল মজিদ শাহ্ (র.) তাঁর ইন্তিকালের কয়েক বছর পূর্বেই একবার উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের শিকার হয়েছিলেন। তখন ঢাকার তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল। এ চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাতে স্বাস্থ্যের অবনতি আর বোধ করা যায়নি। ১৯৮৬ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিক থেকে তাঁর অবস্থা আরো অবনতির দিকে যেতে থাকে। শত চেষ্টা করেও তাঁর অবস্থা স্বাভাবিক করা যায়নি। ১৭ ই জানুয়ারী  শুক্রবার বিকেলের দিকে তাঁর অবস্থা আরও দ্রুত অবনতির দিকে যায়। এক পর্যায়ে তাঁর কথা বন্দ হয়ে আসে। অতঃপর রাত ১২টা ৩০ মিনিটে তিনি নিজ বিছানাতেই ইন্তিকাল করেন।

## ৪.৯ আল্লামা মুস্তাফা রেযা খান নূরী বেরেলভী (রহ.)

২২ জিলহজ্ব, ১৩১০ হিজরী মোতাবেক ১৮ জুলাই ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রোজ সোমবার বেঅেলি শরীফে জন্মলাভ করেন। যখন তিনি দুনিয়াতে তাশরিফ আনেন তখন তাঁর ওয়ালেদে মুহারাম আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান মাহরা শরীফে অবস্থান করছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন সন্তান জন্ম লাভ করেছে। স্বপ্নে তাঁর নাম 'আলে রহমান' রাখ হয়।[৫২৮] হযরত মখদুম শাহ্ আবুল হোসায়ন আহমদ নূরী মিয়া (রহ.) তাঁর নাম সাব্যস্ত করেন আবুল বরকাত মুহি উদ্দিন জিলানী। পরবর্তীকালে  ওরফে তাঁর নাম মোস্তফা রেযা খান খ্যাতি লাভ করে।[৫২৯]
হযরত শাহ্ আবুল হোসায়ন আহমদ নূরী মিয়া (রহ.) ইমামে আহলে সুন্নাত ফাযিলে বেরেলভী (রহ.) কে বলেছেন মাওলানা যখন আমি বেরেলভীতে আসব, তখন অবশ্যই আমি এ সন্তানটি

---

৫২৭. ১. ছেরাতুল মো'মেনিন  ২. ইসলাম দর্শন  ৩. জেহাদের ডাক ৪. ওজিফা ও জেকের শিক্ষা ৫. সংক্ষিপ্ত ওজিফানামা ৬. তাবিজাতে রহমানী  ৭. দেলবাহার পঞ্জিকা ৮. খোয়াবনামা  ৯. উর্দু শিক্ষক  ১০. ঈমানদার মুসলমান ও রাজনৈতিক সমস্যা  ১১. মাওতের পরে ১২. কেয়ামত দর্পন  ১৩. অযিফা ও ত্বরীকার পীরগণের শেজরা  ১৪.  প্রেরণা  ১৫. দাওয়াত  ১৬. খোৎবা  ১৭. হাফেজ্জী হুজুরের তিন দফা ১৮. জে.ডি. এণ্ড সি. ওয়ার্কস  ১৯. ইশারা  ২০.  পাক সঙ্গীত ২১. মানব জীবন ২২. যৌবন বাহার  ২৩. বাংলা মিলাদ শরীফ ২৪. উর্দু মিলাদ শরীফ  ২৫. হযরত গরীব নওয়াজ আজমীরি (র.) জীবন কাহিনী ২৬. মজিদিয়া ফরমুলা ২৭. বার চাঁদের ফজিলত  ২৮. কোরান মুকুট। খাজা  আবদুল মজীদ শাহ্ (র.)-এর অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী- ১দিওয়ানে ফিরোজাবাদী ২. মানুষের পুনরুত্থান ও পরিণতি ৩. এসমে আজম ৪. গল্প ও কবিতাগুচ্ছ  ৫. হাদীস শরীফ ৬. মেশ্‌কাতুল কোরআন  ৭. মিশকাতুল আনোয়ার।

৫২৮. মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, *খান্দানে রেযভীয়া পরিচিতি*, (চট্টগ্রাম : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ২০০৯), পৃ. ৪২

৫২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

দেখব। এ সন্তানটি খুবই বরকতপূর্ণ। যখন তিনি বেরেলভী শরীফে তাশরিফ আনেন, সেই সময়ে হুযূর মুফতীয়ে আযমে হিন্দ এর বয়স হয়েছিল কেবল মাত্র ছয় বছর। তিনি এ সন্তানটির জন্য দু'য়া করেন এবং তাঁর  পূন্যময় বিলাদতের জন্য মুবারকবাদ জানা এবং সুসংবাদ দেন-এ সন্তানটি দ্বীন ও মিল্লাতের বিরাট খেদমত করবেন। তাঁর মাধ্যমে অসংখ্য লোক ফয়েজ প্রাপ্ত হবেন। এ সন্তানটি একদিন মহান অলি হবেন। অংসখ্য পথ ভ্রষ্ট লোককে তিনি দ্বীনে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। ফযুজাতের দারিয়া প্রবাহিত করবেন তিনি।[৫৩০]

তিনি মাওলানা শাহ্ রহম আলী মঙ্গলোরী ও মাওলানা বশির আহমদ আলী গড়ী (রহ.)এর নিকট হতে বিশেষ ভাবে দরস হাসিল করেন। অতঃপর আলা হযরতের শিষত্ব গ্রহন করে তিনি বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান সমূহে চুড়ান্ত বিকাশ লাভ করেন। তাফসীর, আদব, ফালসাফা, মানতিক, রিয়াদি, ইলমে জুফর ও তাকছীর, ইলমে তাওকীত ও ইতিহাস শাস্ত্রেও তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ইলমী ও রুহানী পরিবারের এক উজ্জ্বল প্রদ্বীপ। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোর পরিবেশে তাঁর এ পরিবারটি গড়ে উঠে।[৫৩১]

৬ বছর বয়সে তিনি কুতুবে আলম, শায়খে তরীকত হযরত শাহ্ আবুল হোসাইন আহমদ নূরী মাহরভী কুদ্দিসা সিররুহু এর নিকট বায়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি নিজ ওয়ালেদে  মুহাতারাম ইমামে আহলে সুন্নাত ফাযিলে বেরেলভী (রহ.) এর নিকট বায়আত হন। উভয়ের  নিকট হতে তিনি খেলাফত ও ইযাযত লাভ করেন।[৫৩২] আলা হযরতের ইনতেকালের পর তাঁর  বড় সাহেবজাদা ও খলীফা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা শাহ্ হামেদ রেযা খান কাদেরী (রহ.) এর উপর খানকাহ আলীয়া কাদেরীয়া বরকতীয়া রেজভীয়ার সাজ্জাদানশীনী এবং দারুল উলুম মানযারে ইসলাম এর যাবতীয় দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়। তাঁর ইন্তেকালের পর সর্ব সম্মতিক্রমে খানকাহ ও দারুল উলূমের যাবতীয় দায়িত্বভার তাঁর  আপন ভ্রাতা হুযূরে মুফতীয়ে আযমে হিন্দ আল্লামা মোস্তাফা রেযা খান বেরেলভী (রহ.) এর উপর অর্পিত হয়।

তিনি উত্তম চরিত্র ও অনুপম আদর্শের অধিকারী ছিলেন। নম্রতা ও বিনয়তা, বদান্যতা ও দানশীলতা, ইবাদত ও রিয়াযত প্রভৃতি গুনাবনীতে তিনি ছিলেন অনন্য অসাধারণ। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর প্রতি গভীর ভালবাসা এবং গাউছুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁর জীবনের উন্নত ভূষন। মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ কচৌচভী (রহ.), জামেয়া আমজাদীয়া নাগপুর, এর প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুফতী আবদুর রশিদ ফতেহপুরী, হুযূরে হাফেযে মিল্লাত আল্লামা শাহ্ আবদুল আযীয মুবারকপুরী, হুযূরে মুজাদ্দিদে মিল্লাত আল্লামা হাবীবুর রহমান এরাহীবাদী, গাজ্জালীয়ে দাওয়ান আল্লামা সাইদ আহমদ কাজেমী, শামছুল ওলামা হযরত আল্লামা কাযী শামছুদ্দীন জাফরী, জৌনপুরী, শাহ্ আহমদ নুরানী, হযরত মুহাম্মদ মিয়া কামেল সাহসারামী, হযরত ক্বারী মুসলেহ উদ্দিন, খলীফায়ে আলা হযরত শাহ্ জিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানী, আল্লামা আবদুল মোস্তাফা আজহারী ও হযরত সৈয়দ মুখতার আশরাফ আশরাফী জিলানী

৫৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৫৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৫৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

সাজাদানশীন কচৌচভী শরীফ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ তাঁর ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা অপকটে পেশ করেছেন।[৫৩৩]

ভারত বিভাগের পূর্বে তিনি দুইবার হারামাইন শরীফাইনের পবিত্র হজ্জ ও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭১ সাল / ১৩৯১ হিজরী সনে তিনি তৃতীয় হজ্ব সম্পন্ন করেন। এ সফরে তিনি সেই সকল ওলামায়ে হারামাইনের সহিত শুভ সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। তাঁরা হলেন (১) সৈয়দ আমিন কুতুবী (২) সৈয়দ আব্বাস আলভী (৩) সৈয়্যতদ নুর মুহাম্মদ। তারা সকলেই আল্লামা ফাযিলে বেরেলভী (রহ.) এর সময়কালের বহু ঘটনাবলী ও হালাত বর্ণনা করেন। এবং তারা মুফতীয়ে আজমে হিন্দ (রহ.) নিকট হতে খিলাফতের ইযাযত লাভ করেন। এ সময়ে হিযায, মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও তুরষ্কের বিপুল সংখ্যক ওলামা মাশায়েখগণ ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। এতদ্ব্যব্যতীত আরব, আফ্রিকা, মারিশাচ, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বহু লোক তাঁর দ্বারা উপকৃত হন।[৫৩৪]

বহুমুখী খিদমতের মধ্যে তাঁর ক্ষুরধার লিখনী মুসলিম মিল্লাতের বিশাল সম্পদ।[৫৩৫]
কতিপয় বিশিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ খলীফাগন

১. হযরত সৈয়দ আব্বাস আলভী, মক্কা মুকাররমা
২. হযরত সৈয়্যদ নূর মুহাম্মদ, হিযায
৩. হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীন সাহেব, হিযায,
৪. হযরত গোফরান সাহেব সিদ্দীকী, আমেরিকা
৫. হযরত মাওলানা ইব্রাহীম খোশতর সাহেব, লন্ডন
৬. হযরত মাওলান আবদুল হাদী সাহেব, আফ্রিকা
৭. হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ সাহেব, আফ্রিকা
৮. হযরত মাওলানা আহমদ মুকাদ্দাস সাহেব, আফ্রিকা
৯. হযরত মাওলানা আইউব রেজভী সাহেব, মরিশাচ
১০. হযরত মাওলানা বদরুল কাদেরী, হল্যান্ড।[৫৩৬]

তিনি ১৩ মহররম, ১৪০২ হিজরী/১১ নভেম্বর, ১৯৮১ খৃঃ ৯২ বছর বয়সে বুধবার ১ টা ৪০ মিনিটে রাত্রে ইহকাল ত্যাগ করেন। আল্লামা সৈয়্যদ মুখতার আশরাফ আশরাফী আল জীলানী (সাজ্জাদানশীল কচৌচা শরীফ) তাঁর জানাজার নামাযের ইমামতি করেন। খানকায়ে রেযভীয়া বেরেলি শরীফে স্বীয় পিতা ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাজেলে বেরেলী (রহ.) এর বামপার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৫৩৭]

---

৫৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৫৩৪. মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, *খান্দানে রেযভীয়া পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৫৩৫. ১.তানবীরুল হুজ্জাত বে ইলতিওয়ায়িল হুজ্জাতে ২.তারদুশ শয়তান ৩.হুজ্জাতুল ওয়াহেরা বে ওজুবিল হুজ্জাতির হাযেরাহ ৪.আলকাওলুল আযীব ফী আজওয়াবাতিত তাশবীব ৫.য়াকআতু ইনসান ফী হালাকিনি মেরাতু বাসতিল বানান ৬.ইদখালু ইনসান ৭.মাসায়েলে সেমা ৮.হাশতাদ বায়দ ও বান্দ বর মকালে দউবন্দ ৯.আলমাউতুল আহমর, ১০.মাসয়ালায়ে আযান সানী।
৫৩৬. মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, *খান্দানে রেযভীয়া পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৫৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

# পঞ্চম অধ্যায়

## ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রাতিষ্ঠানিক অবদান

পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে যে সমস্ত মনীষীর অবদান ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) তাঁদের অন্যতম। স্বীয় পিতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র ইন্তিকালের পর ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পিতার চেহলামে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) আগমন করেন। তাঁর পিতার জীবদ্দশায়ও দু'বার এদেশে এসেছিলেন। এই সমস্ত সফরে ধর্মীয় শিক্ষাকে উপলক্ষ করে আয়োজিত বিভিন্ন সভায় তিনি সারগর্ভ বক্তব্য রাখতেন। তিনি চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদিঘী ময়দানে এক ভাষণে বলেছিলেন,"সুন্নী দর্শনই হোক বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের যোগসূত্র"।[৫৩৮] দেশের পত্র-পত্রিকা বেতার ও টিভিতে তাঁর এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বাণীগুলো প্রকাশ ও প্রচার করা হতো।[৫৩৯] তিনি পিতার অবর্তমানে এ উপমহাদেশে পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬১ হতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের তদারকির জন্য প্রতি বছরই আসা-যাওয়া করতেন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.)।[৫৪০] ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর উপর আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব অর্পিত হলে তিনি সংস্থাটির কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন। পরবর্তীতে সংস্থার গঠনতন্ত্র ঢেলে সাজানো হলে এটি একটি ধর্মীয় সেবামূলক ট্রাস্ট-এ পরিণত হয় এবং তা সরকারী স্বীকৃতিও লাভ করে। এ সংস্থার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাদরাসা, মসজিদ, খানকাহ, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন যা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর এক বিশাল অবদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

### ৫.১ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা শতাধিক। স্বীয় পিতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) কর্তৃক

---

৫৩৮. *মাসিক তরজুমান*, (জুলাই, ৩৩ তম বর্ষ, ২০১২) পৃ. ১৭; মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

৫৩৯. এম. সেলিম খান চাঁটগামী সম্পাদিত ***আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) স্মারক গ্রন্থ***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৫৪০. তাঁর পিতা আধ্যাত্মিক সাধক ও অন্যতম ধর্মীয় সংগঠক আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বার্মায় সর্বপ্রথম "আন্‌জুমান-এ শুরায়ে রহমানিয়া" নামে ধর্মীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে গঠন করেন উক্ত সংগঠনের চট্টগ্রাম শাখা এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আন্‌জুমান-এ আহমদিয়া সুন্নিয়া নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৬ সালে উভয় সংগঠনকে একত্রিত করে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট গঠন করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ আন্‌জুমানের অফিসিয়াল যাত্রা শুরু হয়। ৮ জানুয়ারি এক সভায় হুজুর আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র সভাপতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় আন্‌জুমান'র সংবিধান সংশোধন উপ-কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)কে। তাঁর নেতৃত্বে আন্‌জুমান আরো বেগবান ও গতিশীল হতে থাকে। ১৯৬১ সালে তাঁর পিতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি ইন্তেকালের পর পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, ***গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-১০)

প্রতিষ্ঠা মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি তিনি নতুন নতুন আরো অনেক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এবং পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত মাদ্‌রাসার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি ঐ সমস্ত মাদ্‌রাসার প্রভাবে সারা দেশে গড়ে উঠেছে আরো বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি মনে করতেন, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই। তাই তিনি সব সময় প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রতি তাকিদ দিতেন। যেখানেই যেতেন সেখানকার গন্যমান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র খুলে দিতেন।

## ৫.২ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকায় মুহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যাবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের হালিশহরে তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদরাসা ও কালুরঘাটস্থ মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া হাফিযিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তানের করাচির আউরঙ্গী টাউনে মাদরাস-এ-তৈয়্যবিয়া কাদেরিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রমের রাঙ্গুনিয়ার চন্দ্রঘোনায় তৈয়্যবিয়্যা অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার পরিচালনার দায়িত্ব নেন।[৫৪১] তিনি মায়ানমারের রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুনে) মাদরাসা-ই আলিয়া আহলে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে গাউসিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা আন্‌জুমান'র তত্ত্বাবধানে আসে। নরসিংদী জেলার মাঝিনা নদীর পাড়ে তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা সহ বহু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, সৈয়দপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সহ বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর অনুপ্রেরণায় সুন্নী মতাদর্শের উপর গড়ে উঠেছে। নিম্নে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এবং প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ কয়েকটি মাদ্‌রাসার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি :

### ৫.২.১ কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চর্চার স্বর্গযুগে মুঘল, আফগান, পাঠানদের পদচারণায় ধন্য হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যের জনপদ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মোহাম্মদপুরে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসা।[৫৪২] যুগশ্রেষ্ঠ অলীয়ে কামিল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)বিশ্বব্যাপী ইসলামী আদর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক যোগ্য নাগরিক তথা ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, যুগোপযোগী, আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে যথার্থ শিক্ষা দানের মাধ্যমে আদর্শবান দেশপ্রেমিক জাতি গঠন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে অত্র মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন।[৫৪৩]

---

৫৪১. মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, *ইসলামের মহান সংস্কার আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৫৪২. অফিস রেকর্ড, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

৫৪৩. প্রাগুক্ত

**প্রতিষ্ঠালগ্নে যাদের অবদান**

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র আহবানে তৎকালীন নেতৃত্বস্থানীয় কতিপয় লোক এগিয়ে আসেন। প্রতিষ্ঠানটির ঊষালগ্ন থেকে রয়েছে তাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও ত্যাগ । প্রতিষ্ঠাকালীন যারা নানা ভাবে অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে- মরহুম আলহাজ্ব চিনু মিয়া, আমেনা খাতুন, মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল করিম, মরহুম হোসেন আলী লস্কর, মরহুম চাঁদ মিয়া মেম্বার, মরহুমা রাহিলা বেগম, মরহুম আব্দুল আজিজ, মরহুমা সালমা খাতুন, আলহাজ্ব এইচ.এম চৌধুরী, মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সওদাগর, মরহুম ইঞ্জিনিয়ার নূর মোহাম্মদ, মরহুম আলহাজ্ব বাদশা মিয়া, মরহুম আলহাজ্ব মনজুর আলী ভূঁইয়া (মিয়া হাজী), মরহুম আলহাজ্ব সাইদুজ্জামান চৌধুরী, মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হক পাটোয়ারী, মরহুম আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ সওদাগর আল কাদেরী (চট্টগ্রাম), মরহুম আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর (চট্টগ্রাম), মরহুম আলহাজ্ব আমিনুর রহমান সওদাগর, মরহুম আলহাজ্ব আকরাম খান, মরহুম আলহাজ্ব সালেহ আহমদ সওদাগর আলকাদেরী (চট্টগ্রাম), আলহাজ্ব মোহাম্মদ আশরাফ আলী প্রমুখ।

**বর্তমান পৃষ্ঠপোষক**

এ মাদরাসার বর্তমান পৃষ্ঠপোষক হলেন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সুযোগ্য সন্তান ও খলীফা আওলাদে রাসূল রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বরীকৃত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.) ও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মু.যি.আ.)। এই মহান দিকপালদ্বয়ের দিক নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠানটি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

**সরকারী অনুমোদন লাভ**

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আওলাদে রাসূলের পবিত্র হস্তে মাদরাসার ভিত্তি স্থাপনের পর ১৪/০৩/১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে দাখিল মানে উন্নীত হয়। ০৭/৪/১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আলিম ও ফাযিল মঞ্জুরী হয়। ৮/৯/১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কামিল (হাদিস) মঞ্জুরী হয় এবং ১/৭/২০০৪ইং খ্রিস্টাব্দে কামিল (ফিকহ) মঞ্জুরী হয়।

**প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যারা পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও সদস্য সচিব এর দায়িত্ব পালন করেছেন**[৫৪৪]

| সভাপতি | সচিব | মেয়াদকাল | পর্যন্ত |
|---|---|---|---|
| আলহাজ্ব মোহাম্মদ চিনু মিয়া | ---------------- | ১৯৬৮ | ২১/৯/৮৯ |
| আলহাজ্ব মোহাম্মদ চিনু মিয়া | আলহাজ্ব এম.এ কাইয়ুম | ২৭/৯/৮৯ | ৩০/৯/৯৩ |
| আলহাজ্ব মোহাম্মদ চিনু মিয়া | আলহাজ্ব আলাউদ্দিন আহমেদ | ১/১০/৯৩ | ২০/৭/৯৪ |
| জনাব আবু সোলাইমান চৌধুরী (জেলা প্রশাসক, ঢাকা) | আলহজ্ব আলাউদ্দিন আহমেদ | ২১/৭/৯৪ | ২১/৭/৯৫ |
| আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম রতন | আলহজ্ব আলাউদ্দিন আহমেদ | ২২/৭/৯৫ | ১/৮/৯৮ |
| আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম রতন | আলহাজ্ব এম এ কাইয়ুম | ২/৮/৯৮ | ৩১/১২/০২ |
| আলহাজ্ব মো. আশ্রাফ আলী | আলহাজ্ব এম এ কাইয়ুম | ১/১/০৩ | ৩১/১২/০৪ |
| আলহাজ্ব মো. আশ্রাফ আলী | আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক | ১/১/০৫ | ১১/১১/২০১৬ |

৫৪৪. ড. আবদুল মাবুদ, *ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আনজুমান-এ রহমানিয়অ আহমদিয়া ট্রাস্টে'র ভূমিক : একটি পর্যালোচনা* ( অপ্রকাশিত অভিসন্দভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ . ২৪৭

| | | | |
|---|---|---|---|
| আলহাজ্ব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম রতন | আলহাজ মাওলানা হাফিয কাজী আবদুল আলীম রেযভী | ১২/১১/১৬ | . . . . . . |

**প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মাদ্‌রাসা সুপারিনটেনডেন্ট ও অধ্যক্ষের তালিকা** [৫৪৫]

| নাম | পদবী | মেয়াদকাল | পর্যন্ত |
|---|---|---|---|
| জনাব মুহাম্মদ ফয়েজী | সুপারিনটেনডেন্ট | ১/১/৬৮ | ৩১/১০/৭১ |
| জনাব আহমাদ হোসাইন | সুপারিনটেনডেন্ট | ১/১১/৭১ | ৩১/১০/৭৮ |
| জনাব হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল জলিল | অধ্যক্ষ | ১/১১/৭৮ | ৩১/৫/৮৭ |
| জনাব একে এম শামসুদ্দিন | অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) | ১/৬/৮৭ | ৩০/১১/৮৭ |
| জনাব মুহাম্মদ আবু তাহের | অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) | ১/১২/৮৭ | ৩১/৭/৮৯ |
| জনাব মাওঃ জালালুদ্দিন আল কাদেরী | অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) | ১/৮/৮৯ | ১৯/১০/৮৯ |
| জনাব ফজলুল করীম | অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) | ২০/১০/৮৯ | ৩০/১১/৯০ |
| জনাব হাফেজ মুহাম্মদ আ: জলিল | অধ্যক্ষ | ১/১২/৯০ | ৩১/১২/৯৪ |
| জনাব হাফেজ আব্দুস সাত্তার | অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) | ১/১/৯৫ | ৩০/৬/৯৬ |
| সৈয়দ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন | অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) | ১/৫/৯৬ | ২১/৯/০৩ |
| মুফতী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম মুজাহিদী | অধ্যক্ষ | ২২/৯/০৩ | ৩১/১২/২০১০ |
| মাও. আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক | অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) | ০১/০১/২০১১ | ০৯/০৬/২০১২ |
| মাওলানা হাফিয কাজী আবদুল আলিম রেযভী | অধ্যক্ষ | ১০/৬/২০১২ | . . .. . . . |

**শিক্ষকমণ্ডলী**

এক ঝাঁক তরুণ ও মেধাবী শিক্ষক কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসায় শিক্ষাদানে তাঁদের দক্ষতা দ্বারা ছাত্রদেরকে আদর্শ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য নিরলস ভাবে পাঠ দান করে যাচ্ছেন। শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশবিশ্ব বিখ্যাত মিশর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী রয়েছেন।

**স্কেলভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারী**[২০৮]

| ক্রম | নাম | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পদবী |
|---|---|---|---|
| ১ | হাফিয কাজী আবদুল আলীম রিযভী | কা.হা, কা.ফি, কা. তাফ. ১ম শ্রেণী, বি এ (অনার্স), ১ম শ্রেণি, এম,এ, ১ম শ্রেণি | অধ্যক্ষ |

৫৪৫. প্রাগুক্ত

২০৮. অফিস রেকর্ড, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | মুফতী আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক | কা. হা. ১ম শ্রেণী কা, ফি, ১ম শ্রেণি, বি এ (অনার্স) এম,এ, ১ম শ্রেণি ১ম স্থান | উপাধ্যক্ষ |
| ৩ | মাওলানা মুহাম্মদ মুশতাক আহমদ | কা. হা. বি,এ (অনার্স) ১ম শ্রেণি, এম,এ ১ম শ্রেণি | প্রধান মুহাদ্দিস |
| ৪ | মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন আল্ আজহারী | কা. হা. ১ম শ্রেণি বি এ (অনার্স) এম.এ ১ম শ্রেণি | মুহাদ্দিস |
| ৫ | মুফতী মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান | কা. হা. ১ম শ্রেণি, কা.ফি. ১ম শ্রেণি | প্রধান ফক্বীহ্ |
| ৬ | মাওলানা মুহাম্মদ আবু ইউসুফ | কা. হা. ১ম শ্রেণি কা. ফি. ১ম শ্রেণি | ফক্বীহ্ |
| ৭ | সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল করিম | বি,এ (অনার্স), এম,এ | প্রভাষক (ইংরেজী) |
| ৮ | মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম | এমএম, বি,এ, (অনার্স) এম,এ স্কলার | সহ. অধ্যাপক (ইস. ইতিহাস) |
| ৯ | মাওলানা মাহমুদুর রহমান চিশতী | কা.হা. ১ম শ্রেণি বি,এ, (অনার্স) ১ম শ্রেণি এম,এ, ১ম শ্রেণি | সহকারী অধ্যাপক |
| ১০ | মাওলানা হাফিয মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান | কা. হা. ১ম শ্রেণি কা. ফি. ১ম শ্রেণি, বি,এ | প্রভাষক (আরবী) |
| ১১ | ড. মাওলানা মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন | কা. হা. ১ম শ্রেণি, কা. ফি.১ম শ্রেণি, এম,এ ১ম শ্রেণি, পিএইচডি, | প্রভাষক (আরবী) |
| ১২ | আ.স.ম এয়াকুব হোসেন | কা. হা. ১ম শ্রেণি কা. ফি. ১ম শ্রেণি | প্রভাষক (আরবী) |
| ১৩ | খন্দকার মুহাম্মদ ওবায়দুল হক | বি.এস-সি, | সি. সহ. শিক্ষক |
| ১৪ | মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মুঈদ | কা. হা. ২য় শ্রেণি, এম,এ, ১ম শ্রেণি | সহকারী মৌলভী |
| ১৫ | মাওলানা মোস্তফা কামাল মজুমদার | কা. হা. ১ম শ্রেণি, কা. ফি. ১ম শ্রেণি | সহকারী মৌলভী |
| ১৬ | মাওলানা মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ্ | এম,এম ১ম শ্রেণি | সহকারী মৌলভী |
| ১৭ | মুহাম্মদ আব্দুল মুক্তাদির | এম,এ, বিপিএড | শিক্ষক (শরীর চর্চা) |
| ১৮ | এস এম শাহ্ মাহমুদ | বিএসসি, বিএড, ১ম শ্রেণি | সহ.শিক্ষক (বিজ্ঞান) |
| ১৯ | মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম পাটওয়ারী | এমএস-সি (গণিত), বিএড, ১ম শ্রেণি | সহ. শিক্ষক (গণিত) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২০ | মাওলানা আবুল কালাম আজাদ | কা, হা, ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরী সাইন্স | লাইব্রেরিয়ান |
| ২১ | মাওলানা মুহাম্মদ জাকির হোসেন | কামিল মুজাব্বিদ, ১ম শ্রেণি | দাখিল ক্বারী |
| ২২ | আবুল কাশেম মজুমদার | এইচ,এস,সি | জুনিয়র শিক্ষক |
| ২৩ | মাওলানা মুহা. ইকবাল হোসাইন খান | কা. হা. ২য় শ্রেণি | ইবতেদায়ী প্রধান |
| ২৪ | মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম | কা. হা. ২য় শ্রেণি,<br>কা. ফি. ১ম শ্রেণি | ইবতেদায়ী সহকারী |
| ২৫ | মাওলানা মুহাম্মদ মফিজ উদ্দিন | এইচ.এস.সি ২য় বিভাগ | জুনিয়র শিক্ষক |
| ২৬ | মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদির | কা. হা. ২য় শ্রেণি | ইবতেদায়ী ক্বারী |
| ২৭ | মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান | বি,এ | অফিস সহকারী |
| ২৮ | মুহাম্মদ আব্দুল বারেক | এম, কম | হিসাব সহকারী |
| ২৯ | মুহাম্মদ আব্দুল মালেক | কা. হা. বি,এ | মুদ্রাক্ষরিক |
| ৩০ | মুহাম্মদ আব্দুল মোতালিব | আলিম | অফিস পিয়ন |
| ৩১ | মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম | এইচ,এস,সি | দপ্তরী |

**নন এমপিও শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের তালিকা** [২০৯]

| ক্রম | নাম | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পদবী |
|---|---|---|---|
| ১ | মুহাম্মদ ফিরোজ খান | বি,এ (অনার্স)<br>এম,এ, (ইংরেজী) ১ম শ্রেণি | প্রভাষক (ইংরেজী) |
| ২ | মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা | বি,এ (অনার্স)<br>এম,এ (বাংলা) ১ম শ্রেণি | প্রভাষক (বাংলা) |
| ৩ | মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন হেলাল | এম,এম, এম,এফ,<br>১ম শ্রেণি,<br>বি,এস (অনার্স), এম,এ | প্রভাষক (আরবী) |
| ৪ | মাওলানা মুহাম্মদ আক্তার হোসাইন | বি,এ (অনার্স) এম, এ | প্রভাষক (অনার্স বিভাগ) |
| ৫ | মাওলানা মুহাম্মদ শফিউল আলম | বি,এ ( অনার্স), এম,এ | প্রভাষক (অনার্স বিভাগ) |
| ৬ | মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গণি | কামিল ফিক্হ | সহকারী (মৌলভী) |
| ৬ | মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন | এমএসসি<br>(কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) | সহকারী শিক্ষক (কর্ম) |

২০৯. অফিস রেকর্ড, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; *রাহমাতুল লিল আলামীন, পবিত্র ঈদ-এ-মীলাদুন্নবী (সা.) স্মারক ২০১৪ খ্রি.*, প্রকাশনায় : কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা, মুহাম্মদপুর, পৃ. ১৬

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭ | মাওলানা মুহাম্মদ নাজমুস সায়াদাত | এম,এম. ১ম শ্রেণি,<br>এম,এফ. ১ম শ্রেণি | সহকারী মৌলভী |
| ৮ | মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান | এম,এম. ২য় শ্রেণি | হোস্টেল সুপার |
| ৯ | মাওলানা মুহাম্মদ আশেক জুনাঈদ | এম,এফ ১ম শ্রেণি, বি,এ-(অনার্স) এম,এ, ১ম শ্রেণি | ইবতেদায়ী সহকারী |
| ১০ | হাফিয ক্বারী মুহাম্মদ মুকছুল আলম | হাফিয-এ কুর'আন | হিফয শিক্ষক |

**ভর্তি নিয়ম ও পদ্ধতি**

মাদরাসার বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির জন্য জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির পর সম্মানিত শিক্ষকদের মধ্য থেকে ভর্তি উপকমিটি করা হয়। এ কমিটি ছাত্রদের মেধা যাচাই করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। বর্তমানে আবাসিক ও আনাবাসিক প্রায় ১০০০ এর মত ছাত্র রয়েছে।

**অবকাঠামো**

মনোরম ও নিরিবিলি পরিবেশে মাদ্‌রাসার ত্রিতলা ২টি ও ৪তলা বিশিষ্ট ২টি ইমারত রয়েছে। একটি ৮ তলা বিশিষ্টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ও গ্রন্থাগার ভবন, ২টি ছাত্রাবাস। শিক্ষাথীর তুলনায় আবাসিক হল যথেষ্ট নয় বিধায় বহু শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না ।

**আবাসিক সুবিধা**

একজন হোস্টেল সুপার ও তিনজন হাউজ টিউটরের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে হিফ্‌যখানাসহ প্রায় ৪ শতাধিক ছাত্র ছাত্রাবাসে অবস্থান করে দু'বেলা খাবারসহ আবাসিক শিক্ষকদের নিকট থেকে সার্বক্ষণিক পাঠ গ্রহণের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছে। দানশীল ব্যক্তিদের বদান্যতায়, হিফ্‌যখানার ছাত্রসহ বেশীর ভাগ ছাত্র ফ্রি, অর্ধ ফ্রি ও নামমাত্র খোরাকী দিয়ে আবাসিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছে।

**হল সমূহের নাম**

১. ইমাম হাসান (রহ.) হল
২. ইমাম হোসাইন (রহ.) হল
৩. খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (রহ.) হল
৪. আ'লা হযরত (রহ.) হল
৫. সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি (রহ.) হল
৬. সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্‌ (মু.যি.আ.) হল
৭. সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্‌ (মু.যি.আ.) হল

**লাইব্রেরী**

কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা লাইব্রেরী দেশের প্রসিদ্ধ কয়েকটি লাইব্রেরীর মধ্যে অন্যতম। এতে বাংলা, আরবী, উর্দূ, ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত বিষয়ভিত্তিক প্রায় ২০ হাজার রেফারেন্স বই রয়েছে। শিক্ষক ও ছাত্ররা নিয়মনীতি অনুযায়ী লাইব্রেরীর দ্বারা জ্ঞান আহরণ করে থাকেন, ছুটির পরও লাইব্রেরী উন্মুক্ত রাখা হয়। লাইব্রেরীর কাজ-সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

**দারুল ইফতা**

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটমান জঠিল মাসয়ালার সমাধান কল্পে মাদরাসার ফিক্হ বিভাগের অধ্যাপকদের সমন্বয়ে "দারুল ইফতা বিভাগ" চালু করা হয়েছে। তাঁদের সমাধান পূর্ণ ফাতাওয়া প্রশংসনীয় এবং সমাজের লোকমনের কাছে খুবই সমাদৃত ।

**হিফ্য বিভাগ**

দক্ষ হাফিযে কুরআন তৈরির লক্ষ্যে অভিজ্ঞ হাফিযের তত্ত্বাবধানে হিফ্যুল কুরআন বিভাগ চালু করা হয়েছে। প্রতি বছর হিফয শেষে "দস্তারে ফযীলত প্রদান করা হয় "।

**সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা**

নিরিবিলি পরিবেশে জ্ঞান পিপাসু ছাত্র-শিক্ষক সবাই প্রয়োজনীয় সহায়ক কিতাবপত্র অধ্যয়নের পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার রয়েছে সুযোগ সুবিধা। একজন দক্ষ শরীর চর্চা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা নিয়মিত শরীর চর্চা অনুশীলন করে থাকে বার্ষিক ক্রিজ প্রতিযোগিতাসহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহাণকারীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদেরকে পুরস্কৃর প্রদান করা হয় মাড়ম্বর এ অনুষ্টানের মাধ্যমে।

**প্রাত্যহিক সমাবেশ**

নিয়মানুবর্তিতার নিমিত্তে প্রতিদিন ক্লাস শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারী'র যৌথ অংশগ্রহণে মাদ্রাসা মাঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে এসেম্বলী করা হয়।

**বিশেষ পাঠদান**

শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন ও গতিশীলতা আনয়নে সিলেবাসভুক্ত প্রতিটি বিষয়ের উপর বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক দ্বারা মানসম্মত প্রশ্নপত্রের আলোকে ক্লাস টেস্ট ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ প্রতিটি ছাত্রের জন্য বাধ্যতামূলক। যথাসময়ে ছাত্রদের সিলেবাস শেষ করার নিমিত্তে দীর্ঘ নিসাবের কিতাব যেমন- সিহাহ সিত্তার হাদীস, হেদায়াসহ ফিক্হ কিতাবে অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস ও ফকীহ দ্বারা তাখাস্সু (বিশেষ পাঠ) দান করানো হয। গণিত, ইংরেজী ও আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে স্পেশাল কোচিং করা হয়।

**ডায়েরী, পরিচয় পত্র ও ইউনিফর্ম**

ডায়েরী হল শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে ছাত্রদের যোগসূত্র সৃষ্ঠির উৎকৃষ্ট মাধ্যম। তাই প্রত্যেক ছাত্রকে ডায়েরী ও পরিচয় পত্র সরবরাহ করা হয়। যা নিয়মিত ছাত্রদের সঙ্গে থাকা বাধ্যতামূলক। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণী কক্ষে নির্ধারিত ইউনিফর্ম বাধ্যতামূলক। ছাত্রদের পোষাক হল সাদা পাজামা পাঞ্জাবী ও টুপি।

**সাপ্তাহিক জলসা ও একাডেমিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা**

ছাত্রদের মেধাবী ও মননশীল করে গড়ে তোলার জন্য একাডেমিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অপরিহার্য। ছাত্ররা নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক একাডেমিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সুনাম অর্জন করছে। সাপ্তাহিক জলসায় ছাত্ররা অংশ নিয়ে বাকশক্তি শাণিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

**বার্ষিক প্রকাশনা**

মাদরাসা পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক ও ছাত্রদের যৌথ উদ্যোগে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা ও বিশ্বাস প্রচারের লক্ষ্যে প্রতি বছর "রাহমাতুল্লিল আলামীন" নামে বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়।

**জশনে জুলূসে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)**

প্রতি বছর পবিত্র রবীউল আউয়াল উপলক্ষে হুযূর কেবলাহ্ (মু.যি.আ)'র সদারতে জশনে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) অনুষ্ঠিত হয়। আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ঢাকা'র কায়েৎটুলী খানক্বা শরীফ থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম জুলূস প্রবর্তন করেন। যা বর্তমানে উপমহাদেশে সুন্নী আক্বীদা প্রতিষ্ঠার মডেল। হুযূর ক্বিবলাহ (মু.যি.আ)'র উপস্থিতিতে প্রতি বছর মাদরাসা মাঠে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

**মাসিক গেয়ারভী শরীফ উদযাপন**

বর্তমান হুযূর ক্বিবলাহ (মু.যি.আ)'র অনুমতিতে ও মাদরাসা পরিচালনা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় কাদেরিয়া খানকাহ শরীফে মাসিক গেয়ারভী শরীফ উদযাপিত হয়। এতে ছাত্র শিক্ষা অংশ গ্রহণ করে বরকত হাসিল করে থাকে।

**প্রাত্যহিক দু'আ :** সিলসিলার সকল পীর ভাই বোন, শুভাকাঙ্খী, সহযোগী, দানবীর ও মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর হোস্টেল সুপার ও হাউস টিউটরদের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় পীর ভাই মুসল্লী ও আবাসিক ছাত্রদের যৌথ অংশগ্রহণে পবিত্র খতমে গাউযিয়া, মীলাদ শরীফ শেষে দু'য়া করা হয়।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) বলেছেন, "কাজ কর্ম, ইবাদত বন্দেগী, সবক, কল্যাণকর কাজ বা পরোপকরো সৎকাজ যা কর, তাতে তুমি এ রকম ধারণা মোটেই রাখবে না যে, এ কাজটি আমিই করছি, মূলত এহেন মহৎ কাজ করতে পেরে মহান আলীশান দরবারে শুকরিয়া প্রকাশ কর, তিনি ( আল্লাহ) আমি অধম গুনাহগার হতে এহেন কাজ সম্পাদন করে নিলেন। তাঁর কৃপা এবং অনুকম্পা যদি না হত, আমি কোন কিছুই করতে পারতাম না"।[৫৪৬]

কয়েকটি প্রস্তাবনা :

* ছাত্রদের কম্পিউটার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কম্পিউটার কোর্স চালুকরণ

* শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার ব্যবস্থা করণ

* মাদ্রাসার কল্যাণে ত্যাগী শিক্ষকদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ

* ছাত্র শিক্ষক ও অভিবাবকদের বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থাকরণ

* পৃথক মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

* লাইব্রেরীতে আরো কিতাব ও রেফারেন্স বই ব্যবস্থাকরণ

* বিএনসিসি চালুকরণ

৫৪৬. *বার্ষির্ক রিপোর্ট*, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা: ২০১৫ খ্রি.

* অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ছাত্রদের মাসে একবার শরীর চেকআপের ব্যবস্থাকরণ

* ইবতেদায়ী ছাত্রদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

* সকল শিক্ষকের আবাসন নিশ্চিতকরণ

* মাদরাসা ক্যাম্পাসে কেন্টিনের ব্যবস্থাকরণ

* অডিটরিয়াম নির্মাণ

## ৫.২.২ মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম

আওলাদে রাসূল রাহনুমায়ে শরী'আত ও তরীকত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মৌলিক আক্বীদাহ্-বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, যুগোপযোগী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে যথার্থ শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শ দেশপ্রেমিক সুনাগরিক গড়ে তোলা, আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ২৬ জন সুযোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের সুষ্ঠু পাঠদানে শিশু শ্রেণি হতে ফাযিল (স্নাতক) পর্যন্ত ১৬টি শ্রেণিতে ১২ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত অধ্যয়নরত। হিফযুল কুরআন বিভাগে ৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে ।[৫৪৭]

**বর্তমান পৃষ্ঠপোষক**

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.)

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মু.যি.আ.)

**গভর্নিং বডি** [৫৪৮]

| ক্রম | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ০১ | মুহাম্মদ মনজুর আলম মনজু | সভাপতি |
| ০২ | হোসনে আরা বেগম (জেলা শিক্ষা অফিসার) | সদস্য |
| ০৩ | আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী | সদস্য |
| ০৪ | আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল হামিদ | সদস্য |
| ০৫ | আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল মনসুর | সদস্য |
| ০৬ | আলহাজ্ব মোহাম্মদ সেলিম | সদস্য |
| ০৭ | আলহাজ্ব শেখ আহমদ | সদস্য |
| ০৮ | মাওলানা ইউনূস তৈয়্যবী | সদস্য |
| ০৯ | মিসেস্ উম্মে হাবিবা | সদস্য |

৫৪৭. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম

৫৪৮. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

| | | |
|---|---|---|
| ১০ | আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইলিয়াছ | সদস্য |
| ১১ | মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিযভী | সদস্য |

**সরকারী স্বীকৃতি**

০১-০১-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মাদরাসাটি অনুমতি লাভ। ০১-০১-১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে দাখিল স্বীকৃতি। ০১-০৭-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আলিম স্বীকৃতি। ০১-০৭-২০০১ খ্রিস্টাব্দে ফাযিল অনুমতি এবং ২৯-০৫-২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার কর্তৃক অধিভুক্তি লাভ[৫৪৯] করে।

**প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য**

১. বিষয়ভিত্তিক দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও আদর্শবান মুহাদ্দিস, অধ্যাপক, প্রভাষক ও শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
২. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং যুগোপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক সিলেবাসের আলোকে পাঠদান।
৩. লেখাপড়ার পাশাপাশি চরিত্র গঠনে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান।
৪. কেন্দ্রীয় পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাস এর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
৫. মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা।
৬. মেধাবী গরিব ছাত্রদের আবাসিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
৭. সাপ্তাহিক বক্তৃতা ও বিতর্ক সভার ব্যবস্থা।
৮. কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স ও নিয়মিত শরীর চর্চার সুযোগ-সুবিধা।
৯. সমৃদ্ধ পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করণ।
১০. আরবী, ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা।
১১. খেলাধুলা ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।
১২. অরাজনৈতিক পরিবেশে অধ্যয়নের অনন্য সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি।

**সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্য**

১. সালানা জলসা (বার্ষিক সভা)।
২. বার্ষিক সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান।
৩. সাপ্তাহিক বক্তৃতা ও বিতর্ক সভা।
৪. ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস সমূহ উদ্‌যাপন।
৫. বার্ষিক শিক্ষা সফর/ বনভোজন।
৬. বৃক্ষরোপন অভিযান।
৭. ব্লাড পরীক্ষা, রক্তদান ও খতনা কর্মসূচি।
৮. পরিচ্ছন্নতা অভিযান।
৯. দেয়াল পত্রিকা, ক্রোড়পত্র প্রকাশ।
১০. বার্ষিক স্মারক প্রকাশ।

---

৫৪৯. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), হালিশহর, চট্টগ্রাম

১১. অভিভাবক, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ী পরামর্শ সভা।

১২. সংবর্ধনা ও দু'আ মাহফিল।

১৩. দুর্যোগ মোকাবেলা কর্মসূচি।

* প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে কমপক্ষে ৫টি সহ শিক্ষাক্রমিক কাজে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

* সহশিক্ষা কাজে অংশগ্রহণে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ।

**ছাত্র-ছাত্রীদের পালনীয় নির্দেশা** [৫৫০]

১. প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে প্রয়োজনীয় বই, খাতা, কলম, ডায়েরী, ব্যাজ/পরিচয়পত্র ও ইউনিফর্মসহ যথাসময়ে মাদ্‌রাসায় উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক।

২. প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সাপ্তাহিক জলসা ও যে কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা বাধ্যতামূলক।

৩. এসেম্বলীতে যথাসময়ে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

৪. যথাসময়ে জামা'আত সহকারে সালাত আদায় বাধ্যতামূলক। জামা'আতের সময় ক্লাসে কিংবা ছাত্রাবাসে অবস্থান নিষিদ্ধ।

৫. শ্রেণিকক্ষের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা রক্ষা বাঞ্ছণীয়।

৬. মাদ্‌রাসা ক্যাম্পাসে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ও ফেলা, দেয়ালে লেখা নিষিদ্ধ।

৭. প্রতিষ্ঠানে সার্বিক আইন-কানুন মেনে চলা অপরিহার্য্য কর্তব্য।

৮. ইসলাম বিরোধী ও শরী'আত পরিপন্থী কার্যকলাপ পরিহার করা বাধ্যতামূলক।

**চিকিৎসা সেবা**[৫৫১]

এফপিএবি কর্তৃক মাসে ৪ দিন মাদ্‌রাসায় অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মাদ্‌রাসার রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা সকাল ১০ টা হতে ১ টা পর্যন্ত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

## আবাসিক হলসমূহ

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবা-যে কিরাম আউলিয়া -কামিলীন এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নামে হলগুলো নামকরণ করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মনন ও মানসিকতায় তাদের জীবন-কর্ম, আধ্যাত্মিকতা, অবদান মনেপ্রাণে প্রভাবিত হবে। দীনদার হতে অনুপ্রেণীত সৃষ্টি হবে। ছাত্রবাসগুলো হল

১। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) হল।

২। হযরত ফারুক্বে আযম (রা.) হল।

৩। হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা.) হল।

৪। হযরত মাওলা আলী (রা.) হল।

৫। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) হল।

৬। ইমাম বুখারী (রহ.) হল।

৭। ইমাম মুসলিম (রহ.) হল।

---

৫৫০. *প্রসপেক্টাস*, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম

৫৫১ . প্রাগুক্ত

৮। সুলতানুল 'আরিফীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.) হল।

৯। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) হল।

১০। ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) হল।

১১। খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.) হল।

১২। হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) হল।

১৩। হযরত শাহ আমানত (রহ.) হল।

১৪। আল্লামা সৈয়্যদ আল্লামা মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) হল।

১৫। আল্লামা ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) হল।

১৬। সদরুল আফাযিল নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) হল।

১৭। সদরুশ শরী'আহ্ মুফতী আমজাদ আলী (রহ.) হল।

১৮। হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ.) হল।

১৯। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মু.যি.আ.) হল।

২০। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ (মু.যি.আ.) হল।

**সাপ্তাহিক জলসা**

প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ৪র্থ ঘন্টার পর আধুনিক যুযোপযোগী বিষয়াদি ও আক্বাইদের মৌলিক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক জলসা, বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণবন্ত এ অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

**প্রকাশনা**

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও লেখালেখি চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণে প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন উপলক্ষে দেয়ালিকা, স্মরণিকা, ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। আত্ব-ত্বাহির স্মারক, গিয়ারভী শরীফের ফযীলত ও 'আল ইসবাহ্' নামে দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়।

**খেলাধুলা ও সংস্কৃতিক চর্চা**

ছাত্ররা থানা, জিলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফলতা অর্জন করে গৌরবান্বিত হচ্ছে। এতে প্রতিষ্ঠানের, খ্যাতি ও সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**ক্লাস টেস্ট ও ক্লাস মডেল টেস্ট**

শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়ন ও গতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বছরে তিন পর্বে যথাক্রমে এপ্রিল, আগস্ট ও নভেম্বরে একাডেমিক ক্যালেন্ডারে ঘোষিত তারিখে সিলেবাসভুক্ত প্রতিটি বিষয়ে শ্রেণি রুটিন অনুসারে বিষয়ের শিক্ষক কর্তৃক মানসম্মত প্রশ্নপত্রের আলোকে ক্লাসটেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ৪র্থ হতে ফাযিল পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। প্রাপ্ত নম্বর মূল পরীক্ষার নম্বরের সাথে যোগ করা হয়। ৫ম ও ৮ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার্থী এবং দাখিল, আলিম ও ফাযিল শ্রেণির নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের তিন মাস মেয়াদী বিশেষ ক্লাস বাধ্যতামূলক। পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়নে মডেল টেস্ট নেয়া হয়।

## ইউনিফর্ম ও ডায়েরী

প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত ইউনিফর্ম রয়েছে। ছাত্রদের জন্য সাদা পায়জামা, পাঞ্জাবী, টুপি ও সাধারণ জুতো। ছাত্রীদের জন্য সাদা সেলোয়ার-বোরকা, সাদা ওড়না, সাদা নিকাব ও সাধারণ জুতো।

ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক কর্মসূচির নির্দেশনা হল ডায়েরী। এতে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিয়মাবলীর। এ ডায়েরী শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে যোগসূত্রের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ডায়েরী সংগ্রহ করে তাতে নিয়মিত লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক।

## কম্পিউটার বিভাগ

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত প্রচেষ্টায় ০১-০১-২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে কম্পিউটার বিভাগের সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। ১৩ এপ্রিল ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ (মু.যি.আ.) কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন করেন। বিগত বছরগুলোতে মাদ্‌রাসা গভর্নিং বডির সভাপতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র মুহাম্মদ মনজুর আলম মনজু কর্তৃক ৫টি, সরকারী গভর্নিং বডির ২টি, খানজাহান আলী কম্পিউটারস এর কর্তৃক ১টি এবং ০৫-০৪-২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ চট্টগ্রাম-১১ সংসদীয় আসনের এমপি আলহাজ্ব এম এ লতিফ কর্তৃক। সৌজন্যে ২টি কম্পিউটার অনুদান পাওয়া যায়।[৫৫২] বিগত বছরগুলোতে কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্তির সাফল্য অর্জন করেছে।

## লাইব্রেরি

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)  গ্রন্থাগার' নামে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। এতে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ ও শুভাকাঙ্খীদের সহযোগিতায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দূর্লভ কিতাবাদি সংগ্রহ করা হয়। আলিম-ফাযিল শিক্ষার্থীরা এ লাইব্রেরি থেকে মূল্যবান কিতাবগুলো সংগ্রহ করে শিক্ষা অর্জন করে থাকে।

## লিল্লাহ বোডিং

এ মাদ্‌রাসার হোস্টেলে দেশের বিভিন্ন জেলার প্রায় দু'শতাধিক নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারের সন্তান অধ্যয়নরত। আবাসিক ছাত্রদের থেকে নামে মাত্র খোরাকী টাকা নিয়ে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা, পীর ভাই-বোন ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের যাকাত-ফিতরা, দান, সাদক্বাহ্, কুরবানীর চামড়া, মান্নত, অনুদান ইত্যাদির ভিত্তিতে মাদ্‌রাসার লিল্লাহ্ বোডিং পরিচালিত। অসচ্ছল পরিবারের সন্তানরা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় আবাসিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে। পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ, সদস্যমণ্ডলী, গাউসিয়া কমিটির সদস্য, শিক্ষক-কর্মচারি, ছাত্র-ছাত্রীসহ ধর্মপ্রাণ মুসলমান থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতায় এ লিল্লাহ্‌বোডিং সুচারুরূপে পরিচালিত হয়।[৫৫৩]

---

৫৫২. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম

৫৫৩. সাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী, সদস্য সচিব, গর্ভনিং বডি, মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম

**সাপ্তাহিক খতমে গাউসিয়া ও মাসিক গিয়ারভী শরীফ**

পীর সাহেব হুযূর (মু.যি.আ.)'র অনুমতিক্রমে মাদ্‌রাসা গর্ভর্নিং বডির ব্যবস্থাপনায় প্রতি সোমবার বাদে যুহর খত্‌মে গাউসিয়া শরীফ ও প্রতি চান্দ্র মাসের ১০ তারিখ দিবাগত বাদ মাগরিব হতে ত্বারীক্বাতের মাসিক গিয়ারভী শরীফ নিয়মিত উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এতে পীর ভাই বোনসহ অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান অংশ নিয়ে থাকেন। বালা মুসিবত থেকে নাজাত প্রাপ্তি, রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ, মামলা-মোকদ্দমায় সাফল্য অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, চাকুরীতে পদোন্নতি বৈধ মনোবাসনা পূরণার্থে বিশুদ্ধ নিয়্যতে টাকা পয়সা, দ্রব্য-সামগ্রী মাদ্‌রাসার নামে মান্নত করলে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মাশায়িখ হযরাতে কেরামের ওয়াসীলায় মাক্বসুদ পূর্ণ হয়। এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।[৫৫৪]

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

মাদ্‌রাসার পূর্বদিকে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ

স্বতন্ত্র মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা।

সুপরিসর মিলনায়তন নির্মাণ।

বিজ্ঞান বিভাগ চালুকরণ।

ইবতেদায়ী বিভাগে সেকশান (শাখা) চালু করণ।

সুপরিসর পৃথক ডাইনিং হল নির্মাণ।

বহিরাগতদের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে মাদ্‌রাসার চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

**প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও অধ্যক্ষবৃন্দ :**[৫৫৫]

| ক্রম | নাম | পদবী | ঠিকানা | মেয়াদকাল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মাওলানা মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন (মরহুম) | তত্ত্বাবধায়ক | ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম। | ১৬-০১-৭৫ হতে ১১-১২-৮৩ পর্যন্ত |
| ২ | মাওলানা আবু নোমান শাহ্‌ শামসুল (মরহুম) | সুপারিন্টেন্ডেন্ট | পটিয়া, চট্টগ্রাম। | ১২-১২-৮৩ হতে ৩০-০৮-৮৫ পর্যন্ত |
| ৩ | মাওলানা মুহাম্মদ নেয়াজুর রহমান | সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) | ধর্মপুর, চট্টগ্রাম। | ০১-০৯-৮৫ হতে ০৭-০২-৮৬ পর্যন্ত |
| ৪ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম | সুপারিন্টেন্ডেন্ট | চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। | ০৮-০২-৮৬ হতে ৩০-০২-৮৭ পর্যন্ত |
| ৫ | মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম | সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) | পটিয়া, চট্টগ্রাম। | ০১-০৩-৮৭ হতে ০৩-০৮-৮৭ পর্যন্ত এবং ০১-১২-৮৭ হতে ২৬-০১-৮৮ পর্যন্ত |

৫৫৪. প্রসপেক্টাস্ ২০১৪ খ্রি. মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম, প্রাগুক্ত
৫৫৫. প্রাগুক্ত

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬ | মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস শামীম | সুপারিন্টেন্ডেন্ট | রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম। | ০১-০৯-৮৭ হতে ৩০-১১-৮৭ পর্যন্ত |
| ৭ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের | সুপারিন্টেন্ডেন্ট | শাহরাস্তি, চাঁদপুর । | ২৭-১০-৮৮ হতে ৩০-০৫-৮৮ পর্যন্ত |
| ৮ | মাওলানা আবু বশর মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর | সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) | লক্ষ্মীপুর | ০১-০৬-৮৮ হতে ৩০-১১-৮৮ পর্যন্ত |
| ৯ | মাওলানা জহির উদ্দিন মোহাম্মদ ইলিয়াস | সুপারিন্টেন্ডেন্ট | লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। | ০১-১২-৮৮ হতে ৩১-১২-৮৯ পর্যন্ত |
| ১০ | মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আজিম | সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) | পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম | ০১-০১-৯০ হতে ৩০-০২-৯০ পর্যন্ত |
| ১১ | মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন (মরহুম) | সুপারিন্টেন্ডেন্ট | রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | ০১-০৩-৯০ হতে ০১-০১-৯৩ পর্যন্ত |
| ১২ | মাওলানা আব্দুল্লাহ আল ফারুক (মরহুম) | সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) | সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। | ০২-০১-৯৩ হতে ০৫-০২-৯৩ পর্যন্ত |
| ১৩ | মাওলানা এ.এস.এম. জালাল উদ্দিন ফারুকী | সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) | বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম। | ০৬-০২-৯৩ হতে ৩০-১০-৯৩ পর্যন্ত |
| ১৪ | মাওলানা মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন (মরহুম) | সুপারিন্টেন্ডেন্ট | রাউজান, চট্টগ্রাম। | ৩১-১০-৯৩ হতে ১৪-০৪-৯৪ পর্যন্ত |
| ১৫ | মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী খান | অধ্যক্ষ | সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। | ০১-০৬-৯৪ হতে ২৯-০৮-৯৭ পর্যন্ত |
| ১৬ | মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আমিরী | অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) | কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম। | ২২-০৩-৯৭ হতে ১৭-০৪-৯৭ পর্যন্ত |
| ১৭ | আলহাজ্ব মাওলানা মো. নূরুল আলম খান | অধ্যক্ষ | চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। | ০১-১১-৯৭ হতে ২৪-১০-২০০২ পর্যন্ত |
| ১৮ | জনাব আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিযভী | অধ্যক্ষ | চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। | ২৫/১০/২০০২ হতে অদ্যাবধি। |

**শিক্ষক ও কর্মচারী**[৫৫৬]

| ক্রমিক | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ১ | মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিযভী | অধ্যক্ষ |
| ২ | মাওলানা এ এস এম জালাল উদ্দীন ফারুকী | সিনিয়র আরবী প্রভাষক |
| ৩ | মুহাম্মদ আলতাফ ফিরোজ মণ্ডল | প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান |
| ৪ | মাওলানা আবুল হাসনাত | প্রভাষক, আরবী |
| ৫ | মুহাম্মদ আমির আলী | প্রভাষক, ইংরেজি |

৫৫৬. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

| | | |
|---|---|---|
| ৬ | মাওলানা মুজিবুর রহমান | প্রভাষক, আরবী |
| ৭ | মাওলানা সগির আহমদ | প্রভাষক, আরবী |
| ৮ | এ কে এম রফিক উল্লাহ্ খাঁন | সিনিয়র শিক্ষক |
| ৯ | মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস তৈয়্যবী | সহকারী মাওলানা |
| ১০ | মাওলানা জহির উদ্দীন | সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) |
| ১১ | মাওলানা মুহাম্মদ শেখ সাদী | সহকারী মাওলানা |
| ১২ | মাওলানা রফিকুল ইসলাম আনোয়ারী | সহকারী মাওলানা |
| ১৩ | মাওলানা মুহাম্মদ কায়সার হোসাইন | সহকারী মাওলানা |
| ১৪ | মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর খাঁন | ইবতেদায়ী প্রধান |
| ১৫ | মাওলানা এরফানুর রহমান | ইবতেদায়ী মৌলভী |
| ১৬ | মাওলানা মুহাম্মদ হাসান | জুনিয়র মৌলভী |
| ১৭ | মাওলানা হাফিয রেজাউল করিম | ইবতেদায়ী শিক্ষক |
| ১৮ | মাওলানা মোস্তাক আহমদ | আরবী শিক্ষক |
| ১৯ | শাহিদা আখতার | জুনিয়র শিক্ষিকা |
| ২০ | মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব | লাইব্রেরীয়ান |
| ২১ | হাফিয ইয়ার মুহাম্মদ | হিফযখানা শিক্ষক |
| ২২ | মুহাম্মদ নুরুল আমিন | হিফযখানা শিক্ষক |
| ২৩ | মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন | হিসাবরক্ষক |
| ২৪ | মুহাম্মদ সুহাইল | অফিস সহকারী |
| ২৫ | দিদারুল আলম রিজভী | অফিস সহকারী |
| ২৬ | মুহাম্মদ আবুল বশর | দপ্তরী |
| ২৭ | মুহাম্মদ  জাগির হোসেন | পিয়ন |
| ২৮ | মুহাম্মদ জাকির হোসেন | দারোয়ান |
| ২৯ | মুহাম্মদ আবদুল মান্নান | ঝাঁড়ুদার |
| ৩০ | মুহাম্মদ আবদুর রব | ঝাঁড়ুদার |
| ৩১ | মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম | বাবুর্চি |
| ৩২ | মুহাম্মদ বেলাল হোসেন | সহ. বাবুর্চি |
| ৩৩ | মুহাম্মদ ইব্রাহীম | সহ. বাবুর্চি |

### ৫.২.৩ মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, চন্দ্রঘোনা, চট্টগ্রাম

ষাটের দশকে বিধর্মী খ্রিষ্টান ও বাতিলপন্থীদের সক্রিয় তৎপরতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রাংগুনিয়ার সুন্নী মুসলমানদের ঈমান আক্বীদাহ্ রক্ষা করা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠে। কেননা খ্রীষ্টিয় ধর্মের কিল্লা চন্দ্রঘোনা খ্রীস্টান মিশন হাসপাতালকে কেন্দ্র করে তাদের ধর্মযাজকরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে নানাবিধ সুযোগ সুবিধার প্রলোভনে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার করে বিভিন্ন ধর্মের কিছু সংখ্যক লোককে দীক্ষিত করতে থাকে, অপর দিকে মুসলমানদের মধ্যে বাতেলপন্থীদের একপক্ষীয় প্রচারে দুর্বল ঈমানের মুসলমানরা বিভ্রান্তিতে পড়ে বিপদগামী হতে লাগল। নাজুক পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে কিছু ধর্মানুরাগী ব্যক্তি ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শে'রে বাংলা আযীযুল হক আল-কাদেরী (রহ.)'র অনুপ্রেণায় তৎকালীন উত্তর চট্টগ্রামের দ্বিতীয় হাজী মুহাম্মদ মহসিন খ্যাত রাউজানের বিশিষ্ট দানবীর বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরীর একক অবদানে চট্টগ্রাম, পার্বত্য জেলার সমন্বয়স্থল চন্দ্রঘোনা দোভাষী বাজার সংলগ্ন ৪৯ শতক জায়গায় একখানা ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৫৭] চৌধুরীর ইন্তিকালের পর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অর্ধনির্মিত মাদ্‌রাসাটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় রাঙ্গুনিয়া মরিয়ম নগরে ব্যবসায়ী মরহুম হাজী সৈয়্যদ আহমদ সওদাগর ও হাজী আবদুল মালেক সওদাগরের প্রচেষ্টায় চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী আমাতুন নূর বেগম চৌধুরাণী পরিত্যক্ত অর্ধনির্মিত মাদ্‌রাসাটি মহান আধ্যাত্মিক সাধক, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র নিকট কবলামূলে হস্তান্তর করেন। হুযূর ক্বিবলার নির্দেশে তখন থেকে মাদ্‌রাসাটি আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের পরিচালনাধীন হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠানটি 'মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া চন্দ্রঘোনা' নামে নবরূপে যাত্রা শুরু করে।[৫৫৮] উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সঙ্গে মেহমান ছিলেন দেশ বরেণ্য জ্ঞানতাপস শায়খুল হাদীস পীরে কামিল হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ ওবাইদুল মুস্তাফা মুহাম্মদ নূরুচ্ছাফা না'ঈমী (রহ.)।[৫৫৯]

#### লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে কুরআন-সুন্নাহ্‌র শিক্ষা অনুসরণে বিশ্বব্যাপী ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মৌলিক আক্বীদাহ্ বিশ্বাস। ইতিহাস-ঐতিহ্য ও যুগোপযোগী যথার্থ শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শ দেশপ্রেমিক আলিমে দীন তৈরী করা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সন্তুষ্টি অর্জন করা।[৫৬০]

#### স্বীকৃতি ও অনুমোদন

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র নির্দেশে আনজুমান কর্তৃপক্ষ মাদরাসাটি গ্রহণের পাঁচ বছর পর ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল (মাধ্যমিক), ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) ও ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে

---

৫৫৭. অফিস রেকর্ড, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, চন্দ্রঘোনা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম

৫৫৮. প্রাগুক্ত

৫৫৯. প্রাগুক্ত

৫৬০. সাক্ষাৎকার : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী, অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) চন্দ্রঘোনা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম

ফাযিল (স্নাতক) ক্লাসের চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধিভুক্ত হয়। বর্তমানে কামিল (স্নাতকোত্তর) ও মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে।[৫৬১] বর্তমানে উত্তর চট্টগ্রামে মাদ্‌রাসাটি সুন্নী মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তর দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হয়েছে।

**পরিচালনা পরিষদ**

মাদ্‌রাসার বর্তমান পৃষ্ঠপোষক হলেন যথাক্রমে আওলাদে রাসূল, হযরতুলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.) ও পীরে বাঙ্গাল হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মু.যি.আ.)। আনজুমান ট্রাস্ট মনোনীত ও সরকার অনুমোদিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। যাদের শ্রম ও ত্যাগে ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যে সব সমাজহিতৈষী, দানবীর ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি নানাভাবে অবদান রেখেছেন তাদের অনেকে ইন্তেকাল। তৎমধ্যে আন্‌জুমান ট্রাস্ট-এর সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আলকাদেরী, আলহাজ্ব সালেহ আহমদ সওদাগর, আলহাজ্ব গোলাম সারোয়ার এবং এ মাদ্‌রাসা পরিচালানা পরিষদের সাবেক সভাপতি হাজী সৈয়দ আহমদ সওদাগর, সাবেক সেক্রেটারী মুহাম্মদ সৈয়দুল হক, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, হাজী মতিউর রহমান চৌধুরী, মেম্বার সিদ্দীক আহমদ, আলহাজ্ব আবু আহমদ, ফিরোজুল আনোয়ার (আবু কোম্পানী) হাজী হামীদুল হক সওদাগর, হাজী আবদুল মালেক, মুহাম্মদ আবুল হোসেন, সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মমতাজউদ্দীন তালুকদার আমীরুল হজ্জাজ, মাওলানা ফয়েজ আহমদ হোসনাবাদী, বুলবুলে চাট্‌গাম মাওলানা মকবুল আহমদ, মুহাম্মদ মুজিবুলদৌলাহ্ সাওদাগর এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। আল্লাহ তা'আলা দরবারে প্রত্যেকের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

**শিক্ষকমণ্ডলী**

বর্তমানে সরকারী এমপিওভুক্ত ২৬ জন এবং নন-স্কেলে ১৬ জন সহ মোট ৪২ জন শিক্ষকের আন্তরিকভাবে পাঠ দান দ্বারা হুযূর ক্বিবলাহ্ (র) এর নির্দেশনা ও সরকারী সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষায় বিস্তৃতি ঘটছে।

**শিক্ষক ও কর্মচারী**[৫৬২]

| ক্রমিক | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ১. | এম আবু তৈয়ব চৌধুরী | অধ্যক্ষ |
| ২. | আ র ম মোজাম্মেল হক | উপাধ্যক্ষ |
| ৩. | মুহাম্মদ নূরুল আলম | আরবী প্রভাষক |
| ৪. | মুজিবুর রহমান নেজামী | আরবী প্রভাষক |
| ৫. | এ এম নছিমুদ্দীন কাওছার | ইতিহাস প্রভাষক |
| ৬. | মুহাম্মদ আনিছুল হক | বাংলা প্রভাষক |

৫৬১. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত
৫৬২. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

| | | |
|---|---|---|
| ৭. | মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন | ইংরেজি প্রভাষক |
| ৮. | মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান | আরবী প্রভাষক |
| ৯. | মুহাম্মদ আবদুল মান্নান | আরবী প্রভাষক |
| ১০. | মুহাম্মদ ইলিয়াছ আহমদ | সহকারী মৌলভী |
| ১১. | মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন | বিপিএড |
| ১২. | মুহাম্মদ রমজান আলী | সহকারী মৌলভী |
| ১৩. | মুহাম্মদ আবু ছালেহ | সহকারী শিক্ষক |
| ১৪. | মুহাম্মদ শাহ আলম | সহকারী শিক্ষক গণিত |
| ১৫. | মুহাম্মদ আবদুল বদরুজ | সহকারী শিক্ষক কৃষি |
| ১৬. | মুহাম্মদ আবদুল জলিল | সহকারী শিক্ষক |
| ১৭. | মুহাম্মদ আব্দুর রহমান | সহকারী লাইব্রেরিয়ান |
| ১৮. | মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ | ইবতেদায়ী প্রধান |
| ১৯. | মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান ফোরকানী | দাখিল ক্বারী |
| ২০. | মুহাম্মদ নেজামুল ইসলাম | ইবতেদায়ী শিক্ষক |
| ২১. | মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম | ইবতেদায়ী মৌলভী |
| ২২. | মুহাম্মদ মনজুর আলম | অফিস সহকারী |
| ২৩. | মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম | নিম্নমান অফিস সহকারী |
| ২৪. | মুহাম্মদ আবুল হাশেম | দপ্তরী |
| ২৫. | মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন সিকদার | পিয়ন |
| ২৬. | আব্দুল মান্নান | মালী |

**নন-স্কেল শিক্ষক/ কর্মচারী:**

| ক্রমিক | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ১. | ফয়েজ আহমদ | সহকারী মৌলভী |
| ২. | মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন | জুনিয়র মৌলভী |
| ৩. | মাওলানা কামাল উদ্দীন | ক্লার্ক এন্ড কাতেব শিক্ষক |
| ৪. | আবদুল হামিদ | ক্যাশিয়ার (মাদ্রাসা) |
| ৫. | আবদুল সত্তার | হোস্টেল সহকারী |
| ৬. | হাফিয মুহাম্মদ ইউনুছ | হাফিয শিক্ষক |
| ৭. | হাফিয মুহাম্মদ ইস্কান্দর | হাফিয শিক্ষক |
| ৮. | মুহাম্মদ আব্দুল খালেক | ক্যাশিয়ার (আনজুমান) |
| ৯. | মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন চৌধুরী | সহকারী ক্যাশিয়ার |
| ১০. | মুহাম্মদ আব্দুল বারেক | প্রধান বাবুর্চি |
| ১১. | মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম | সহকারী বাবুর্চি |

| | | |
|---|---|---|
| ১২. | মুহাম্মদ আব্দুল মোনাফ | সহকারী বাবুর্চি |
| ১৩. | মুহাম্মদ নাছির মিয়া | সহকারী বাবুর্চি |
| ১৪. | মুহাম্মদ ইদরিস | নৈশ প্রহরী |
| ১৫. | পুজন বিশ্বাস | দিবা প্রহরী |
| ১৬. | তপন মালী | সুইপার |

**অবস্থান**

চট্টগ্রামের পূর্বপ্রান্তে রাঙ্গুনিয়া উপজেলাধীন নোয়াশহর খ্যাত চন্দ্রঘোনা দোভাষী বাজারের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় সাড়ে তিন একর জায়গা জুড়ে মাদ্‌রাসা ক্যাম্পাসে গড়ে উঠেছে। ইংরেজী অক্ষর L আকৃতি ত্রিতল বিশিষ্ট মাদ্‌রাসা ভবন। সম্মুখে রয়েছে খেলার মাঠ, নির্মাণাধীন বহুতল বিশিষ্ট ইবতেদায়ী ভবন, চারতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন ও জামে মসজিদ বিশাল। পশ্চিমাংশে রয়েছে ১টি বিরাট পুকুর ও খানকাহ্‌ শরীফ, মাদ্‌রাসা সংলগ্ন ডাইনিং হল ও তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূরুল হক জরিনা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা এবং তৈয়্যবিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাদ্‌রাসাটি চট্টগ্রাম শহর হতে ৩৩ কি.মি. দূরে লিচু বাগান বাসস্টাণ্ড সন্নিকটে মাদ্‌রাসার দক্ষিণ পাশ দিয়ে কর্ণফুলী নদী প্রবাহিত হয়েছে অবস্থিত। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান শহরের সাথে উন্নতমানের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।[৫৬৩]

**আবাসিক ব্যবস্থাপনা**

বর্তমানে আবাসিক-আনাবাসিক ও হিফ্‌যখানাসহ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। দূর দূরান্তের ছাত্রদের জন্য মাদ্‌রাসায় ছাত্রাবাস রয়েছে। আবাসিক শিক্ষকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং বন্ধুত্বসুলভ কঠোর অনুশাসনে শিক্ষার্থীদের চরিত্রে কাঙ্খিত পরিবর্তন এনেছে। যা ভবিষ্যৎ জীবনেশীল রুচি ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ হওয়ার প্রেরণা যোগায়। এ ছাত্রাবাসে গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের ফ্রী থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। ঐক্য, শৃঙ্খলা, আক্বীদাহ্‌, সুশিক্ষা ও সহমর্মিতার সুন্দর পরিবেশ এবং মানসম্পন্ন খাবারের পাশাপাশি আবাসিক শিক্ষকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে নিয়মিত পাঠ আদায়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিশ্বস্ত অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া অসহায়, আশ্রয়হীন এতীম শিশুদের পালন ও লেখাপড়া শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ইতীমখানা রয়েছে। এতিমখানাটি সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধিভুক্ত।[৫৬৪]

**সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম**

লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক উৎকর্ষ সাধন, জড়তা কাটিয়ে উঠা এবং সুপ্ত প্রতিভা ও মননশীলতা বিকাশের জন্য কো-কারিকুলাম ও এক্সট্রা-কারিকুলাম পাঠ্যক্রম কর্মসূচীর ব্যবস্থা রয়েছে। ছেলেমেয়েদের নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

---

৫৬৩. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন

৫৬৪. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

**শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম**

ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নত চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক দ্বারা পাক্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ও শিক্ষামূলক দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শনের জন্য প্রতি বছর শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

**ক্রীড়া ও স্কাউটিং**

ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ, সবল, পরিশ্রম ও সেবামুখী করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত শরীর চর্চা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত খেলাধূলা, ব্যায়াম ও স্কাউটিং অনুশীলনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি বছর মাদ্‌রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফলতার সাথে শিরোপা ও পদক অর্জন করে আসছে।

**প্রকাশনা**

মাদ্‌রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, মনন, মুক্তবুদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে মাসিক দেয়ালিকা 'আল্ ইরফান' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পবিত্র রমযান উপলক্ষে প্রতি বছর ক্যালেন্ডারসহ 'তুহ্‌ফা' প্রকাশ করা হয়। বার্ষিক ম্যাগাজিন 'গুলশানে তৈয়্যব'প্রকাশিত হয়ে থাকে।[৫৬৫]

**লাইব্রেরী**

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা বিবেচনা করে পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের অর্থ ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে এতে দশ সহস্রাধিক দুষ্প্রাপ্য কিতাবাদি রয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ানের তত্ত্বাবধানে এটা পরিচালিত হয়ে আসছে। তা'ছাড়া ছাত্রদের প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে 'শহীদ আব্দুল হালিম পাঠাগার' নামে ক্যাম্পাসে পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি বছর ইবতেদায়ী ১ম হতে ৫ম শ্রেণী এবং আলিম ও ফাযিল শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে মাদ্‌রাসা হতে বিনা মূল্যে কিতাব প্রদান করা হয়।

**বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা**

হাতের লেখা পরিষ্কার ও সুন্দর করার জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল অর্জনের বিশেষ সহায়তা ভূমিকা পালন করছে। ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা এবং দাখিল, আলিম ও ফাযিল পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য তিন মাস মেয়াদি বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে ।[৫৬৬]

## ৫.২.৪ মাদ্‌রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, বানুর বাজার, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

ভারত উপমহাদেশে ইসলাম এসেছে আউলিয়ায়ে কিরাম ও সূফী-দরবেশদের মাধ্যমে। তাঁরা ধর্মের মর্মবাণী মানুষের হৃদয়গ্রাহী করতে অনেক ত্যাগ সাধন করেন। এ দেশে ইসলামী আদর্শ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সুন্নী মতাদর্শভিত্তিক যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির প্রয়াসে তাদের অতুলনীয় অবদান রয়েছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানসাধক, গাউসে যামান, আওলাদে রাসূল রাহ্‌নুমায়ে

---

৫৬৫. প্রাগুক্ত

৫৬৬. গ্রন্থাগারের তথ্য, প্রাগুক্ত

শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অসংখ্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মাদ্রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম) তাঁর স্মৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন। বার আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত চাট্গাঁ অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মহিমায় সমুজ্জ্বল। শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের লীলাভূমি চট্টগ্রাম জেলার শিল্প এলাকা সীতাকুণ্ড উপজেলার ভাটিয়ারী বানুর বাজারস্থ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন পূর্ব পাশে মনোরম পরিবেশে মাদ্রাসাটি অবস্থিত। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে হুযূর ক্বিবলাহ্ (রহ.) ও শেরে মিল্লাত মুফ্তী ওবাইদুল হক না'ঈমীসহ কুমিল্লা টাউন হলে মাহ্ফিল থেকে আসার পথে আসরের নামাযের সময় হলে বানুর বাজার রাস্তার পাশের মসজিদে নামায আদায় করেন। নামাযের পর মসজিদ থেকে পূর্ব দিকে মুখ করে কি যেন বলতে চেয়েছেন। সেই দিন আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোবারক হোসেন সওদাগর ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি হুযূর ক্বিবলাহ্ (রহ.)'র প্রথম সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।[৫৬৭]

১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষানুরাগী মরহুম আলহাজ্ব ডা. গোলাম মুর্শেদ চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় ফৌজদার কে এম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সুন্নী সম্মেলনে আওলাদে রাসূল সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ হুযূর (রহ.) তাশরীফ আনেন। মরহুম মাওলানা মাহবুব আলম রিযভী'র অনুপ্রেরণায় মাহফিলে মরহুম আহমদ সওদাগর, মরহুম আলহাজ্ব সাবের সূফী কামাল, আলহাজ্ব মোবারক হোসেন সওদাগরসহ অনেকে হুযূর ক্বিবলাহ্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। [৫৬৮]

**মাদ্রাসার ও ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন**

আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্গুলো হল ত্বারীক্বাতের আদর্শ বিকাশের কেন্দ্র। এখানে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের আকাঙ্খা পূরণে আধ্যাত্মিকতার চর্চা করা হয়। এ মর্মে মুর্শিদ ক্বিবলাহ্র মুরীদরা খানকাহ্ নির্মাণে জায়গা খুঁজতে ছিলেন। তখন রহমত চৌধুরীর পরামর্শে মরহুম আলহাজ্ব নেছার আহমদ চৌধুরী ও তাঁর ভাই আলহাজ্ব শাহ্ আলম চৌধুরীকে কিছু জমি দান করতে অনুরোধ করলে তারা ৮ শতক জমি আন্জুমান-এ রাহ্মানিয়া আহ্মদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টকে দান করেন। আন্জুমান ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ খানকাহ্ শরীফ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করার নিমিত্তে জায়গাগুলো বর্তমান মাদ্রাসার নামে রেজিস্ট্রি করেন। দানকৃত জমিতে স্থানীয় পীর ভাইদের আবেদন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে হুযূর ক্বিবলাহ্ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ১২-০৮-১৯৮৩ খ্রি. খানকাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া এবং মাদ্রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহ্মদিয়া সুন্নিয়ার ভিত্তি দেন।[৫৬৯] ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাঁশের বেড়ার তৈরী খানকাহ্ থেকে সিলসিলার কাজ আরম্ভ হয়ে মক্তব, পর্যায়ক্রমে ইবতেদায়ী, দাখিল এবং বর্তমানে আলিম শিক্ষা পর্যন্ত কার্যক্রম চলছে। [৫৭০]

---

৫৬৭. আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, *মাদ্রাসা-এ-মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম) প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বৈশিষ্ট্য,* (চট্টগ্রাম: আত্-তৈয়্যব ২০১৫), পৃ. ৩৩

৫৬৮. প্রাগুক্ত

৫৬৯. অফিস রেকর্ড, মাদ্রাসা-এ-মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

৫৭০ .আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, *মাদ্রাসা-এ-মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম) প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বৈশিষ্ট্য,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

**মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষক**

আওলাদে রাসূল রাহনুমায়ে শরী'আত ও ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.) এবং পীরে বাঙাল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মু.যি.আ.)।[৫৭১]

**মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের মৌলিক আক্বীদাহ্ বিশ্বাস ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে যুগোপযোগী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে যথার্থ শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শ দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক গড়ে তোলা, বিশেষতঃ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সন্তুষ্টি অর্জন।

**সরকারী স্বীকৃতি লাভ**

এ মাদ্‌রাসা ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল এমপিওভুক্ত হয়। ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে আলিম এর অনুমতি লাভ করে। বর্তমানে চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।[৫৭২] বর্তমানে আবাসিক-আনাবাসিক হিফ্‌যখানাসহ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫০০ জন। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ক্লাসে ন্যূনতম ৭৫% উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে আজ তা সীতাকুণ্ড উপজেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যে সব সমাজহিতৈষী ভূমিকা ও অবাদন রেখেছেন তাদের অনেকে আজ দুনিয়াতে বেঁচে নেই, জান্নাতবাসী হয়েছেন।

**মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় যাঁদের অবদান**

| ক্রমিক | নাম | ঠিকানা | পদবী |
|---|---|---|---|
| ১. | আলহাজ্ব নেছার আহমদ চৌধুরী | ইমাম নগর | প্রথম সভাপতি |
| ২. | আলহাজ্ব শাহ্ আলম চৌধুরী | ইমাম নগর | বর্তমান সভাপতি |
| ৩. | আলহাজ্ব সাবের আহমদ সওদাগর | ভাটিয়ারী | প্রাক্তন সভাপতি |
| ৪. | আলহাজ্ব সূফী কামাল উদ্দীন | বি.এম.এ.গেট | কমিটির সদস্য |
| ৫. | আলহাজ্ব মোবারক হোসেন সওদাগর | দুর্লভবাড়ী আব্দুল্লাহ্ ঘাটা | কমিটির সদস্য |
| ৬. | আলহাজ্ব ডা. গোলাম মুর্শেদ চৌধুরী | ফৌজদার হাট | প্রাক্তন সেক্রেটারী |
| ৭. | আলহাজ্ব নূরুল আবছার চৌধুরী | আব্দুল্লাহ ঘাটা | প্রাক্তন সেক্রেটারী |
| ৮. | আলহাজ্ব মাও. আবদুর রহিম আনসারী | চন্দনাইশ | প্রাক্তন অধ্যক্ষ |
| ৯. | আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম | মাদাম বিবির হাট | প্রাক্তন সেক্রেটারী |
| ১০. | আলহাজ্ব ইঞ্জি. আমিনুর রহমান | কদম রসুল | বর্তমান শিক্ষানুরাগী |
| ১১. | আলহাজ্ব নাছির আহমদ জব্বার | ফৌজদারহাট | কমিটির সদস্য |

৫৭১. প্রাগুক্ত
৫৭২. প্রাগুক্ত

**প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অধ্যক্ষ**

| ক্রমিক | নাম | মেয়াদ |
|---|---|---|
| ১. | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রাহীম আনসারী | ১৯৮৩-২০০৭ |
| ২. | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রিযভী, পটিয়া | ২০০৭ থেকে অদ্যাবধি |

**শিক্ষক ও কর্মচারী**

মাদ্‌রাসায় ১৩ জন স্কেলধারী এবং ১৭ জন স্কেলবিহীন শিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন। শিক্ষকরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ। শিক্ষকদের অনেকে উচ্চতর ডিগ্রী প্রাপ্ত।[৫৭৩]

| ক্রমিক | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ১ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রেজভী | অধ্যক্ষ |
| ২ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ শফিউল আলম | উপাধ্যক্ষ |
| ৩ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মুসা আল কাদেরী | প্রভাষক (আরবী) |
| ৪ | মাওলানা মুহাম্মদ জাবিদ হোসাইন | প্রভাষক (আরবী) |
| ৫ | মেরিনা আনোয়ার | প্রভাষক (বাংলা) |
| ৬ | মোহাম্মদ ওমর ফারুক | প্রভাষক (ইংরেজি) |
| ৭ | মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মজিদ | প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস) |
| ৮ | মোহাম্মদ নূরুল করিম | প্রভাষক (ইংরেজি) |
| ৯ | আলহাজ্ব মাওলানা এ এস এম হারুনুর রশীদ নূরী | সহকারী মৌলভী |
| ১০ | মাওলানা মুহাম্মদ হাসান শরীফ | সহকারী মৌলভী |
| ১১ | মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম | সহকারী মৌলভী |
| ১২ | মুহাম্মদ সারোয়ার হোসেন | সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) |
| ১৩ | জেবুন নাহার | সহকারী শিক্ষিকা (গণিত) |
| ১৪ | তাহমিনা আক্তার | সহকারী শিক্ষিকা (সমাজ বিজ্ঞান) |
| ১৫ | মুহাম্মদ আলা উদ্দীন | সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) |
| ১৬ | মুহাম্মদ নূরুল আমিন | সহকারী মৌলভী |
| ১৭ | মাওলানা মুহাম্মদ রহিম উদ্দীন | ইবতেদায়ী প্রধান |
| ১৮ | রিনা আক্তার | ইবতেদায়ী শিক্ষিকা |
| ১৯ | মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন ইউসুফ | ইবতেদায়ী শিক্ষক |
| ২০ | ক্বারী মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা | ইবতেদায়ী ক্বারী |
| ২১ | হাফিয মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ | শিক্ষক (হিফযুল কুর'আন) |
| ২২ | জুবাইদা আক্তার | শিক্ষিকা (নার্সারী শাখা) |
| ২৩ | নাহিদ জাহান | শিক্ষিকা (নার্সারী শাখা) |
| ২৪ | মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন | অফিস সহ. কম্পিউটার অপারেটর |
| ২৫ | মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন | হিসাব রক্ষক কম্পিউটার অপারেটর |
| ২৬ | মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন | এম.এল.এস.এস |

৫৭৩. প্রাগুক্ত

| | | |
|---|---|---|
| ২৭ | মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন | এম.এল.এস.এস |
| ২৮ | মুহাম্মদ নূরুন্নবী রুয়েল | ড্রাইভার |
| ২৯ | মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ | নৈশ প্রহরী |
| ৩০ | মুহাম্মদ শামসুল আলম | বাবুর্চি |

### মাদ্‌রাসা ভবন

ত্রিতল বিশিষ্ট ২টি ভবন, এর ১টির মধ্যে প্রশাসনিক ভবন, খানকাহ্ ও শ্রেণীকক্ষ, অপরটি ৬ কক্ষ বিশিষ্ট ত্রিতল ভবনের মধ্যে হিফযখানা ও আবাসিক ভবন। আর ২টি ১ তলা বিশিষ্ট ফ্যাসিলিটিজ ভবন রয়েছে এ গুলোর মধ্যে শ্রেণীর পাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাদ্‌রাসার সামনে একটি খেলার মাঠ রয়েছে।[৫৭৪]

### বোর্ড পরীক্ষার সফলতা

মাদ্‌রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেক বছর ইবতেদায়ী সমাপনী, জেডিসি, দাখিল, আলিম কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জন করে আসছে। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে ২ জন জেডিসি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল বৃত্তি লাভ করে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে ১ জন জেডিসি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল বৃত্তি লাভ করে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে ৫ম শ্রেণীতে ২ জন ট্যালেন্টপুল বৃত্তি লাভ করে।[৫৭৫]

### লিল্লাহ বোর্ডিং ও এতীমখানা

ঐক্য, শৃঙ্খলা, আক্বীদাহ্ ও সুশিক্ষা শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতায় মৈত্রীর বন্ধনে মনোরম পরিবেশে ১ জন হোস্টেল সুপার ও ২ জন অভিজ্ঞ আবাসিক শিক্ষকের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে হিফযখানাসহ প্রায় একশ ছাত্র ছাত্রাবাসে অবস্থান করে দু'বেলা খাবারসহ আবাসিক শিক্ষকের নিকট থেকে সকাল-বিকাল পাঠ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছে। ছাত্রদের মধ্যে যারা গরীব অসহায় এতীম মেধাবী ছাত্রদের জন্য এতীমখানায় ভর্তি করে ফ্রী থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ।[৫৭৬]

### হিফযুল কুর'আন বিভাগ

পবিত্র কুরআনুল কারীম হিফয্ করার জন্য মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ আলাদা হিফ্যুল কুরআন বিভাগ চালু করেছেন। দক্ষ হাফিযে কুরআন তৈরীর লক্ষ্যে দু'জন অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে হিফ্যুল কুরআন বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ৪০ জন শিক্ষার্থী কুরআন মাজীদ হিফ্যরত।[৫৭৭]

---

৫৭৪. গবেষকের সরেজমিন জরিপ, মাদ্‌রাসা-এ-মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

৫৭৫. অফিস রেকর্ড,

৫৭৬. সাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রিযভী, অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

৫৭৭.আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহ্ আলম চৌধুরী, সভাপতি, মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ, মাদ্‌রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

**খেলাধূলা ও সংস্কৃতি চর্চা**

প্রতি বৃহস্পতিবার ৩য় ঘন্টা পর আধুনিক যুগোপযোগী জটিল কঠিন বিষয়াদি ও আক্বায়িদের মৌলিক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য । সাপ্তাহিক জলসা, বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ প্রত্যেক জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় দিবসে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধূলা, রচনা প্রতিযোগিতা ও আলোচনা আয়োজন করা হয়।[৫৭৮]

**লাইব্রেরী**

মাদ্‌রাসায় বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ, প্রভৃতি ভাষায় লিখিত বিষয়ভিত্তিক প্রায় ছয় শতে'র কাছাকাছি বই রয়েছে। কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ৮টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ একটি ল্যাব রয়েছে। একজন দক্ষ ও অভিক্ষ কম্পিউটার শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার শেখানো হয়।[৫৭৯]

**পরীক্ষা পদ্ধতি**

সরকারী কারিকুলাম অনুযায়ী অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষা ছাড়াও ক্লাস টেস্ট, মডেল টেস্ট, টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেওয়া হয়। ইবতেদায়ী সমাপনী, জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।

**ইউনিফর্ম, ব্যাজ ও পরিচয়পত্র**

এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ইউনিফর্ম বাধ্যতামূলক। ছাত্রদের জন্য সাদা পায়জামা, সাদা পাঞ্জাবী, সাদা টুপি, সাদা জুতো ও সাদা মোজা। ছাত্রীদের জন্য সাদা ফ্রক/কামিজ, সাদা সেলোয়ার, সাদা ওড়না, সাদা জুতো, সাদা মোজা ও কালো বোরকা। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত ব্যাজ ও পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা ও কার্য দিবসে সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক।[৫৮০]

**ডায়েরী**

ডায়েরী এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক কর্মসূচীর নির্দেশনা। এতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিয়মাবলীর বিবরণ রয়েছে। এ ডায়েরী শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগসূত্র রচনার উৎকৃষ্ট মাধ্যম। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ডায়েরী সংগ্রহ এবং দৈনিক লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক।

**খতমে গাউসিয়া ও গেয়ারভী শরীফ উদ্‌যাপন**

হুযূর ক্বিবলাহ্ (মু.যি.আ.)'র অনুমোদনক্রমে মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় খানকাহ্ শরীফে ধর্মীয় গুরুত্ব সহকারে ত্বারীক্বাতের মাহ্‌ফিল প্রতি বৃহস্পতিবার বাদে ফজর খতমে গাউসিয়া শরীফ এবং প্রতি চাঁদের এগার তারিখ গেয়ারভী শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। মাহ্‌ফিলে মাদ্‌রাসার আবাসিক শিক্ষক ও ছাত্রদের উপস্থিতিতে পীর ভাই-বোন মাদ্‌রাসার শুভানুধ্যায়ীসহ ধর্মপ্রাণ

---

৫৭৮. গবেষকের সরেজমিন জরিপ

৫৭৯. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

৫৮০. প্রাগুক্ত

মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য আল্লাহ্‌র  দরবারে হযরাতের কেরামের উসীলা নিয়ে মুনাজাত করা হয়।[৫৮১]

## ৫.২.৫ তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা

রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত বিখ্যাত কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লি. এর ১নং গেইট সংলগ্ন মনোমুগ্ধকর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবস্থিত এ মাদরাসা। উপমহাদেশের প্রখ্যাত অলিয়ে কামিল, আওলাদে রাসূল (স.) হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) নির্দেশে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা কাপ্তাই ।[৫৮২] এতদঞ্চলে ইসলামের মূলধারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ভিত্তিতে এবং আধ্যাত্মিকতার রৌশনি বিতরণ পূর্বক ইসলামের বিশাল দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এই মাদরাসা। কেপিএম এর তৎকালীন এম.ডি এ.ই.এম ইসহাক হুযূরের ভক্ত-অনুরক্তদেরকে নিয়ে এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

**বর্তমান পৃষ্ঠপোষক**

বর্তমান পীর সাহেব হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্‌ (মু.যি.আ.)'র পৃষ্ঠপোষকতা, আঞ্জুমান ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সহযোগিতা, কেপিএম ও স্থানীয় ভক্তদের নিঃস্বার্থ বদান্যতায় প্রতিষ্ঠানটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটি ০১-০১-২০০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের স্বীকৃতি অর্জন করে।[৫৮৩] বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি মাওলানা মুহাম্মদ জাফরুল আলম নিজামীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

ইবতেদায়ী প্রথম থেকে দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ১৩ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকার অধ্যাপনায় অধ্যয়নরত।[৫৮৪] মাদ্‌রাসাটি কাপ্তাই উপজেলা থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এতে ৫টি পাকা এবং ৪টি সেমিপাকা ভবন রয়েছে। বিশুদ্ধ ও সুপেয় পানি, গ্যাস, স্যানিটেশনসহ সকল সুবিধাদির মাধ্যম পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠান বিগত শিক্ষাবর্ষগুলোতে প্রশংসনীয় ফলাফলের মাধ্যমে জেলার অনন্য কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

**শিক্ষক-কর্মচারী**[৫৮৫]

| ক্রমিক | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ০১ | মোহাম্মদ জাফরুল আলম নিজামী | সুপারিনটেনডেন্ট |
| ০২ | মাওলানা মোহাম্মদ আবু তৈয়্যব | সহকারী মাওলানা |
| ০৩ | মোহাম্মদ রেজাউল করিম | সিনিয়র শিক্ষক (গণিত) |
| ০৪ | মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন | সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজি) |

৫৮১. আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোবারক হোসেন, *মাদ্‌রাসা-এ-মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম) প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বৈশিষ্ট্য,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৫৮২. অফিস রেকর্ড,  তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

৫৮৩. প্রাগুক্ত

৫৮৪. সাক্ষাৎকার: মোহাম্মদ জাফরুল আলম নিজামী, সুপার, তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা ।

৫৮৫. অফিস রেকর্ড, তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

| | | |
|---|---|---|
| ০৫ | মোহাম্মদ আসলাম হোসেন | সিনিয়র শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) |
| ০৬ | মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক (কৃষি) |
| ০৭ | মাওলানা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম | ইবতেদায়ী প্রধান |
| ০৮ | মোহাম্মদ বেলাল হোসেন | জুনিয়র শিক্ষক |
| ০৯ | মাওলানা ক্বারী আনোয়ার হোসেন | ক্বারী |
| ১০ | মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম | জুনিয়র শিক্ষক |

**মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ**[৫৮৬]

| ক্রমিক | নাম | পদ |
|---|---|---|
| ০১ | জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল | সভাপতি |
| ০২ | জনাব মোহাম্মদ জাফরুল আলম নিজামী | সদস্য সচিব |
| ০৩ | জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ শহীদুল আলম | সদস্য |
| ০৪ | জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ | সদস্য |
| ০৫ | জনাব মাফুজা বেগম | সদস্য |
| ০৬ | জনাব মুহাম্মদ রেজাউল করিম | সদস্য |
| ০৭ | জনাব মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন | সদস্য |

## ৫.২.৬ মির্জা হোসাইন তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম

রাহ্‌নুমায়ে শরী'আত ও ত্বরীক্বত গাউসে যামান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ৮০ দশকে রাংগুনিয়া উপজেলাধীন হোসনাবাদ ইউনিয়নে এক মাহ্‌ফিলে যাওয়ার পথিমধ্যে ঐতিহাসিক মোগল দিঘী বরাবর পৌঁছুলে গাড়ী থামিয়ে সফর রতদের নিয়ে যিয়ারত করেন এবং বলেন 'ইহা এক বড়া অলী আরাম ফরমা রাহে হেঁ' এরপর মাহ্‌ফিলের উদ্যোক্তা আল্লামা সিরিকোটি (রহ.)'র মুরীদ মাওলানা ফয়েজ আহমদ হোসনাবাদী সেখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আক্বীদাহ্ ও সিল্‌সিলায়ে আলিয়া ক্বাদিরিয়ার আদর্শ বিকাশের লক্ষ্যে একটি দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেন এবং উত্তর রাংগুনিয়ার মুরীদান, ভক্ত-অনুরক্তদের সংগঠিত করে সিল্‌সিলার কার্যক্রম প্রসারিত করার লক্ষ্যে খিলমোগল তাজ মুহাম্মদ পাড়ায় একটি খানকাহ্ শরীফ স্থাপন করেন।[৫৮৭] খান্‌ক্বাহ্‌টি মাওলানা ফয়েজ আহমদ হোসনাবাদী (রহ.)-এর নেতৃত্বে স্থাপিত হয়। সাবেক ইউ পি চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম চৌধুরী, হাজী আবুল কাসেম সওদাগর, হাজী ইউনুস তালুকদার, হাজী বদিউল আলম চৌধুরী, মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন (র), মাওলানা আ.র.ম. মোজাম্মেল হক,মুহাম্মদ মুজিবুদ্দৌলাহ্ সওদাগর প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতা ছিল। খান্‌ক্বাহ্ শরীফ স্থাপনের মধ্য দিয়ে মোগলদিঘী এলাকায় মাদ্‌রাসা স্থাপন প্রক্রিয়া জোরদার হতে থাকে। উদ্যোক্তাদের অনেকে ইন্তিকাল করলেও এক পর্যায়ে ঐতিহ্যবাহী মোগলবাড়ীর মির্জা জামশেদ, মির্জা ওমরা মিয়া, ইউ,পি চেয়ারম্যান মির্জা নাজিম উদ্দীন খোকন পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে মাদ্‌রাসা স্থাপনের প্রয়োজনীয় জমি দান করেন।

---

৫৮৬. প্রাগুক্ত

৫৮৭. অফিস রেকর্ড, মির্জা হোসাইন তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তর রাংগুনিয়ার সর্বস্তরের মুরীদানরা ২০১০ খ্রিস্টাব্দে 'তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মির্জা হোসাইনিয়া সুন্নিয়া' মাদ্‌রাসা নামকরণ করেন হুযূর আল্লামা শাহ্ সূফী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) দ্বারা ভিত্তি দেন। বর্তমানে ৩৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠদানে নিয়োজিত আছেন।[৫৮৮]

**শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ**[৫৮৯]

| ক্রমিক | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ১ | মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া | সুপারিনটেনডেন্ট |
| ২ | মাওলানা নূরুল আবছার | সহ-সুপার |
| ৩ | মাওলানা আনোয়ার হোসাইন | সহকারী মৌলভী |
| ৪ | আহমদ ছাফা | সহকারী শিক্ষক |
| ৫ | মুহাম্মদ ইছহাক | সহকারী শিক্ষক |
| ৬ | মাওলানা আবদুর রহিম | সহকারী মৌলভী |
| ৭ | মাওলানা আবদুল মাবুদ | ইবতেদায়ী প্রধান |
| ৮ | মাওলানা মোহসেন | ইবতেদায়ী শিক্ষক |
| ৯ | ইয়াছমিন আকতার | ইবতেদায়ী শিক্ষিকা |
| ১০ | তাইফা সুলতানা | ইবতেদায়ী শিক্ষিকা |
| ১১ | মালেকা নাসরিন | জুনিয়র শিক্ষিকা |
| ১২ | ইয়াসমিন মির্জা | জুনিয়র শিক্ষিকা |
| ১৩ | নজরুল ইসলাম | অফিস সহকারী |
| ১৪ | হাফিয সেকান্দর | হিফযখানা শিক্ষক |

## ৫.৩ ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে বহু মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এমন কি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নে কখনো স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে আবার কখনো চিঠি-পত্রের মাধ্যমে  খোজ খবর রাখতেন। তাঁর বলিষ্ট পৃষ্টপোষকতার কারণে যে সমস্ত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে তম্মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল :

### ৫.৩.১ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

এশিয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া বেসরকারী ভাবে দরসে নিযামী'র আদলে পরিচালিত হয়ে আসছিল। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী ও খলিফা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ

৫৮৮. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত
৫৮৯. অফিস রেকর্ড, প্রাগুক্ত

তত্ত্বাবধানে আসার পর এক বছরের মধ্যে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ফাযিল স্তরের সরকারী অনুমোদন লাভ করে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক কামিল হাদীস, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে কামিল ফিক্হ বিভাগের সরকারী অনুমোদন পায়। বর্তমানে কামিল তাফসীরসহ তিনটি বিভাগের সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে। পাশাপাশি ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিষয়ে (আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ও আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ) দুই বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স এর অনুমোদন লাভ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি উপমহাদেশে অনন্য দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর এ প্রতিষ্ঠান থেকে কুরআন-হাদীস, ফিক্হ ও আক্বায়িদ সহ ধর্মীয় অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে অসংখ্য বিজ্ঞ আলিম বের হচ্ছে।

**প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট**

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে দৈনিক আজাদী চট্টগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার'র অনুরোধে হযরত আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) চট্টগ্রামে আগমণ করেন। তখন থেকে তিনি এতদ্ অঞ্চলের মুসলিম জনতাকে কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার নিমিত্তে দ্বীনি দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[৫৯০] তাঁর একনিষ্ঠ দ্বীনি দাওয়াতের প্রভাবে চট্টগ্রামের মুসলিম জনতা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ ও মত গ্রহণ করতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা এজহার সাহেবের উদ্যোগে হুযূর আল্লামা সিরিকোটি (রহ.)'র একটি ওয়াজ মাহফিলের প্রোগ্রাম নির্ধারিত হয় চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার শেখেরখিল এলাকায়।[৫৯১] বাঁশখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অগণিত লোকের সমাবেশ ঘটলে যথারীতি মাহফিল শুরু হয়। মাহফিলের শুরুতে তিনি কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন- ان الله وملا ئكته يصلون علي النبيّ يايها الّذين امنوا صلّوا عليه وسلموا تسلميا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ফেরেস্তারা নবীর উপর দুরূদ পাঠ করছেন, হে মুমিনরা! তোমরাও তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ কর।[৫৯২] এ আয়াত শ্রবণের পরও কেউ নবীজীর উপর উপর দুরূদ শরীফ পড়ল না, সবাই নিরব-নিস্তব্ধ। নিয়মতান্ত্রিকভাবে ও বিশুদ্ধরূপে দুরূদ শরীফ তারা পড়তে পারল না। আল্লামা সিরিকোটি শাহ্ (রহ.) এ ঘটনায় মর্মাহত হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এমনকি তিনি সে রাতে এবং পরদিন কোন পানাহার পর্যন্ত করেননি।[৫৯৩] এমন মর্মাহত হওয়ার কথাও। কেননা, আল্লাহ্র প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর দুরূদ পাঠ করা তাঁর প্রেম ও ভালবাসার বহি:প্রকাশ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভালবাসা থাকা ঈমানের মূল এবং পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। নবীজী ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য লোকের চেয়ে প্রিয় না হব।[৫৯৪] যার অন্তরে আল্লাহ-রাসুলের

---

৫৯০. প্রাগুক্ত

৫৯১. শাজরা শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৫৯২. আল কুরআন, ৩৩ : ৫৬

৫৯৩. ***শাজরা শরীফ***, চট্টগ্রাম: সিলসিলা-ই কাদিরিয়া আলিয়া, আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ২০০২ খ্রি., পৃ. ১০

৫৯৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, ***সহীহ বুখারী***, বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনায়: মাওলানা এম.এন.এম 'ইমাদুল্লাহ ও মাওলানা এ.কে.এম ফযলুর রহমান মুনশী, (ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৫৪

ভালবাসা ও তাঁর আদর্শের চর্চা নেই, হাজারো দাবি করলে কিংবা রাতদিন আমল করলেও তার এ ঈমানের বিন্দুমাত্র দাম নেই। তাঁর মুহব্বত ঈমানের মূল চালিকাশক্তি।

### মাদ্‌রাসার স্থান নির্ণয় পক্রিয়া

আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিকিরোটি (রহ.) ভাবলেন, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রেম-ভালবাসা যাদের অন্তরে নেই সে অন্তর নির্জীব ও নিস্প্রাণ। তিনি চিন্তা করলেন, তাঁদেরকে রাসূল আদর্শে উজ্জীবিত করতে হবে। বাংলার ঘরে ঘরে দুরূদ-সালামের গুরুত্ব ও আমল পৌঁছাতে হবে। তিনি আরো ভাবলেন, এদেশের মুসলিম জনতাকে কুর'আন-হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ ও মতে আহ্বানের বিকল্প নেই। ইসলামের মূলধারা সুন্নী মতাদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। অত:পর তাঁর মুরীদদেরকে দ্বীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ের হুকুম দেন, এমন স্থান নির্ণয় কর যা শহরও হবে না গ্রামও হবে না। যেখানে পুকুর থাকবে এবং মসজিদও থাকবে।[৫৯৫]

পীরের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা স্থান নির্ধারণে তৎপর হয়ে উঠলেন। অনেক খোঁজখবর ও অনুসন্ধানের পর তাঁর বিশিষ্ট মুরীদ ও আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্মকর্তা মরহুম আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম সওদাগর (বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন'র পিতা) তাঁকে নিয়ে বর্তমান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা সংলগ্ন দায়েম নাযির জামে মসজিদের নিকট আসেন। সিরিকোটি শাহ্ (রহ.) জায়গাটি দেখা মাত্রই মুচকি হাসি দিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বললেন, "হ্যাঁ এহি হে, ইসসে ইলমকি খুশবো আ-রেহিহে" অর্থাৎ, 'এটিই, এখান থেকে জ্ঞানের সুঘ্রাণ আসছে'। হুযূরের অভিব্যক্তি দেখে উপস্থিত মুরীদরা বুঝতে পারলেন, এ জায়গটিই তাঁর পছন্দ হল। এখানেই মাদ্‌রাসার ভিত্তি দিতে হবে। তাঁর পরম স্বপ্ন বাস্তবায়ন হল। [৫৯৬]

### মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন

তাঁরই পবিত্র হাতে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপিত হল। [৫৯৭] বার আউলিয়ার পূণ্যভূমিতে আহল-ই সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ধারক-বাহক ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন। এ জামেয়া আহল-ই সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হল। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ভাষায় এটি কিশতীয়ে নূহ।[৫৯৮]

---

৫৯৫. ***শাজরা শরীফ***, সিলসিলা-এ-কাদেরিয়া আলিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৫৯৬. প্রাগুক্ত

৫৯৭. আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (র.)-এ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপনের সময় হুযূরের ভক্ত-অনুরক্ত নাযিরপাড়া এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। নির্মাণ কাজে ইট, বালি ও সরঞ্জমাদি যোগানে সহযোগিতা করেন 'মুহাম্মদ মুন্সি মিয়া (নাযির পাড়া), আব্দুল মজীদ সওদাগর (নাযির পাড়া), নূরুল ইসলাম সওদাগর (বর্তমান আনজুমান সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের পিতা) ও কালামিয়া সওদাগর (নাযির পাড়া) প্রমুখ। আর ভিত্তি স্থাপনকালীন ইপস্থিত ছিলেন, আব্দুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার, নূর আহমদ সওদাগর আল-কাদেরী, ওয়াযির আলী সওদাগর আল্-কাদিরী, আমিনুর রহমান আল কাদিরী প্রমুখ। (মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, পৃ. ৬৭)

৫৯৮. কিশ্তী-ই নূহ্ (আ.) : হযরত নূহ (আ.) পৃথিবীতে প্রেরিত সর্বপ্রথম রাসূল। যিনি সাড়ে নয়শ বছর তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচারে কাজ করেছিলেন। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক লোক ঈমান এনেছিলেন। গোত্রপতিরা তাঁকে দৈহিক ও মানসিক সব ধরনের নির্যাতন চালিয়েছিল। এমনকি সাধারণ জনগণ

জায়গাটির মালিক ছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট দানবীর জনাব কামাল উদ্দীন চৌধুরীর পিতা মরহুম হযরত উদ্দিন চৌধুরী।

### মাদ্‌রাসার ভৌত অবকাঠামো

বাংলাদেশের বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রাম শহরের পাঁচলাইশ থানাধীন পশ্চিম ষোলশহরের নাযিরপাড়া মৌজায় সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ রোডস্থ প্রাকৃতিক নৈসর্গিক পরিবেশে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার অবস্থান। মাদ্‌রাসার পশ্চিম (রহ.) চট্টগ্রাম-দোহাজারী রেল লাইন পর্যন্ত বিশাল খোলা মাঠ (১২০০ শতাংশ), উত্তর (রহ.) বড় পুকুর (০.৬৮০০ শতাংশ), উত্তর (রহ.) দায়িম নাযির পাড়া জামে মসজিদ এবং পূর্ব-উত্তরে আধ্যত্মিক কেন্দ্র খানকাহ্-ই কাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া (আলমগীর খনকাহ্ শরীফ)। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার মূল একাডেমিক ভবন ৪৫০০ বর্গফুটে নির্মিত শৈল্পিক সৌন্দর্যের অনন্য প্রতীক। ভবনটির দ্বিতল প্রশাসনিক অফিস (অধ্যক্ষ অফিস, উপাধ্যক্ষ অফিস, শিক্ষক মিলনায়তন, ক্যাশ বিভাগ, টাইপ প্রশিক্ষণ বিভাগ ও আইসিটি ল্যাব। নিচ তলা অডিটোরিয়াম কক্ষ এবং তিন, চার ও পাঁচ তলা শ্রেণিকক্ষ। আর ছয়তলা আধুনিক বিজ্ঞানাগার এবং আন্তর্জাতিক মানের বিশাল লাইব্রেরী। এ ভবনের পশ্চিম (রহ.) সংযুক্ত ছয়তলা বিশিষ্ট উন্নত মানের হিফ্য বিভাগ। দূরাগত ছাত্রদের আবাসন সুবিধার জন্য রয়েছে সবুজ গম্বুজ বিশিষ্ট ত্রিতল সাইজের আকর্ষণীয় আবাসিক হোস্টেল।[৫৯৯] আধুনিক কারুকার্য শৈল্পিক নির্মিত মাদ্‌রাসার প্রধান ফটকের সাথে সংযুক্ত রয়েছে পাঁচতলা বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দিত দ্বিতীয় একাডেমিক ভবন।

আজ যে মূল্যবান জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে জামেয়া ইলমে্ দ্বীনের উঁকি মারছে তা ছিল একটি ওয়াক্ফ সম্পত্তি। তাই ওয়াক্ফ কমিশনারের অনুমতি নিয়ে অন্যজন খরিদ করে এ জমির সাথে রদবদল করতে হয়। এ সময় পাঁচ কানি পরিমাণ জমি খরিদ করতে ব্যয় হয় ৫০০১/৯০ আনা। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার মূলভিত্তি অবকাঠামো ছিল ১৬৮ হাত লম্বা ত্রিতল দালানের উপর।

---

ওয়ারিসদের ওসিয়ত করে যেত, তারা যেন হযরত নূহ (আ.)-এর উপদেশ গ্রহণ করে না। কওমের এই চরম উদাসীনতা দেখে আল্লাহর কাছে তাদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, "হে আল্লাহ এ ভূখন্ডে নির্দিষ্ট কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে তুমি রেহাই অব্যাহতি দিওনা"। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করেছেন এবং তাঁকে একটি নৌকা তৈরী করতে নির্দেশ দিলেন। অত:পর নৌকা তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে তিনি পশু, প্রাণী, পাখি, পোকা-মাকড়ের এক এক জোড়া নিজের তিন সন্তান ও ৭২ জন মু'মিন লোক মোট ৮০ জন লোক এতে উঠালেন। পরবর্তীতে নৌকাতে যারা উঠেছিল তাঁর প্রাণে বেঁচে গেল। বাকিরা লাঞ্চলার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মহান অলী আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তায়্যিব শাহ (রহ.) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসাকে নূহ (আ.) এর কিস্তীর সাথে উপমা দিয়ে এর আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন এবং আপন আপন মুরিদ-ভক্তদেরকে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার ভালবাসা ধারণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ঐতিহ্যবাহী এ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ইসলামী নিদর্শন' রূপে মুসলিম জনতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্থান করে নিয়েছে। এ অলৌকিকত্ব বুকে ধারণ করে মুক্তির মাধ্যম মনে করে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসাকে কিশতী নূহ (আ.) অভিহিত করে বলেন, 'ইয়ে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা নূহ আলাহিস সালাম কিশতী হ্যায়'। (দ্র. মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, ***গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি***, প্রাগুক্ত পৃ. ৯)

৫৯৯. মাওলানা মুহাম্মদ সগীর ওসমানী, ***প্রসঙ্গ : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা***, *আবারাত: কামিল বিদায়ী স্মরণিকা'৯৫* পৃ. ১৬-১৭; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'ইউনিট প্রশ্নমালা' তথ্য অনুসারে জামি'আর অফিস রেকর্ড।

**মাদ্‌রাসার নামকরণ**

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপন ও নির্মাণ কাজ শুরু হয় 'মাদ্‌রাসা আহমদিয়া সুন্নিয়া' নামে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা মহান অলী হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) মাদ্‌রাসার ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে সামনে রেখে মাদ্‌রাসার সাথে 'জামেয়া' শব্দটি সংযোজন করেন। তাই মাদ্‌রাসা আহমদিয়া সুন্নিয়া পরিবর্তন করে 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' রাখা হয়।[৬০০] জানুয়ারী ১৯৫৬ খ্রি মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং নতুন নামেই ২১ মার্চ ১৯৫৬ খ্রি. মাদ্‌রাসার প্রথম বার্ষিক সভা (সালানা জলসা) অনুষ্ঠিত হয়।[৬০১]

**আ'লা হযরতের মসলকের উপর প্রতিষ্ঠিত**

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.)[৬০২] তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা, ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত

---

৬০০. মুহাম্মদ শায়েস্তা খান, আসলাফ-ই জামেয়া *সৈয়্যদুল আউলিয়া কুতুবুল ইরশাদ হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) প্রতিষ্ঠিত এশিয়ার অন্যতম দীনী শিক্ষানিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা*, পৃ. ২৬

৬০১. মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, *'আলা হযরতের চিন্তাধারা ও শাহেনশাহে সিরিকোট*, (চট্টগ্রাম : গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ), প্রাগুক্ত,পৃ. ১৫

৬০২. ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) : ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) প্রকাশ আ'লা হযরত এ সংখ্যাতাত্ত্বিক নাম (আবজাদী নাম) 'আল মুখতার'। ভারতের বেরলভী শরীফে (ইউপি) ১২৭০ হিজরী, ১০ শাওয়াল মোতাবেক ১৪ জুন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা নকী আলী খান (রহ.) (মৃ. ১২৯৭/১৮৮০ খ্রি.) ছিলেন তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সূফীসাধক। আর পিতামহ মাওলানা আহমদ রেযা আলী খান (রহ.) (মৃত ১২৮২-১৮৬৬) ভারতের বিখ্যাত ইসলামিক ব্যক্তিত্ব ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। পিতা তাঁকে আহমদ মি:া ডাকতেন। নবী প্রেমের অনন্য নমুনা স্বরূপ নামের পূর্বে আব্দুল মুস্তফা (প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনুগত) শব্দদ্বয় সংযোজন করেন। তাঁর পুরো নাম হল আব্দুল মুস্তফা আহমদ রেযা বিন নক্বী আলী বিন রেযা আলী খান। তিনি মাত্র ১৪ বছরের কম বয়সে (অর্থাৎ ১৩ বৎসর ১০ মাস ০৫ দিন) ইসলামী শিক্ষার প্রায় সকল বিষয়ে একাডেমিক জ্ঞানার্জন ও সনদ লাভ করেন। প্রতিভা, অনুসন্ধিৎসু চিন্তা ও গবেষণায় আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও রাসূলে পাক (সা.) এ ফুয়ূযাত লাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পঞ্চাশটিরও অধিক শাখায় গভীর পান্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। উপমহাদেশের ধর্মীয়-অঙ্গনে ইংরেজ শাসনের ছাত্রছায়ায় সঠিক ভাবে সুন্নিয়তের বিকাশ যখন নানাভাবে বাবাগ্রস্থ হয়েছিল; ঠিক এমনি সময়ে সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এ কলমযুদ্ধ শুরু হয়। তিনি লা-মাযহাবী, সালাফী, কাদিয়ানী ও শিয়াসহ সকল বিপদগামী যাত্রা থামিয়ে দেন এবং ইসলামের নামে তাদের সকল অপব্যাখ্যা খণ্ডন করে ইসলামের সঠিক রূপরেখাকে তুলে ধরেন। তিনি উঁচু মাপের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। গবেষণা কর্ম (মকামে ফিক্‌র) ও তথ্যকর্ম (মকামে যিক্‌র) উভয় গুণে গুণান্বিত অনন্য জ্ঞান তাপস। ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রহ.) ছিলেন জ্ঞানের বিশ্বকোষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পদচারণা ও ব্যুৎপত্তি তাঁকে উঁচু মানের ইসলামী স্বীকৃতি দেয়। অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মেধা প্রয়োগ করে শরী'আত ত্বারীক্বাত, মা'রিফাত ও দর্শনসহ প্রায় ৫৫টি বিষয়ে এক হাজারোধিক গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রিশ বছর বয়সে ৭৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৩২৩ হি. মুতাবিক ১৯০৫ খ্রি. তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা চার শতাধিকে উপনীত হয়। (মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার উদ্দিন, 'আলা হযরতের চিন্তাধারা ও শাহেন শাহে সিরিকোট, প্রকাশনায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, পৃ. ১৫, 'আলা হযরত ডট কম প্রচারণায় জামা'আতে আহলে সুন্নাত, পাকিস্তান করাচী; সৈয়্যদ ওয়াজাহাতুর রাসূল ক্বাদিরী, পয়গাম-ই রেযা, স্মরণিকা আলা হযরত কনফারেন্স ২০০২, পৃ. ০৭; ফতওয়ায়ে রেযভিয়া, ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এ জীবনী অংশ; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, দীনের সফল সংস্কারক আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহ.) : আল মুখতার, আ'লা হযরত কনফারেন্স ২০০৮ খ্রি. স্মারক, পৃ. ১৯; মুহাম্মদ আবু তালেব বেলাল, স্মারক ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) এক বিস্ময়কর প্রতিভা, আ'লা হযরত

ওয়াল ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দেন। তাঁর সাহসী বক্তব্যের সামনে সম সাময়িক বাতিলপন্থিরা শোচনীয়ভাভে পরাজয় বরণ করেছিল। তাঁর সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় আলিম সমাজ স্বীকৃতি প্রদান করেন। আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.) বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামী শিক্ষার চর্চা ও বিকাশে দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তাতে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)'র মাসলক ও চিন্তাধারা প্রতিফলনে প্রয়াসী হন। তিনি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ভিত্তি স্থাপনের সময় বলেন-"ইয়ে জামেয়া মাসলাকে আ'লা হযরত (ইমাম আহমদ রেযা) পর বেনা ঢালা গিয়া হ্যায়"। এ মাদ্রাসাটি মাসলাকে (চিন্তাধারা) আহমদ রেযা (রহ.)'র উপর প্রতিষ্ঠা করা হল। [৬০৩]

## গভর্নিং বডি

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সংস্কার সফলতা ও সার্থকতা নির্ভর করে দক্ষ পরিচালনা পরিষদ বা গভর্নিং বডির উপর। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে জামেয়া পরিচালিত হয়ে আসছে সরকারী বিধি মোতাবেক গঠিত একটি শক্তিশালী পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে। যুগে যুগে গঠিত আত্মোৎসর্গী পরিচালনা পরিষদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সুনাম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ছাড়িয়ে পড়েছে গোটা ইসলামী বিশ্বে। সরকার অনুমোদিত একটি যোগ্য, দক্ষ, কর্মঠ ও আত্মনিবেদিত পরিচালনা পরিষদের সুন্নীপুণ ব্যবস্থায় জামেয়া পরিচালিত হচ্ছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার বর্তমান গভর্ণিং বডি

| ক্রম. | নাম | পদবি |
|---|---|---|
| ১ | প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম | সভাপতি (ট্রাস্ট কর্তৃক মনোনীত) |
| ২ | মাওলানা হাফেজ সোলাইমান আনছারী | সদস্য, সচিব |
| ৩ | আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন | সদস্য (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত) |
| ৪ | আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন | সদস্য (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত) |
| ৫ | জেলা শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম। | বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি (উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক মনোনীত) |
| ৬ | মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন চৌধুরী | বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি (মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত) |
| ৭ | আলহাজ্ব মুহাম্মদ সামশুদ্দিন | সদস্য (প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত) |
| ৮ | মাওলানা কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ | সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি) |
| ৯ | মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন | সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি) |
| ১০ | আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক | সদস্য ( অভিভাবক) |
| ১১ | আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ (সাবেক কমিশনার) | সদস্য ( অভিভাবক) |

---

কনফারেন্স-২০১২ খ্রি. পৃষ্ঠা. ১০। সময়ে (১৮৫২-১৮৫৭) হলেও তাঁর পবিত্র জীবন ইমাম আহমদ রেযা (র.)'এ চেয়ে ৪০ বছর বেশি।

৬০৩. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার *'আলা হযরতের চিন্তাধারা ও শাহেনশাহে সিরিকোট*, (চট্টগ্রাম : গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ), পৃ. ১৫

ইসলামী তাহ্যীব-তামুদ্দুনের ব্যাপক প্রচার প্রসারে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার যে ভিত্তি স্থাগিত হয়েছিল তার সদূর প্রসারী কর্মসূচী ও কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য একদল আত্মত্যাগী ও শিক্ষানুরাগী পরিচালনার গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে। তাঁদের পরিচিতি ও কার্যকাল নিম্নরূপ

**অধ্যক্ষবৃন্দ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ওকার উদ্দিন (রহ.) | এম.এম. | ১৯৫৪-১৯৬২ |
| ২ | মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম (রহ.) | এম.এম. | ১৯৬২-১৯৬৩ |
| ৩ | মাওলানা আবু তাহির মুহাম্মদ নাযির (রহ.) | এম.এম. | ১৯৬৩-১৯৬৪ |
| ৪ | মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (রহ.) | এম.এম | ১৯৬৪-১৯৬৬ |
| ৫ | মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিহ উদ্দীন,(র.) | এম.এম এম. এ. | ১৯৬৬-১৯৬৭ |
| ৬ | মাওলানা মুহাম্মদ নসরুল্লাহান | এম.এম | ১৯৬৭-১৯৬৯ |
| ৭ | মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিহ উদ্দীন (র.) | এম.এম এম. এ. | ১৯৬৯-১৯৭৭ |
| ৮ | হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলীল (র.) | এম.এম, এম.এ.বিসিএস | ১৯৭৭-১৯৭৭ |
| ৯ | মাওলানা মুহাম্মদ আকব্দুল গফুর (র.) | এম.এম | ১৯৭৮- |
| ১০ | মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ মুযাফ্ফর, (র.) | এম.এম, এম.এফ. | ১৯৭৮-১৯৭৯ |
| ১১ | মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল গফুর, | এম.এম | ১৯৭৯-১৯৮০ |
| ১২ | মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল-কাদিরী | এম.এম, এম.এফ | ১৯৮০-২০১৩ |
| ১৩ | মাওলানা মুহাম্মদ ছগীর উসমানী (ভারপ্রাপ্ত) | এম.এম | ২০১৩-২০১৬ |
| ১৪ | মাওলানা সোলাইমান আনছার (ভারপ্রাপ্ত) | এম.এম | ২০১৬- চলমান |

**শিক্ষকবৃন্দের তালিকা (স্কেলভুক্ত)**

| ক্রমিক | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ০১ | হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান আনছারী | অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) |
| ০২ | মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান | ফকীহ্ |
| ০৩ | মাওলানা কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ | ফকীহ্ |
| ০৪ | ড. মাওলানা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী | মুহাদ্দিস |
| ০৫ | মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ছালেকুর রহমান আলকাদেরী | মুফাস্সির |
| ০৬ | মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন | মুফাস্সির |
| ০৭ | হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী | সি. প্রভাষক (আরবী) |
| ০৮ | মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নুরুল আলম | প্রভাষক (আরবী) |
| ০৯ | মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম শাহ চৌধুরী | প্রভাষক (আরবী) |
| ১০ | জনাব শেখ মাঈনুল হক চৌধুরী | প্রভাষক (ইংরেজী) |
| ১১ | মাওলানা মীর মুহাম্মদ আলাউদ্দীন | প্রভাষক (আরবী) |
| ১২ | মাওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নূরুন্নবী | প্রভাষক (আরবী) |
| ১৩ | মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ | প্রভাষক (ই.ইতিহাস) |
| ১৪ | মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিম | প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) |

| | | |
|---|---|---|
| ১৫ | মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান | প্রভাষক (আরবি) |
| ১৬ | মাওলানা আবুল আছাদ মুহাম্মদ জুবাইর রজভী | সহকারী মাওলানা |
| ১৭ | জনাব মুহাম্মদ আবদুল আলীম | সহ.শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) |
| ১৮ | জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম | সহ. শিক্ষক (গণিত) |
| ১৯ | জনাব মুহাম্মদ আবু তাহের | সহ.শিক্ষক (সা.বিজ্ঞান) |
| ২০ | জনাব এস এম দিদারুল ইসলাম | সহ. শিক্ষক (বিজ্ঞান) |
| ২১ | জনাব মুহাম্মদ শাহ-ই-জাহান | সহ. শিক্ষক (কম্পি) |
| ২২ | জনাব মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার | সহ. ইবতেদায়ী প্রধান |
| ২৩ | ক্বারী মুহাম্মদ ইব্রাহীম | ক্বারী |
| ২৪ | আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফিরোজ উদ্দিন | জুনিয়র শিক্ষক |

**নন স্কেল শিক্ষকদের তালিকা**

| | | |
|---|---|---|
| ০১ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ছগীর ওসমানী | অতি. মুহাদ্দিস |
| ০২ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুল হক না'ঈমী | অতি. মুহাদ্দিস |
| ০৩ | মাওলানা সৈয়্যদ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন | অতি. মুহাদ্দিস |
| ০৪ | জনাব মুহাম্মদ আবুল কাশেম | সহ.অধ্যা (বাংলা) |
| ০৫ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদের | প্রভাষক, আরবি |
| ০৬ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক | প্রভাষক (আল্ কুরআন) |
| ০৭ | জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান | প্রভাষক (ইংরেজী) |
| ০৮ | জনাব মুহাম্মদ আবদুস সবুর | প্রভাষক (বাংলা) |
| ০৯ | জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হামেদ রেযা নঈমী | প্রভাষক (আল হাদীস) |
| ১০ | জনাব মাওলানা মুহাম্মদ রবিউল আলম | প্রভাষক (আল্ কুরআন) |
| ১১ | আলহাজ্ব মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ওসমান গণি | প্রভাষক, আরবী |
| ১২ | মাওলানা হাফেজ সৈয়্যদ মুহাম্মদ আজিজুর রহমান | প্রভাষক, আরবী |
| ১৩ | জনাব শেখ মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী | ইংরেজি, প্রভাষক |
| ১৪ | জনাব মুহাম্মদ আহসান হাবীব | ইংরেজি, প্রভাষক |
| ১৬ | আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদুল হক | সহকারী মাওলানা |
| ১৭ | মাওলানা হাফেজ ক্বারী মুহাম্মদ জালালুদ্দীন | সহকারী মাওলানা |
| ১৮ | মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন আল কাদেরী | সহকারী মাওলানা |
| ১৯ | জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন খালেদ | সহকারী মাওলানা |
| ২০ | জনাব মাওলানা মুহাম্মদ তারেকুল ইসলাম | সহকারী মাওলানা |
| ২১ | জনাব মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক | সহ.শিক্ষক (সামা.বিজ্ঞান) |
| ২২ | জনাব মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর রশিদ চৌধুরী | সহকারী মাওলানা |

| | | |
|---|---|---|
| ২৩ | জনাব মুহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম | সহ: শিক্ষক (বিজ্ঞান) |
| ২৪ | মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম | ক্বারী |
| ২৫ | জনাব মুহা্ম্মদ আছির আলী | লাইব্রেরীয়ান |
| ২৬ | জনাব মুহাম্মদ আশিকুজ্জামান | প্রদর্শক |
| ২৭ | জনাব মাওলানা মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন | আরবি প্রভাষক |
| ২৮ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুর রহমান ভূঁইয়া | জুনিয়র মৌলভী |
| ২৯ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল গফুর রিজভী | জুনিয়র মৌলভী |
| ৩০ | আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইউনুছ রজভী | জুনিয়র মৌলভী |
| ৩১ | মাওলানা মুহাম্মদ আতাউর রহমান নঈমী | জুনিয়র মৌলভী |
| ৩২ | জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরী | ইবতিদায়ী শিক্ষক |
| ৩৩ | জনাব এম এ কাশেম ফারুকী | ইবতেদায়ী শিক্ষক |
| ৩৪ | জনাব মুহাম্মদ আমজাদ হোসেন | জুনিয়র শিক্ষক |
| ৩৫ | জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ওমর ফারুক | জুনিয়র মৌলভী |
| ৩৬ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান | জুনিয়র মৌলভী |
| ৩৭ | আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবু কায়সার | জুনিয়র মৌলভী |
| ৩৮ | মাওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন | জুনিয়র শিক্ষক |

**আনুষ্ঠানিক পাঠদান, পাঠদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার স্তর**

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে এর প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদান শুরু হয়। ইবতেদায়ী ১ম হতে ফাযিল (স্নাতক) পর্যন্ত ক্লাসভিত্তিক একসাথে পাঠদান শুরু হয়।[৬০৪] জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠার কথা চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা চতুর্দিক থেকে জামেয়ায় ভর্তি হতে শুরু করে। দক্ষ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত ও বিজ্ঞ অধ্যক্ষ এবং যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদানের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাদ্‌রাসার সুনাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মানসম্মত লেখাপড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে দ্রুত সময়ে জামেয়া মাদ্‌রাসার পড়ালেখার মান ও উন্নয়ন দেখে তদানিন্তন ইস্ট পাকিস্তান মাদ্‌রাসা বোর্ড জামেয়াকে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে সরকারীভাবে ফাযিল মানের স্বীকৃতি ঘোষণা করে। দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ও উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। ধারাবাহিক উন্নয়ন সাধনের ফলে এ মাদ্‌রাসা ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে কামিল হাদীস-এ উন্নীত হয় এবং ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কামিল ফিক্‌হ অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে কামিল তাফসীর বিভাগ খোলার অনুমতি পায়।[৬০৫] সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে ৩১টি 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় অনার্স চালু করলে

৬০৪. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
৬০৫. প্রাগুক্ত

তখন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়। তখন ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক অনার্স পরীক্ষার কেন্দ্র স্থায়িত্ব হয়। [৬০৬]

### শিক্ষার স্তর

বর্তমানে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় ইসলামী শিক্ষার ছয়টি স্তর চালু আছে। ১. ইবতেদায়ী স্তর, ২. মাধ্যমিক স্তর, ৩. উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর, ৪. ফাযিল (স্নাতক) স্তর, ৫. ফাযিল (স্নাতক) সম্মান স্তর ও ৬। কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তর।[৬০৭]

### ইব্‌তেদায়ী স্তর

১ম হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ইবতেদায়ী তথা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর। ১ম শ্রেণি ৪র্থ শ্রেণি এক সেকশনে (শাখা বিহীন) নির্ধারিত ছাত্রসংখ্যার কোটাপূর্ণ করে নতুন বছরের জানুয়ারীর প্রথম তারিখ হতে শ্রেণির পাঠদান শুরু করা হয়। শিশুর মানসিকতা, যোগ্যতা ও চাহিদানুপাতে যোগ্য শ্রেণি শিক্ষক নির্ধারণ করা হয় এ স্তরের লেখাপড়া ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে খুবই স্পর্শকাতর বিবেচনা করা হয়। ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণিকে আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিশেষ মনোযোগে বিবেচনা করা হয়। সরকার ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে ৫ম শ্রেণির শিক্ষা সনদকে "প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী" সন নামকরণ করে। বর্তমানে মাদ্রাসা ও স্কুলের ৫ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা একই তারিখে অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ ক্লাসের লেখাপড়ার গুণগত মান বৃদ্ধি ও আশানুরূপ ফলাফলের জন্য ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে একে ডাবল সেকশন (দু'ভাগ)-এ উন্নীত করা হয়েছে। উভয় সেকশনে ক্লাসের পরিবেশ, ভারসাম্য ও গতিশীলতা আনয়নে যোগ্য দু'জন করে শ্রেণি শিক্ষক কর্মরত আছেন। এ দু'জন শ্রেণি শিক্ষক নতুন ভর্তির কার্যক্রম, রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণসহ সার্বিক দায়িত্ব দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেন।[৬০৮]

### মাধ্যমিক স্তর

দাখিল ৬ষ্ঠ হতে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসসমূহ মাধ্যমিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত। ২০02 খ্রি. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পড়ালেখার মান আরো উন্নয়ন ও গতিশীল করার লক্ষ্যে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়াকে দাখিল ৬ষ্ঠ থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ডাব্‌ল সেকশন খোলার অনুমোদন দিয়েছে। তাই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দাখিল ৬ষ্ঠ হতে দাখিল ১০ম পর্যন্ত ডাবল সেকশন চালু করেছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বমোট পাঁচ শ্রেণিতে ডবল সেকশনসহ সর্বমোট ১০ ক্লাসে যোগ্য, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান শ্রেণি শিক্ষকমণ্ডলী দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।[৬০৯]

অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণের ভিত্তিতে পূর্বের শাখা অনুযায়ী উপরের উত্তীর্ণ শ্রেণির অভিন্ন শাখায় পাঠ গ্রহণের সুযোগ পায়। নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা অফিস কর্তৃক শাখা নির্ধারিত হয়ে পাঠদান গ্রহণের অনুমতি পায়। অধ্যয়নরত কোন শিক্ষার্থীর স্বেচ্ছায় শাখা পরিবর্তন করার

---

৬০৬. প্রাগুক্ত

৬০৭. প্রাগুক্ত

৬০৮. প্রাগুক্ত

৬০৯. প্রাগুক্ত

সুযোগ নেই। তবে বিশেষ প্রয়োজনে শ্রেণি শিক্ষক ও যথাযথ অভিভাবকের মাধ্যমে অফিস অনুমোদনের ভিত্তিতে শাখা পরিবর্তনের সুযোগ।[৬১০]

**আলিম ক্লাস**

২০০২ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণির সাথে আলিম ও ফাযিল (স্নাতক) ক্লাসে সেকশন চালুর অনুমতি পায়। উভয় শাখার স্তরের সেকশনে জন্য যোগ্য শ্রেণি শিক্ষক রয়েছে। প্রতিটি শাখায় সাধারণত ১৫০ জন করে মোট ৩০০ শিক্ষার্থী শিক্ষার্জনের সুযোগ পায়।

উভয় শাখা শিক্ষার্থী জন্য শ্রেণী পাঠে পূর্ণ সাতঘন্টা উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। প্রতি শাখার শিক্ষার্থীদের পাঠদান বিষয়ভিত্তিক যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী রয়েছে। ক্লাসের শ্রেণী পাঠদানের শৃঙ্খলা, ভারসাম্য, গতিশীলতা ও ধারাবাহিকতার জন্য অফিস থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রমিকের ছাত্রকে মনিটরিং দয়িত্ব দেয়া হয়। শ্রেণীর ক্লাসের যে কোন সমস্যা, উদ্ভুত পরিস্থিতি, শিক্ষকমণ্ডলীর যথাসময় উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়সমূহের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে তাদের পালন করতে হয়। তাদের উপরই অর্জিত হয় অফিসের তদারকি, শিক্ষকদের পাঠদানে আন্তরিকতা ও শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোযোগিতা, এ তিনের সমন্বয়ে কার্যকরী ও অধ্যয়নমুখী ক্লাসে পরিণত হয়।[৬১১]

**ফাযিল ক্লাস**

মাদ্রাসায় ফাযিল ১ম বর্ষ (ক ও খ শাখা), ফাযিল ২য় বর্ষ (ক ও খ শাখা) এবং ফাযিল ৩য় বর্ষ (ক শাখা ও খ) এ ৬ শাখায় নির্দিষ্ট কোটায় শিক্ষার্থীরা ইসলামী জ্ঞানার্জন করে আসছে। এ চার ক্লাসে  সিনিয়র আরবী প্রভাষক পর্যায়ের ৬ জন যোগ্য শ্রেণি শিক্ষক দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার মহান উদ্যোগ নিলে অক্টোবর ২০০৬ খ্রি. ফাযিলকে (স্নাতক) এবং কামিলকে (মাস্টার্স) বা স্নাতকোত্তর মান দিয়ে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষায় নতুন দিগন্তের সূচনা করে। সাধারণ শিক্ষা সমন্বয় করে ফাযিল (স্নাতক)-কে তিন বৎসরে উন্নীত করে। তখন থেকে ফাযিল ক্লাস ছয় শাখায় উন্নীত হয়। ফাযিল ৩ বছর, কামিল ২ বছর ও ফাযিল (সম্মান) দু'বিষয়ে (আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ও আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ) অনার্স চালু হওয়ায় ক্লাসের সংখ্যা বেড়ে যায়।  তাই ২০১০ খ্রি. থেকে ফাযিল ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষকে এক সেকশনে একীভূত করা হয়। তবে ফাযিল প্রথম বর্ষে ছাত্র সংখ্যাধিক্যের কারণে এ ক্লাসে শাখা বহাল রাখা হয়।[৬১২]

**ফাযিল (সম্মান) ক্লাস**

সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে দেশের প্রসিদ্ধ ৩২ 'আলিয়া মাদ্রাসায় মোট পাঁচ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করে। জামেয়া কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ এবং আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ নামে দু'বিষয়ে অনার্স খোলার অনুমতি পায়। এ স্তরের লিখা-পড়ার মানোন্নয়ন, সমৃদ্ধিশীল ও অগ্রগতির লক্ষ্যে এ্যাফিলিয়িটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,

৬১০. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৩ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম
৬১১. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম
৬১২. প্রাগুক্ত,

কুষ্টিয়া'র অধীনে কামিল ও ফাযিলের সাথে অনার্স কোর্স পরিচালনার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনার্স কোর্সকে চার বর্ষে ভাগ করে আট সেমিস্টারে বিয়াল্লিশ কোর্স বিন্যাস করে। ২০১৩ খ্রি. হতে উভয় বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ৮ম সেমিস্টারের ক্লাস চালু আছে।[৬১৩]

**কামিল ক্লাস (স্নাতকোত্তর)**

চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া একমাত্র কামিল মাদ্‌রাসা। যেটি কামিল স্তরে (স্নাতকোত্তর) এক সাথে হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ বিভাগে সুষ্ঠু পরিবেশে ধারাবাহিকভাবে ক্লাসের মাধ্যমে পাঠদান হয়। ১৯৭২ খ্রি. কামিল হাদীস ১৯৮৫ খ্রি. কামিল ফিক্‌হ এবং ১৯৯৭ খ্রি. কামিল তাফসীর পাঠদানের অনুমতি লাভ করে। এ তিন বিভাগে দু'বর্ষ করে ছয় বর্ষের জন্য ৬ জন বিষয়ভিত্তিক অধ্যাপক দক্ষতার সাথে পাঠদানে কর্মরত আছেন। তিন বিভাগের পাঠদানকে সুবিন্যস্ত ও অগ্রগতির লক্ষে জামেয়া কর্তৃপক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক বেতনে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ফক্বীহ নিয়োগ দান করে পড়ালেখার মান উন্নীতকরণের ব্যবস্থা করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক জারীকৃত পাঠ্যক্রম প্রজ্ঞাপন মতে সেমিস্টার ভিত্তিক নির্দিষ্ট সিলেবাস সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ প্রস্তুতির জন্য শিক্ষকমণ্ডলী কর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দৈনিক পত্রিকায় পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই শিক্ষকরা সম্ভাব্য প্রশ্ন ও প্রশ্নপত্র সাজেশান্স শিক্ষার্থীদের প্রদান করেন। ফলে তারা পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে আশানুরূপ ফলাফল লাভ করতে সামর্থ হয়।[৬১৪]

**পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস**

যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখার বস্তুনিষ্ঠ, অগ্রগতি ও উন্নতির পূর্বশর্ত, পরিকল্পিত, মানসম্মত ও গুণগত পাঠ্যক্রম। জামেয়া কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, পরিবেশিত ও প্রকাশিত পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস অনুসরণ করে। তবে সত্যিকার আলিম-ই দ্বীন তৈরী এবং ইসলামের মৌলিক জ্ঞান লাভের অভিপ্রায়ে সরকারী সিলেবাস (মাদ্‌রাসা বোর্ড ও ইবি)'র পাশাপাশি অতিরিক্ত মৌলিক বিষয়াদির কিতাবও সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরবী ব্যাকরণ (নাহু-সারফ্), উসূল, বালাগত, আক্বীদাহ্, আমল ও আদর্শ বিষয়ক অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস সংযোজন করা হয়।[৬১৫]

**শিক্ষার পরিবেশ**

সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত শান্ত পরিবেশ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার লেখা-পড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশের হরতাল-ধর্মঘটের সময়ও মাদ্‌রাসার ক্লাস যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের আন্তরিকতায় ইবতেদায়ী স্তর থেকে অনার্স এবং কামিল হাদীস, ফিক্বহ্ ও তাফসীর পর্যন্ত সমগ্র মাদ্‌রাসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।[৬১৬]

---

৬১৩. অফিস রেকর্ড, ইবি, কুষ্টিয়া এবং জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।
৬১৪. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন।
৬১৫. অফিস রেকর্ড, ইবি, কুষ্টিয়া এবং জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।
৬১৬. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

## ছাত্র ইউনিফর্ম

লেবাস পোশাক মানুষের সৌন্দর্য বর্ধক ও ভূষণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'আদম সন্তান! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এমনই এক পোশাক অবতরণ করেছি, যা দ্বারা তোমাদের লজ্জার স্থানগুলো গোপন করবে এবং এটি এমনও যে, তোমাদের শোভা হবে এবং তাক্ওয়ার পোশাক; সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহ্র নিদর্শনগুলোর অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৬১৭] এ আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, সতর ঢাকা পরিমাণ পোশাক পরা ফরয আর সৌন্দর্য্যের পোশাক পরা মুস্তাহাব।[৬১৮] তাই জামেয়া কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম নির্ধারণ করেন সাদা পায়জামা, সাদা পাঞ্জাবী ও সাদা টুপি। নির্ধারিত এ পোশাক প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র পছন্দনীয় পোশাকের অন্যতম। তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা তা হল পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয়।[৬১৯]

## অ্যাসেমব্লি

৮.১৫ মিনিটে সতর্ক ঘন্টা বাজার সাথে সাথে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মাঠে শৃংখল ও আদবের সাথে শিক্ষকমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। আর অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ্, মুফাস্সিরসহ মুদাররিসীনে কেরামের উপস্থিতিতে কুর'আন তিলাওয়াত ও ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এ রচিত না'ত-ই মোস্তাফা (সা.) "সাব্সে আলা ওয়ালা ওয়া হামারা নবী'র[৬২০] পরিবেশনায় অ্যাসেম্বিলী শুরু হয়। অত:পর অধ্যক্ষের মুনাজাতের মাধ্যমে অ্যাসেমব্লী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। প্রতিদিন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার বিশাল ময়দানে যখন শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা সাদা পোশাক পরিধান করে দাঁড়ায় তখন সত্যিই বেহেশ্তী পরিবেশ অনুভূত হয়।[৬২১] মুনাজাতের পর শিক্ষার্থীরা ক্লাসওয়ারী স্ব-স্ব ক্লাসে সুশৃঙ্খলভাবে প্রবেশ করে। শ্রেণি শিক্ষকমণ্ডলী উপাধ্যক্ষ এর মহোদয়ের কক্ষে শিক্ষক হাযিরা খাতায় স্বাক্ষর করে সংরক্ষিত স্থান থেকে ছাত্র হাযিরা সংগ্রহ করে আপন আপন ক্লাসে প্রবেশ করেন। শিক্ষক ছাত্রদের রোল কল করে ক্লাস ক্যাপ্টেনকে মার্কার কলম দিয়ে বোর্ডে উপস্থিত-অনুপস্থিত ছাত্রদের সংখ্যা লিখতে আদেশ করেন। এভাবে নির্দিষ্ট সময়ে (৪৫.০০ মি.) প্রথম ঘন্টা সমাপ্ত হয়।[৬২২]

## দৈনন্দিন পাঠদান

মর্নিং শিফ্টে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার পাঠদান ও শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়। শিক্ষকদের পাঠদান ও পাঠ গ্রহণের সমন্বয় এবং শ্রেণির কার্যক্রমকে উৎসব মুখর ও বেগবান করার প্রয়াসে জামেয়া কর্তৃপক্ষ এ শিফট চালু করেন। জামেয়া কর্তৃপক্ষের লেখাপড়ার মানোন্নয়নে

---

৬১৭. প্রাগুক্ত

৬১৮. আল কুরআন, ৫ : ২৬

৬১৯. মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), ***তাফসীর-ই নূরুল 'ইরফান***, অনূদিত খ. ১, পৃ. ৩৯৮

৬২০. আল্লাহ্র প্রিয় রাসূল (সা.)-এর শানে রচিত এক অনবদ্য আকর্ষণীয় প্রস্তুতিমূলক কবিতা। ৪৪ শ্লোক বিশিষ্ট এ কবিতায় ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও উচ্চাঙ্গের ভাষা এবং উন্নত রচনাশৈলী ব্যবহার করে প্রিয় রাসূল (সা.)-এর স্তুতি বর্ণনা করেন। এ কবিতায় উর্দূ সাহিত্যে ইমাম আহমদ রেযা খান (র.)-এর পরিপক্কতা ও দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। উপমহাদেশে তাঁর এ নামটি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে। (দ্র. ইমাম আহমদ রেযা, হাদায়িক-ই বখশিষ, পৃ. ১০৭)

৬২১. *পাঠ পরিকল্পনা ও সিলেবাস* : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম

৬২২. প্রাগুক্ত

পরিকল্পনাভিত্তিক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত অন্যতম। ১ম থেকে ৭ম ক্লাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একটানা ক্লাসের কার্যক্রম চলে, প্রতি ক্লাসের সময় বন্টন হয় ৪০ মিনিট। মাঝখানে বিরতি (ফাঁক) বিহীন সকাল ৮.৩০ টায় শুরু হয়ে ১.১৫ মিনিটে পাঠদান সমাপ্ত হয়। ক্লাসের ছাত্র উপস্থিতির ধারাবাহিকতা ও শ্রেণি কক্ষের ভারসাম্য রক্ষা করতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক যে কোন ঘন্টায় ক্লাসে নাম, রোল কল্ করতে পারেন। অনুপস্থিত ছাত্রদের শাস্তির বিধানও চালু আছে। ছাত্র অনুপস্থিতির প্রতি শিক্ষকদের কঠোরতা ও বিশেষ দৃষ্টির ফলে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার আদর্শিক লেখাপড়া এবং ঈর্ষান্বিত ফলাফল। বর্তমান ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান চলছে। এ পাঠদান ফলপ্রসু ও কার্যকর করার জন্য শিক্ষকরা হাতে কলমে শিক্ষা দেন, প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অধ্যক্ষের অনুমতিতে কোন শিক্ষক ছুটিতে থাকলে উপাধ্যক্ষ ছুটিতে থাকা শিক্ষকের ক্লাসগুলো উপস্থিত শিক্ষকদের বণ্টন করে দেন। অফিসের তদারকি, শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও ছাত্রদের মনোযোগিতা ইত্যাদিতে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে উঠে।[৬২৩]

সরকারের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রজ্ঞাপন মতে জুমা'বার ব্যতিত শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সাপ্তাহিক ৬ দিন শ্রেণী কার্যক্রম চলে। প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিদিন অ্যাসেম্বলীসহ ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। বিনা ছুটিতে কোন ছাত্র মাদ্‌রাসায় অনুপস্থিত থাকার অনুমতি নেই। তিন দিনের অধিক বিনা ছুটিতে মাদ্‌রাসায় অনুপস্থিত থাকলে যথাযথ অভিভাবক ব্যতিরেকে ক্লাসে প্রবেশের অনুমতি নেই। অধ্যক্ষের নিকট নির্দিষ্ট কারণ বর্ণনা করে শ্রেণি শিক্ষকের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সংশোধনের অঙ্গীকারের শর্তে সে পুনরায় ক্লাস করার অনুমতি লাভ করে।[৬২৪]

### ক্লাস টেস্ট ও মডেল টেস্ট

ষান্মাষিক এবং বার্ষিক পরীক্ষার ভাল রেজাল্টের জন্য শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় মনোযোগিতা ও অগ্রগতির জন্যে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ক্লাস টেস্ট নেয়া হয়। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, দাখিল ও আলিম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক ফাযিল স্নাতক (পাশ) ও ফাযিল (সম্মান) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পরীক্ষা নেয়ার পূর্বে এ সকল শিক্ষার্থীদের মডেল টেস্টে অংশ নিতে হয়। এ মডেল টেস্ট শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ভাল ফলাফল ও প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।[৬২৫]

### অতিরিক্ত ক্লাস

কেন্দ্রীয় ফলাফলসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে জামেয়া কর্তৃপক্ষ ইবতেদায়ী ৫ম থেকে কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত নির্দিষ্ট ক্লাস সময় ব্যতিত অতিরিক্ত সময়ে নিবিড় গুরুত্ব ও পর্যবেক্ষণ সহকারে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করেন।[৬২৬] ক্লাসের স্ব-স্ব শ্রেণি শিক্ষক অফিসের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করে কোচিং-এর প্রধান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের থেকে মাসিক

---

৬২৩. প্রাগুক্ত

৬২৪. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

৬২৫. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন

৬২৬. *পাঠ পরিকল্পনা ও সিলেবাস* : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা

সামান্য ফিস নিয়ে তা অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের নিকট বন্টন করা হয়। অতিরিক্ত ক্লাসে শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও ছাত্রদের মনোযোগিতায় কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল বয়ে আনে।[৬২৭]

**ভর্তির কার্যক্রম ও নিয়ম-পদ্ধতি**

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ইবতেদায়ী ১ম থেকে কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভর্তি হয়। ক্লাস ও স্তরভেদে ভর্তির কার্যক্রম ও কর্মকাণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট কতগুলো নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।[৬২৮] ইবতেদায়ী ১ম হতে দাখিল ৮ম ক্লাসসমূহের ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা নতুন বছরের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়।[৬২৯] ডিসেম্বর মাসে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার মাধ্যমে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করা, জমা দেয়ার তারিখ, ভর্তির সময় জানিয়ে দেয়া হয়। অফিস নোটিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকমণ্ডলী ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে নির্দিষ্ট তারিখে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করে অফিসে জমা দেন। শ্রেণি শিক্ষক তা পরিমার্জিত করে উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট জমা করেন। উপাধ্যক্ষ ভর্তি পরীক্ষা উপ কমিটির কাছে পৌঁছান। কমিটি প্রশ্নপত্র সংশোধন ও কম্পোজকরণসহ ভর্তি পরীক্ষার সব কর্মকাণ্ড অফিসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।[৬৩০] ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীরা ভর্তি ফরম জমা দেয়ার সময় অফিস কর্তৃক প্রবেশ পত্র গ্রহণ করে। প্রবেশ পত্রে ভর্তির তারিখ, সময় ও প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন উল্লেখ থাকে। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অফিস থেকে ঘোষিত নির্দিষ্ট তারিখে যথাযথ অভিভাবকের স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন পূর্বক ভর্তির সুযোগ পায়।[৬৩১] উপাধ্যক্ষ শিক্ষার্থীর আখলাক, মনোযোগ ও স্বভাব চরিত্র ইত্যাদি বিবেচনা করে অধ্যক্ষ'র নিকট সুপারিশ করেন। অধ্যক্ষের অনুমোদনের পর ক্যাশ বিভাগে নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা দিয়ে নির্দিষ্ট রিসিভ কপি শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা করে শ্রেণি শিক্ষক তার নাম হাযিরা খাতায় রেজিস্ট্রি করেন। এরপর সে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার ছাত্রের মর্যাদা অর্জন করে।[৬৩২] আলিম ক্লাসে ভর্তির জন্য কতিপয় শর্তাদি জুড়ে দেয়া হয়। বোর্ড কর্তৃক দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরই জামিয়া অফিস থেকে আলিম ১ম বর্ষে "ছাত্র ভর্তি" শিরোনামে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় তারিখ ঘোষণা করা হয়। দাখিল পরীক্ষায় অর্জিত পয়েন্ট এর ভিত্তিতে ভর্তি ফরম দেয়া হয়।

দাখিল ক্লাসসমূহের ন্যায় আলিম প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রেও পরীক্ষা পদ্ধতি চালু ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল হওয়ায় অর্জিত পয়েন্ট ও গ্রেট ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কোটায় ছাত্র সংখ্যা নির্বাচন করা হয়। ভর্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার পর্বে অংশগ্রহণ করে। এতে মেধা ও চারিত্রিক আচারণ বিবেচনা করে যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ণয় করা

---

৬২৭. ইবতেদায়ী ৫ম, দাখিল ৮ম (জেডিসি), দাখিল ১০ম ও আলিম ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীদের এ বিশেষ কোচিং-এর আওতায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি করে তোলা হয়। (গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন)

৬২৮. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন

৬২৯. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম

৬৩০. প্রাগুক্ত

৬৩১. ইবতেদায়ী ১ম থেকে দাখিল নবম শ্রেণি পর্যন্ত শুধু লিখিত ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তাদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয় না। ভর্তি পরীক্ষায় মোট নম্বর থাকে ১০০। আরবী ও সাধারণ উভয় বিভাগে ৫০ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়

৬৩২. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন

হয়। মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অফিস থেকে প্রচারিত নির্দিষ্ট তারিখে যথাযথ অভিভাবক (শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা) নিয়ে অফিসে যোগাযোগ করে ও উপাধ্যক্ষ এর যৌথ স্বাক্ষরিত ভর্তি ফরমটি ক্যাশ বিভাগে জমা করতে হয়। ক্যাশ বিভাগে দায়িত্বরত অফিস সহকারী ফরমে উল্লেখিত টাকা গ্রহণ করে  রশিদ প্রদান করেন। অফিস প্রদত্ত রিসিটের ভিত্তিতে শ্রেণি শিক্ষক ভর্তি হওয়া ছাত্রের নাম হাযিরা খাতায় রেকর্ড করেন।[৬৩৩] সাধারণত: দাখিল পরীক্ষায় সর্বনিম্ন ৩.৫০ পয়েন্ট থাকলে ভর্তি ফরম নেয়ার যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়।[৬৩৪] এভাবে ফাযিল স্নাতক (পাশ), ফাযিল স্নাতক (সম্মান) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম বর্ষে ভর্তি ইচ্ছুকদের দৈনিক পত্রিকার ভর্তি বিজ্ঞপ্তির অপেক্ষায় থাকতে হয়। জামেয়া অফিস বিজ্ঞপ্তি দেয়ার সময় ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড'র প্রজ্ঞাপন ও নিয়ম পদ্ধতি সমন্বয় করে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তির তথ্য ও শর্ত মতে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থী ফরম সংগ্রহ করে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার অফিসে ফরম জমা করে। ভর্তি উপ কমিটি অফিস জারীকৃত শর্ত মোতাবেক যাচাই করে মেধা তালিকা তৈরি করে উপাধ্যক্ষ বরাবরে পেশ করেন। অত:পর উত্তীর্ণ ছাত্র নির্দিষ্ট তারিখে ভর্তি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।[৬৩৫] উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনীয় কোন কাগজপত্র দাখিল করতে ব্যর্থ হলে বা কোন ধরনের গরমিল হলে বা কোন ক্রুটি ধরা পড়লে জামেয়া অফিস তার ভর্তির সুযোগ বাতিল করতে পারে।[৬৩৬]

### অনার্স ভর্তি পরীক্ষা

সরকার মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী, উন্নয়ন ও জাতীয় পর্যায়ে আরো গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষে ২০১০ খ্রি. দেশের শীর্ষস্থানীয় ৩২ মাদ্‌রসায় ফাযিল স্নাতক (সম্মান) চালু করে।[৬৩৭] চট্টগ্রামে শুধু জামেয়ার দু'টি বিষয়ের অনার্স চালু করার অনুমোদন পায়। বিষয় দুটি হল, (ক) আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ এবং (খ) আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ভিত্তিতে জামেয়া অফিস থেকে পত্রিকা মারফত ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সারা দেশে একই তারিখ ও সময়ে অভিন্ন প্রশ্নে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। জমেয়া অফিসের সহযোগিতায় ভর্তি পরীক্ষায় মূল দায়িত্ব পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রতিনিধি। উভয় পরীক্ষায় ই.বি কুষ্টিয়ার দু'জন প্রফেসর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[৬৩৮] পরীক্ষা শেষে একই অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনেই যথাযথ খাতা মূল্যায়ন করে অর্জিত নাম্বার অনুসারে বিষয় ভিত্তিক ৫০ জন করে মেধা তালিকা ঘোষণা করা হয়। তবে বিশেষ বিবেচনায় ৫০ জনের অতিরিক্ত কিছু সংখ্যার অপেক্ষমান তালিকাও প্রকাশ করা হয়। মেধা তালিকায় উন্নীত শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে ভর্তির নির্দিষ্ট তারিখ হওয়ার পর কোটা (জায়গা) খালি থাকলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে প্রাপ্ত নাম্বারের সিরিয়াল মতে ভর্তির সুযোগ

৬৩৩. কর্তৃক ফলাফল ঘোষণার এক সপ্তাহ পর এ শ্রেণিদ্বয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়

৬৩৪. শিক্ষার্থীর আক্বীদাহ্, আখলাক ও আচরণ কোন ক্রুটি পরিদৃষ্ট হলে জমে'য়া কর্তৃপক্ষ তার ভর্তি বাতিল করার অধিকার রাখেন

৬৩৫. প্রাগুক্ত

৬৩৬. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা

৬৩৭. প্রাগুক্ত

৬৩৮. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা

পায়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বাক্ষরিত তালিকার পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হয়। তালিকা পরিবর্তনে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের সুযোগ থাকেনা।[৬৩৯]

**অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা**

ইবতেদায়ী ১ম হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত এবং দাখিল ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণত: দু'টি পরীক্ষা নেয়া হয়।[৬৪০] ইবতেদায়ী ৫ম ও দাখিল ৮ম শ্রেণিদ্বয়ের সরকারী পর্যায়ে যথাক্রমে সমাপনী ও জুনিয়র দাখিল পরীক্ষার (সরকারী পর্যায়ে) পূর্বে টেস্ট পরীক্ষা নেয়া হয়। এভাবে দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষার প্রস্তুতি স্বরূপ মডেল টেস্ট নেয়া হয়। দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষার্থীদের মাদ্‌রাসা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা নেয়া হয়। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহ মাদ্‌রাসার বার্ষিক একাডেমিক ক্যালেন্ডার মোতাবেক যথা তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পাঠ্যক্রম অনুসারে ষাম্মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নির্ধারিত সিলেবাস সমাপ্ত করে ছাত্রদেরকে পরীক্ষার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত করে তোলেন। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফি, হোস্টেল ফি ও অন্যান্য প্রাপ্য আদায় করে  শ্রেণিশিক্ষক থেকে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করে। শতকরা সত্তর ভাগ উপস্থিত হারের পরীক্ষার্থীরাই  প্রবেশপত্র পেয়ে থাকে।[৬৪১]

**ফলাফল ঘোষণা**

পরীক্ষার ফলাফল ছাত্র-অভিভাবকের কাছে কাঙ্খিত ও প্রত্যাশিত বিষয়। এ ফলাফল প্রমাণ করে শিক্ষার্থীর অর্ধ ও পূর্ণ বছরের লেখাপড়ার মাপকাঠি। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ইবতেদায়ী ১ম থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বাৎসরিক দু'টি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। বার্ষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নাম্বারের সাথে ষান্মাষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নাম্বার যোগ করে শিক্ষার্থী মেধাক্রম রোল নির্ণয় করা হয়। ছাত্র, অভিভাবক ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা পরিচালনা পরিষদ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। অধ্যক্ষ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের 'পাঠোন্নতি বিবরণ' প্রদান করেন। অবশিষ্ট ছাত্রদের ফলাফল কার্ড শ্রেণি শিক্ষক ক্লাসে প্রদান করেন।[৬৪২] এ ভাবে আলিম ১ম বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা ও আলিম নির্বাচনী পরীক্ষা, ফাযিল ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ, ৩য় বর্ষ, অনার্স ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ বর্ষ, কামিল ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল শ্রেণি শিক্ষকরা যথাসময়ে প্রস্তুত করে অফিসে জমা করেন।[৬৪৩]

---

৬৩৯. ভর্তি পরীক্ষার মোট নাম্বার ১০০, লিখিত পরীক্ষায় ৮০ এবং দাখিল ও আলিম পরীক্ষাদ্বয়ের অর্জিত পয়েন্ট ও গ্রেডে ২০। এতে আবশ্যিক বিষয় ৩টি, বাংলা ১০ নাম্বার, আরবি সাহিত্য ৩০ নাম্বার, ঐচ্ছিক চার বিষয়ের একটিতে ৩০ নাম্বার। ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ (১) আল কুর'আন, (২) আল-হাদীস, (৩) ইসলাম শিক্ষা, (৪) ইসলামের ইতিহাস (অফিস রেকর্ড, ইবি, কুষ্টিয়া)

৬৪০. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা

৬৪১. সরেজমিন প্রতিবেদন

৬৪২. ২০১৩ খ্রি. সন হতে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড'র প্রজ্ঞাপন মতে ইবতেদায়ী ১ম হতে ৫ম পর্যন্ত তিনটি এবং দাখিল ৬ষ্ঠ হতে ১০ম পর্যন্ত দু'টি পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। (প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড ও অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা

৬৪৩. ইবতেদায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণি দু'ই বিষয়ের কৃতকার্য ছাত্ররা 'অটোপাস' হিসেবে পরবর্তীতে ক্লাশে উন্নীত হয়। তবে ৩য় শ্রেণি থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত এক বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও সে পরবর্তী ক্লাশে (উপরের

**তাখাস্সূস (বিশেষ) ক্লাস**

বোর্ড কর্তৃক ফাযিল ও কামিল ক্লাসের নেসাব ব্যাপক হওয়ায় নির্দিষ্ট মেয়াদে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। তাই জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মৌলিক কিতাবের পাঠদানে দ্বীনি শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি লাভের মানসে জামেয়ার প্রথম পৃষ্ঠপোষক আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে সকাল ৮-৯টা পর্যন্ত, আর বা'দে ইশা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত দরজায়ে তাখাস্সূস বিশেষ পাঠদানের নির্দেশ দেন। তখন থেকে আলিম, ফাযিল এবং কামিল (হাদীস, ফিক্হ ও তাফসীর) ক্লাসসমূহের মৌলিক কিতাবসমূহ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী শিক্ষকমণ্ডলী পাঠদান করে আসছেন। বিশেষ করে কামিল হাদিস বিভাগের বুখারী শরীফ এবং কামিল ফিক্হ বিভাগের আল-আশবাহ্ ওয়া নাযায়ের কিতাব দু'টি পরিপূর্ণভাবে খতম করতে চেষ্টায় থাকেন ছাত্র-শিক্ষক। কামিল হাদীস ৩য় ব্যাচে বুখারী শরীফের ত্রিশ পারা খতম সর্বপ্রথম সূচনা করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রথিতযশা মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ (রহ.) এবং আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ের ১ম খতম সর্বপ্রথম সূচনা করেন ফিক্হ বিভাগের অধ্যাপক স্বনামধন্য মুফতী সৈয়্যদমুহাম্মদ অছিয়র রহমান।[৬৪৪] দরজায় তাখাস্সূস-এ বর্তমানে নিয়োজিত আছেন শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী, মুফতী ক্বাযী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজিদ, মুহাদ্দিস হাফিয মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী, মুফাস্সির ক্বাযী মুহাম্মদ সালিকুর রহমান।[৬৪৫]

**টাইপ প্রশিক্ষণ ও কিতাবত (হস্তলিপি) প্রশিক্ষণ**

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। দক্ষ প্রশিক্ষক মুহাম্মদ আবু সাঈ'দ টাইপ প্রশিক্ষণের নিয়োজিত আছেন।[৬৪৬] হাতের লেখা সুন্দর ও শৈল্পিক করাই কিতাবতের উদ্দেশ্য। সুন্দর হস্তাক্ষর শিক্ষার উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। তাই শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য অর্জনের কথা বিবেচনা করে কিতবত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন জামেয়া কর্তৃকপক্ষ। মাওলানা মুহাম্মদ রূহুল আমীন অবসরগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সুনামের সাথে কিতাগত প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন।[৬৪৭]

**কিরাত বিভাগ**

বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত ইসলামের একটি অন্যতম গুরুত্ব বিধান। পবিত্র কুরআন তারতীল-এ (ধীরস্থীরভাবে) তিলাওয়াত করার আদেশ হয়েছে। তাই বিশুদ্ধ ও সুলিলত কণ্ঠে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের উপর গুরুত্বারোপ করে জামেয়া কর্তৃপক্ষ দু'জন অভিজ্ঞ ক্বারী (ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ আন্ওয়ারুল ইসলাম ও ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম)'র তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণে নিয়োজিত আছেন। মাদ্রাসার ছাত্ররা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

---

ক্লাশে) উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ পায় না। আর একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা শ্রেণি শিক্ষকের মতামত সাপেক্ষে তাকে টিসি (ছাড়পত্র) দিয়ে অন্য মাদ্রাসায় চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়; এতে কারো কোন সুপারিশ কিংবা আবেদন অধ্যক্ষ মহোদয়ের সমীপে গৃহীত হয় না। অফিস রেকর্ড জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ষোলশহর, চট্টগ্রাম

৬৪৪. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

৬৪৫. *কামিল বিদায়ী স্মরণিকা আত-তৈয়্যব,* প্রাগুক্ত, ষোলশহর ২০০০ খ্রি. চট্টগ্রাম পৃ. ১০৪

৬৪৬. প্রাগুক্ত

৬৪৭. প্রাগুক্ত

সরকারীভাবে কির'আত, না'ত-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও আযান বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের গৌরব অর্জন করছে।[৬৪৮]

**ছাত্রাবাস ও আবাসন সুবিধা**

সুন্দর ও পরিমার্জিত আবাসন সুবিধা ও উন্নত লেখাপড়ার পূর্বশর্ত। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী ইসলামী জ্ঞানার্জন করে যাচ্ছে। তাদের থাকা-খাওয়াসহ সার্বিক সুবিধা দেওয়ার নিমিত্তে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছে উন্নত ও পরিস্কার ছাত্রাবাস। ইসলামের মহা মনীষী চারজন খুলাফা-ই রাশিদার নামে চারটি আবাসিক হল রয়েছে।

(ক) হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর (রহ.) হল,

(খ) হযরত ফারূক আযম (রহ.) হল,

(গ) হযরত 'উসমান বিন 'আফ্ফান (রহ.) হল ও

(ঘ) হযরত আলী মুরতাযা (রহ.) হল।

**আবাসিকের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় নিয়োজিত আছেন :**

১. মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নূরুল আলম (ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়ক, প্রশাসন)।

২. ড. মাওলানা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী (ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়ক, হাউস টিউটর)।

৩. মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, শৃঙ্খলা)।

৪. মাওলানা মুহাম্মদ রবিউল আলম (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, পর্যবেক্ষণ)।

৫. মাওলানা মুহাম্মদ জহরুল আনোয়ার (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, তথ্য সংরক্ষণ)।

৬. মুহাম্মদ শাহ আলম (সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, বাজার)।

আবাসিক ছাত্রদের লেখাপড়া ও আদর্শিক চরিত্র গঠন করার জন্য কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত শিক্ষকমণ্ডলীকে নিয়োগ দান করেছেন। হোস্টেলে অবস্থানরত এক হাজার শিক্ষার্থী দৈনিক দু'বেলা খাবার, নিয়মিত জামা'আত সহকারে নামায আদায়সহ আবাসিক হলসমূহে বিধি-বিধান পালনে বদ্ধপরিকর।

**আবাসন লাভের নিয়ম-কানুন**

নিম্নোক্ত শর্তের ভিত্তিতে ছাত্রাবাসের সুবিধা লাভ করতে পারে :

০১. দূরাগত ও মেধাবী ছাত্র হওয়া

০২. ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকা

০৩. সৎ চরিত্র ও আদর্শবান হওয়া

০৪. মাদ্রাসার নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ অনুসরণ করা

০৫. স্থানীয় ইউ.পি পৌর মেয়র/ সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলর কর্তৃক সত্যায়ন

০৬. মাদ্রাসার জিম্মাদার শিক্ষকদের সাক্ষর।

০৭. যথাযথ অভিভাবকের সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ।[৬৪৯]

---

৬৪৮. প্রাগুক্ত

৬৪৯. অফিস রেকর্ড, হোস্টেল, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ষোলশহর, চট্টগ্রাম

**বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা**

আমাদের দেশে মেট্রো এলাকায় বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট রয়েছে। দেশের অধিকাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানির অভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ছাত্র-শিক্ষক যাতে বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারেন তজ্জন্য ফিল্টার মেশিন দ্বারা রয়েছে বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ পানির ব্যবস্থা করা হয়। শুভাকাঙ্খী শিল্পপতি মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ও মুহাম্মদ সেলিমের যৌথ উদ্যোগে প্রায় তিন লাখ টাকা ব্যয়ে ওয়াটার ট্রিট প্যান্ট নামে আধুনিক মেশিনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। মাদ্‌রাসার শিক্ষক ও আবাসিক-অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা এ থেকে পানি পান করেন। এ প্রকল্পের মেশিনারী জিনিসপত্রের দেখাশুনা ও সার্বিক রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য দানবীর মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী মনোনীত করেন। তাদের এ বদান্যতা মঠ মহলে প্রশংসিত হন।[৬৫০]

**আইসিটি ল্যাব**

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার লেখাপড়ার গুণগতমান বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় গড়ে তোলার লক্ষে সরকার এ প্রতিষ্ঠানে ২৫টি উন্নতমানের কম্পিউটার প্রদান করেছে, এ গুলো দ্বারা উন্নত মানের একটি আইসিটি ল্যাব-এর ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ। আইসিটি ল্যাব-এর শুভ উদ্বোধন করেন মাদ্‌রাসার বর্তমান পৃষ্ঠপোষক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ ১৭ অক্টোবর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে দুপুর ১২ টায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনজুমান ট্রাস্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল-ক্বাদিরী, আন্‌জুমান জয়েন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, সদস্য আলহাজ্ব মোহাম্মদ রশিদুল হক, উপাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সগীর উসমানীসহ আনজুমান কর্মকর্তাবৃন্দ ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষকবৃন্দ।[৬৫১] অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় জামেয়াকে আইসিটি ল্যাব উপহার প্রদানের মধ্য দিয়ে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ল্যাবে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য নিয়োজিত আছেন দক্ষ কম্পিউটার শিক্ষক মুহাম্মদ আকতারুল আলম সোহেল। অবাধ ও সহজ পন্থায় শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার শিখে আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা অর্জন করছে। ল্যাবের মাধ্যমে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় নিজস্ব ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট চালু করা হয়।[৬৫২]

**হিফ্‌জ বিভাগ**

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে মানসমৃদ্ধ হিফ্‌যখানা। বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত ও নিখুঁত হিফ্‌য শিক্ষায় মাদ্‌রাসার হিফ্‌য বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে অবদান রেখে আসছে। এ বিভাগে আন্তরিকতার সাথে দেশ খ্যাত বিজ্ঞ হাফিযরা

---

৬৫০. তথ্য প্রতিবেদন, জামেয়া প্রকৌশলী মুহাম্মদ জামশেদ

৬৫১. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

৬৫২. প্রাগুক্ত

শিক্ষকতার দয়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে প্রায় দু'শ শিক্ষার্থী পবিত্র কুরআন হিফ্য শিক্ষা গ্রহণের লিপ্ত আছে। শিক্ষকতার আটজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ হাফিয।

**সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড**

জামেয়া আহ্মদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় বিভিন্ন দিবস, অনুষ্ঠান, বার্ষিক সভা ও ধর্মীয় শিক্ষা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সকল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল :

**বার্ষিক সভা**

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা গভর্নিং বডি প্রতিবছর মাদ্‌রাসার আয়-ব্যয় হিসাব, লিখাপড়া অগ্রগতি ও বার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরার নিমিত্তে বার্ষিক একবার সভার আয়োজন করে। এতে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে আগত সাধারণ মুসলিম জনতার সম্মুখে কুরআন-হাদীসের আলোকে তাৎপর্যবহ ও সারগর্ভ আলোচনা করার জন্য জামেয়াসহ দেশের খ্যাতিমান আলিম, বিজ্ঞ আলোচক ও ইসলামী চিন্তাবিদ-গবেষকরা আলোচনা করে থাকেন। দেশ-বিদেশের মন্ত্রীবর্গ, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সভাকে প্রাণবন্ত করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৬১ খ্রি. পর্যন্ত বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.), ১৯৬২ খ্রি. থেকে ১৯৮৬ খ্রি. পর্যন্ত আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) এবং ১৯৮৭ খ্রি. থেকে অদ্যবধি (২০১৬ খ্রি.) আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্।[৬৫৩]

**সাপ্তাহিক বিতর্ক অনুষ্ঠান**

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কর্তৃপক্ষ ইসলামী শরী'আতের অর্জিত জ্ঞান ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সুদূর প্রসারি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একজন শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাকে আদর্শিক বক্তা, দক্ষ উপস্থাপক ও আলোচক গড়ে তুলতে হয়।[৬৫৪] তাই জামেয়া কর্তৃপক্ষ প্রবর্তন করেছেন সাপ্তাহিক বির্তক অনুষ্ঠান। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার চতুর্থ ঘন্টার পর অভিজ্ঞ দু'জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এ বির্তক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।[৬৫৫] ইসলামী শরী'আতের মৌলিক বিষয়, প্রিয় রাসূল (স.), সাহবায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র জীবনী এবং বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয়ক বির্তকের আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়। বিতর্কের বিষয় এক সপ্তাহ আগে বিতর্ক উপ কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ পূর্বক অধ্যক্ষের অনুমোদনের পর ক্লাসসমূহে পৌছানো হয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত আলোচ্য বিষয়ের উপর কুর'আন-হাদীসের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দ্বারা উপস্থাপনের সুযোগ পায়। অধ্যক্ষ, উপধ্যক্ষ ও জামেয়ার শিক্ষকমণ্ডলী বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি শোধরিয়ে দেন। অনুষ্ঠান শেষে অধ্যক্ষ উপদেশমূলক বক্তব্য ও মুনাজাতের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রহ.) বাংলাদেশে সফলকালে বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এবং বর্তমান পৃষ্ঠপোষক আল্লামা সৈয়্যদ

---

৬৫৩. বার্ষিক প্রদিবেদন ২০০৫ খ্রি., জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম
৬৫৪. বার্ষিক প্রদিবেদন ২০০৬ খ্রি., প্রাগুক্ত
৬৫৫. অফিস কেকর্ড, প্রাগুক্ত

মুহাম্মদ তাহের শাহ্ শরীক হন। শিক্ষার্থীর কথা ও বক্তব্যে সৃজনশীলতা ও নিপুণতা সৃষ্টির অনুষ্ঠানটি কার্যকরী ভূমিকা রাখে।[৬৫৬]

## ৫.৩.২ দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম

রাউজান দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত অন্যতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি রাউজান, সুলতানপুরে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে আরও দুটি স্থানে ছিল বলে এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিরা বলে থাকেন।[৬৫৭] তবে বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ২ এপ্রিল।[৬৫৮] খ্যাতনামা অলী হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা হযরতুল আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)-এর (১৮৫২-১৯৬১ খ্রি.) এর তৎকালীন মুরিদানের উদ্যোগে বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.) উদ্যোগে একটি ভবন স্থাপন হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকালে সর্বপ্রথম জমিদাতা ছিলেন তৎকালীন সুলতানপুর ইউনিয়নের দানবীর, শিক্ষানুরাগী মরহুম আলহাজ্ব মোয়াজ্জেম হোসেন খান চৌধুরী পোস্ট মাস্টার জেনারেল, রেঙ্গুন) ও মরহুম কাজী গোলামুর রহমান মুনশী। পরে আরও যাঁরা অনেকে জমি দান করেছেন তাঁদের তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আলহাজ্ব ডা. শামসুল হুদা চৌধুরী (প্রকাশ লাল মিয়া ডাক্তার), আলহাজ্ব শামসুল হুদা ভেন্ডার, আলহাজ্ব সৈয়দুর রহমান সওদাগর, আলহাজ্ব খায়ের আহমদ, মরহুমা আয়েশা খাতুন, এয়ার মোহাম্মদ সওদাগর, আলহাজ্ব আবদুস সমদ চৌধুরী, আলহাজ্ব আব্দুল গফুর, আলহাজ্ব মফিজুর রহমান, মুহাম্মদ বদিউল আলম, আবদুল হাশেম চৌধুরী প্রমুখ। সর্বশেষ জমি দান করেছেন বর্তমান সভাপতি আলহাজ্ব অধ্যাপক কাজী শামসুর রহমানসহ তাঁর অপর তিন ভাই যথাক্রমে জনাব কাজী শফিকুর রহমান, কাজী মুজিবুর রহমান ও মরহুম কাজী মাহাবুবুর রহমানের পক্ষে তাঁর পরিবার। তাঁদের বদন্যতায় আজকের এই বিশাল প্রতিষ্ঠান।

### শিক্ষার স্তর

মাদ্‌রাসাটি ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে স্বীকৃতি লাভ করে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে দাখিল, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে আলিম, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ফাযিল অনুমতি/স্বীকৃতি এবং সর্বশেষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধিভুক্তি লাভ করে। বর্তমানে ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা-এর অধিভুক্ত একটি ফাযিল (স্নাতক) মাদ্‌রাসা এবং কামিল (স্নাতোত্তর) পর্যায়ে অধিভূক্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এটি রাউজান উপজেলা সদর ও পৌরসভার একমাত্র এমপিওভুক্ত ফাযিল (স্নাতক) মাদ্‌রাসা।

### বর্তমান গভর্নিং বডি

| ক্রমিক | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ০১ | আলহাজ্ব অধ্যাপক কাজী শামসুর | সভাপতি |

৬৫৬. বর্তমানে অধ্যক্ষ মহোদয়ের তত্ত্বাবধান ও দিক-নির্দেশনায় অনুষ্ঠানটি নিয়মিত পরিচালিত হয়।
৬৫৭ . সাক্ষাৎকার: মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানী, অধ্যক্ষ, দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম
৬৫৮ . অফিস রেকর্ড, দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম

| | | |
|---|---|---|
| ০২ | আলহাজ্ব আনোয়ারুল কিবরিয়া | সদস্য সচিব |
| ০৩ | উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, রাউজান, চট্টগ্রাম। | সদস্য |
| ০৪ | আলহাজ্ব আবু বকর চৌধুরী | সদস্য |
| ০৫ | আলহাজ্ব কাজী মুজিবুর রহমান | সদস্য |
| ০৬ | আবু মাসুদ আজাদ | সদস্য |
| ০৭ | আলহাজ্ব মে. খোরশেদুল আলম | সদস্য |
| ০৮ | আলহাজ্ব সৈয়দ মো. কামাল উদ্দিন | সদস্য |
| ০৯ | মো: নাছির উদ্দিন চৌধুরী | সদস্য |
| ১০ | মোবারক হোসেন | সদস্য |
| ১১ | আলহাজ্ব মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানী | সদস্য |

**প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অধ্যক্ষ তালিকা**[৬৫৯]

| ক্রম. | নাম | পদবী | কার্যকাল | |
|---|---|---|---|---|
| | | | হইতে | পর্যন্ত |
| ০১ | মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হোসাইন ফারুকী | সুপার | ২০-০৭-৭১ | ৩০-০৬-৭৮ |
| | | অধ্যক্ষ | ০১-০৭-৭৮ | ৩০-১১-০৯ |
| ০২ | মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানী | ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ | ০১-১২-০৯ | ০৮-১২-১০ |
| | | অধ্যক্ষ | ০৯-১২-১০ | অদ্যাবধি |

**শিক্ষক কর্মচারী তালিকা** [৬৬০]

| ক্র. | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|---|---|
| ০১ | রফিক আহমদ ওসমানী | অধ্যক্ষ | কামিল (হাদিস, ফিকাহ্ আদব) এস.এ (ইসলামী স্টাডিজ) শিক্ষা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। |
| ০২ | মোহাম্মদ মারফতুন নুর | উপাধ্যক্ষ | কামিল-১ম শ্রেণি |
| ০৩ | মোহাম্মদ মারফতুন নুর | উপাধ্যক্ষ | কামিল-১ম শ্রেণি |
| ০৪ | বাবু আশীষ কুমার গুপ্ত | সহ. অধ্যাপক | এম,এ (ইংরেজী) ২য় শ্রেণি |
| ০৫ | মো. নাজমুল হুদা | প্রভাষক (বাংলা) | এম,এ (বাংলা) ২য় শ্রেণি |
| ০৬ | মো: নাছির উদ্দিন চৌধুরী | প্রভাষক (জীব) | এম,এস.সি (জীব) ১ম শ্রেণি |

৬৫৯. প্রাগুক্ত
৬৬০. প্রাগুক্ত

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০৭ | জনাব মোহাম্মদ ফারুক | প্রভাষক (পৌরনীতি) | এম,এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ২য় শ্রেণি |
| ০৮ | আনোয়ার হোসেন | প্রভাষক (পদার্থ) | এম,এস.সি (পদার্থ) ২য় শ্রেণি |
| ০৯ | বাবু সুভাষ চন্দ্র নাথ | প্রভাষক (রসায়ন) | এম,এস.সি (রসায়ন) ২য় শ্রেণি |
| ১০ | আহমদুল্লাহ ফোরকান খান | প্রভাষক (আরবী) | কামিল (হাদিস) ১ম শ্রেণি |
| ১১ | মোহাম্মদ জাকারিয়া | প্রভাষক আরবী) | কামিল (হাদিস) ১ম শ্রেণি |
| ১২ | নিশিতা নাসরীন সোনিয়া | প্রভাষক (উচ্চতর গণিত) | এম,এস.সি ১ম শ্রেণি |
| ১৩ | মোবারক হোসেন | সহকারী শিক্ষক | বি,এস.সি-বি,এড-২য় শ্রেণি বিভাগ |
| ১৪ | শামসুল আলম হেলালী | সহকারী মৌলভী | কামিল (হাদিস) ২য় শ্রেণি |
| ১৫ | মো. নেয়ামত উল্লাহ | সহকারী মৌলভী | কামিল (হাদিস) (প্রাঃ) ১ম শ্রেণি |
| ১৬ | মো. সিরাজুল ইসলাম | সহকারী মৌলভী | কামিল (হাদিস) ২য় শ্রেণি |
| ১৭ | কোহিনুর আকতার | সহকারী শিক্ষিকা | বি,এ-বি,এড-২য় বিভাগ |
| ১৮ | রমিজ আলম | সহকারী শিক্ষক | বিএ.বিপিএড-১ম শ্রেণি |
| ১৯ | আনোয়ারুল আজিম | সহকারী শিক্ষক | কৃষি ডিপ্লোমা |
| ২০ | মোঃ আবদুর রহিম | সহকারী শিক্ষক | এম এ (ইংরেজী) ১ম শ্রেণি EL: |
| ২১ | মরিয়ম বেগম | সহ. শিক্ষক(বিজ্ঞান) | বি..এস.সি, বি,এড- ২য় শ্রেণি |
| ২২ | আবু তৈয়ব আনছারী | ইবতেদায়ী প্রদান | কামিল (হাদিস) ২য় শ্রেণি |
| ২৩ | সৈয়দ মোঃ আবদুল্লাহ | ইবতেদায়ী সহ. | কামিল (হাদিস) ৩য় শ্রেণি |
| ২৪ | শামসুল আলম নুরী | ইবতেদায়ী ক্বারী | কামিল (হাদিস) ৩য় শ্রেণি |
| ২৫ | উম্মে কুলসুম | ইবতেদায়ী সহকারী | বি,এ- ২য় বিভাগ। |

**পরীক্ষা কেন্দ্র**

মাদ্রাসাটি উপজেলা ও পৌরসভা সদরে হওয়াতে এখানে ইবতেদায়ী, (প্রাথমিক সমাপনী), জেডিসি, দাখিল, আলিম, ফাযিল পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশসহ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে উপজেলা হেড কোয়াটার-এ একাধিকবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর যোগ্যতা ও মর্যাদা অর্জন করে।[৬৬১]

**প্রাসঙ্গিক তথ্য**

মাদ্রাসায় বর্তমানে সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রায় চল্লিশ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী রয়েছে। আওলাদে রাসূল (স.) আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) এর নামে একটি ইতীমখানা এবং বর্তমান পীর হুযূর আওলাদে রাসূল (স.) হযররতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.যি.আ.) এর নামে হিফযখানা চালু রয়েছে। প্রতিবছরে বিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল অর্জন করে আসছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখান থেকে সর্বশেষ

৬৬১. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন

ডিগ্রী অর্জন করে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত মানখ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়ন করে দেশে বিদেশে চাকরিরত আছেন। অনেক আলিমেদীন এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করে মাযহাব-মিল্লাতের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন।[৬৬২]

## ৫.৪ ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ্ (রহ.)'র অনেক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে ক্ষান্ত হননি, বরং স্বীয় পিতা আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার পৃষ্ঠাপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করে একদিকে আন্‌জুমানকে শক্তিশালী করেন, অন্যদিকে আনজুমান পরিচালিত মাদ্‌রাসাগুলোর শিক্ষার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক অবদান রাখেন।

### আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিবৃত্ত

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া সুন্নীয়া দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম অরাজনৈতিক সেবামুলক আধ্যাত্মিক সংস্থা; যা এতদ্‌অঞ্চলে দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছে। আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র (১৮৫২-১৯৬১) প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ভিত্তিকে শরী'আত-তরীকত প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন বিধায় কখনো মসজিদ, কখনো মাদ্‌রাসা, কখনো আন্‌জুমান, কখনো খানেকাহ্ শরীফ তৈরী করে সমমনাদের কাজে লাগানোর প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর পীর খাজা চৌহরভী (রহ.) কতৃক ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত দারুল উলূম ইসলামিয়া রহমানিয়া মাদ্‌রাসা, (হরিপুর, পাকিস্তান) কে তিনি শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেন। এর বিশাল দ্বিতল ভবনটি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় সিরিকোটি (রহ.)-এর নেতৃত্বে রেঙ্গুন-চট্টগ্রামের মুরীদানের অর্থায়নে। এই মাদ্‌রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদ নির্মিত হয় সিরিকোটি হুযূরের বদান্যতায়।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই তাঁর পীর খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.) ইন্তিকাল করেন। এর আগে সিরিকোটি হুযূরকে তাঁর প্রধান খলীফা মনোনীত করে যান এবং শারী'আত-তরীকতের এই বিশাল মিশনের প্রধান কর্ণধারের উপর ৩০ পারা দুরূদ শরীফ 'মাজমু'আয়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম' ছাঁপানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়।[৬৬৩] পীরের ইন্তিকালের পর হরিপুর দারুল উলুম ইসলামিয়া রহমানিয়া মাদ্‌রাসার পৃষ্ঠপোষকতা, দুরূদ শরীফের বিশাল গ্রন্থ ছাঁপানোর দায়িত্বসহ শরী'আত-তরীকতের এই বিশাল যিম্মাদারী যথাযথভাবে আনজাম দিতে এবং এ মহৎ কাজে তাঁর মুরীদ-ভক্তদের অংশীদার করে তাদের দুনিয়া আখিরাত উজ্জ্বল করতে তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'আনজুমান-এ শুরায়ে রহমানিয়া, রেঙ্গুন'।[৬৬৪] তার নেতৃত্বে দ্বীনি খিদমতে শামিল হল হাজার হাজার ভক্ত। তখন থেকে ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রি. পর্যন্ত রেঙ্গুন অধ্যায়ের যাবতীয় কর্মকাণ্ড চলে এ আনজুমান এর মাধ্যমে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের

---

৬৬২. সাক্ষাৎকার: মুহাম্মদ মারফতুন নূর, উপাধ্যক্ষ, দারুল ইসলাম ফাযিল (স্নাতক) মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম

৬৬৩. প্রাগুক্ত

৬৬৪. প্রাগুক্ত

হরিপুরে রহমানিয়া মাদ্‌রাসার দ্বিতল ভবন তৈরী, এর দৈনন্দিন যাবতীয় খরচ মেটানো, সিলসিলাহ ও সুন্নীয়তের প্রচার-প্রসার, বিশেষত : ৩০ পারা দুরূদগ্রন্থ ছাঁপানোর বিশাল যিম্মাদারী সবকিছু সম্পন্ন করে এ আনজুমান। আনজুমান ট্রাস্ট-এর আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের সাথে জাগতিক হিকমতের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় এই সিলসিলাহ্‌কে রেঙ্গুন থেকে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেয়। সে সময় রেঙ্গুনে কর্মরত চট্টগ্রামের ধর্মপরায়ণ মানুষদের দেখা যায় সিরিকোটি (রহ.) এর মুরীদ এবং আনজুমান ট্রাস্ট-এর কর্মী হয়ে নিজেদের জীবন ধন্য করতে, বাংলাদেশকেও রেঙ্গুনের আলোতে আলোকিত করতে। চট্টগ্রাম সংবাদপত্র শিল্পের জনক আলহাজ্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার আবদুল জলিল, আলহাজ্ব সূফী আবদুল গফুর (১৯০০-১৯৬৮ খ্রি.), মাস্টার আবদুল লতিফ, ডা. মুজাফফরুল ইসলাম, মোয়াজ্জেম হোসেন পোস্ট মাস্টার, আবদুল মজিদ সওদাগর (১৯১৫-১৯৮২ খ্রি.) সহ চট্টগ্রামের বিশিষ্ট মুরীদদের অনুরোধে হযরত সিরিকোটি (রহ.) চট্টগ্রাম আসতে সম্মত হন এবং করাচি-কলিকাতা-রেঙ্গুন সমুদ্র পথে যাতায়াত কালে চট্টগ্রামে যাত্রা বিরতি শুরু করেন ১৯৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দের দিক থেকে।[৬৬৫] তিনি যে ক'দিন চট্টগ্রামে অবস্থান করতেন তখন সিলসিলাহ্‌র সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়তে থাকে এখানে। রেঙ্গুন ফেরত মুরীদান এবং চট্টগ্রামে নবদীক্ষিত তরীকত পন্থীদের সুন্নীয়তের কর্মকাণ্ডের এই বিশাল মিশনে সমন্বয় সাধন করতে ২৯ আগস্ট ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে গঠন করা হয় 'আনজুমান-এ শুরায়ে রহমানিয়া, চট্টগ্রাম শাখা'।[৬৬৬] শুরু হল শরী'আত-ত্বারীক্বাতে রেঙ্গুন-চট্টগ্রামের সেতুবন্ধন। শাহনশাহে সিরিকোট (র.)'এ দ্বীনি মিশনের বাধভাঙ্গা জোয়ারের ধাক্কা রেঙ্গুন সীমানা অতিক্রম করে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত আছড়ে পড়তে লাগল। যুগ সন্ধিক্ষণে তাঁর রেঙ্গুন মিশন সমাপ্তি করে পরবর্তী মিশন নিয়ে চট্টগ্রাম আসেন।[৬৬৭] তিনি এ সময় ঘোষণা দেন, রেঙ্গুনে ভয়াবহ বোমা হামলা হবে এবং জান মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। তাই শীঘ্রই যেন সকলে রেঙ্গুনের কাজ কারবার গুটিয়ে স্ব স্ব দেশে ফিরে যায়। তাঁর কথায় বিশ্বাস রেখে যারা কাজ করেছেন তারা লাভবান হয়েছেন, আর যারা রেঙ্গুনে থেকে যান, তাদের জান-মালের অপূরাণীয় ক্ষতি হয়। হুযূর আল্লামা তৈয়্যব শাহ (র.)'এর রেঙ্গুনস্থ খলীফা হাজী ইসমাঈল বাগিয়া (র.) বলেন, তাঁর বাবা হাফিয দাউদজী বাগিয়া সিরিকোটি (র.) নির্দেশে স্বপরিবারে রেঙ্গুন ত্যাগ করেন ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে। আর ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র রেঙ্গুন শহর ভয়াবহ বোমাহামলায় বিধ্বস্ত হয় এবং রেঙ্গুনের পতন ঘটে। সিরিকোটি (রহ.) রেঙ্গুন ছাড়েন এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে।

১৯৪২ থেকে ১৯৫৮ খ্রি. পর্যন্ত সিরিকোটি হুযূরের মিশন চলেছে এই বাংলাদেশে। বিশেষত চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে আলহাজ্ব আব্দুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারের আন্দরকিল্লাস্থ বাসভবন কোহিনুর মনযিলে যা সাপ্তাহিক কোহিনুর ও দৈনিক আজাদী অফিস ও প্রেস-এর দ্বিতীয় তলা।[৬৬৮] ইত:পূর্বে ২৯ আগষ্ট ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত আন্‌জুমানে শুরায়ে রহমানিয়া, চট্টগ্রাম শাখার কর্মকাণ্ড শুরু হল নবউদ্দীপনায়। তখন থেকে এটা শাখা কমিটি নয় বরং মূল সংগঠন হয়ে কাজ শুরু করে (তৎকালীন

৬৬৫. অফিস রেকর্ড, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম

৬৬৬. প্রাগুক্ত

৬৬৭. প্রাগুক্ত

৬৬৮. মোছাহের উদ্দীন বখতিয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি* চট্টগ্রাম: গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার ২০১২ খ্রি., পৃ. ১-১০

পূর্ব পাকিস্তান) বাংলাদেশে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ২৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম লালদিঘী ময়দানে অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান' এর জনসভায় হযরত সিরিকোটি (র.) সভাপতিত্ব করেন এবং সেদিন তাঁর সভাপতির ভাষণটি ছিল দেশের বর্তমান-ভবিষ্যত রাজনীতি ও ধর্মীয় গতিপ্রকৃতির ভবিষ্যতবাণী সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল যা 'খুতবায়ে সাদারাত' নামে পাকিস্তান থেকে উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়। তিনি জাতীয় রাজনীতির সাথে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক রেখে রাষ্ট্রীয় অবস্থা পরিস্থিতির উন্নয়নের ভূমিকা রাখতেন, তাঁর খুতবায়ে সাদারাত সূত্র থেকে তা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়। ১৯৫২ সালে ঢাকা কায়েৎটুলীতে প্রতিষ্ঠা করেন খানকাহ্য়ে ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া' যা এখনো শারী'আত-তরীকত ও সুন্নীয়তের মারকাজ। পরবর্তীতে এই মারকাজ থেকে ঢাকার মুহাম্মদপুরে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) প্রতিষ্ঠা করেন ক্বাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা।[৬৬৯]

২২ জানুয়ারি ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন সংগঠন 'আনজুমান-এ আহমদিয়া সুন্নীয়া'। এ সংগঠনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে 'মাদ্‌রাসা-এ আহমদিয়া সুন্নীয়া' নামে একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। ২৫ জানুয়ারী ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহনশাহে সিরিকোট (র.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এ মাদ্‌রাসাকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। তাই এর নামের সাথে 'জামেয়া' শব্দটি সংযোজন করে 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' নামকরণ হয় এবং তৎকালিন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর শুভাগমনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। ১৮ মার্চ ১৯৫৬ খ্রি. এক সভায় 'আনজুমানে শুরায়ে রহমানিয়া' এবং 'আনজুমান-এ আহমদিয়া সুন্নিয়া'-কে একত্রিত করে 'আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া ট্রাস্ট নামকরণ করা হয়।' ০১ এপ্রিল ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে থেকে এই নতুন আনজুমানের অফিসিয়াল যাত্রা শুরু হয়। ০৮ জানুয়ারি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে এক সভা হযরত আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটি (রহ.) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে আনজুমানের সংবিধান সংশোধন করার জন্য গঠিত উপ-কমিটিতে শাহযাদা আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)-কে প্রধান দায়িত্ব অর্পন করে তাঁকে আনজুমানের কাজে অফিশিয়ালি অর্ন্তভূক্ত করা হয়। এই সংবিধান সংশোধন কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত অপর পাঁচ সদস্য হলেন :[৬৭০] ১. মৌলভী জয়নুল আবেদীন চৌধুরী, ২. হাজী নূর মোহাম্মদ সওদাগর, ৩. হাজী সূফী আবদুল গফুর, ৪. মৌলভী এস এম বদিউল আলম ৫. হাজী আবদুল জলিল

২১ জানুয়ারী ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এ কমিটি সংবিধান সংশোধন করে খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে। যা সামন্য রদবদলের মধ্যেদিয়ে গৃহীত হয়।

এ বছরের চট্টগ্রাম সফরে আল্লামা সিরিকোটি (রহ.) তাঁর শাহ্যাদা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ কে প্রধান খলীফার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং সে থেকে এই দ্বীনি কাফেলা তাঁর নেতৃত্বে আরো বেগবান হতে থাকে। ১৯৫৮ খ্রি. ছিল সিরিকোটি (রহ.) এর শেষ সফর। এ বছর তিনি শাহ্যাদা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদম তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)-কে দরবারে আলিয়া ক্বাদেরিয়া সাজ্জাদানশীন ঘোষণা এবং আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর কর্মকাণ্ডে অভিষিক্ত করা, প্রিয় বড় নাতি

৬৬৯. অফিস রেকর্ড, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
৬৭০. অফিস রেকর্ড, আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.) কে চট্টগ্রামে এনে এখান থেকে বিরাট কাফেলার সাথে তাঁকে হজ্জে নিয়ে যান। এর পূর্বে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের হজ্জ পালনকালীন বড় নাতি তাহের শাহ্ কে হজ্জে নিয়ে যেতে মদিনা পাক থেকে নির্দেশিত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। এরপর তিনি আর বাংলাদেশে তাশরীফ আনেন নি এবং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে (১১ যিলক্বদ ১৩৮০ হি.) ইন্তিকাল করেন।[৬৭১]

আন্‌জুমান ট্রাস্ট কর্তৃক পালনীয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান :[৬৭২]

১. মুহাররাম উপলক্ষে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে কর্মসূচি।

২. সফর মাসে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) স্মরণ।

৩. রবিউল আওয়াল মাসে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে জশ্‌নে জুলুসে আয়োজন। চট্টগ্রামের বাইরে বিভিন্ন জেলায় ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে জশ্‌নে জুলূস আয়োজন করে। ৯ রবিউল আওয়াল আনজুমান ট্রাস্ট ঢাকা শাখা কর্তৃক ঢাকা মুহাম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা হতে 'জশ্‌নে জুলূস' বের হয়।

৪. রবিউল সানি মাসে 'ফাতিহা ইয়াযদাহুম' আর 'ফাতিহা ইয়াজদাহুম' এর অপর নাম হল 'গেয়ারভী শরীফ যা গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর ওফাত দিবস ১১ রবিউস সানী।

৫. জামাদিউস সানি মাসে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ওফাত দিবস ২২ জমাদিউস সানী। সে দিবসে বা মাসে তাঁর স্মরণে অনুষ্ঠান হয়।

৬. রজব মাসে ২৭ তারিখে (২৬ দিবাগত রাতে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মি'রাজ সংগঠিত হয় সশরীরে। এ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান আমাদের ঈমান-আকীদাকে চাঙ্গা করে বিধায় সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী পালন করা হয়। এ মাসের ৬ তারিখে উপমহাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত, সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মুঈনদ্দীন চিশতী (র.) স্মরণে মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

৭. শাবান মাসে ১৪ তারিখে দিবাগত রাত শবে বরাত বা 'লাইলাতুল বরাত'। এ উপলক্ষে কুর'আন-সুন্নাহ্ ও ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা হয়।

৮. রমযান মাসে ১ তারিখে শুভ জন্ম হয় গাউসুল আ'যম বড়পীর হযরত আবদুল ক্বাদের জিলানী (র.), ১৭ তারিখ সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধ (বদর দিবস), ২০ তারিখ শাহাদাত বরণ করেন শেরে খোদা হযরত আলী (র.), ২৬ দিবাগত রাত লাইলাতুল কদর এবং কুর'আন নাযিলের স্মৃতিময় সময়, মাহে রমযানের তাৎপর্য ও যাকাত এর গুরুত্ব আলোচনা করা হয়।

৯. শাওয়াল মাসে ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও ঈদ পুনর্মিলনী সাধারণ মুসলমানদের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

১০. যিলক্বদ মাসে ১১ যিলক্বদ ১৩৮০ হি. ওফাত বরণ করেন শাহানশাহে সিরিকোট আল্লামা হাফিয সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.)। এ উপলক্ষে উরস শরীফ উদ্‌যাপনসহ পূর্বে

---

৬৭১. মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, *"আনজুমান ট্রাস্টের ইতিবৃত্ত" (দৈনিক ইনকিলাব*, তারিখ- ২১/১১/২০১২) খ্রি., পৃ. ১০

৬৭২. মোছাহের উদ্দিন বখতেয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

বর্ণিত কর্মসূচিসমূহ পালন করা হয়। তিনি, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম, এবং আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া (ট্রাস্ট) এর প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ সুতরাং তাঁকে স্মরণ করা হয়।[৬৭৩]

১১. জিলহজ্ব মাসে ১ যিলহজ্ব গাউসে দাঁওরান, কুতবে আলম খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.) এর বার্ষিক উরস শরীফ এবং ১৫ যিলহজ্ব ১৪১৩ হি.) গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, তরজুমান এ আহলে সুন্নাত, বাংলাদেশে জশ্‌নে জুলূস, ঢাকা কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া মাদ্‌রাসা সহ অসংখ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক আল্লামা হাফেজ সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) এর বার্ষিক উরস শরীফ উপলক্ষে সারাদিন ব্যাপী খতমে কুরআন, খতমে মজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল (সা.) এবং খতমে বুখারী ও বাদে মাগরিব হতে পরিচালিত হুযূরের জীবন-কর্মের উপর আলোচনা সভা মিলাদ, মাহফিল এর আয়োজন করা হয়।

**আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া ট্রাস্ট’ কর্তৃক প্রকাশিত রচনাবলী**

১. মাসিক তরজুমান ২. মাজমূ‘আহ্-এ সালাওয়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ৩. গাউসিয়া তারবিয়াতী নিসাব ৪. দরসে হাদীস ৫. যুগ জিজ্ঞাসা ৬. নূরানী তাক্বরীর সম্ভার ৭. শানে রিসালত ৯. ইরশাদাত-ই আ'লা হযরত ১০. আহলে বায়তের ফযীলত, ১১. নযরে শরী‘আত ১২. ইন্তিকালের পর দুনিয়ায় জীবিত হলেন যাঁরা ১৩. হাযির-নাযির, ১৪. হায়াতুল আম্বিয়া, ১৫. শাজরাহ্ শরীফ।

**আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া পরিচালিত কিছু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**

১. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
২. কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়ার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৩. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
৪. পশ্চিম সোনাই মোহাম্মদিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা,
৫. তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূরুল হক জরিনা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা, চন্দ্রঘোনা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম,
৬. মাদ্‌রাসা-ই তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া দাখিল, নুনিয়ারছড়া, কক্সবাজার প্রতিষ্ঠা ০১.০১.১৯৯৪ সাল।
৭. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা, পাঁচরাইশ, চট্টগ্রাম, প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৬ সাল।
৮. তাহিরিয়া সাবিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা পঠানদণ্ডী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম ১৯৭৪ সাল।
৯. তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, কে.পি.আর.সি চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি, প্রতিষ্ঠা- ১৯৮৭ সাল।
১০. কাদিরিয়া তাহিরিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা উত্তর গাঁও, খিলগাঁও, ঢাকা, প্রতিষ্ঠা- ২০০১সাল।
১১. শরিফাবাদ দাখিল মাদ্‌রাসা, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ, সিলেট, প্রতিষ্ঠা- ২০০৩ সাল।
১২. জামেয়া গাউছিয়া তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, বন্দর, নারায়নগঞ্জ, প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৭ সাল।
১৩. পশ্চিম সোনাই মুহাম্মদ নগর তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা মাহনিমুখ, লংগদু, রাঙ্গামাটি, প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৯ সাল।
১৪. লেঙ্গুর বিল মুহীউসসুন্নাহ বালিকা দাখিল মাদারাসা, টেকনাফ, কক্সবাজার, প্রতিষ্ঠা- ২০০৫ সাল।
১৫. কাদিরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া মাদ্‌রাসা, পুরাতন জিলখানা, নারায়নগঞ্জ সদর, প্রতিষ্ঠা- ১৯৯৫ সাল।

৬৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২০

১৬. তাহিরিয়া বদরুল আলম রুনা সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, আখিরহাট, মিঠাপুকুর, রংপুর।
১৭. তাহিরিয়া বদরুল আলম রুনা সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, চিরাহাটি, ডোমার, নিলফামারী।
১৮. কাদিরিয়া চিশতিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, মেশাদী, চাঁদপুর।
১৮. তাহিরিয়া সাবিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, ঘাটিয়ারা, বি.বাড়িয়া।
১৯. দক্ষিণ রাঙ্গীপাড়া গাউছিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, মাইমুখ, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা।
২০. তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া বালিকা মাদ্‌রাসা, মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার।
২১. বাগমারা অলী শাহ (র.) সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, কাথরিয়া, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
২২. মাদ্‌রাসা-ই গাউছিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া, পূর্ব মুরাদপুর (পেশকার পাড়া) সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
২৩. তৈয়্যবিয়া সাবিরিয়া আযীযিয়া মাদ্‌রাসা, ধোপছড়ি বাজার, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
২৪. মাদ্‌রাসা-ই গাউছিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া, শ্রীপুর, খরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২৫. গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, কাহারঘোনা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
২৬. গাউছিয়া তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া কমপে-ক্স, পূর্ব সাতবাড়িয়া, হাজিপাড়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
২৭. পূর্বকৈয়গ্রাম সাবিরিয়া খলিলিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, মালিয়ারা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২৮. রহমানিয়া মুহাম্মদিয়া কাদিরিয়া মা. হিফযখানা ও ইয়াতিমখানা, করণখাইন, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২৯. হায়দারনাসী মুহাম্মদিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, লামা, বান্দরবন পার্বত্য জেলা।
৩০. ফয়যুল উলুম মাদ্‌রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৩১. কাদিরিয়া তাহিরিয়া হুসাইনিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা, ফেনী।
৩২. মাদ্‌রাসা-ই তৈয়্যবিয়া তাহিরিয়া মির্জা হুসাইনিয়া, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
৩৩. মাদ্‌রাসা-ই তায়্যিবিয়া তাহিরিয়া দরবেশিয়া সুন্নিয়া, পশ্চিম সরোয়াতলী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।[৬৭৪]
৩৪. তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া বালিকা মাদ্‌রাসা মহেশখালী, কক্সবাজার।

উল্লেখিত মাদ্‌রাসা ছাড়াও আরো বহু মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দিক নির্দেশনায়। শুধু তাই নয়, বরং আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার ব্যবস্থাপনায় এবং গাউসিয়া কমিটি বিভিন্ন শাখার উদ্দ্যেগে ইত:মধ্যে তাঁর নাম অনুসারে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে শতাধিক। ঐ সব প্রতিষ্ঠান ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক অবদান রেখে যাচ্ছে।

৬৭৪. দৈনিক ইনকিলাব, ১০-০৫-২০১৩ খ্রি.

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## আধ্যাত্মিক শিক্ষালয়-খানকাহ্ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার

### ৬.১ খানকাহ্ পরিচিতি

আভিধানিক অর্থে খানকাহ্ সূফী দরবেশদের নির্দিষ্ট গৃহ বা আবাসন। এটি ফার্সী যৌগিক শব্দ, অর্থ কোন সূফী তরীকা অবলম্বনকারী মুসলিম সাধকের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা আবাসন।[৬৭৫]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র তত্ত্বাবধানে হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা.)'র বাড়ীতে পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল ইসলামী শিক্ষার আনুষ্ঠানিক বুনিয়াদ। কালের বিবর্তনে যুগ-যুগান্তরে, কাল-কালান্তরে এ ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারে বিভিন্ন মাদ্রাসা, মসজিদ, মাযার এবং খানকাহ্ সমূহ অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইবাদত ও ইসলামী শরী'আহ্'র বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষাদানের কেন্দ্ররূপে খোরাসান ও ট্র্যান্স অক্সিয়ানায় দশম শতাব্দীতে খানকাহ্'র প্রবর্তন ঘটে।[৬৭৬] তখন থেকে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, আল-মাগরিব (মরক্কো), এশিয়া মাইনর এবং অটোমান বা উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশসহ ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র শহর ও গ্রামাঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে খানকাহ্ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

### ৬.২ খানকাহ্ ভিত্তিক ইসলামী কার্যক্রম

খানকাহ্ মুসলমানদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। খানকাহ্গুলোতে সালাত, যিকর-আযকার, ইসলামী তা'লীম ইত্যাদির মত ইসলামী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। বহু সংখ্যক সূফীকে আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে সব খানকাহ্তেই আবাসিক ভবন, মসজিদ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন উপগৃহ ও অন্যান্য ভবন নির্মান করা হতো। ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বহু খানকাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় লাখোরাজ বা নিষ্কর ভূমির উপরও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৭৭] মধ্যযুগের বাংলায় শায়খ ও সূফীদের খানকাহ্গুলো মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সূফীরা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত মেধার অধিকারী এবং ইসলামের মূলনীতির প্রতি অনুগত ছিলেন। এর মাধ্যমে তাঁরা জনগণ ও সমাজকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারেন।

### ৬.৩ নৈতিক চরিত্র প্রতিষ্ঠায় খানকাহ্'র অবদান

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতাব্দী সময়কালটি বাংলার রাজধানী লক্ষণাবতী বা লখনৌতি যখন তুর্কী ও স্বাধীন সুলতানদের গৌরবের কেন্দ্রস্থল ছিল, তখন দেশী-বিদেশী বহু পীর-দরবেশ সেখানে এসেছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের আস্তানা ও খানকাহ্-এ তাওহীদের মহিমা ব্যাখ্যা করতেন, মানুষের সেবা করতেন এবং ইসলাম প্রচার করতেন। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের

---

৬৭৫. সম্পাদনা পরিষদ, ***ইসলামী বিশ্বকোষ***, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নভেম্বর ১৯৯০ খ্রি). খ. ৯, পৃ. ৪৯৮

৬৭৬. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ***বাংলাপিডিয়া***, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৩৭

৬৭৭. ড. মোহাম্মদ আজিবার রহমান, ***আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর খুলনা জেলার আলিমগণের অবদান*** (পিএইচ.ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৪১৬

উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, প্রধানত এদের চেষ্টায় বাঙালী মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব ও সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। সূফীরা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া হতে উত্তর ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে বাংলায় আগমণ করেন। খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার সর্বত্র শহরে ও গ্রামে সূফীরা দরগা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায়ও উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। প্রত্যেক সূফীর বহু শিষ্য ছিল। এরা শিষ্যদেরকে ইসলামী শাস্ত্রের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে দীক্ষা দিতেন। এই শিষ্যরাও আবার বড় হয়ে দরগাহ্ প্রতিষ্ঠা করে নতুন নতুন শিষ্যকে শিক্ষা দীক্ষা দিতেন। রাজা-প্রজা সকলেই সূফীদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। সূফীদের দরগায় শিক্ষা-দীক্ষা ব্যতীত দরিদ্রের অন্ন দান ও চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।[৬৭৮]

### ৬.৪ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খানকাহ্

খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করে সূফীরা বাংলার সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই অনেক অনুগামী ছিল। তাঁরা তাঁদের অনুসারীদের খানকাহ্গুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন। সুলাতানরা এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। জালাল উদ্দীন তাবরিজি, শাহ্জালাল, নূর কুতুবুল আলম-এর ন্যায় বিখ্যাত সাধকের খানকাহ্গুলো আজও টিকে আছে। তাছাড়া মোঘল আমলের খানকাহ্গুলোও বিদ্যমান আছে। মুসলিম শাকসরা মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্র ব্যয় নির্বাহে জমি দান করতেন এবং বরাবরই 'উলামা, সূফী ও অপরাপর ধর্মীয় নেতাদের উৎসাহ দিয়ে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বাংলায় মুসলিম সমাজ বিকাশে সহায়তা করতেন। মিনহাজ-ই-সিরাজ উল্লেখ করেন যে, তৎকালীন বাংলার রাজধানী লখনৌতিতে স্থাপনের পর মুহাম্মদ বখতিয়ার বহু মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ্ নির্মাণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলার মুসলিম শাসনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলাম বিশ্বাসীদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। এ পর্যন্ত আবিস্কৃত বাংলায় মুসলমান শাসনামলের (১২০৪-১৩০৪ খ্রি.) ১৩ টি শিলালিপির মধ্যে ছয়টি খানকাহ্'র স্মৃতি বহন করে। এগুলো তৎকালীন বাংলার সমাজে খানকাহ্র গুরুত্ব নির্দেশ করে। দেবকোট, দেওতলা, মহাস্থান, ঢাকা, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম, সিলেট, গৌড়, পাণ্ডুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ এবং ত্রিবেণীর (সাতগাঁও) মত স্থানগুলো ছিল খানকাহ্র জন্য বিখ্যাত।

সূফীরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তারের সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারেও অগ্রণী ছিলেন। বাংলার সূফী-দরবেশদের কোন কোন খানকাহ্ ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনচর্চার পীঠস্থান ছিল। খানকাহ্গুলো শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে বহু সূফী-দরবেশ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছিল। শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী, আশরাফ সিমনানী, নাসিরুদ্দীন মানিকপুরী, হোসেন যুক্কারপোস, হাসান উদ্দীন মানিকপুরী, বখতিয়ার কাকী এবং উত্তর ভারতের আরও কয়েকজন বাংলায় তাঁদের আধ্যাত্মিক ও বৃদ্ধিভিত্তিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। খানকাহ্ হতে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মানসিক শান্তি লাভ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তার আগ্রহ পরিতৃপ্ত করতে পারত। এটা হাসপাতাল বা আশ্রয়স্থানরূপেও

---

৬৭৮. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ***বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ*** (কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৩৮৫ বাংলা,) পৃ. ২৩৪

কাজ করত যেখানে বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত এবং অসুস্থ ব্যক্তির আশ্রয়, উপযুক্ত চিকিৎসা, ভাল সেবা-শুশ্রূষা এবং যত্ন পেতে পারত।[৬৭৯]

### ৬.৫ খানকাহ্'র প্রাত্যহিক কর্মসূচি

প্রত্যেকটি খানকাহ্‌তে একটি লঙ্গরখানা সংযুক্ত থাকত, সেখান থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের খাদ্য সরবরাহ করা হত। লঙ্গরখানাগুলোতে দানকৃত অর্থ বা লাখোরাজ সম্পত্তির আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হত। খানকাহ্ ও লঙ্গরখানাগুলো দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্তদের যথেষ্ট স্বস্তিদান করত। এসব লঙ্গরখানা সূফী-দরবেশদেরকে সাধারণ মানুষের অধিকতর কাছে আসার সুযোগ করে দেয় এবং তাঁদের অনুভূতি ও মনোভাব বুঝতে সাহায্য করে। খানকাহ্ ছিল মানবতাভিত্তিক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মত ও পথের মানুষ এখানে আসত, পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান করত এবং খোলামেলা আলোচনায় প্রবৃত্ত হত। আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান ছাড়াও খানকাহ্‌গুলো দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত।

### ৬.৬ ইসলাম প্রচারে খানকাহ্'র গুরুত্ব

খানকাহ্‌গুলোতে সাধারণত : তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ এগুলো ইসলামী শিক্ষা প্রচারের কেন্দ্র ছিল। দ্বিতীয়ত, এগুলো নির্যাতিত জনগণের আশ্রয়কেন্দ্র এবং যালিম সমাজ-শক্তির বিরুদ্ধে মযলুমের প্রতিরোধের ঘাঁটি এবং তৃতীয়ত, প্রতিটি খানকাহ্ সাথে বুভুক্ষু মানুষের 'লঙ্গরখানা' চালু ছিল। সূফী দরবেশদের এ ভূমিকার কারণে মুসলমানদেরকে ভারতবর্ষের মানুষ ত্রাণকর্তারূপে দেখেছিলেন। ইসলামের বাণীবাহক এ শিক্ষকদের ত্যাগ, সাহস ও মনোবল এবং সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের সেবা ও ভালবাসা এবং তাদের নিষ্কলুষ চরিত্র এ জনপদে দলিত জনগোষ্ঠীর সুপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রবল শক্তিমত্তায় জাগ্রত করতে ও সংগঠিত করতে সহায়ক হয়। ইসলামের শিক্ষকরা জন্ম, বংশ, গোত্র, বর্ণ, ও বিত্তের কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙে ফেলার যে আহ্বান প্রচার করেন, তার চেয়ে আবেদনময় ও জাগরুক শ্লোগান বাংলার তখনকার সামাজিক পটভূমিতে কল্পনাতীত ছিল। খানকাহ্য় হাজার হাজার লোক আসা-যাওয়া করত। জীবনের নানা বিষয়ে তারা সূফী-দরবেশদের নিকট থেকে জানার সুযোগ পেত। বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত, শিক্ষার্থী, সংসারী, ব্যবসায়ী, হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি সব ধরনের মানুষের তাদের মকসুদ হাসিলের জন্য সূফী-সাধকের খানকাহ্য় আসতেন। যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের জন্য খানকাহ্-এ যাতায়াত করতেন। পার্থিব উন্নতির আশায় যারা আসতেন সূফীরা তাদের প্রতি উদাসীন থাকতেন না। সবাইকে সময় দিতেন, সমস্যার কথা শুনতেন, পরামর্শ দিতেন এবং চলার পথ দেখাতেন।[৬৮০]

### ৬.৭ রাজ্য বিস্তারে খানকাহ্'র প্রভাব

সূফী-সাধক বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জাফর খাঁ গাজী, শাহ্ শফীউদ্দীন, শাহ্ জালাল, খানজাহান আলী, ইসমাঈল গাজী মাক্কীসহ অসংখ্য মুজাহিদ-দরবেশ বাংলার মুসলিম রাজ্যসীমা বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। শায়খ আলাউল হক, মুজাফফর

---

৬৭৯. ড. মোহাম্মদ আজিবার রহমান, *আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর খুলনা জেলার আলিমগণের অবদান* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮

৬৮০. ড. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্ক., ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২৩৫

শামস বলখী ও নূর কুতবুল আলমসহ যুগের শ্রেষ্ঠ সূফীরা মুসলিম শাসকদের রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ দান এবং মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদের সময় জনগণের স্বাধীনতা ও ঈমান সুরক্ষায় নেতৃত্ব দান করেছেন। জালাল উদ্দীন তাবরিযী, আখি সিরাজ, শায়খ আলাউল হকসহ বহু মনীষীর পরিচালিত লঙ্গরখানা সে যুগের শাসক-সুলতানদের দানশীলতাকেও হার মানাত। মানব সেবাকে সে যুগের ইসলাম প্রচারক সূফী-সাধকরা কত গুরুত্ব দিতেন তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্-এর সহপাঠি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী নূর কুতবুল আলম-এর জীবন থেকে উল্লেখ করা যায়। উস্তাদ হামীদুদ্দীন নাগুরীর কাছে শিক্ষা লাভ করার পরও পিতার তত্ত্বাবধানে তার পরবর্তী জীবন গড়ে ওঠে। পুত্রকে যথাযথভাবে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য পিতার চেষ্টার অন্ত ছিল না। এ জন্য ভোগ-বিলাসের জীবন থেকে দূরে তাকে কৃচ্ছতাসাধনের জীবনে অভ্যস্ত করে তোলা হয়। পিতার পরিচালিত খানকাহ্ সংশ্লিষ্ট লঙ্গরখানা পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত। ফক্বীর, ভিখারী, মুসাফিরদের কাপড় ধোয়া, তাদের অযূ-গোসলের জন্য পানি গরম করা, খানকাহ্-এর মেঝে ঝাঁড়ু দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তৎসংলগ্ন টয়লেট পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজ তাকে করতে হত। দূরবর্তী বন থেকে লঙ্গরখানার জ্বালানী কাঠও তাকে সংগ্রহ করতে হত। কথিত আছে, একদিন এভাবে জ্বালানী কাঠ বহন করে আনার সময় পথে তার ভাই আযম খাঁর সাথে দেখা হয়। তার ভাই আযম খাঁ গৌড়ের সুলতানের অধীনে মন্ত্রী ছিলেন। নূর কুতবুল আলমের কষ্ট দেখে ভাই আযম খাঁ তাকে এহেন মজুরের কাজ ত্যাগ করে তার অধীনে সম্মানজনক কোন চাকরি গ্রহণে পরামর্শ দেন। কিন্তু সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণের লোভনীয় প্রস্তাব তিনি বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন।[৬৮১] এ ধরনের কঠোর সাধনাও জনসেবার মাধ্যমে সূফী-সাধকরা সাধারণ মানুষের অন্তরের গভীরে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলামের শিক্ষকদের এ প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। গোপাল হালদারের ভাষায়, ইসলামের বলিষ্ঠ ও সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্য সৃষ্টির কাজে এ জনপদের জীবনধারা ও সংস্কৃতির পরাজয় কোন রাষ্ট্রশক্তির কাছে নয়, ইসলামের উদারনীতিও আত্মসচেতনতার কাছে। কারণ ইসলাম একটি সর্বজনীন জীবন বিধান। এটি অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অন্যকে চলার পথও দেখায়।[৬৮২]

### ৬.৮ তরীকত চর্চার প্রাণকেন্দ্র খানকাহ্

পাক-ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন এলাকায় সূফী-সাধক ও পীর-মাশায়িখের এমন সব খানকাহ্ বিদ্যমান, যেখানে পূর্ব থেকে ধর্মীয় প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়ে আসছে। অলী-দরবেশ ও সূফীসাধকরা ইন্তিকালের পর তাঁদের খানকাহ্ কেন্দ্রিক কার্যক্রমে ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নের প্রতিফলন ঘটে। ইসলামের প্রচার-প্রসার ছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক সংস্কৃতি এবং জনহিতকর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। যা বঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষত এসব খানকাহ তরিকত চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবেই যুগ যুগ ধরে এতদ অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করেছে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে যে সকল আধ্যাত্মিক শিক্ষালয় তথা খানকাহ

---

৬৮১. আবদুল মান্নান তালিব, ***বাংলাদেশে ইসলাম***, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৫৪
৬৮২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ***'বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য'***, অগ্রপথিক, ১৭ বর্ষ, সংখ্যা ১০, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৭৫

গড়ে উঠেছে তম্মধ্যে মোহাম্মদপুরের খানকাহ্-এ-ক্বাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, কায়েৎটুলীর খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, মাদারটেক খানকাহ-এ তৈয়বিয়া,বার আউলিয়ার পূর্ণভূমি চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানাধীন বলুয়ার দিঘীরপাড়স্থ খানকাহ্-এ ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানাধীন পশ্চিম ষোলশহরস্থ আলমগীর খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া[৬৮৩] অন্যতম।

## ৬.৯ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্সমূহ

পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে সূফী, অলী-দরবেশগণের ছিল অপরিসীম প্রভাব, যা আপামর জনগণের গৃহাঙ্গম থেকে শুরু করে শাসনকর্তাদের রাজপ্রসাদ পর্যন্ত সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় অনুরাগ, ধর্ম প্রচারে আগ্রহ, আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর মাধ্যমে অসংখ্য সূফী-সাধক শহরে, গ্রামে-গঞ্জে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খানকাহ্'র সাথে মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি জনমানুষকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেন। তন্মধ্যে উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাধক, আলে রাসূল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তিনি প্রথমত: পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হরিপুরের সিরিকোট শরীফে তাঁর পিতা ও মুর্শিদ সিরিকোটি (রহ.)'র মাযারের পাশেই মর্মর পাথর ও লাল পাথর দ্বারা একটি মসজিদে তৈরী করেন, যার কারুকার্য ও মনোরম দৃশ্য দেখলে খোদাভীরু, নবীপ্রেমিক ও অলী ভক্তদের ইবাদতে অনুপ্রেরণা যোগায়। চট্টগ্রাম শহরের বলুয়ার দিঘীর পাড় খানকা্হ-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশে খানকাহ্ ভিত্তিক তরিকত চর্চার এক যুগান্তিকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর পর ষোলশহর এলাকায় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা সংলগ্ন খানাকায়ে কাদিরিয়্যা সৈয়্যদিয়্যা তৈয়্যবিয়্যা তাঁরই নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা কায়েৎটুলিস্থ খানাকায়ে সৈয়্যদিয়্যা তৈয়্যবিয়্যা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত। এ সকল খানকাহ্ শরীফে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও তরীকতের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এবং ইরাক, ইরান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, মালয়শিয়া মধ্যপ্রাচ্য সহ বর্হিবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর ভক্ত অনুরক্তরা তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর পিতা ও তাঁর নামানুসারে অনেক খানকাহ্ তৈরী করেছেন। বর্তমানে ঐ সমস্ত খানকাহ্ তাঁর সুযোগ্য পুত্র আল্লামা তাহের শাহ্ ( মু:যি:আ:) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। নিম্মে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত কয়েকটি খানকাহ্'র পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

### ক. খানকাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, বলুয়া দিঘীর পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম শহরের কোতোয়ালী থানাধীন কোরবানীগঞ্জ বলুদিঘীপাড়াস্থ খানকাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে নূর মোহাম্মদ আল কাদেরী,[৬৮৪] মাস্টার আব্দুল জলিল, দৈনিক

৬৮৩. মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, *গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচী* (চট্টগ্রাম: গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৩

৬৮৪. আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ আল-কাদেরী ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে বাকলিয়ার চর চাক্তাই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স ইন্ড্রাষ্টিজ এর নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং জমিয়তুল ফালাহ্ কমপ্লেক্সের নির্বাচিত গভর্ণর ছিলেন। ৫০-এর দশকের

আজাদীর প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত সাংবাদিক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক, সূফী আবদুল গফুর ও জালাল আহমদ সওদাগরের সহযোগিতায় শাহ্ সূফী সৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটি (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৮৫] খানকাহটি এতদাঞ্চলে মুসলিম মিল্লাতের সমাজ, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান ১২ই রবীউল আউয়াল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শুভাগমন উপলক্ষ্যে শেতালু শরীফের সাজ্জাদানশীন হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)-এর নির্দেশে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে জশনে জুলূসে ঈদ-এ মীলাদুন্নবী শোভাযাত্রা বের হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জশনে জুলুস উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা। পরবর্তীতে হুযূর আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)-এর সদারতে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বলুয়ার দিঘীর পাড়স্থ খানকাহ্ শরীফ থেকে জশনে জুলূস উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের হয়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ষোলশহরস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা ময়দানে গিয়ে শেষ হয়। এখানে তাঁর সভাপতিত্বে বিশাল অনুষ্ঠিত মাহ্‌ফিলে বাংলাদেশের বরেণ্য উলামা-মাশায়িখ উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে মুখরিত করেন এবং তাঁদের সারগর্ভ বক্তব্যে সুন্নি মুসলমান উজ্জীবিত হন। আখেরী মুনাজাতের মাধ্যমে এ মাহ্‌ফিলের সমাপ্তি হয়।

এ খানকায় ১ মুহররম থেকে শুরু করে ১০ই মুহররম পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপি 'পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা মাহফিল' বাদে মাগরিব থেকে পরিচালিত হয়। দেশ-বিদেশের প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ইমামে আলী মাকাম, আহলে বাইতে রাসূল'র উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে থাকেন।

২৯ মুহররম আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আল-কাদেরীর(রহ.) উরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ সফর হাস্‌সানুল হিন্দ আ'লা হযরত ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত, ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পবিত্র উরস শরীফ উদ্‌যাপিত হয়।

১ রবিউল আউয়াল থেকে ১২ রবীউল আউয়াল পর্যন্ত পবিত্র ঈদ-এ মীলাদুন্নবী (স.) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১২ দিন ব্যাপী মীলাদ মাহ্‌ফিল, আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রত্যহ বা'দে মাগরিব থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এশিয়া মহাদেশে ইসলামের বাণী যাঁর মাধ্যমে এসেছে তিনি হলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী (রহ.)। এ মহান সাধকের ওফাত বার্ষিকী হল রজব মাসের ৬ তারিখ। ওফাত বার্ষিকী পালনের জন্য এ খানকাহ্ শরীফে ১ রজব থেকে ৬ রজব পর্যন্ত খাজা গরীবে নাওয়াজের উরশ শরীস উদ্‌যাপনের জন্য পরিচালনা কমিটি-এর পক্ষ থেকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

---

প্রথম ভাগে এ বর্ণাঢ্য কর্মবীর আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর মুবারক হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এর খেদমতে আত্মনিবেদিত ছিলেন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিরিকোট দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া হতে আল-কাদেরী উপাধিতে ভূষিত হন। এ সময় আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)-এর পক্ষ থেকে সিলসিলায়ে কাদেরিয়ার খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মুহররম এ মহান ব্যক্তিত্ব ইন্তিকাল করেন। (এম সেলিম খান চাঁটগামী, বাগে তৈয়্যবাহ্, চট্টগ্রাম : আল্লামা তৈয়্যবিয়া সোসাইটি-বাংলাদেশ ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ১২৫-১২৬

৬৮৫. অফিস রেকর্ড, আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম

২৬ রজব রাত্রে পবিত্র 'লাইলাতুল মি'রাজ'। উপলক্ষে খান্কাহ্ শরীফে মাহ্ফিলের আয়োজন করা হয়।

১৪ শা'বান 'লাইলাতুল ব'রাত' উদ্‌যাপন। শা'বান মাসের দিনগত রজনীতে পবিত্র লাইলাতুল বারাত খানকাহ্ শরীফে পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে মীলাদ-মাহ্ফিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১ রমযান হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর পবিত্র উরস শরীফ। উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

১৭ রমযান 'বদর দিবস' উপলক্ষে রমযান মাসের ১৭ তারিখে 'বদর দিবস' পালন করা হয়।

১০ যিলক্বদ আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমিদয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর প্রতিষ্ঠাতা সিরিকোট দরবারে মহানপীর আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)-এর পবিত্র ওফাত দিবস উপলক্ষে এ খানকাহ্ শরীফ সিরিকোটি (রহ.)-এর উরশ শরীফ উদ্‌যাপন করে থাকেন।

১ জিলহজ্ব হযরত আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)-এর পীর আল্লামা খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.)-এর পবিত্র ওফাত দিবস উপলক্ষে বলুয়ার দিঘী খানকাহ্ শরীফে উরশ মুবারক উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

১৫ জিলহজ্ব আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)-এর পবিত্র ওফাত দিবস উপলক্ষে এ খানকাহ্ শরীফে উরস পালন করা হয়। এতে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ আলোচনা করে আসছেন, তন্মধ্যে খতীবে বাঙাল অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-কাদেরী, খতীব, জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ চট্টগ্রাম, শেরে মিল্লাত মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী, শায়খুল হাদীস জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া চট্টগ্রাম, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ক্বাযী মঈনুদ্দীন আশরাফী মুহাদ্দিস সোহানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম আরো অনেকে।

**খ. আলমগীর খানকাহ্-কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম**

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি যে সকল খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করেন তম্মধ্যে খানকাহ্-এ ক্বাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া  আলমগীর খানকাহ্ শরীফ অন্যতম। তাঁর নির্দেশে তাঁরই সুযোগ্য সন্তান ও খলীফা রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও ত্বরীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.) তাঁর মুরিদ আলহাজ্ব মুহাম্মদ জাকারিয়া, আলহাজ্ব এম এ ওয়াহাব আলকাদেরী, আলহাজ্ব ডা. আবুল হাশেম, আলহাজ্ব আবু মুহাম্মদ তবিবুল আলম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেনসহ অগণিত ভক্তের সহযোগিতায় পশ্চিম ষোলশহর, এশিয়ার বিখ্যাত দীনি শিক্ষানিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার পার্শে বিশাল আয়তনে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে এ খানকাহ্ শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৮৬] খান্ক্বাহ্ শরীফের ভৌত অবকাঠামো, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা উন্নত ও সুশৃঙ্খল পরিচালনায় দীন, মিল্লাত, মাযহাব ও আধ্যাত্মিকতার প্রচার-প্রসারের অনন্য মারকাজে পরিণত হয়।

৬৮৬. ড. আবদুর মাবুদ, *ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে  আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

এখানে নিয়মিত যে সব কর্মসূচি পালিত হয় তা হলো :

১. ১ মুহাররাম থেকে ১০ মুহর্‌রম পর্যন্ত প্রতিদিন বা'দে মাগরিব হতে শোহাদায়ে কারবালার স্মরণে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশ বরেণ্য উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন।

২. ২৫ সফর পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাধক আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেযা খাঁ ফাযিলে বেরলভী স্মরণে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

৩. ১২ রবিউল আউয়াল সিরিকোট দরবারে আলিয়া ক্বাদেরিয়ার বর্তমান সাজ্জাদানশীন হুযূর আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.)'র নেতৃত্বে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী শোভাযাত্রা আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনায় বের করা হয়। এতে দেশ-বিদেশের উলামা-মাশায়িখ, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণপূর্বক অনুষ্ঠানকে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলেন।

৪. ৬ রজব এশিয়া উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারক হযরত খাজা মুঈনদ্দীন চিশতী (রহ.)'র ওফাত দিবস। এ উপলক্ষে আলমগীর খান্‌ক্বাহ্ শরীফে তাঁর উরস মুবারক উদ্‌যাপন করা হয়। এতে উলামায়ে আহলে সুন্নাত উপস্থিত হয়ে নূরানী তাক্বরীর পেশ করেন।

৫. ২৭ রজব মি'রাজ উপলক্ষে আলামগীর খান্‌ক্বাহ্ শরীফে বিশেষ আয়োজন করা হয়। [৬৮৭]

৬. ১৪ শাবান দিনগত রজনীতে জাঁকঝমকভাবে পবিত্র লায়লাতুল বরা'আত পালিত হয়। রাতব্যাপী মাহফিল চলে এবং মুনাজাত শেষে খানকাহ্ শরীফে সহরী পরিবেশন করা হয়।

৭. ১ রমযান থেকে রমযানের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকদিন খান্‌ক্বাহ্ শরীফে ইফতার মাহ্‌ফিল আয়োজন করা হয়। আসরের নামযের পর থেকে খত্‌মে গাউসিয়া শরীফ শুরু হয়ে ইফতারের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে এবং আখেরী মুনাযাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয় এবং ইফতার বিতরণ করা হয়।

৮. ১০ রমযান গিয়ারভী শরীফ, রমযান মাসের ১০ রমযান পবিত্র গিয়ারভী শরীফ উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে মীলাদ মাহ্‌ফিলের আয়োজন করে খান্‌ক্বাহ্ কর্তৃপক্ষ। পবিত্র গিয়ারভী শরীফের অনুষ্ঠানটি মীলাদ-ক্বিয়াম, মুনাযাতের মাধ্যমে শেষ হয়। মাহফিল শেষে রোযাদারদের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়।

৯. ১২ রমযান পবিত্র বারবী শরীফ, রমযান শরীফের ১২ রমযান পবিত্র বারবী শরীফ অনুষ্ঠানটি এ খানকাহ শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। এতে দূর-দূরান্ত থেকে দরবারে 'আলিয়া ক্বাদেরিয়ার ভক্তবৃন্দরা এসে উপস্থিত হয়।

---

৬৮৭. ২৭ রজব রাত্রের শেষাংশে সোমবার নবী করীম (সা.) বিবি উম্মেহানী (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। বিবি উম্মেহানী (রা.) ছিলেন আবূ তালিবের কন্যা এবং নবী করীম (সা.)-এর দুধ বোন। গৃহটি ছিল হেরেম শরীফের ভিতর। হযরত জিব্রাঈল (আ.) নূরের পাখা দিয়ে ঘরের ছাদ দিয়ে প্রবেশ করে, অন্য রেওয়ায়েত মোতাবেক গন্ডদেশ দিয়ে নবী করীম (সা.)-এর কদম মুবারকের তালুতে স্পর্শ করতেই নবী করীম (সা.)-এর তন্দ্রা ছুটে যায়। জিব্রাঈল (আ.) আল্লাহর পক্ষ হতে দাওয়াত জানালেন এবং নবীজীকে জমজমের কাছে নিয়ে গেলেন। সিনা মুবারক বিদীর্ণ করে জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করে মহাশূন্যে ভ্রমণের প্রস্তুতি পর্ব শেষ করলেন। নিকটে বুরাক দন্ডায়মান ছিল। হযরত জিব্রাঈল (আ.) সামনে, মিকাঈল (আ.) পিছনে এবং ইস্রাফীল (আ.) সত্তর হাজার ফেরেস্তার মিছিল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গমন করে। অতি অল্প সময়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-কে সমগ্র মাখলুকা ভ্রমণ করা।

১০. ১৭ রমযান ১৭ রমযান ঐতিহাসিক বদর দিবস পালিত হয়। বদরের যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন এবং গাজী হয়েছেন তাঁদের স্মরণে আলোচনা সভা ও মীলাদ-মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং ইফতার বিতরণ করা হয়।

১১. ২৬ রমযান দিনগত রজনীতে পবিত্র লাইলাতুর ক্বদর উপলক্ষ্যে খান্ক্বাহ্ শরীফে সারারাত ব্যাপী মাহফিল হয় এবং মুনাজান শেষে সাহরী পরিবেশন করা হয়।

১২. ১১ যিলক্বদ আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট অলী, সূফী-সাধক আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)-এর ওফাত দিবস উপলক্ষ্যে। উক্ত খান্ক্বাহ্ শরীফে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

১৩. ১ যিলহাজ্ব হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.)-এর ওরশ শরীফ, আন্জুমান-ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনায় খানকাহ্ শরীফে নির্ধারিত কর্মসূচিতে উরশ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়।

১৪. ১৫ যিলহাজ্ব সিরিকোট দরবারে 'আলিয়া ক্বাদেরিয়ার সাজ্জাদানশীন রাহ্নুমায়ে শরী'আত ওয়া ত্বারীক্বাত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ওফাত বার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে খান্ক্বাহ্ শরীফ কর্তৃপক্ষ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ময়দানে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মরীদ ও ভক্ত-অনুরক্তরা এসে উপস্থিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রখ্যাত আলেম-ওলামাগণ হযূর ক্বেবলাহ্ (রহ.)  সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন।

১৫. প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বা'দে ফযর খত্মে গাউসিয়া শরীফ অনুষ্ঠিত হয়।

খানকাহ্'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত শায়খুল হাদীস, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফক্বীহ্গণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কামিল শ্রেণীর ছাত্রদের সিহাহ্ সিত্তাসহ, তাফসীর ও ফিক্হ বিষয়ের বিশেষ ক্লাসকার্যক্রম পরিচালিত হয়। চট্টগ্রামের খানকাহ্সমূহে প্রত্যেক অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন দেশবরণ্য, ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী  উলামায়ে কেরামগণ

উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ তথা মক্তব শিক্ষার উন্নয়নে খানকাহ্গুলো গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শৈশবকাল থেকে মুসলিম শিশুরা ইসলামী মৌলিক শিক্ষা ও আক্বীদার বলয়ে বেড়ে উঠে। বাস্তব জীবনে ইসলামী অনুশাসন, অনুসরণ-অনুকরণে মক্তব শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তা বাস্তবায়িত হয় খানকাহ্ কেন্দ্রীক মক্তব শিক্ষার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

## গ. খানকাহ্-এ-ক্বাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, কায়েৎটুলী, ঢাকা

সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়ার বাংলাদেশের সর্বপ্রথম খানকাহ্ হল, ঢাকার কায়েৎটুলী খান্কাহ্-ই সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া। উক্ত খানকাহ্টি **১৯৫৭** খ্রিস্টাব্দে আওলাদে রাসূল খলীফা-ই হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.)হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)তাঁর বক্তবৃন্দের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৮৮] সুদীর্ঘকাল ব্যাপী এ খানকাহ্ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের

৬৮৮. মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, *সিরিকোট থেকে রেঙ্গুন* (চট্টগ্রাম: চাটগাঁ প্রকাশন, ২য় সংস্ক., ২০১০ খ্রি./ ১৪৩১ হি.), পৃ. ১৩২

পাশাপাশি আধ্যাত্মিকভাবে ঈমান-আক্বীদাহ্, মিল্লাত-মাযহাব ইত্যাদির সকল প্রচার-প্রসারে এতদাঞ্চলের নবী ও অলীপ্রেমিক আপামর জনসাধারণকে মৌলিক ইবাদতের পাশাপাশি বিলায়তের অমীয় সুধা পান করার উদ্দেশ্যে হুযূর ক্বিবলা শাহ সুফী সৈয়্যদ আহম্মদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)এ খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। এতে হিজরী সনের প্রতিটি মাসে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি অত্যন্ত ঝাঁক-জমকপূর্ণভাবে পালিত হয়।

বিশেষত : ১০ ই মহররম পবিত্র আশুরা, সফর মাসের শেষ বুধবার আখেরী চাহার শোম্বা, পঁচিশ সফর মুজাদ্দিদ-ই দীনো মিল্লাত শাহ্ আহমদ রেযা খাঁন ফাজেলে বেরলভী (রহ.)'র উরস শরীফ, ১ লা রবিউল আউয়াল থেকে ১২ই রবিউল আউয়াল পর্যন্ত ১২ দিনব্যাপি ঈদে মিলাদুন্নবী সেমিনার, ৬ই রজব হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.)'র উরস, ২৬শে রজব দিবাগত রাত পবিত্র মি'রাজুন্নবী, ১৪ই শা'বান দিবাগত রাত পবিত্র লাইলাতুল বরা'আত, রবিউস সানী মাসে পবিত্র ফাতিহা-ইয়াজদাহুম, ১৭ই রমজান বদর দিবস, ১০ই জিলক্বদ রাত্রে হযরত সৈয়্যদ আহমদ (রহ.)'র উরস মোবারক, ১ জিলহজ্ব হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌরহভী (রহ.)'র উরস এবং ১৫ জিলহজ্ব হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ্ (রহ.)'র উরস পালন করা হয়।[৬৮৯] এসব অনুষ্ঠানাদির পাশাপাশি এ খানকাহ্ বিভিন্ন ধরনের সেবাধর্মী কর্মকাণ্ড ও পরিচালনা করে। উক্ত খানকায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে জ্ঞান গর্ভ আলোচনা ও সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে

১. মাওলানা মুহাম্মদ এম এ মান্নান (প্রাক্তন ধর্মমন্ত্রী), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব।
২. হযরত মাওলানা খাজা আবূ তাহের (রহ.), সাবেক খতীব, কমলাপুর রেলষ্টেশন জামে মসজিদ, ঢাকা।
৩. ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন, সাবেক প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৪. মাওলানা মুহাম্মদ আমীমূল ইসলাম, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সম্পাদক, মাসিক আল বালাগ।
৫. মাওলানা বাকি বিল্লাহ্ আলকাদেরী, প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণগঞ্জ সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা।
৬. মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারূকী, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।
৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল, সাবেক অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৮. ড.এম.এ অদূদ, প্রফেসর, ইসলামি স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯. হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আলীম রেযভী, অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১০. মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, উপাধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৬৮৯. গবেষকের সরেজমিন জরিপ

১১. মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, মুফাস্‌সির, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম ও খতীব গাউসুল আজম রেলওয়ে জামে মসজিদ, শাহাজানপুর, ঢাকা।
১২. মাওলানা মুহাম্মদ মাহমদুল হাসান, প্রধান ফক্বীহ্, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান আল-ক্বাদিরী, আরবী প্রভাষক, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৪. ড. মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন, আরবী প্রভাষক, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, ফক্বীহ্, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৬. মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন আল আযহারী, মুহাদ্দিস, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

এ খানকাহ্ শরীফে এভাবে বহু বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এসে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। অনেকেই এ পৃথিবী ছেড়ে জান্নাতবাসী হয়েছেন। ঢাকার কায়েৎটুলীস্থ খানকাহ্ শরীফটি আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত হয়ে এদেশে সুন্নিমতাদর্শ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ্ প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এ খানকাহ্ শরীফটি বর্তমানে পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন মুহাম্মদ আবুল কাশেম।

উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ তথা মক্তব শিক্ষার উন্নয়নে উপরোক্ত খানকাহ্গুলোর গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যার দরুণ শৈশবকাল থেকে মুসলিম শিশুরা ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষা ও আক্বীদার বলয়ে বেড়ে উঠে। যা বাস্তব জীবনে ইসলামী অনুশাসন অনুসরণ-অনুকরণে এ মক্তব শিক্ষার বিশেষ একটি ভূমিকা রয়েছে। আর তা বাস্তবায়িত হয় খানকাহ্ কেন্দ্রীক মক্তব শিক্ষার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

## ঘ. খানকাহ্-এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া, মাদারটেক, ঢাকা

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ১৯৬৬ খ্রি. শীতকালীন সফরে সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়ার প্রচার-প্রসার কল্পে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পূর্বাঞ্চলের শেষ সীমানায় বর্তমান ২নং ওয়ার্ডে বায়তুস সালাম জামে মসজিদ (পূর্বের সাপড়া মসজিদ) এর পেছনে অবস্থিত আলহাজ্ব মতিউর রহমান সাহেবের বাসায় আগমন করে মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করেন।

দ্বিতীয় বারে আগমন করেন ১৯৬৮ সালে। আওলাদে রাসুলের ভালবাসায় সীক্ত হয়ে মাদারটেকের বহু স্থানীয় মুরুব্বী ও যুবকেরা তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলেয়ায় তরীকতের চর্চার প্রাথমিক সূচনা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী সফরে এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব মোহাম্মদ মতিউর রহমান ও সাবেক কমিশনার আলহাজ্ব মোহাম্মদ রহমত আলী সাহেবের বাবা মরহুম রজ্জব আলী সাহেব হুযূরের কাছে তরীকতের প্রচার ও প্রসারকে স্বানীত

করার জন্য সপ্তাহে ১দিন গাউছিয়া শরীফের অনুমতি প্রার্থনা করলে সপ্তাহের বৃহঃবার হুযূর কেবলা গাউছিয়া শরীফের মতো মহতি মাহফিলের অনুমতি প্রদান করেন। সেই থেকে ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চলের মাদারটেক, বাসাবো, দক্ষিণগাঁও, তিলপা পাড়া, শাহজাহানপুর, কমলাপুর, ধলপুর, মুগদা, মানিকনগর, সায়দাবাদ ও যাত্রাবড়ী এলাকার বিভিন্ন বাসায় গাউছিয়া শরীফের মতো পবিত্র মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ফলে এসব অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ তরীকতে দাখিল হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সদারতে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল আয়োজনের নির্দেশনা দিলে আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ঢাকা'র সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে মাদারটেকে অনুষ্ঠিত মাহফিলটি ছিল ঐতিহাসিক।

এই মাহফিলে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার শীর্ষ স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে শায়খুল হাদিস আল্লামা ফজলুল করিম নকশবন্দী (রহঃ), অধ্যক্ষ আল্লামা জালাল উদ্দিন আল কাদেরী (রহঃ), শের-এ মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী), কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ জলিল (রহঃ), আল্লামা খাজা আবু তাহের (রহঃ) সহ অসংখ্য আলেমের উপস্থিতিতে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন- "ঢাকার পূর্বদিক থেকে আমি প্রিয় নবী (সা.) এর আশেকের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। এই মহান উক্তির মাধ্যমে এই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার সুন্নী ওলামায়ে কেরামের পদার্পণ শুরু হলে সহজ সরল সাধারণ মুসলমানগণ ধীরে ধীরে নবীপ্রেমে উজ্জীবিত হতে থাকে।

১৯৮৬ সালে ঐতিহাসিক মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল থেকে শুরু করে প্রতি বছর একই স্থানে বর্তমান সাজ্জাদানসীন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী সদারত করে আসছেন।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। শীতকালীন সফরে বাংলাদেশে শুভাগমন করলে মাদারটেক আবদুল আজিজ স্কুল ময়দানে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাহাফিল ১৯৯০ আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ঢাকার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আয়োজন হলে মাহফিলের আগের দিন সার্বিক প্রস্তুতি ও কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার জন্য আল্লামা খাজা আবু তাহের (রহ.) মাদারটেকে আসেন। আসার পর তৎকালীন মরহুম মকবুল হোসেন সাহেবের নির্মানাধীন বাড়ীর নীচ তলায় এলাকার প্রবীণ মুরুব্বী বিশেষত মরহুম রজ্জব আলী, মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা তাজুল ইসলাম ও মরহুম মকবুল হোসেন সহ অসংখ্য পীর ভাইয়ের উপস্থিতিতে আল্লামা খাজা আবু তাহের (রহ.) মিলাদুন্নবী মাহফিলের সার্বিক কার্যক্রমের ব্যাখ্যা শুনেন। উক্ত ব্যাখ্যা প্রদানকালে এলাকার মুরুব্বীদের অর্ন্তনিহীত আখাঙ্খা এই অঞ্চলে সিলসিলার প্রচার প্রসারে সিলসিলায়ে আলেয়া কাদেরিয়ার একটি খানকা শরীফ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আলহাজ্ব মাওলানা তাজুল ইসলাম পীর ভাইদের পক্ষে তোলে ধরেন। তৎক্ষণাৎ

আল্লামা খাজা আবু তাহের (রহ.) উক্ত মহতি উদ্যোগ ও পবিত্র প্রস্তাবটি পরের দিন বর্তমান হুযূর কেবলার নিকট আরজি পেশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেমন কথা তেমন কাজ। পরের দিন আসর ও মাগরিবের নামাজের পর মাদারটেক আবদুল আজিজ স্কুল ময়দানের মাহফিলে যাওয়ার পূর্বে মরহুম মকবুল হোসেনের ৮২/৬ মাদারটেক, বাসাবো, ঢাকা-১২১৪ নির্মানাধীন ভবনের নীচ তলায় হুযূর কেবলায়ে আলম ও আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম ও ঢাকার পরম শ্রদ্ধেয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উপরে উল্লেখিত দেশের শীর্ষ স্থানীয় ওলামায়ে কেরামের সম্মুখে আল্লামা খাজা আবু তাহের (রহ.) এর হাতে খানকা শরীফের নাম খানকায়ে তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া লিখে পীর ভাইদের পক্ষে মাওলানা তাজুল ইসলাম (রহ.) প্রদান করেন। আল্লামা খাজা আবু তাহের (রহ.) শের-এ মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী মাদ্দাজিল্লুহুল আলী ও অধ্যক্ষ হাফেজ আবদুল জলিল (রহ.) এর কাছে প্রস্তাবটি প্রদান করতে চাইলে ওনারা হুযূর কেবলার উপস্থিতিতে খাজা আবু তাহের (রহ.) এর হাতে এ আরজি পেশ করার পরামর্শ দেন।

খাজা আবু তাহের (রহ.) বলেন– হুযূর ইস জাগামে খানকায়ে কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া হোনে কে লিয়ে পীর ভাইয়োকা আরজি হে।

আরজি পেশ করার সাথে সাথে হুযূর কেবলায়ে আলম অনুমোদন দিয়ে দোআ করেন।

এর পর হতে অত্র অঞ্চলে সিলসিলার কার্যক্রম প্রচারের বিষয়টি উক্ত খানকা শরীফ থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছে।

**৬. অন্যান্য খানকাহ্**

উপর্যুক্ত খানকাহ্গুলো ছাড়া আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.)'র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশনায় আরো কিছু প্রসিদ্ধ খানকাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার একটি সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া
   পুরাতন জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
২. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া
   বৈলতলী রোড, পটিয়া পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
৩. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া
   পেশকার পাড়া, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৪. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়া
   চন্দঁনাইশ, চট্টগ্রাম।
৫. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া
   বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৬. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া
   কদলপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৭. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া
   চৌধুরী পাড়া, কোয়েপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।

৮. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া
নুনিয়াছড়া, বিমানবন্দর সড়ক, কক্সবাজার।

৯. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া
মৌলভী বাজার, হ্নীলা, টেকনাফ, কক্সবাজার।

১০. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া
মধ্যম আশ্রমপুর, কুমিল্লা।

১১. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১২. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া
বালুয়াহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

১৩. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

১৪. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া
জঙ্গল খাইন, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১৫. খানকাহ্-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া
পাঠানদণ্ডী, চঁন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

উল্লিখিত খানকাহ্ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো বহু খানকাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ সব খানকাহ্ সমাজের মুসলিম মিল্লাতের ইবাদত বান্দেগীর কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার পরশ দিয়ে যুব সমাজকে তরীকতের আলোয় আলোকিত করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

# সপ্তম অধ্যায়

## ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ভূমিকা

### ৭.১ ইসলামী সংস্কৃতি

আরবী তাহযীব শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে সংস্কৃতি। ইসলামী পরিভাষায় শব্দটি বহুল প্রচলিত। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল-উৎকর্ষ, অনুশীলন বা সংশোধন। ইংরেজীতে Culture বলা হয়। Cultivation শব্দ থেকে Culture শব্দের উৎপত্তি। Culture এসেছে জার্মান Kulture থেকে।[৬৯০] বাংলায় সংস্কৃতি শব্দটি কৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং Cultivation অর্থ- কর্ষণ Culture অর্থ কৃষ্টি। অতএব কর্ষণ থেকে কৃষ্টি। জমিকে যেমন চাষপোযোগী করার জন্য কর্ষণ করে আগাছামুক্ত করা হয়, জীবনকেও তেমনি সৌন্দর্যমণ্ডিত, মার্জিত, রুচিসম্মত ও মহিমাময় করে তোলাই সংস্কৃতির লক্ষ্য।[৬৯১]

আমেরিকার নৃবিজ্ঞানী এ.এল ক্রোয়েবার ও ক্লাইভ ক্লাক হন ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃতির ১৬৪ টি সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করেন।

এড ওয়ার্ড বার্নেট টেইলর (E.B. Tylor) নামক এক বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী তার Primitive Culture গ্রন্থে নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ; যা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হিসাবে বিবেচিত। তাঁর মতে 'সংস্কৃত হল একাধিক অংশ নিয়ে গঠিত একটা সমন্বিত রূপ। যেটাতে রয়েছে জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতিমালা, আইন প্রথা এবং অন্যান্য অভ্যাসসমূহ। যেগুলো একজন লোক সমাজের সভ্য হিসাবে অর্জন করে থাকে।[৬৯২]

সভ্যতার গবেষক হুমায়ূন কবীরের মতে, সংস্কৃতি বলতে Expression of life আর সভ্যতা বলতে Organization of life কে বোঝানো হয়। তাই সংস্কৃতি হলো জীবনবোধ আর সভ্যতা হলো জীবনব্যবস্থা।[৬৯৩]

ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বুঝায়, স্রষ্টার নির্দেশিত, প্রিয়নবীর প্রদর্শিত কুরআন সুন্নাহ্‌র সমর্থিত তথা ইসলামী শরী'আতের অনুমোদিত সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতি। এক কথায় ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয়।

#### ৭.১.১ ইসলামী সংস্কৃতির উৎস

মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রই ইসলামী সংস্কৃতির মূল উৎস। কুরআন, সুন্নাহ্ ইজমা, কিয়াসের সমষ্টি বিধান চতুষ্টয় অনুমোদন করে না এমন কোন বিষয় ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত, কিতাব, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ে ঈমান পোষণ

---

৬৯০. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, ***ইসলামী সভ্যতা***, (ঢাকা : মেরিট কেয়ার প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী ২০১৫), পৃ. ২১

৬৯১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, ***বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান***, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী. ডিসেম্বর ২০০০), পৃ. ১১০৩

৬৯২. E.B. Tylor, ***Primitive Culture***, 1871, P. 1

৬৯৩. Humayun Kabir, ***The Indian Heritage***, (Dhaka : Bangla Academy, 1984), P. 37

করে, সে ব্যক্তিই ইসলামী সংস্কৃতির সীমার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। এভাবে ইসলামী সংস্কৃতি এক বিশ্বজনীন জাতীয়তা গঠন করে, যার মধ্যে বর্ণ, গোত্র, ভাষা, নির্বিশেষে সব মানুষকেই প্রবেশ করতে পারে। [৬৯৪]

### ৭.১.২ ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তাধারা বিবর্জিত সংস্কৃতি মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী মুহাম্মদ মার্মাডিউক নিক্থলে এর মতে ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য মানব জীবনের আনুসাঙ্গিক উপকরণগুলোর সৌন্দর্য বর্ধন, পরিমার্জন ও পরিশীলন নয় বস্তুত: সামগ্রিক মানব জীবনকে সুন্দরতম, মহত্তর, মহিমামণ্ডিত করাই সংস্কৃতির লক্ষ্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে ইসলামী সংস্কৃতির মূলোৎপাটনে চলছে গভীর ষড়যন্ত্র। একদিকে আল্লাহ্দ্রোহী, নাস্তিক্যবাদীরা সভ্যতা সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের ভোগবাদ ও বস্তুবাদের প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। অন্যদিকে ইসলাম নামধারী বাতিল অপশক্তিরা মুসলিম সমাজ জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির যে প্রভাব রয়েছে সে প্রভাবটুকু মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর অবস্থাও চরম বেদনাদায়ক।

## ৭.২ ইসলামী সংস্কৃতির বিবর্তন ও রূপরেখা

ইসলামী সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে ব্যাপক পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে মূলত: ইসলামের চার দলীলের ভিত্তিতে- কিতাবুল্লাহ্, সুন্নাহ্, ইজমা ও ক্বিয়াস। কুরআনুল করীম হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম  মারফত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র  কাছে প্রেরিত আল্লাহ্র  বাণী বা 'ওহী'। 'সুন্নাহ্' বলতে বুঝাচ্ছি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কর্ম, বাণী ও অনুমোদন, যেগুলো খোদ্ রাসূলে পাকের জন্য  খাস নয়; উম্মতের আমল করার জন্য প্রযোজ্য।

এগুলো ছাড়াও খুলাফা-ই রাশেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম'র সুন্নাত সমূহও 'সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত। কুরআন-সুন্নাহ্ মূলত আল্লাহ্রই পক্ষ হতে এসেছে। এ দু'টি ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি। এ দুই ভিত্তি'র আলোকেই ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমত হলো ইজমা। কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা'র অনুসরণে কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত পরিবেশ, সমস্যা ও পরিস্থিতির আলোকে গবেষণা করে ক্বিয়াস বা অনুমান ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠবে। এভাবে ইসলামী সংস্কৃতি বিনির্মাণের অবারিত ধারা চলতে থাকবে, যা কখনো শেষ হবে না। উল্লেখ্য, বর্ণিত উৎসগুলো শেষ নবী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সময় থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম পুরুষ হযরত আদম আলায়হিস সালাম এবং প্রথম নারী হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম'র জীবনাচার'র বিবর্তন' ও আজকের সংস্কৃতির আদিতম উৎস, যা তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়ে এবং তাদের মধ্যে সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হয়ে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)'র হাতে পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত সেই রূপরেখা অনুসরণ করেই সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ মানব সমাজের স্রোতে ভেসে কালের শেষ সীমানা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। যদিও এ সাংস্কৃতির ধারা আদম-হাওয়া আলায়হিমাস। সালাম'র মাধ্যমেই সর্বপ্রথম এ দুনিয়ায় প্রবেশ করে, পক্ষান্তরে একটি প্রশ্ন থেকে

৬৯৪. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামী সভ্যতা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

যায় 'অপসংস্কৃতি' সম্পর্কে। অপসংস্কৃতির উৎস ও বিকাশ কিভাবে হলো- আর এর সহজ উত্তর হলো এই যে, এ অপসংস্কৃতির উৎস এর বিকাশ মানুষের আদি শত্রু ইবলীসের মাধ্যমে। আল্লাহ্‌র বিধান ও নির্দেশের প্রতি বিনা প্রশ্নে অনুগত হওয়ার ফেরেশতা আচরণ এ উভয় বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীতে বিকশিত হয় এ পৃথিবীতে। হযরত আদম আলায়হিস সালাম এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণ তথা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এ ফেরেশতা মনোভাবের বিকাশ ঘটতে থাকে, যাঁর নামই সংস্কৃতি বা ইসলামী সংস্কৃতি। আর পরবর্তীতে ইবলিস শয়তানের প্ররোচণায় স্রষ্টা বিস্মৃত পথভ্রষ্ট মানব সমাজের মাধ্যমে প্রসারিত বিশ্বাস ও আচার-আচরণই হলো অপসংস্কৃতি।

সুতরাং সংস্কৃতি নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসা এক মহান নিয়ামত যা দুনিয়াকে জান্নাতের মরূদ্যানে পরিণত করতে পারে। আর পক্ষান্তরে, অপসংস্কৃতি হলো শয়তানী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ যা সৃষ্টির সেরা মানুষকে নিকৃষ্ট জীব-জানোয়ারের পর্যায়ে নামিয়ে দুনিয়াতে অশান্তি ও আখিরাতে কষ্টদায়ক ভয়াবহ্ নরক যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত করে। মানুষ নবীগণের শিক্ষায় সংস্কৃতিবান হয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর শয়তানী প্ররোচনায় নিজের মনগড়া বিশ্বাস ও আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বিতাড়িত ইবলিসের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কারণে আল্লাহ্‌র গজব ডেকে আনে। উল্লেখ থাকে যে, সেদিন আদম আলায়হিস সালামকে সম্মান না করার অপরাধে বিতাড়িত ইবলিস, তাঁর হাজার হাজার বছরের ইবাদতের বদলা হিসেবে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে এমন একটি ক্ষমতা অর্জন করেছিল, যেন সে মানুষের একটি বিশাল অংশকে প্ররোচনা দিয়ে তার সঙ্গী হিসেবে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। তাঁর এই শক্তির মহড়া সেদিন থেকে শুরু হয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এভাবে সৃষ্টির শুরু থেকে একদল মানুষ নবীগণের আদর্শে সংস্কৃতিবান হয়ে জান্নাতের দিকে আর অপর দল শয়তানের অপসংস্কৃতিতে মগ্ন হয়ে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। আল্লাহ্‌র খলীফাগণ সত্যের দিকে আর শয়তান তাঁর বিপরীতে নেতৃত্ব দিয়ে পৃথিবীর দিকে ধাবিত করবে। মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে, শয়তানের প্ররোচনায় নিজের ভালো-মন্দের বিধান নিজেরা তৈরী করে পৃথিবীতে অশান্তি-হানাহানি বাড়িয়ে দেয়, ঠিক তখনি আল্লাহ্ পাক তাঁর সে বান্দাদের ফিরিয়ে আনতে পাঠিয়ে দেন উক্ত অঞ্চলের মানুষের একই ভাষাভাষি কোন নবী রাসূল আলায়হিমুস্ সালামকে। এভাবে হযরত আদম (আ:) থেকে খলীফা প্রেরণের কথা আমরা জেনে আসছি। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সা.)'র পর আর কোন নবী প্রেরণ করবেন না, সেহেতু তাঁর হাতেই দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষণা করা হয়; যাতে করে মানুষ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামের সংস্কৃতি অতিক্রম করার কোনো প্রয়োজন না হয়।[৬৯৫]

### ৭.৩ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে মুসলিম মিল্লাত

সংস্কৃতি একটি জাতির নিয়ামক শক্তি। জাতির চিন্তা চেতনা, ধ্যাণ-ধারণা, আচার আচরণ, চাল-ধ্যান চলন সবকিছু তার সংস্কৃতির পরিচায়ক। অথচ মুসলিম মিল্লাত আজ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার, অপসংস্কৃতির কবলে সমাজ জীবন আজ কলুষিত। ডিস এন্টিনা, এন্ড্রয়েড মোবাইল এর আমদানির ফলে মুসলিম পরিবারগুলো আজ সিনেমা হলে পরিণত, নগ্নচিত্র, অশ্লীল সাহিত্য,

৬৯৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সম্পাদিত *দা'ওয়াত* (চট্টগ্রাম আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, ২০১৬), পৃ. ২০৮

কুরুচিপূর্ণ নাটক, ছায়াছবি, মদ, জুয়া, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি আজকের মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃতি চর্চার নামে চলছে পাশ্চাত্যের অন্ধ দাসত্ব। জাতির এহেন নাজুক সন্ধিক্ষণে সমাজকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ নেই। তাই আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগন সময়োপযুগী কিছু সাংস্কৃতিক কর্মসূর্চি আবিস্কার ও প্রচলন করে থাকেন যা চর্চার ফলে সমাজে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উক্ত সাংস্কৃতি চর্চার ফলে মানুষ অনুভব করতে পারে ইসলাম কত সুন্দর। প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামী অনুশাসনের অনুশীলন, বিশ্ব মানবতার মুক্তির মডেল প্রিয় নবী (সা.)'র আদর্শ অনুসরণ এবং তাঁর প্রেমে উজ্জীবিত হয় এমন সকল কার্যক্রম তথা হামদ-নাত, জিকির-আজকার, মিলাদ-কিয়াম, ফাতিহা, দরুদ-সালাম, জশ্‌নে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.), আজানের আগে ও পরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাত-সালাম পাঠ, উরস,[৬৯৬] ইসালে সাওয়াব,[৬৯৭] খত্‌মে গাউসিয়া শরীফ, গেয়ারভী শরীফ, বারভী শরীফ ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে ইসলামী সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতি, নবীপ্রেম ও অলী আল্লাহ্‌দের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়।

### ৭.৪ ইসলামী সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.)'র ভূমিকা

যে জাতির সাংস্কৃতিক অঙ্গন যতবেশী সমৃদ্ধ, সে জাতি উন্নত জাতি হিসেবে ততবেশী প্রতিষ্ঠিত। তাই যুগে-যুগে মনীষীরা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। বিশেষত: ইসলামি সংস্কৃতি মানুষের হৃদয়কে খুব বেশী আন্দোলিত করে। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)ইসলামী সাংস্কৃতিক জগতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী সংযোজন করে মুসলিম সমাজে এক বিপ্লব সাধিত করেন। শতাব্দীর সংস্কারক হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফিজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.)ছিলেন এসব আদর্শ-সংস্কৃতির পুনর্জীবন দানকারী। আদর্শ সংস্কৃতি বিনির্মাণে এ মহামনীষী আজীবন কার্যকরী ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।[৬৯৮]

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে শাহানশাহে সিরিকোট কর্তৃক 'সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরিয়া'র প্রধান খলীফা মনোনীত হয়ে। ১৯৬১ ইংরেজী সনে সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইন্তিকাল করার পর হতে দ্বীন ও তরীকতের ময়দানে এক অকুতোভয় সিপাহসালার হিসেবে

---

৬৯৬. 'উরস' (عرس)-এর আভিধানিক অর্থ বিবাহ। বর ও কনে উভয়কে আরবীতে 'আরূস' (عروس) বলা হয়। বাসর, প্রীতিভোজ, ওলীমাহ্ (وليمه - طعام - زفاف)কেও উরস বলা হয়। এর বহুবচন হয় 'আ'রাস' ও 'উরূসাত' (اعراس وعروسات)। পরিভাষায়, বুযুর্গগানে দ্বীন-এর ওফাত দিবসকে 'উরস' বলা হয়। এর ভিত্তি হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, মুন্‌কার ও নাকীর যখন মৃত ব্যক্তির কবরে এসে প্রশ্ন করবে, তখন ওই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করতে সক্ষম হলে মৃত ব্যক্তিকে বলা হয়- نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَايُوْقِظُه اِلاَّ اَحَبُّ اَهْلِه اِلَيْهِ অর্থাৎ ওই দুলহানের মত ঘুমিয়ে পড়, যাকে পরিবারে তার প্রিয়তম ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ জাগাবে না। ওই দিন মুন্‌কার ও নাকীর ফিরিশ্‌তাদ্বয় তাকে 'আরূস' (عَرُوْس) নামে আখ্যায়িত করে। এ জন্য ওই ওফাত দিবসকে 'উরস' (عُرْس) বলা হয়।

৬৯৭. 'ঈসাল' শব্দের অর্থ পৌঁছানো আর 'সওয়াব' অর্থ পূণ্য। পরিভাষায় জীবিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তিদের রূহের মাগফিরাত অথবা মর্যদা বুলন্দের উদ্দেশ্যে কুরআন খানি যিকির-আযকার, দরূদ-সালাম ইত্যাদি পাঠের মাধ্যমে সওয়াব পোঁছানোর ব্যবস্থাকে ঈসালে সওয়াব বলে। (জা'আল হক, মুহাম্মদী কুতুবখানা, খ. ২, পৃ. ৪২)

৬৯৮. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

আবির্ভূত হন। হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র জীবদ্দশায় কয়েকবার এবং তাঁর ইন্তিকালের পর হতে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশে সফর করে 'কাদেরিয়া তরীক্বা' এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের ব্যাপক সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।[৬৯৯]এছাড়া তিনি বার্মার রেঙ্গুন সফর করে শরীয়ত ও তরীকতের ব্যাপক কল্যাণ সাধন করেছিলেন। ১৯৮৬ হতে ১৯৯৩ ইংরেজী পর্যন্ত চিঠিপত্র মারফত দেশ ও বিদেশের অনুগতদেরকে তিনি দ্বীনি কাজে সচল রেখেছেন। উল্লেখ্য, বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো এদেশে তাঁর দ্বীনী খেদমত নজির বিহীন। বিশেষ করে ১৯৬১ হতে ১৯৯৩ খ্রি: পর্যন্ত অর্থাৎ হিজরী ১৩৮০ হতে ১৪১৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ তেতত্রিশ বছরে এদেশের মুসলমানদের অন্তর-রাজ্যে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এক মহা ঈমানী প্লাবন প্রবাহিত করেন। মুসলিম সমাজে ইসলামী সংস্কৃতির কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়ে ইসলামী সংস্কতির অঙ্গনকে করেন অনেক সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের ইসলামী সংস্কৃতির কয়েকটি অবদান তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম-

### ৭.৪.১ জশনে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.)

৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল এ প্রিয়নবীজির শুভাগমন বিশ্ববাসীর মহান নেয়ামত। সেই নেয়ামত প্রাপ্তিকে উপলক্ষ করে আনন্দ প্রকাশ করার নাম ঈদে মিলাদুন্নবী। নিয়ামত প্রাপ্তিকে উপলক্ষ করে খুশী উদযাপন করার নির্দেশ পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে রাহমাতুল লিল আলামীনের আগমনী দিবসকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে ঈদ উদযাপিত হয়ে আসছে। মাহফিলের মাধ্যমে কেউ বা বাঙ্গালী ভোজের মাধ্যমে আবার বর্ণাট্য র‍্যালীর মাধ্যমে যুগের সংস্কারক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)বাংলাদেশে মুসলমানদের কে নবী প্রেমে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে এক নতুন মাত্রা দিলেন জশনে জুলূছের মাধ্যমে শুভাগমনের দিবসকে ঈদ হিসেবে পালনের যুগোপযোগী এক অতি উত্তম কর্মসূচী হিসেবে 'জশনে জুলূসে[৭০০] ঈদে মিলাদুন্নবী প্রচলন করেন।[৭০১]

---

৬৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

৭০০. জশনে জুলূস : জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) আমাদের ধর্মের মৌলিক উৎসব থেকে উৎসারিত। এ ঈদ বা আনন্দোৎসব পালিত হয় প্রথম সৃষ্টি নূরের নবী হুযূর করীম (সা.) এর শুভ আবির্ভাব উপলক্ষ্যে। এ প্রসঙ্গে শাইখ মুহাক্কীক্ব হযরত শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন, "এটি এক শাশ্বত ও চিরন্তন সত্য যে, সৃষ্টিকুলের প্রথম এবং সমগ্র কায়েনাত সৃষ্টির কারণ আর তামাম আলম ও আদম (আ.) পয়দা হওয়ার মাধ্যম হল নূরে মুহাম্মদী (সা.)। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী'। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টি আগে আমার নূর সৃষ্টির করেছেন। সকল উর্ধজগতও তাঁরই নূর থেকে সৃষ্ট। তাঁরই নূরানী (মূল একক) সত্তা থেকে আত্মাসমূহ, কায়াসমূহ, আরশ ও কুরসী, লওহ, কলম, জান্নাত, দুযোখ, আসমান, যমীন, জ্বীন, ইনসান এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

সমগ্র সৃষ্টি ও সকল নবীরও পূর্বে ছিল মুহাম্মদী সত্তা (সা.)। এটা কুর'আন কারীম দ্বারা ইঙ্গিত এবং বিশুদ্ধ হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وما ارسلنا ك الا رحمة للعا لمين "হে হাবীব, আমি আপনাকে সমগ্র জগতের রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছি" (আল কুরান- ২১ : ১০৭)। সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সা.) কে নিয়ে হুদায়বিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। দশ সহস্র সাহাবীর সুসংহত পদযাত্রা যখন মক্কা শরীফ বিজয়ের পবিত্র উল্লাসে রাজপথ কাঁপিয়ে তাকবীর ও হামদ-নাত পড়ে পুরা কোরাশ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, আজকের জশনে জুলূস এর শোভাযাত্রার রূপরেখা সেই বিজয় মিছিলের অনুকরণ। মক্কার কাবাগৃহের ৩৬০ মূর্তি থেকে খোদার ঘরকে মুক্ত করতে আসা সেই শোভাযাত্রার অগ্রনায়ক ছিলেন রাহমাতুলিল আলামীন (সা.)। বিজয় বা তার সূচনাকে কুরআনুল কারীমে 'ফাতহি মুবীন' বলা হয়েছে। নবীর শুভজন্মের পবিত্র মুহূর্তে সদল বলে ফেরেশতাদের অবতরণের কথাও স্মরণ করা হয়েছে। সে দিনের সেই জুলূসের আগমনে পবিত্র হয়ে

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সিরিকোট শরীফ থেকে চট্টগ্রাম আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া'র কর্মকর্তাদের চিঠি মারফত নিদের্শ দিলেন-'ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম' উদযাপন উপলক্ষ্যে 'জশনে জুলূস'-এর আয়োজন করতে। 'জশনে জুলূস' কি এবং কিভাবে পালন করা হবে এ সম্পর্কে সকল রূপরেখা এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাও তিনি নিজেই চিঠি দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বলুয়ার দিঘী পাড়স্থ খানকাহ-এ ক্বাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া' হতে আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ সওদাগর আলকাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র নেতৃত্বে সেদিন যে 'জুলুস' চট্টগ্রাম শহর প্রদক্ষিণ করে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ময়দানে শেষ হয়ে এক বিশাল মাহফিল'-এর রূপ ধারণ করেছিলো তা সমগ্র চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশে এক নতুন ঈমানী প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তী বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এ অনুষ্ঠানে উদ্‌যাপিত হতে লাগল। ১৯৭৬ হতে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হুযূর ক্বেবলা নিজেই জুলূসের নেতৃত্ব দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জশনে জুলূসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আলহাজ্ব আমিনুর সওদাগর আলকাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। সেদিন থেকে অনেকে এর বিরোধিতা করলেও কালের বিবর্তনে তাঁর যুগান্তকারী সংস্কার কর্মটি ক্রমান্বয়ে সকলের কাছে সমাদৃত হতে শুরু করেছে। এখন অনেক সুন্নী মাশায়েখ স্ব-স্ব দরবারের উদ্যেগে 'জশনে জুলূস'র আয়োজন করেন। 'জশনে জুলূস'র অর্থাৎ 'বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা' মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র স্বাগত

---

ওঠেছিল খানায়ে কা'বা। এ মুক্তির পরিবেশ হয়েছিল এর ছয় দশক আগে। সে আনন্দে, সে আবেগে, আর কৃতজ্ঞতায় ঝুঁকে পড়েছিল খোদ্ কা'বা। সেদিন ছিল বার রবিউল আউয়াল। কা'বার মর্যাদা ও পবিত্রতা নিশ্চিতকারীর শুভ জন্মের খুশী ও আবেগের আতিশয্যে কাবা লুটে পড়েছিল। ষাট বছর পরে সেই কা'বার পবিত্রতার আনুষ্ঠানিকতায় অগণিত সাহাবীদের মিছিল হয়েছিল অষ্টম হিজরীতে। আমরা আমাদের ধ্যানে সেই দৃশ্যকে ধারণ করতে পারি। জশনে জুলূস এর মিছিল শুধু-বৈধই নয়, এটা আমাদের বিকৃত রুচির অপসংস্কৃতি রোধের জন্যও অপরিহার্য। শ্লোগান দেয় উচ্ছসিত প্রাণের মানুষ। জশনে জুলূসে শ্লোগানে উদ্ধুদ্ধ করা হয় নারায়ে তাকবীর। আল্লাহু আকবর, নারায়ে রেসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, উচ্চরিত হয় 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'র যিকর। ধ্বনিত হয়, 'সব্‌সে আওলা ওয়া আ'লা হামারা নবী।" হজ্ব পালনকারী বান্দারা হজ্বের আনুষ্ঠানিকতায় জনসম্মুখে মিশ্‌তে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয় সম্মিলিত শব্দ, ইসলামের পরিভাষায় একে 'তালবিয়া' বলে। لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ দ্বারা প্রাণে উচ্ছাস জাগায়। এটা ইবাদত, পূণ্য আমল। মসজিদে নববীতে যখন ফরয নামাযের সালাম ফেরানো হত, তখন সাহাবায়ে কেরাম আওয়াজে যিকর করতেন। তখন আশপাশের গৃহবাসী মহিলারা বুঝতেন মসজিদে জামা'আত শেষ হয়েছে। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, আহযাব যুদ্ধের সময় হুযূর (সা.) স্বয়ং পরিখা খননে ব্যস্ত। সাহাবীরা দেখলেন, তিনি মাটি উঠাচ্ছেন, আর তাঁর পবিত্র উদরের শুভ্রতা মাটিতে ঢাকা পড়ছিল। তখন তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার রচিত শে'র পড়ছিলেন, "আল্লাহুম্মা লাওলা আনতা মাহতাদাইনাইন আরাদনা ফিতনাতান আবাইনা।" শে'র এর সর্বশেষ শব্দ 'আবাইনা, আবাইনা' বলে দ্বিরক্ত উচ্চারণ করছিলেন। জা-আ রাসূলুল্লাহ্ ওয়া জা-আ নাবীয়্যুল্লাহ।' আমরা সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি স্মরণ করতে পারি, যখন প্রিয় নবীকে বরণ করতে আনসারদের সকল গোত্রের পর্দানশীন মহিলা নিজ নিজ ঘরের ছাদে, দরজায় ও গলির মাথায় দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়ে বলতে ছিলেন, طلع البدر علين। (পূর্ণ শশীর উদয় ঘটেছে আমাদের মাঝে)। আমাদের 'জশনে জুলূস'এ গগণবিদারী উচ্চকন্ঠের হাম্‌দ ও না'তের সুরলহরী, সেই পবিত্র ঐতিহ্যের রঙে আজকের প্রজন্মকে রাঙ্গাবার প্রত্যয় ঘোষণা করেন। এ জুলূসে আলোচিত হয় নবী তত্ত্ব, নবীর শান। এ সংস্কৃতিকে জোরদার করতে বর্ণাঢ্য এ উৎসবের নেতৃত্ব দেন খোদ রাসূলের আওলাদ। সংস্কৃতির পূণ্যময় সংস্কারে বিশ্বের বৃহত্তম এ জুলূস মুসলিম ঐক্য ও ইসলামী সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য সংযোজন কবি কাজী নজরুলের উচ্চারণ যথার্থ, 'ধুলির ধরা বেহেশতে আজ, জয় করিল দিলরে লাজ।' (দ্র. মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান, ***পাক পঞ্জতন;*** মীলাদুন্নবী সংখ্যা, (চট্টগ্রাম : ষোলশহর, নাজির পাড়া, ফেব্রুয়ারী- ২০১০ খ্রি. পৃ. ০৬)

৭০১. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

মিছিল ইত্যাদি । মজার বিষয় হচ্ছে- এসব নামে ভ্রান্ত মতবাদীরাও জশনে জুলূস উদ্‌যাপন করে, এ সংস্কারকে সার্বজনীন করে তুলেছে। আজ জশনে জুলুস একটি স্বীকৃত ইসলামী কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত। এটা নবীপ্রেমে মতোয়ারাদের মহামিলন কেন্দ্র। বাংলাদেশে এ কৃতিত্বের প্রথম ও প্রধান দাবীদার এ শতাব্দীর মহান সংস্কারক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। ১২ রবিউল আউয়াল ঢাকা-চট্টগ্রামসহ শহর, বন্দর, গ্রাম নির্বিশেষে জুলূসের যে ঢল নামে তা দেখে রীতিমত ইসলামের শক্রদের ভিত কেঁপে উঠে। প্রতি বছর 'জুলূস' বাড়ছে। ইসলামী ঐক্য ও সংহতি জোরদার হচ্ছে। ইসলামী জয় ও নবীপ্রেমের বহি:প্রকাশ ও জশনে জুলূস ছাড়াও হুযূর ক্বেবলার দু'আয় ঈদ-এ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষ্যে আয়োজিত মাহফিলের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই জশনে জুলূসে ঈদ-এ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ শতাব্দীর এক দ্বীনি সংস্কার এবং ঈদে মিলাদুন্নবীর দলিল নিয়ে আলোচনা করব।

**আল্ কুরআনের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী**

**এক.**

واذ اخذ الله ميثاق النّبيّن لمآ اتيتكم مّن كتاب وّ حكمة ثمّ جآء كم رسول مّصدق لّما معكم لتؤمننّ به ولتنصرنّه - قال ءاقررتم واخذتم علي ذالكم اصري - قالوا اقررنا - قال فاشهدوا وانا معكم مّن الشّاهدين - فمن تولّي بعد ذالك فأولئك هم الفسقون -

'আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা সকল নবী আলায়হি সালাম থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করব। অত:পর যখন শুভাগমন করবেন সম্মানিত রাসূল তোমাদের সাথে যা রয়েছে সেগুলোর সত্যায়নকারী, তখন তোমরা তার ওপর অবশ্যই ঈমান আনবে এবং তাঁকে অবশ্যই সাহায্য সহযোগিতা করবে। তোমরা কী স্বীকার করে নিয়েছ এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছ ? সকলে আরজ করল আমরা স্বীকার করলাম। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তবে তোমরা পরস্পরের স্বাক্ষী হয়ে যাও। আমিও তোমাদের সাথে স্বাক্ষীর অন্তর্ভুক্ত হলাম।' অত:পর যারা অঙ্গীকার করার পর তা থেকে বিমুখ হবে তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যকারী' (আল-কুর'আন-৩: ৮১-৮২)। কি চমৎকার মর্যাদা আমাদের প্রিয়নবী (সা.) এর। আল্লাহ্ তা'য়ালা রূহ জগতে নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, যা সর্বপ্রথম মিলাদ। আল্লাহ তা'আলা নবীজির শান-মান ও মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য নিজেই ব্যবস্থা করেছেন। এতে প্রমাণিত হল মিলাদ পাঠ করা মহান আল্লাহ্‌র সুন্নাত আর মিলাদ শ্রবণ করা নবীদের সুন্নাত।

**দুই.**

আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেন- وذ كّرهم بايّام الله 'তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিবসগুলো স্মরণ করিয়ে দিন' (আল-কুর'আন- ১৪:৩)। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, সকল দিবসই তাঁর। এর পরের আয়াতে করীমায় কোন দিনকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত বিশেষভাবে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরকুল শিরোমণি হযরত ইবন আব্বাস, হযরত উবাই ইবন কা'ব, হযরত মুজাহিদ এবং হযরত কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ তাফসীর বিশারদরা বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্‌র দিন দ্বারা ওই দিনগুলোর উদ্দেশ্য, যে দিবস সমূহের মধ্যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের ওপর অফুরন্ত নিয়ামত, রহমত ও করুণা বর্ষণ করেন। একথা দিবালোকের

ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন মহান আল্লাহ প্রদত্ত সকল নিয়ামতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্ব উৎকৃষ্ট নিয়ামত। অতএব এই জগতে তাঁর শুভাগমনের দিবস সৃষ্টিকূলের জন্য মহান নিয়ামত। তাই দিনকে স্মরণ করা এবং অন্যদেরকে স্মরণ করার জন্য উৎসাহিত করা আল্লাহ পাকের নির্দেশের প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন।

**তিন.**

আল্লাহ্ পাক কালামে মাজীদে তাঁর দয়া ও পুরস্কার লাভ করার পর খুশি উদ্‌যাপনের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন- قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون ‘হে মাহবুব আপনি ঘোষণা করুন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং করুণা (নবীজীকে) পাওয়াতে মানবজাতির আনন্দ উদ্‌যাপন করা উচিত। এ খুশি ও আনন্দ সকল ধন ভাণ্ডার হতে অতি উত্তম।[৭০২] এই আয়াতে আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমতকে উপলক্ষ করে খুশি ও আনন্দ উৎসব করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর প্রিয়নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হচ্ছেন, সর্ব উৎকৃষ্ট নিয়ামত। ফলে পৃথিবীতে তাঁর আগমনের দিন শরী‘আত সম্মত পন্থায় ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) পালন করা কুরআন পাকের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

**চার.**

আল্লাহ তা‘আলা আল্ কুরআনে ইরশাদ করেন, لقد من الله علي المومنين اذ بعث فيهم رسولا ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ তা‘আলা ঈমানদারদের ওপর বড়ই দয়া করেছেন যে, তাদের কল্যাণের জন্য সম্মানিত রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে প্রেরণ করেছেন।[৭০৩] আয়াত দ্বারা বোঝা গেল হুযূর পাক (সা.) এর শুভ আগমন মুমিনদের জন্য বড় নেয়ামত। সুতরাং নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য **১২** রবিউল আউয়াল ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন করা সর্বোত্তম নেক আমল।

**পাঁচ.**

মহান আল্লাহ পবিত্র কুর’আনের সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ করে, واذ كروا نعمت الله عليكم ‘তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর, যা আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে দান করেছেন[৭০৪]’ সৃষ্টির ইতিহাসে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বোত্তম নেয়ামত হলেন তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অনুসারীরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য **১২** রবিউল আউয়াল নবীজির পৃথিবীতে শুভ আবির্ভাব দিবসকে কেন্দ্র করে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন করে থাকেন।

**ছয়.**

পরবর্তীকালে সকল নবী রাসূল স্ব-স্ব যুগে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ.) এর মীলাদুন্নবী পালন করার কথা বর্ণনা দিয়ে আল্ কুরআনে ইরশাদ করেন-

واذ قال عيسي ابن مريم يبني اسرائيل انّي رسول الله اليكم مّصدقا لّما بين يديّ من التوراة ومبشّرا برسول يّا تي من بعدي اسمه احمد

---

৭০২. আল কুরআন, ১০ : ৫৮
৭০৩. আল কুরআন, ৩ : ১৬৪
৭০৪. আল কুরআন, ৩ : ১০৩

'হে আমার প্রিয় নবী ওই সময়ের কথা আপনি স্মরণ করুন, যখন মারিয়াম তনয় ঈসা (আ.) বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল আমি তোমাদের নিকট রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যায়ন করছি এবং এমন এক মহান রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, আর যার নাম হবে আহমাদ।[৭০৫]

উপরের কুর'আনে পাকের আয়াতসমূহ হুযূরে পাক সাহিবে লাওলাক সরকারে দু আল্‌ম (সা.) এর পবিত্র মীলাদ বৈধ হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। অতএব, এটা শরী'আত সম্মত অনুষ্ঠান, নবীজির প্রতি আন্তরিক মুহাব্বাত ও অকৃত্রিম প্রেম-ভালোবাসা ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা।

**হাদীস শরীফের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী**

পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি হাদীসে মধ্যে আমরা ঈদে মিলাদুন্নবীর পালনে বৈধতা এবং ফযিলতের উপর দলিল দেখতে পাই, নিম্নে কয়েকটি দলিল উপস্থাপনা করা হল-

**এক.**

বিশ্ব বরণ্যে আলেমে দ্বীন, মুফাস্‌সিরে কুরআন আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)রচিত কিতাব "আল্‌ হাভী লিল্‌ ফাতাওয়া" এর ১৯৪ পৃষ্ঠায় হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন, হযরত রাসূল পাক (সা.) হিজরতের পর ছাগল জবেহ করে নিজের মিলাদ নিজেই উদ্‌যাপন করেছেন।[৭০৬]

**দুই.**

হুযূর পাক (সা.) সপ্তাহের প্রতি সোমবার নফল রোযা রাখতেন। প্রিয় নবীর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ কাতাদাহ্‌ (রা:) রোযা রাখার কারণ জানতে চাইলে তিনি ইরশাদ করেন- فيه ولدت وفيه على انزل 'ওই দিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং ওই দিনেই আমার উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। সুতরাং নবীজী নিজের জন্ম দিনে শুকরিয়া স্বরূপ প্রতি সোমবারে রোযা পালন করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় নিজের মিলাদ নিজে উদ্‌যাপন করেছেন।[৭০৭]

**তিন.**

হযরত আবু দারদা (রা:) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবিজী হযরত আবু আমের আনসারী (রা.)- এর ঘরে গমন করলে দেখতে পান, হযরত আবু আমের আনসারী (রা.) তাঁর সন্তানাদিসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে একত্রিত করে নবী কারীম (সা.) এর বেলাদত শরীফের বিবরণ শিক্ষা দিচ্ছেন। আজই এ বিশ্বে তাঁর শুভ বেলাদতের তারিখ। এ অবস্থা দেখে নবীজী খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন, হে আবু আমের নিশ্চয় আল্লাহ তোমার জন্য তার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাকুল তোমাদের সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। হে আবু আমের যারা তোমার মত এ কাজ করবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও তোমার মত পুরস্কৃত করবে।[৭০৮]

**চার.**

সাতশ হিজরীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস হযরত শায়খ আবুল খাত্তার ইবন দাহিয়া (রহ.) রচিত কিতাব "আত্‌ তানভীর ফী মাওলিদিল বশীরে ওয়ান নযীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হযরত

---

৭০৫. আল কুরআন, ৬১ : ৬

৭০৬. এম এ জলীল, *মিলাদ-কিয়ামের বিধান*, (ঢাকা, উজ্জীবন লাইব্রেরী ২০১০), পৃ. ১০

৭০৭. প্রাগুক্ত

৭০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি একদিন নিজ ঘরে জনগণকে সমবেত করে নবীজির জন্ম কাহিনী বর্ণনা করছিলেন, যা শ্রবণ করে উপস্থিত সবাই আনন্দ উৎফুল্লচিত্তে নবীজির (সা.) প্রতি সালাম পেশ করতে থাকেন। এ অবস্থায় নবীজি সেখানে উপস্থিত হয়ে অবস্থা দেখে তাঁদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন, "হাল্লাত লাকুম শাফায়াতী" অর্থাৎ, তোমাদের জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল। নবী মুস্তফার নূরানী জবানের মন্তব্য প্রমাণ করে, ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করা উত্তম ইবাদত ও উৎকৃষ্ট আমল।[৭০৯]

**পাঁচ.**

ইমাম কুস্তলানী (রহ.)বলেন, রবিউল আওয়াল বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর শুভ আগমনের মাস। এ মাসে সারা বিশ্বের মুসলমান মিলাদের ব্যবস্থা করে থাকেন, তারা রাত্রে দান সাদক্বা এবং সাওয়াবের কাজ পালন করে থাকেন। বিশেষ করে এ সকল অনুষ্ঠানা নবীজির শুভ বেলাদতের আলোচনা করে আল্লাহ্‌র রহমত হাসিল করেন। মিলাদ মাহফিলে বরকত লাভ করাটা পরীক্ষিত। মিলাদ মাহফিলের বারকতে সারা বছর শান্তি বিরাজমান থাকে ও উদ্দেশ্য পূরণ হয়। যে ব্যক্তি নবীজির শুভ আবির্ভাব মাসের রাত্রিসমূহে খুশি উদ্‌যাপন করবে, আল্লাহ্‌ তাকে করুণা ও অনুগ্রহ দান করবেন।[৭১০]

**খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মিলাদুন্নবী (দ:)**

আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী (রহ.) নিজ সনদে খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক মিলাদ পাঠের ও অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরোপের কথা নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন :-

قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه من انفق درهما على قراءة مولد النبى ﷺ كان رفيقى فى الجنة وقال عمر رضى الله عنه من عظم مولد النبى ﷺ فقد احيى الاسلام- وقال عثمان رضى الله عنه من انفق درهما على قراءة مولد النبى ﷺ فكانما شهد غزوة بدر وحنين وقال على رضى الله عنه وكرم الله وجهه من عظم مولدالنبى ﷺ وكان سببا لقراءة مولده لايخرج من الدنيا الا بالايمان ويدخل الجنة بغير حساب – ( النعمة الكبرى على العالم صفحة ٨-٧)

অর্থাৎ- হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মিলাদ শরীফ পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমান খরচ করবে, সে আমার বেহেস্তের সাথী হবে"। হযরত ওমর (রা:) বলেছেন:" যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো, সে দ্বীন ইসলামকেই জীবিত করলো"। হযরত ওসমান (রা:) বলেছেন : "যে ব্যক্তি মিল্লাদুন্নবী পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে, সে যেন বদর ও হোনায়েনের মত কঠিন জেহাদে শরীক হলো"। হযরত আলী (রহ.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মিলদুন্নবী (দ:) কে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে- সে দুনিয়া থেকে ঈমানের সাথে বিদায় হবে এবং বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবে"।[৭১১]

---

৭০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৭১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৭১১. ইবন হাজর আল হাইছামী, *আন নে'মাতুল কুবরা আলাল আলম ফী মাওলিদি সাইয়েদে উলদি আদম* (ইস্তাম্বুল : ইখলাস ওয়াকেফী), পৃ. ৭-৮

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রহ.)-এর নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। তাঁর উক্ত কিতাবের উপর বহু শরাহ লেখা হয়েছে। তন্মধ্যে আল্লামা দাউদী ও আল্লামা সাইয়েদ আহমদ আবেদীন দামেস্কী অন্যতম। তাঁর রেওয়ায়াতকৃত উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মিলাদুন্নবী চালু ছিল এবং তারাও এর জন্য অন্যকে তাকিদ করেছেন।

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী উক্ত গ্রন্থে মিলাদুন্নবী (সা.) পালনের ফজিলত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রহ.), হযরত মারুফ কারাখী (রহ.), হযরত ছিররি ছাকাতী (রহ.), হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহ.) এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) প্রমুখ ইমাম ও সলফে সালেহীনদের রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এক কথায় মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের মূল ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও হাদিস।

সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা রোজে আজলে আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্মেলন ডেকে নবী করিম (দ:) -এর শান-মান, তাঁর উপর ঈমান আনয়নের প্রয়োজনীয়তা, দুনিয়াতে তাঁর আগমনী বার্তা প্রচার করা- ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঐ মাহফিল পরিচালনা করেছিলেন। সুরা আলে-ইমরানের ৮১-৮২ নং দীর্ঘ দুটি আয়াতে আল্লাহ পাক এ মিলাদ অনুষ্ঠান করার ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান স্বয়ং আল্লাহ্র সুন্নাত বা তরীকা। মাহফিলটি ছিল নবীগণের। সুতরাং কেয়ামসহ মিলাদ মাহফিল করা নবীগণেরও সুন্নাত তা তরীকা। এই মাহফিল ছিল হুযূর আকরাম (দ:)-এর আবির্ভাবের কোটি কোটি বছর পূর্বেকার। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম দুনিয়াতে এসে তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রধান দায়িত্ব হিসাবে হুযূর (দ:) -এর সানা সিফাত কেয়াম অবস্থায় বর্ণনা করেছেন এবং শেষ যুগে তাঁর আবির্ভাবের (মিলাদের) আগাম শুভ সংবাদ ঘোষণা করেছেন।

হযরত আদম (আ:) নিজ পুত্র শীস পয়গাম্বরকে নসিহত ও অসিয়তের মাধ্যমে নবীজির নূরের তাজীম করতে বলে গেছেন। তখন ঐ নূরে মুহাম্মদী (দ:) ছিল হযরত শীসের ললাটে। হযরত ইব্রাহীম (আ:) পুত্র ইসমাঈল (আ:) কে নিয়ে খানায়ে কাবার কাজ শেষ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নবী করিম (দ:)-এর মিলাদ বা আবির্ভাবের জন্যে খোদার কাছে মুনাজাত করেছিলেন। রাসুলে পাকের শান, মান বিভিন্ন পদমর্যাদার উল্লেখ করে তিনি আরব দেশে হযরত ইসমাইলের (আ:) বংশে নবীজির প্রেরণের জন্য খোদার কাছে আরজি পেশ করেছিলেন। এটা হয়েছিল কিয়াম অবস্থায়।[৭১২] সুতরাং মিলাদ ও কিয়ামের মূল প্রমাণ ও ভিত্তি পাওয়া যায় কুরাআন মজিদের সূরা বাক্বারার ১২৯ নম্বর আয়াতে। আর এই মিলাদ ও কিয়ামের বয়স হলো নবীজির জন্মেরও চার হাজার বছর পূর্বে। সুতরাং মিলাদ ও কিয়ামের প্রচলন নবীজির পরে নয় বরং জন্মের বহু পূর্ব হতে। মিলাদ ও কিয়ামের জন্য নবীজির উপস্থিতি কোন শর্ত নয়। মিলাদ ও কিয়াম হচ্ছে আগমনী শুভ সংবাদের নবীজির প্রতি তাজীম প্রদর্শন করা।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) এরপর হযরত ইছা (আ:) নবী করিম (সা.) এর মিলাদ পাঠ করেছেন বনী ইস্রাইলকে নিয়ে। তাদের মাহফিলে ভাষণরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন- “আমি এমন এক মহান রসূলের আবির্ভাবের শুভ সংবাদ তোমাদেরকে দিচ্ছি-যিনি আমার পরেই আগমন

---

৭১২. ইবনে কাছির, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬১

করবেন এবং তার পবিত্র নাম হবে আহমদ (সা.)।[৭১৩] এ আয়াতে এই মিলাদ মাহফিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল জেরুযালেমে এবং নবীজির জন্মের ৫৭০ বছর পূর্বে। সুতরাং আমরা গভীর পর্যালোচনায় দেখতে পেলাম- মিলাদ ও কিয়াম যে কোন আকৃতি ও প্রকৃতিতেই হোকনা কেন- তা হচ্ছে নবীগণের সুন্নাত। আকৃতি ও প্রকৃতি যুগে যুগে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হতে পারে- কিন্তু মূলনীতির কোন পরিবর্তন হতে পারেনা। যেমন- জেহাদ ও রণকৌশল পরিবর্তন হতে পারে এবং তার উপাদানও পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু মূল জেহাদ ও যুদ্ধের নীতিমালার কোন পরিবর্তন হতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবী (দ:) নিজেই নিজের মিলাদ পাঠ করেছেন সাহাবীদের নিয়ে। সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে মিম্বারে দাঁড়িয়ে, এমন কি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর পবিত্র বেলাদতের দিন তারিখ ও বংশ মর্যাদা বয়ান করেছেন। নেহায়া, শিফা শরীফ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে- "হুযূর (দ:) ভাষণ দানরত অবস্থায় তাঁর নূরের সৃষ্টি, দুনিয়াতে নবীগণের মাধ্যমে তাঁর আগমন, তাঁর বংশ মর্যাদা এবং বংশ তালিকা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মসজিদে প্রবেশ কালে প্রথমে নিজের উপর দরূদ শরীফ ও তার পর মসজিদে প্রবেশের দোয়া পাঠ করেছেন। মসজিদে প্রবেশ কালে তিনি বলতেন, "সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ- আল্লাহুম্মাফতাহলী-আবওয়াবা রাহমাতিকা"। অনুরূপভাবে মসজিদ থেকে বের হতে পাঠ করতেন: "সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ- আল্লাহুমা ইন্নি আছআলুকা মিন ফাদলিকা"।[৭১৪] উল্লেখ্য যে, তিনি কিয়াম বা দন্ডায়মান অবস্থায়ই এই দরূদ ও দোয়া পাঠ করতেন। মুসলমানগণও তাঁর পবিত্র আগমনী বর্ণনা আদ্যোপান্ত পাঠ করে শুভ সংবাদের শুকরিয়া স্বরূপ তাজীমের সাথে কিয়াম করে এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করে থাকেন। ইহাই প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম। সুতরাং যারা মিলাদ ও কিয়ামকে খারাপ বলে মনে করে, তারা প্রকারন্তরে খোদা-নবী ও রাসূলগণকেই খারাপ বলে ও সমালোচনা করে। সাহাবায়ে কিরামগণের মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের ধরন ও নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত দলীলসহ আলোচনা করা হল। কুরআন ও হাদীসে মিলাদ এবং কিয়ামের মূল সূত্র বর্ণিত হয়েছে মাত্র। পরবর্তীকালে যুগের চাহিদা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে মিলাদ ও কিয়ামের পৃথক মাহফিলের প্রচলন শুরু হয়েছে। যেমন প্রচলন হয়েছে জামাতের সাথে বিশ রাক'আত তারাবিহ, কুরআন একত্রিকরণ, কুরআন সংকলন, জুমার প্রথম আযান, আরবী ব্যাকরণ, কুরআনে নোকতা ও হরকত সংযোজিত হওয়ার কারণে এগুলো বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত, কোনটি মোস্তাহাব হয়েছে। তারাবি জামায়াতের সাথে প্রচলন করেছেন হযরত ওমর (রা:) এবং এটি সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। জুমার প্রথম আজান প্রচলন করেছেন হযরত ওসমান (রা:) এবং এটি সুন্নাত। আরবী ব্যাকরণ প্রচলন করেছেন হযরত আলী (রা:) এবং এটি শিক্ষা করা ওয়াজিব। কুরআনের নোকতা, হরকত সংযোজন করেছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া শাসক ৮৬ হিজরীতে এবং এটা মোস্তাহাব। সব মিলিয়ে এগুলোকে বিদআতে হাসানা বলা হয়। তাই বলে কি এগুলো পরিত্যাজ্য ? কখনও নয়। মিলাদ এবং কিয়ামের প্রচলনও অনুরূপভাবে মোস্তাহাব পর্যায়ের বিদআত। যদিও তা ৬০৪ হিজরীতে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী (রহ.) বলেন,

---

৭১৩. আল কুরআন, ৬১ : ৬

৭১৪. কাযী আয়ায, *কিতাবুশ শিফা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৭

ان البدعة الحسنة متفق على ندبها وعمل المولد واجتماع الناس له كذالك اى بدعة حسنة -

অর্থ : বিদাআতে হাসানার কাজ মোস্তাহাব হওয়ার উপর সকল ওলামার ঐক্যমত হয়েছে এবং মিলাদ শরীফের আমল এবং উহার উদ্দেশ্যে লোকদের মাহফিল করাও অনুরূপ মোস্তাহাব।[৭১৫]

সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা রোজে আজলে আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্মেলন ডেকে নবী করিম (দ:)-এর শান-মান, তাঁর উপর ঈমান আনয়নের প্রয়োজনীয়তা, দুনিয়াতে তাঁর আগমনী বার্তা প্রচার করা- ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঐ মাহফিল পরিচালনা করেছিলেন। সুতরাং মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান স্বয়ং আল্লাহ্র সুন্নাত। মাহফিলটি ছিল নবীগণের। যা-তা মাহফিল নয়। সুতরাং কিয়ামসহ মিলাদ মাহফিল করা নবীগণেরও সুন্নাত তা তরীকা । এই মাহফিল ছিল হুযূর আকরাম (দ:)-এর আবির্ভাবের কোটি কোটি বছর পূর্বেকার। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম দুনিয়াতে এসে তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রধান দায়িত্ব হিসাবে হুযূর (দ:) -এর সানা সিফাত কেয়াম অবস্থায় বর্ণনা করেছেন এবং শেষ যুগে তাঁর আবির্ভাবের (মিলাদের) আগাম শুভ সংবাদ ঘোষণা করেছেন । হযরত আদম (আ:) নিজ পুত্র শীস পয়গাম্বরকে নসিহত ও অসিয়তের মাধ্যমে নবীজির নূরের তাজীম করতে বলে গেছেন। তখন ঐ নূরে মুহাম্মদী (দ:) ছিল হযরত শীসের ললাটে। সুতরাং মিলাদ ও কিয়ামের প্রচলন নবীজির পরে নয় বরং জন্মের বহু পূর্ব হতে।

মিলাদ ও কিয়ামের জন্য নবীজির উপস্থিতি কোন শর্ত নয়। মিলাদ ও কিয়াম হচ্ছে আগমনী শুভ সংবাদের নবীজির প্রতি তাজীম প্রদর্শন করা। হযরত ইব্রাহীম (আ:) এরপর হযরত ইছা (আ:) নবী করিম (সা.) এর মিলাদ পাঠ করেছেন বনী ইস্রাইলকে নিয়ে। তাদের মাহফিলে ভাষণরত অবস্থায় দাড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন- "আমি এমন এক মহান রসূলের আবির্ভাবের শুভ সংবাদ তোমাদেরকে দিচ্ছি-যিনি আমার পরেই আগমন করবেন এবং তার পবিত্র নাম হবে আহমদ (সা.)। মিলাদ ও কিয়াম যে কোন আকৃতি ও প্রকৃতিতেই হোকনা কেন- তা হচ্ছে নবীগণের সুন্নাত। আকৃতি ও প্রকৃতি যুগে যুগে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হতে পারে- কিন্তু মূলনীতির কোন পরিবর্তন হতে পারেনা। আমাদের প্রিয় নবী (দ:) নিজেই নিজের মিলাদ পাঠ করেছেন সাহাবীদের নিয়ে। সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে মিম্বারে দাঁড়িয়ে,এমন কি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর পবিত্র বেলাদতের দিন তারিখ ও বংশ মর্যাদা বয়ান নেহায়া, শিক্ষা শরীফ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে- "হুযূর (দ:) ভাষণ দানরত অবস্থায় তাঁর নূরের সৃষ্টি, দুনিয়াতে নবীগণের মাধ্যমে তাঁর আগমন, তাঁর বংশ মর্যাদা এবং বংশ তালিকা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মসজিদে প্রবেশ কালে প্রথমে নিজের উপর দরূদ শরীফ ও তার পর মসজিদে প্রবেশের দোয়া পাঠ করেছেন। মসজিদে প্রবেশ কালে তিনি বলতেন: "সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ- আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা"। অনুরূপভাবে মসজিদ থেকে বের হতে পাঠ করতেন: "সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ- আল্লাহুমা ইন্নি আছআলুকা মিন ফাদলিকা"। (শিফা শরীফ)। উল্লেখ্য যে, তিনি কেয়াম বা দণ্ডায়মান অবস্থায়ই এই দরূদ ও দোয়া পাঠ করতেন। মুসলমানগণও তাঁর পবিত্র আগমনী বর্ণনা আদ্যোপান্ত পাঠ করে শুভ সংবাদের শুকরিয়া স্বরূপ তাজীমের সাথে কেয়াম করে এবং দরূদ ও

৭১৫. আল্লামা ইসমাইল হাক্কী, *তাফসীর রুহুল বয়ান,* (বৈরূত : মাকতাবাহ্ দারুল ফিক্র, ১৪১২ হি.), খ. ৯, পৃ. ৫৬

সালাত পাঠ করে থাকেন। ইহাই প্রচলি মিলাদ ও কিয়াম। সুতরাং সারা মিলাদ ও কিয়ামকে খারাপ বলে মনে করে, তারা প্রকারন্তরে খোদা-নবী ও রাসূলগণকেই খারাপ বলে ও সমালোচনা করে। সাহাবায়ে কেরামগণের  মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের ধরন ও নিয়ম সম্পর্কে আমার পুস্তক "ঈদে মিলাদুন্নবী" তে বিস্তারিত দলীলসহ আলোচনা করেছি। ইতিপূর্বেও অত্র পুস্তকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে মিলাদ এবং কিয়ামের মূল সূত্র বর্ণিত হয়েছে মাত্র। পরবর্তীকালে যুগের চাহিদা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে মিলাদ ও কিয়ামের পৃথম মাহফিলের  প্রচলন শুরু হয়েছে। যেমন প্রচলন শুরু হয়েছে। যেমন প্রচলন হয়েছে জামাতের সাথে বিশ রাকআত তারাবিহ, কুরআন একত্রিকরণ, কুরআন সংকলন, জুয়ার প্রথম আজান, আরবী ব্যাকরণ, কুরআন নোকতা ও হরকত সংযোজিত হওয়ার কারণে এগুলো বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত, কোনটি মোস্তাহাব হয়েছে। তারাবিত জামায়াতের সাথে প্রচলন করেছেন হযরত ওমর (রা:) এবং এটি সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। জুমার প্রথম আজান প্রচলন করেছেন হযরত ওসমান (রা:) এবং এটি সুন্নাত। আরবী ব্যাকরণ প্রচলন করেছেন হযরত আলী (রা:) এবং এটি শিক্ষা করা ওয়াজিব। কুরআনের নোকতা, হরকত সংযোজন করেছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া শাসক ৮৬ হিজরীতে এবং এটা মোস্তাহাব। সব মিলিয়ে এগুলোকে বিদআতে হাসানা বলা হয়।

## বিভিন্ন দেশে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) বাংলাদেশে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে জশনে জুলুসের প্রবর্তন করলে অনেকে মন্তব্য করতে লাগলেন এটা বিদআত। পৃথিবীর কোথাও এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতার অস্তিত্ব নেই। তাদের দাবীটা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং পৃথিবীর বহুদেশেই সরকারি বেসরকারী ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপিত হয়ে থাকে। নিম্নে বিশ্বের প্রসিদ্ধ কয়েকটি মুসলিম দেশের ঈদে মিলাদুন্নবীর চিত্র তুলে ধরার প্রমাণ পাচ্ছি।

### ইয়ামেন

আরবলীগভুক্ত মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম দেশ ইয়ামেন। উপসাগরীয় এই দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ২ কোটি ৩৮ লক্ষ। ৯৯% মুসলিম অধ্যুষিত জনসংখ্যার ৭০% সুন্নী মুসলিম। ইয়ামেনের উত্তরে সৌদি আরব এবং পূর্বে ওমান রাষ্ট্র। ইয়ামেনের বরকতের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে দোয়া করেছেন। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী দিবস ইয়ামেনের সরকারি ছুটির দিন। অতি প্রাচীনকাল হতে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ইয়ামেনে ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত হয়ে থাকে। আল্লামা ইবনে জওজী (রহ.) (জন্ম- ৫০৮ হিঃ / মৃত্যু - ৫৯৭ হিঃ)। আরব (মক্কা-মদীনা), মিশর, সিরিয়াসহ যে কয়টি দেশে অতি প্রাচীনকাল হতে ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে ইয়ামেন অন্যতম।[৭১৬]

### লেবানন

আরব মুসলমান ৫৪%। অটোম্যান সাম্রাজ্য দ্বারা দেশটি ১৫১৬ হতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে ফ্রান্সের কাছে স্বাধীনতা লাভ করে। লেবাননে

---

৭১৬. আল্লামা ইসমাইল হাক্কী, *তাফসীরে রুহুল বয়ান*, খ. ৯, পৃ. ৫৬) ; মুহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফী, *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী যুগে যুগে দেশে দেশে,* প্রাগুক্ত,২০১৫, পৃ. ১৭

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতো অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পবিত্র  ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত হয়ে থাকে।[৭১৭]

## ইরাক

প্রাচীন সভ্যতার দেশ ইরাক। এটি পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম আরব রাষ্ট্র। জনসংখ্যা ৩ কোটি ৬০ লক্ষ এবং আয়তন ৪৩৭০৭২ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে তুরস্ক, পূর্বে ইরান, দক্ষিণ-পূর্বে কুয়েত, দক্ষিণে সৌদি আরব, দক্ষিণ-পশ্চিমে জর্ডান এবং পশ্চিমে সিরিয়া। দেশটি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। ইতিপুর্বে তুরস্কের শাসনাধীনে ছিল।[৭১৮]

ইরাকে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পালনের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)তার কিতাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বপ্রথম মিলাদুন্নবী উদযাপনকারী হিসেবে সুলতান আল আয়ুবীর শাসনকালে ইরাবিল (ইরাকের কুর্দী অধূষিত একটি প্রদেশ) এর প্রবীণ, ন্যায় বিচারক, শাসক ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন বাদশাহ মুজাফ্‌ফর আবু সায়ীদকে আখ্যায়িত করেন। তা ছিল ৬০৪ হিজরীতে। যদিও এর পূর্বে ঘরোয়াভাবে এ জাতীয় অনুষ্ঠান মুসলিম সামাজে প্রচলিত ছিল। বাদশাহ মুজাফ্‌ফর (৫৪৯ হিঃ -৬৩০ হিঃ) ইমাম ইবনে কাছির  একজন অত্যন্ত খোদাভীরু আলেম ও ন্যায় বিচারক শাসক হিসেবে আখ্যয়িত করেছেন। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানও  তাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন ইমাম আব্দুল খাত্তাব ইবনে দিহায়া যখন মিলাদুন্নবীর এ-মহৎ আয়োজনকে দেখতে পেলেন তখন তিনি তার সমর্থনে একটি স্বতন্ত্র রচনা করে বাদশাকে উপহার দেন এবং নামকরণ করেন ‘আত তানভীর ফি মওলিদিন বাশিরীণ নাজির’। বাদশাহ তা পাঠ করে খুশি হয়ে লেখককে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন।[৭১৯]

ইরাকের বিশিষ্ট আলেম ইমাম ইবনুল জাওজী হাম্বলী (রহ) (জন্ম-৫০৮হি. মৃত্যু-৫৯৭ হি.) “মওলিদিন বা ইসমিল উরুশ” ও “আদদুররুল মুনাজ্জাম” এবং ইমাম আঃ রহীম ইরাকী ( মৃত-৮০৬ হি.), “আল মওলুদ আল হেনী ফি আল মওলুদ আল সানী” নামক মিলাদুন্নবী বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। বর্তমানেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ইরাকে ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত হয়। দিনটি সরকারি ছুটির দিন।

প্রাচীন আরবিলে (এখন একটি প্রদেশ) এখনও ঐতিহ্যবাহী মিলাদুন্নবী উদযাপিত হয়ে থাকে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সাবেক ডাইরেক্টর অধ্যক্ষ আল্লামা এম, এ জলিল বলেন, ‘বাগদাদ শরীফের (ইরাক) গাউছুল আযম মসজিদে মিলাদ শরীফ পাঠ করা হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ২/৩ ঘন্টা ব্যাপী। এ সময় দিওয়ানে হাসসান থেকে নবীজীর শানে কাসিদা পাঠ করা হয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে শুক্রবারে এমন এক মিলাদ মাহফিলে শরীক ছিলাম। ছারছীনা আবু জাফর সাহেবও সাথে ছিলেন।[৭২০]

---

৭১৭. মুহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফী, *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী যুগে যুগে দেশে দেশে,* ২০১৫, পৃ. ১৮
৭১৮. প্রাগুক্ত, ২০১৫, পৃ. ২০
৭১৯. মুহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফী, *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী যুগে যুগে দেশে দেশে,* প্রাগুক্ত, ২০১৫, পৃ. ২০
৭২০. প্রাগুক্ত, ২০১৫, পৃ. ২১

**জর্ডান**

মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে জর্ডান। এর জনসংখ্যা ৬/৭২ মিলিয়ন (১) এবং আয়তন ৮৯৩৪২ বর্গ কিলোমিটার। জর্ডানের দক্ষিণ ও পূর্বে সৌদি আরব, উত্তর-পূর্বে ইরাক, উত্তরে সিরিয়া এবং পশ্চিমে ফিলিস্তিন বা ইসরাইল। জর্ডানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পালিত হয়। দিনটি সরকারি ছুটির দিন। এদিনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমা বন্ধ থাকে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্‌যাপিত মাওলিদ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সৌদি রাষ্ট্রদুত সামী বিন আবদুল্লাহ আল সালেহও উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে জর্ডানের বাদশাহ্ বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানসহ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহকে শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন।[৭২১]

**ফিলিস্তিন**

মুসলমানদের প্রথম কিবলা মসজিদ-ই আকসার পূণ্যভুমি ফিলিস্তিন। আরব লীগের সদস্যভুক্ত এবং জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মর্যাদাভুক্ত ফিলিস্তিনের বর্তমান আয়তন ৬২২০ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৪.৫৫ মিলিয়ন। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মত ফিলিস্তিনেও ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পালিত হয়ে থাকে। দিনটি সরকারি ছুটির দিন। হেবরন শহরেও মিলাদুন্নবী পালিত হয়। জেরুজালেম শহরেও মিলাদুন্নবী পালত হয়। নাবলুস শহরেও মিলাদুন্নবী পালিত হয়।

**সংযুক্ত আরব আমিরাত**

উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ ভুক্ত ৬টি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিশালী রাষ্ট্র সংযুক্ত আরব আমিরাত। জনসংখ্যা ৯৩ লক্ষের মধ্যে মুসলমান ৭৭% মুসলিম জনসংখ্যার ৮৫% সুন্নি মুসলমান। তাদের মধ্যে সুফি চিন্তাধারার লোক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। পূর্বে ওমান, দক্ষিণে সৌদিআরব। তাছাড়া কাতার ও ইরাকের সাথে সামুদ্রিক সীমানা রয়েছে। তেল উৎপাদনের দিক দিয়ে দেশটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রাষ্ট্র। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত আরব আমিরাত রাষ্ট্রটি আজমান, দুবাই, ফুজায়রাহ, রাস আল খাইমা, শারজাহ, উম্মে আল কুয়েন, আবুধাবীসহ ৭টি আমিরাত নিয়ে ফেডারেশন। আরবী জাতীয় ভাষা এবং ইসলাম দাপ্তরিক ধর্ম। সংযুক্ত আরব আমিরাত এ রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র ঈদ-এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালিত হয়। এ দিন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যাংক বীমাতে ছুটি থাকে।

**কুয়েত**

পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম আরব রাষ্ট্র কুয়েত। এটি উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদভুক্ত ৬টি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম। দেশটির সাথে ইরাক ও সৌদি আরবের সীমানা রয়েছে। কুয়েতের জনসংখ্যা ৪১ লক্ষের মধ্যে মুসলমান ৮৫% এবং আয়তন ১৭৮২০ কিঃ মিঃ। দেশটি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনাত লাভ করে। পবিত্র ঈদ এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কুয়েতের সরকারি ছুটির দিন। দিনটি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের

---

৭২১. প্রাগুক্ত, ২০১৫, পৃ. ২৩

উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পালিত হয়ে থাকে। পত্রিকাগুলো বিশেষ প্রবন্ধ ছাড়াও তাদের পাঠকদের মিলাদুন্নবীর শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকেন।[৭২২]

**ওমান**

উপসাগরিয় সহযোগিতা পরিষদভুক্ত ৬টি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম ওমান। জনসংখ্যা ৩২ লক্ষ এবং আয়তন ৩০৯৫০১ বর্গ কিলোমিটার। ওমানের পশ্চিমে সৌদিআরব, উত্তর-পশ্চিমে আরব আমিরাত, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইয়ামেন। তাছাড়া ইরান ও পাকিস্তানের সাথে সামুদ্রিক সীমানা রয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শান্তিপূর্ণ দেশের তালিকায় ৫৯তম স্থানে রয়েছে। ওমানে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সরকারী ছুটির দিন। এ দিনে সরকারি-বেসকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, এমনকি বৈদেশিক দূতাবাস বন্ধ থাকে। ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনও আলাদাভাবে মাওলিদ উপলক্ষে বিভিন্ন বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে।[৭২৩]

**বাহরাইন**

মধ্য প্রাচ্যের ক্ষুদ্রতম আরব দ্বীপ বাহরাইনকে দুই সমুদ্রের দেশ বলা হয়। এর আয়তন ৭৬৫ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১.৩৪ মিলিয়ন। দেশটি সর্বশেষ ১৫ আগষ্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এটি একটি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অনান্য আরব দেশের মত বাহরাইনে উৎসব আমেজে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এ দিনটি সরকারি ছুটির দিন। মিলাদুন্নবীর প্রধান অনুষ্ঠান গ্রান্ড মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের উদ্দ্যেগে সারাদেশে অনেক গুলো অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।[৭২৪]

**বাংলাদেশে জশনে জুলূস পালনের ইতিহাস**

প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন্নবীকে কেন্দ্র করে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে সরকারী ছুটি ঘোষণার মাধ্যমে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) নামে ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক উৎসব পালিত হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উৎসব পূর্ব থেকে পালনের চর্চা থাকলেও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) নির্দেশে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সর্ব প্রথম জশনে জুলূসে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) নামে ধর্মীয় ভাব গম্ভীরমূলক একটি বিশাল ধর্মীয় মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।[৭২৫] সে বছর তিনি পাকিস্তান থেকে জশনে জুলূস পরিচালনার পরিকল্পনাও রূপরেখা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১২ই রবিউল আউয়াল চট্টগ্রামে তাঁর নেতৃত্বে ও আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় বিশাল মিছিল সহকারে জশনে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উৎসব উদযাপন করা হয়। ১৯৭৬ ইং খ্রিস্টাব্দে হতে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত (১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ব্যতীত) প্রতি বছরেই তিনি ঢাকা ও

---

৭২২. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৭২৩. অধ্যক্ষ এম এ জলীল, *ফতোয়ায়ে ছালাছা*, (ঢাকা : উজ্জীবন লাইব্রেরী ২০১০), পৃ. ১৫
৭২৪. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, *সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৭২৫. মুহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফী, *পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী যুগে যুগে দেশে দেশে,* প্রাগুক্ত, ২০১৫, পৃ. ২১

চট্টগ্রামে জশনে জুলূসের ধর্মীয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন।[৭২৬] এ জুলূসে শরীক হয় লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাদের জাগ্রত হয় মানুষের ঈমানী চেতনা। সুদৃঢ় হয় মুসলিম ঐক্য।

এ জশনে জুলুসের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে **১২ই** রবিউল আউয়াল ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, বি-বাড়ীয়া, নীলফামারী, সৈয়দপুর, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিরাজগ সহ বাংলাদেশের প্রায় জেলাগুলোতে ধর্মীয় বিভিন্ন সংগঠন পৃথক ভাবে জশনে জুলূসের আয়োজন করে থাকে। তবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ধর্মীয় মিছিলের এ সংস্কৃতিমূলক উৎসব বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন নামে উদযাপন করেন। কেউ করেন ঈদে মীলাদুন্নবীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, কেউ করেন বর্ণাঢ্য মিছিল, কেউ করেন র‌্যালি, কেউ করেন জশনে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) কেউ করেন ঈদে মীলাদুন্নবীর স্বাগত মিছিল নামে। এ'তে শরীক হয় সর্বস্তরের মুসলিম উম্মা। গড়ে তোলেন সুন্নী ঐক্যের মোর্চা। এ দেশের সুন্নী মাশায়েখ কিরাম, ওলামা, বুদ্ধিজীবী এবং সর্বস্তরের মুসলিম জনগণ এ জুলূসের একটি ইসলামী সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাস্তবে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)ই এদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে জশনে জুলূস উদযাপনের রূপদাতা। এ ধরনের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর ইসলামী সংস্কৃতির বলিষ্ট সাংগঠনিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়।[২৯] মুসলিম সংস্কৃতির পুন:জাগরণে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বেলাদত বার্ষিকীর স্মৃতি বিজড়িত অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ জশ্নে জুলূসের প্রবর্তন ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গনে এক নবতর সংযোজন। এ দ্বীনি সংস্কার কর্মের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা এ শতাব্দীর মহান সংস্কারক আলীয়ে কামিল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)সর্বপ্রথম **১৯৭৪** খ্রিস্টাব্দে আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কর্মকর্তাদের প্রতি পত্র মারফত প্রিয়নবী (সা.) এর শুভাগমন দিবসে জশ্নে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্যাপনের নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে চট্টগ্রাম বলুয়ার দিঘীর পাড়স্থ খানকাহ-এ-ক্বাদিরিয়া সৈয়্যাদিয়া তৈয়্যবিয়া হতে আন্‌জুমান ট্রাস্ট-এর তৎকালীন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ আল-কাদেরী (রহ.)-এর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক 'জশ্নে জুলূস' চট্টগ্রাম শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার বিশাল ময়দানে এসে দেশবরণ্যে উলামায়ে-ক্বেরামের তাকরীরে জশ্নে জুলূস তাৎপর্য বর্ণনা ও সালাত সালামের যুযোপযোগী আলোড়নে পালিত হয়।[৭২৭] পরবর্তীতে তাঁর নেতৃত্বে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনায় **১২** রবিউল আউয়াল চট্টগ্রামে, **৯** রবিউল আউয়াল রাজধানী ঢাকায় প্রতি বৎসর ঐতিহাসিক জশ্নে জুলূস পালিত হয়ে আসছে। **১৯৭৬** হতে **১৯৮৬** পর্যন্ত আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)-এর নেতৃত্বে জশ্নে জুলূস পালিত হয়েছে। পরে তাঁর সাহিবজাদা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.)-এর উপর গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। বর্তমনে শুধু এদেশে নয়, বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে 'জশ্নে জুলূস' শানদারভাবে পালিত হচ্ছে।[৭২৮]

---

৭২৬. প্রাগুক্ত, ২০১৫, পৃ. ২২

৭২৭. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৭২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বেলাদতের স্মৃতি বিজড়িত মাস রবিউল আউয়ালের নবচন্দ্র পশ্চিমাকাশে উদিত হওয়ার সাথে সাথে নবী প্রেমিক মুসলমানরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে। প্রিয় নবীর প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসার সওগাত ও ভক্তি নযরানা পেশে উম্মতরা বিভোর হয়ে পড়ে। সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়, ঐতিহাসিক জাতীয় আনন্দোৎসব জশ্‌নে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি, নবী রাসূলের মান মর্যাদা হানিকর মন্তব্যকারী বাতিল পন্থীরা নবী প্রেমিক সুন্নী মুসলমানদের আয়োজন, ব্যবস্থাপনা ও বিশাল কাফেলা দেখে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং প্রলাপ শুরু করে জুলূস করা বিদয়াত নাজায়েয ইত্যাদি। জশ্‌নে জুলূস সম্পর্কিত সৃষ্ট নানাবিধ বিভ্রান্তির অবসানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা জরুরী মনে করছি।

## ৭.৪.২ পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদের সংস্কার কর্মের ব্যাপক প্রসার

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রিযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র আলোড়ন সৃষ্টিকারী চিন্তাধারার সাথে এ দেশবাসীকে ব্যাপকতর পরিসরে পরিচয় করিতে দেয়া ছিল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র আরেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনি স্বীয় তরীক্বাভুক্তদের মধ্যে আ'লা হযরত প্রবর্তিত সালাত-সালাম, না'ত-এ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সহকারে তাঁর সংস্কারকৃত ইসলামী সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা প্রবর্তন করেন। এ সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা সমগ্র সুন্নী সাধারণে কালক্রমে গৃহীত হয়। খতমে গাউসিয়া, গেয়ারভী শরীফ ও মীলাদ শরীফে, আ'লা হযরতের না'ত 'মুস্তফা জানে রহমত পেহ্ লাখোঁ সালাম' (সালামী)' সংযোজন করেছেন তিনিই। তিনি মীলাদ শরীফসমূহে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র না'ত পঠনে উৎসাহ প্রদানসহ আ'লা হযরত রচিত সহস্রাধিক কিতাবের সাথে পরিচিত হয়ে এদেশে উক্ত চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচার-প্রসারে ওলামায়ে কেরামকে উৎসাহ প্রদান করতেন। তাঁর পিতা হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, বর্তমানে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে বলেছিলেন, "আ'লা হযরত কে মসলক পর জামেয়াকী বুনিয়াদ ঢালী গেয়ী।[৭২৯]" সুতরাং জামেয়া আ'লা হযরতের চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠান এবং এতে এখনো ইমাম আ'লা হযরতকে নিয়ে বেশি চর্চা করা হয়। এ জামেয়ারই প্রাক্তন ছাত্র মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন বর্তমানে কায়রো (মিসর ) আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যায়য়ে "আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র জীবন ও কর্ম"-এর উপর এম.ফিল সমাপ্ত করেছেন এবং জামেয়ার আরেক প্রাক্তন ছাত্র বর্তমান ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসার প্রভাষক ড. মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন সম্প্রতি আ'লা হযরতের না'ত সাহিত্যের উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। মিশরের আল-আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এ জামেয়ার বেশ কয়েকজন ছাত্র ভবিষ্যতে সেখানে আ'লা হযরতকে নিয়ে উচ্চ গবেষণার চিন্তা করেছেন। এই জামেয়ার কিছু বর্তমান ও সাবেক ছাত্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়েক বছর পূর্বে চট্টগ্রামে "আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন" নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়েছে। এবং এ জামেয়ার প্রাক্তন ছাত্রদের প্রচেষ্ঠায় রাজধানী ঢাকায় প্রতি বছর আ'লা হযরত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। গত ২০০১ খ্রিস্টাব্দে জামেয়া সংলগ্ন আলমগীর খানকাহ শরীফে

৭২৯. অধ্যক্ষ এম এ জলীল, *ফতোয়ায়ে ছালাছা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

অনুষ্ঠিত আ'লা হযরত স্মারক আলোচনা সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয়েছে। বিগত ২০০০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের নওজোয়ান ওলামায়ে কেরামের সমন্বেয়ে গঠিত হয় "আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ও.এ.সি) বাংলাদেশ। এর ব্যবস্থাপনায় ২০০০ খ্রিস্টাব্দে থেকে চট্টগ্রাম মহানগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রত্যেক বছর বিশাল আকারের আন্তর্জাতিক সুন্নী সম্মেলন। তদুপরি, জামেয়ার প্রাক্তন কৃতি ছাত্র, হযরত আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র একনিষ্ঠ মুরিদ-বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আল্লামা এম.এ.মান্নান ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভীর তরজমা-ই কুরআন 'কানযুল ঈমান', সদারুল আফাযিল সৈয়দ না'ঈম উদ্দিন মুরাদাবাদীর উর্দূ তাফসীর 'খাযাঈনুল ইরফান' এবং এ 'কানযুল ঈমান'র মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমীর তাফসীর 'নুরুল ইরফান'র বঙ্গানুবাদ করে সুন্নিয়তের ময়দানে বিশাল খিদমত আন্জাম দিয়েছেন।[৭৩০] আর এ সব যতটুকুই হয়েছে তাতে রয়েছে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তিনি জামেয়ার এসেম্বলীতে সর্বপ্রথম আ'লা হযরতের বিখ্যাত না'ত 'সবসে আউলা ও আ'লা হামারা নবী' চালু করেছেন। যা আজ বাংলাদেশের প্রায় সকল সুন্নী মাদরাসার এসেম্বলীতে অনুকরণ করা হচ্ছে। মোটকথা, পূর্ববর্তী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সংস্কারকর্ম এদেশে প্রতিষ্ঠায় তাঁর অপরিসীম অবদান রয়েছে, যা ইসলামী সংস্কৃতিতেও এক অপূর্ব সংস্কার হিসেবে গণ্য।

আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সম্পর্কে আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মন্তব্য তুলে ধরে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি একটি অনিন্দ্য সুন্দর বিরল জীবন দর্শন গ্রন্থে মাওলানা ইসমাঈল রেযভী বলেন- 'এ প্রসঙ্গে মহান অলি আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র এ সোনালী বাণীই যথার্থ-"বাতেল পন্থীরা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও অলিগণের শানে কটুক্তিপূর্ণ আচরণ, তাদের ধিকৃত মতাদর্শ ফিতনা-ফাসাদের যাবতীয় উপকরণ নিয়ে যখন তুফান আকারে ধেয়ে আসছিল, ঠিক সেই দোদুল্যমান প্রেক্ষাপটে মুজাদ্দিদে ইসলামে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর বিস্ময়কর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে হযরত নূহ আলাহিস্ সালাম'র তরীর ন্যায় হুযূর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উম্মতের স্বীয় বুকে টেনে নিয়ে রহমতে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দয়ার প্রস্রবণের সুধা পান করান।"[৭৩১] আল্লামা সৈয়্যদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইমাম আ'লা হযরত সম্পর্কে আরো বলেন, "আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার লিখনী ও ক্বসীদা সমূহে নবীপ্রেমের এ অবস্থা! তাঁর ক্বলব বা অন্তরে নবীপ্রেমের কী অবস্থা হতে পারে।"[৭৩২]

### ৭.৪.৩ আযানের পূর্বে ও পরে দুরূদ শরীফের প্রচলন

আজানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠ করা এক পূণ্যময় আমল। আজ হতে দীর্ঘ আটশত বৎসর পূর্বে আরব সহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আজানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠের বরকতময় প্রথা চালু ছিল। ইরাক, মিশর, লেবানন, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিস্তীন সহ মধ্য প্রাচ্যেও বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে আজো এ প্রথা চালু আছে পর্যায়ক্রমে মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে এ প্রথার বিস্তৃতি

৭৩০. মুহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
৭৩১. এম. সেলিম খান চাটগামী, ***স্মারক গ্রন্থ***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৭৩২. প্রাগুক্ত,

ঘটছে। শতাব্দীর মহান সংস্কারক গাউসে জামান রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত, হাদীয়ে দ্বীনো মিল্লাত আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এ প্রথা চালু হয়।[৭৩৩] এই পূণ্যময় আমলে একদিকে সওয়াব হাসিল হয় অপর দিকে নবীপ্রেম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

এ পূণ্যময় আমলের বৈধতা সম্পূর্ণ কুরআন, সুন্নাহ, এজমা, কিয়াস কর্তৃক সমর্থিত ও ইসলামী শরীয়ত সম্মত। বিশ্ববরেণ্য শতাধিক আলেমে দ্বীন ও ইসলামী দার্শনিকদের প্রণীত নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে এর বৈধতা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায়। কুরআন সুন্নাহর আলোকে এ কাজটির বৈবধতা ও ফজিলত নিম্নে আলোকপাত করছি।

**এক.**

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীবের শানে পবিত্র কালামে মজিদে ঘোষণা করেছেন -

ان الله وملائكته يصلون على النبى ياايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর (সদা সর্বদা) সালাত ও সালাম প্রেরণ করে থাকেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও সেই নবীর প্রতি বেশী বেশী শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাত ও সালাম পাঠ কর।" অত্র আয়াতে পাকে দরূদ ও সালাম পাঠ করাকে কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি বিধায় নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যে কোন সম্ভাব্য মুহূর্তে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করা সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য বৈধ ও কর্তব্য। আযানের সময়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। সুতরাং উক্ত আয়াতে এই সময়টিও অন্তর্ভূক্ত। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হবে যে, আযানের পূর্বে বা পরে দুরূদ শরীফ পাঠ করা জায়েজ এবং মুস্তাহাব। কারণ নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য যে কোন সময়ে সালাত ও গালাম পাঠ করা মুস্তাহাব। যেমন- সর্বজন স্বীকৃত সুবিখ্যাত শামী কিতাবের ১ম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যে-

ومستحبة فى كل اوقات الامكان اى حيث لامانى

"নিষিদ্ধ স্থান ও সময় ব্যতীত যে কোন সম্ভাব্য মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।" দুর্‌রুল মোখ্‌তারের উক্ত বাক্যটি দ্বারা সকল সময়ে দরূদ শরীফ পড়া এবং বিশেষতঃ আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব বলে প্রমাণিত হলো। কেননা, দুরূদ পড়ার এ আদেশটি হল - صلوا عليه وسلموا تسليما

ব্যাপক সময় অর্থে প্রযোজ্য অর্থাৎ নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যে কোন সময়েই দুরূদ পড়া জায়েজ প্রমাণ করে এবং ইহা একটি উছিলা। এই আয়াতে দরূদ পড়ার সময় হলো সর্বদা- অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা।

**দুই.**

সুবিখ্যাত সাহাবী হযরত উবাই বিন কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হাদিস-

اجعل لك صلواتى كلها قال اذا يكفى همك ويغفر لك ذنبك -

"হে প্রিয় নবী ! আমি আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাকে সর্বদার জন্য অপরিহার্য মনে করে নিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলে তোমার চিন্তামুক্ত হওয়ার জন্য উহাই যথেষ্ট হবে এবং তোমার সকল পাপও ক্ষমা করা হবে।"

---

৭৩৩. অধ্যক্ষ এম এ জলীল, *ফতোয়ায়ে সালাছা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

এতে প্রামণিত হলো যে, কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে সদা সর্বদা দুরূদ বা সালাত ও সালাত পাঠ করা উত্তম। আযানের পূর্ব মুহূর্তটি নিষিদ্ধ সময় নহে। কাজেই ঐ সময়ে দুরূদ পড়া জায়েয।

**তিন.**

আযান এ ইক্বামতের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব। বিখ্যাত ফিক্হর কিতাবে উল্লেখ আছে-

قال الشيخ الكبير البكرى انہا تسن قبلہما اى الصلواة على النبى ﷺ قبل الاذان والاقامة –

"বিখ্যাত ফকীহ শেখ কবীর বিকরী মক্কী (রহঃ) বলেন যে, আযান ও ইকামতের পূর্বে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাত ও সালাত পাঠ করা মসনুন ও মুস্তাহাব।"

**চার.**

আযানের পর মুনাজাতের পূর্বে সালাত ও গালাম পাঠ করা বৈধ ও জায়েজ। এ সম্পর্কে সকল হাদিছ গ্রন্থ সমূহে উল্লেখ রয়েছে। বরং সালাত ও সালাতের আদেশও দেয়া হয়েছে। যেমন-

ثم صلوا على-

"আযানের পর তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ কর"।[৭৩৪]

**পাঁচ.**

আযানের পূর্বে ও পরে সালাত ও সালাম পাঠ করা সম্পর্কে শেফা শরীফে বর্ণিত আছে-

قال القاضى عياض ومن مواطن الصلواة على النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكره وسماع اسمه او كتابته او عند الاذان (شفا)

অর্থাৎ সালাত ও সালাম পাঠ করার মুস্তাহাব ওয়াক্ত সমূহের মধ্যে অন্যতম সময় হচ্ছে

(ক) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আলোচনা কালে,

(খ) তাঁর নাম মুবারক শুনার সময় ও লিখার সময় এবং

(গ) আযানের সময়।

এ স্থানে عند الاذان অর্থাৎ আযানের সময় শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ- অর্থাৎ আযানের পূর্বে ও পরে বুঝানো হয়েছে। যেমন- অযু ও জবেহ এর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা সম্পর্কে বিভিন্ন ফিক্হে'র কিতাব সমূহ অধ্যায় স্বরূপ অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে,

التسمية عند الوضوء -.التسمية عند الذبح

"অজুর সময় বিসমিল্লাহ পড়া; জবেহের সময় বিসমিল্লাহ পড়া।" এখানে عند শব্দের অর্থ পরে নহে বরং সর্বসম্মতিক্রমে অজু ও জবেহ- এর 'পূর্বে' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অজুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা, জবেহ এর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা। অতএব عند الاذان এর দ্বারাও আযানের পূর্ব সময়কেই বুঝানো হয়েছে।

---

৭৩৪. অধ্যক্ষ এম এ জলীল, *ফতোয়ায়ে ছালাছা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

সর্বশ্রেষ্ঠ হাদিসগ্রন্থ সহীহ বুখারী শরীফের জবেহ ও শিকার সম্পর্কীত كتاب الذبائح والصيد নামক অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনী ও আল্লামা সাহারানপুরী লিখেছেন যে, عند الاذان অর্থ হলো ( التسمية عند ارسال الكلب)

অর্থাৎ- শিকারি কুকুর ছাড়বার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। সুতরাং عند الاذان দ্বারাও আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা উত্তম হওয়া প্রমাণিত হবে। ইহা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত عند শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ। আবু দাউদ শরীফে الدعاء عند الاذان নামক অধ্যায় দ্বারা 'কাবলাল আযান' ও'বাদাল আযান' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আযানের পূর্বে ও পরে পঠিতব্য দু'আ সমূহ। দরূদ শরীফ হচ্ছে উত্তম দু'আ। ইমাম আবু দাউদ عند শব্দটি আযানের পূর্বে ও পরে-এ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। প্রমাণ স্বরূপ উক্ত অধ্যায়েই ইমাম আবু দাউদ ফজরের পূর্বে হযরত বেলালের একটি দোয়া পাঠ করার কথা উল্লেখ করেছেন ।

যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আরম্ভ করার পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব। তাফসীরে রুহুল বয়ানের লিখক আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রহ.)- ان الله وملائكته يصلون على النبى আয়াতের ব্যাখ্যয় সালাত ও সালামের স্থান এবং সময় সমূহের বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করছেন যে, عند الابتداء كل امرذى بال অর্থাৎ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ও নেক কাজ আরম্ভ করার পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব। সুতারং আযান শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক কাজ বিধায় এর পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব এবং মসনুন।

**ছয়.**

মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত 'মাযহাব চতুষ্টয়ের উপর ফিক্হ শাস্ত্রের কিতবে উল্লেখ আছে-

- باب الصلوة على النبى قبل الاذان والتسابيح قبلة بالليل উক্ত শিরোনাম দ্বারা ফকীহ নিজেই আযানের পূর্বে সালাম পাঠ করার বৈধতার ফতোয়া দিয়েছেন। যেহেতু শিরোনাম হলো, আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ কর।' এবং তিনি তার পর দলীল স্বরূপ আযানের পরে সালাত ও সালাম জায়েজ হওয়ার হাদিস উল্লেখ করেছেন।[৭৩৫] সুতরাং অত্র হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হলো যে, আযানের পর সালাত ও সালাম পাঠ করা যখন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং এতে কারো কোন বিরোধ নেই, তাহলে دلالت التزامى দ্বারাই আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা জায়েজ ও মসনুন প্রমাণিত হয়। কারণ, সহীহ বুখারী শরীফে দেখা যায় যে, হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) কোন কোন হাদীস এরূপ ভাবে পেশ করেছেন- যার পূর্বে دلالت التزامى হিসেবে তাঁর বিপরীত অধ্যায় বা ترجمة الباب দাড় করিয়েছেন। যাকে বলা হয় تفقه فى الدين এবং উক্ত অধ্যায়ে تفقه فى الدين হাদিস এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে যে,

قوله ثم صلوا على عام يشتمل المؤذن وغيره من السامعين – ولم ينص الحديث على ان تكون الصلوة سرا – فاذا رفع المؤذن صوته بالصلوة بتذكير الناس بهذا الحديث ليصلوا على النبى ﷺ كان حسنا

৭৩৫. আবদুর রহমান আল জাযায়িরী, *কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ*, খ. ১, পৃ. ৩২৬

অর্থাৎ ثم صلوا على দ্বারা সালাত ও সালাম পাঠ করার জন্য কেবলমাত্র মুয়াজ্জিনকেই বুঝানো হয় নাই, বরং صلوا على হাদিস শরীফে সাধারণভাবে সবাইকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করা হয় নাই বা চুপে চুপে পড়তে হবে, তাও বুঝানো হয় নাই। এ হাদিসের আলোকে লোকদেরকে তাঁর সাথে (মোয়াজ্জিন) সালাত ও সালাম পাঠের প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কোন মুয়াজ্জিন যদি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পড়ে ত উত্তম প্রথা হবে। উক্ত কিতাবের উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মোয়াজ্জিন ও শ্রোতা কর্তৃক উচ্চঃস্বরে আযানের সময় দরুদ পাঠ করা ও দু'আ পড়া মুস্তাহাব ও উত্তম।

قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبى ياايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما -

"হযরত আল্লাম ইসমাইল হক্কী (রহ.) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করার উত্তম সময় গুলো বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, -عند ابتداء كل امرذى بال অর্থাৎ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ নেকী কাজের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব এবং উত্তম।"

**সাত.**

দুর্‌রুল মুখ্‌তার নামক কিতাবে আযানের পূর্বে সালাত ও সালাত পাঠ করা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে,

ثم فيها مرتين وهو بدعة حسنة -

দুর্‌রুল মোখ্‌তার নামক কিতাবের উল্লেখিত বর্ণনায় রয়েছে- মাগরিবের সময় সালাত ও সালাম পাঠ করা হতো। পরবর্তী সময়ে মাগরিবের দু'বার পাঠ করা হতো। ইহা হলো বিদ'আতে হাসানাহ বা উত্তম প্রচলন। নাহু, সরফ, ফিকাহ্‌, ইসলামের সহায়ক গ্রন্থ সমূহ রচনার ন্যায় ইহাও বিদা'আতে হাসানাহ এর অন্তর্ভুক্ত। মূলত বিদ'আতে হাসানাহ সুন্নতেরই অংশ।

**আট.**

দুর্‌রুল মুখ্‌তারের উক্ত ইবারত এর ব্যাখ্যায় আল্লামা শামী তদীয় বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাব 'রদ্দুল মোহতার (শামী) নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে-

قولة (ثم فيها مرتين ) اى فى المغرب كما صرح به فى الخزائن لكن لم ينقله فى النهر ولم اراه فى غيره فكان ذالك كان موجودا فى زمن الشارح او المراد به ما يفعل عقب اذان المغرب ثم بعده بين العشائين ليلة الجمعة والاثنين وهو المسمى فى دمشق تذكيرا كاالذى يفعل قبل اذان الظهر يوم الجمعة –

অর্থাৎ "দুর্‌রুল মোখ্‌তার" নামক কিতাবের উল্লেখিত বর্ণনায় মাগরিবের সময় সালাত ও সালাম দু'বার পাঠ করার কথা "খাজায়েন নামক কিতাবে" পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মূল কিতাব 'নহর' নামক গ্রন্থে এ কথাটুকু উদ্ধৃত নকল করা হয় নাই। খাজায়েন ব্যতীত অন্য কিতাবে উহা আমার দৃষ্টি গোচর হয় নাই। নহর নামক কিতাবে না থাকার অর্থ এই যে, মাগরিবের আযানের সময় দু'বার সালাত ও সালাম পাঠ করার রীতি খাজায়েন কিতাবের লিখকের যুগে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সাহেবে নহরের যুগে প্রচলন ছিল না। অথবা এর ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে,

একবার মাগরিবের আযানের পরে এবং দ্বিতীয়বার মাগরিবের আযানের পরে ও এশার পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা হতো এবং উহার জুমার রাত্রে ও সোমবার রাত্রে বলা হতো। দামেশকে এরূপ ব্যবস্থাকে তাজকীর বা অসতর্ক লোকদিগকে সর্তককরণ বলা হতো। যেমন- (জুমার প্রথম আযানের পূর্বে) " সালাত ও সালাম পাঠ করা হয়ে থাকে।" অতএব শামী কিতাবের উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জুমা ও এশার পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করার বৈধতা ও প্রচলন উভয়েরই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এরূপ কাজকে উত্তম বলা হয়েছে। সুতরাং ইহা মুস্তাহাব এবং যে কোন নামাজের আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করার বৈধতা ইহার দ্বারাই সন্দেহতীত ভাবে প্রমাণিত হলো।[৭৩৬]

আজানের পরে সালাত ও সালাম পাঠ করার হুকুম স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দান করেছেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- ثم صلوا على
অর্থাৎ আজানের শেষে তোমরা আমার উপর সালাত পাঠ কর। প্রসিদ্ধ কিতাব "দুর্‌রুল মোখ্‌তার ও রদ্দুল মোহতার (শামী) কিতাবদ্বয়ে জুমার পূর্বে এবং এশার পূর্বে মোয়াজ্জিন কর্তৃক সালাম পাঠের উল্লেখ আছে এবং উভয় কিতাবেই উক্ত ব্যবস্থাকে হাসানাহ বা উত্তম বলে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। সকল মুফতীগণই উক্ত কিতাবদ্বয়ের দ্বারা ফতোয়া দিয়ে থাকেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাম ও সালাম পাঠ করার মাকরূহ স্থান সমুহ ফিক্‌হর কিতাবে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে : ১.স্বামী স্ত্রীর মিলনকালে, ২. পেশাব-পায়খানা করার সময়, ৩. ব্যবসায়ী সামগ্রীর প্রচারার্থে, ৪. হোঁচট খেয়ে পা পিছলে যাওয়ার সময়, ৫. কোন কাজে আশ্চার্যান্বিত হওয়ার কালে, ৬. জবেহের সময়, ৭. হাঁছি দেওয়ার সময়।[৭৩৭]

উল্লেখিত স্থান ও কাল ব্যতীত সম্ভাব্য সকল সময়ই সালাত ও সালাম পাঠ করা উত্তম ও জায়েজ। যদি আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা মাকরূহ বা নাজায়েজ হতো তবে অবশ্যই উহাও উল্লেখ থাকতো। কাজেই নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হলো যে, আযানের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করা জায়েয ও মসনুন এবং ইহার সমর্থনকারীগণ হবেন নবীজির আদর্শের প্রকৃত অনুসরণকারী। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) এমন একটি পূণ্যময় আমলকে পূণ:প্রচলন করে মুসলিম সংস্কৃতিতে এক জাগরন সৃষ্টি করেন।

### ৭.৪.৪ ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে মাসিক গিয়ারভী শরীফের প্রচলন

চান্দ্র মাসের দশ তারিখ দিবাগত রাত গেয়ারভী রাত। এ রাত্রে কাদেরিয়া তরীকায় অনুসারীগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে একটি মাহফিল আয়োজন করে থাকে, তার নাম 'গোয়াভী শরীফ'।

'উর্দু ভাষায় এগারকে 'গিয়ারাহ্' বলে। আর 'একাদশ'কে বলা হয় 'গিয়ারভী'। সুতরাং মাসের এগার তারিখের ইবাদতবন্দেগীক 'গিয়ারভী শরীফ বলা হয়। হাকীমূল উম্মুত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহমাতুল-াহি আলায়হি) স্বীয় রচিত তাফসীর গ্রন্থ 'আশরাফুত্ তাফসীর' সংক্ষেপে তাফসীরে নঈমীর প্রথম পারা, সূরা বাক্বারা ২৭ নম্বর আয়াত, পৃ. ২৯৭ তে হযরত আদম

৭৩৬. অধ্যক্ষ এম এ জলীল, *ফতোয়ায়ে ছালাছা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৭৩৭. প্রাগুক্ত

আলায়হিস্ সালাম-এর তাওবা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে গেয়ারভী শরীফের ভিত্তি ও ইতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তিনি প্রসিদ্ধ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস্ সালাম-এর গেয়ারভী শরীফ পালনের ইতিকথা বর্ণনা করেছেন।

**গেয়ারভী শরীফ পালনের ইতিহাস**

১. সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা ও আদিমাতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত হাওয়া আলাইহাস্ সালাম বেহেশত হতে দুনিয়াতে আসার পর আল্লাহর নিষেধের কথা ভুলে যাবার জন্য অনুশোচনায় ৩৬০ বছর একাধারে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে ছিলেন এবং তাওবা করেছিলেন। তাঁদের প্রথম আমল ছিল অনুতাপ ও তাওবা। তাই আল্লাহর নিকট বান্দার তাওবা ও চোখের পানি অতি প্রিয়। ৩৬০ বছর পর মহান আল্লাহ্ পাকের দয়া হলো। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় তাওবার বাক্য গোপনে ঢেলে দিলেন। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ওই সব দো'আ করলেন। তিনি মহান আল্লাহ্ পাকের আরশে আজীমের গায়ে লেখা নাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলা ধরে ক্ষমা চাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এতে খুশি হয়ে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত হাওয়া আলাইহাস্ সালাম-এর তাওবা কবুল করলেন। যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দো'আ ও তাওবা কবুল করলেন, ওই দিনটি ছিল আশুরা তথা মুহাররমের দশ তারিখ, শুক্রবার। এই মহাবিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ও হাওয়া আলাইহাস্ সালাম ওই রাতে অর্থাৎ দশ তারিখ দিবাগত রাতে তাওবা কবুল ও বিপদ থেকে মুক্তির শুকরিয়া স্বরূপ যে বিশেষ ইবাদত করেছিলেন সেই বিশেষ ইবাদতেই ছিল তাঁদের গেয়ারভী শরীফ।[৭৩৮]

২. হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালাম মহা প্লাবনের সময় রজব মাসের ১০ তারিখ থেকে মুহাররম মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাস ৭২ জন সঙ্গী নিয়ে কিশতির মধ্যে ভাসমান অবস্থায় ছিলেন। গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত সবকিছু পানির নিচে। অতঃপর আল্লাহর অশেষ রহমতে ৬ মাস পর হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালাম এর কিশতি বা নৌকা জুদী পাহাড়ের চূড়ায় এসে ঠেকল। পানি কমে গেলে তিনি দুনিয়ায় নেমে আসেন। যেদিন নূহ্ আলাইহিস্ সালাম কিশতি থেকে অবতরণ করলেন সেই দিন ছিল আশুরা তথা মুহাররমের দশ তারিখ। তিনি এই মহাবিপদ থেকে মহামুক্তি উপলক্ষে সকলকে নিয়ে ১০ তারিখ দিবাগত রাতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া স্বরূপ ইবাদত করেছিলেন। এটা ছিল হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালাম এর গেয়ারভী শরীফ।

৩. হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে কোন রকমেই তার ইসলাম প্রচার থেকে বিরত করতে না পেরে এবং সকল বাহাস বিতর্কে পরাজিত হয়ে অবশেষে জালেম বাদশাহ্ নমরূদ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রাখা হলো। আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমতের আগুনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলো এবং অগ্নিকুণ্ড ফুল বাগিচায় পরিণত হলো। চল্লিশ দিন পর যেদিন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম আগুন থেকে বের হয়ে আসলেন সেই দিনটিও ছিল আশুরা তথা মুহাররমের ১০ তারিখ। তিনি এই মহামুক্তির

৭৩৮. অধ্যক্ষ হাফিয এম এ জলিল, *গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস*, (ঢাকা : সুন্নি ফাউন্ডেশন, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৪

শুকরিয়া আদায় করলেন ১০ তারিখের রাতে বিশেষ ইবাদতের মাধ্যমে। আর এটাই ছিল হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের গেয়ারভী শরীফ।

৪. হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম আপন প্রিয়তম পুত্র হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে হারিয়ে চল্লিশ বছর একাধারে কান্নারত ছিলেন। পবিত্র কালামুল্লাহ্ শরীফের ১২ পারার সূরা ইউসুফে বর্ণিত বহু ঘটনার পর অবশেষে তিনি হারানো পুত্রকে ফিরে পেলেন এবং তাঁর অন্ধ চক্ষু হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের জামার বরকতে ফিরে পেলেন। এই দীর্ঘ বিপদ মুক্তির দিনটিও ছিল আশুরার দিন। হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে ওই রাতে বিশেষ ইবাদত করেছিলেন। এটা ছিল হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম এর গেয়ারভী শরীফ।

৫. হযরত আইয়ুব আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহ্ তা'আলার পরীক্ষা স্বরূপ দীর্ঘ ১৮ বছর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। পোকায় সমস্ত শরীরের মাংস খেয়ে শুধু হাড় বাকি রেখেছিল। অবশেষে হযরত আইয়ুব আলায়হিস্ সালাম আমাদের দয়াল নবীর ওসীলা নিয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দোয়া-মুনাজাত কবুল করেন এবং তাকে রোগমুক্তি দেন। তাঁর এই রোগমুক্তির দিনটিও ছিল আশুরা তথা মুহাররমের ১০ তারিখ। তিনি ওই রোগমুক্তি ও ঈমানী পরীক্ষায় পাশের শুকরিয়া স্বরূপ ওই ১০ তারিখ দিবাগত রাত ইবাদতে কাটালেন। এটা ছিল হযরত আইউব আলায়হিস্ সালামের গেয়ারভী শরীফ।

৬. হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম ও বনী ইসরাঈলকে মিশরের অধিপতি ফির'আউন বহু কষ্ট দিয়েছিল। আল্লাহর নবীর সাথে বেয়াদবী যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তার খোদায়ী দাবীর মেয়াদ ফুরিয়ে যায়, তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম শিশুসহ ১২ লক্ষ বনী ইসরাইলকে নিয়ে মিশর ত্যাগ করেন। সামনে লোহিত সাগর। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের পানি দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে পাহাড়ের মত দেয়াল স্বরূপ দাঁড়িয়ে যায় এবং ১২টি শুকনো রাস্তা হয়ে যায়। প্রত্যেক রাস্তা দিয়ে ১ লক্ষ লোক খুব দ্রুত গতিতে অতিক্রম করে নদীর অপর তীরে এশিয়া ভুখণ্ডে প্রবেশ করে। ফেরাউন তাদের পচাঁদ্বাবন করতে গিয়ে দু'দিকের পাহাড় সম পানির তোড়ে সৈন্যসহ ডুবে মরে যায়। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর সঙ্গীদের এই মহামুক্তির দিনটিও ছিল আশুরার দিন। তিনি সঙ্গীসহ এই আশুরা তথা মুহাররমের ১০ তারিখ দিবাগত রাত আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করার জন্য ইবাদতে মশগুল থাকেন। এটা ছিল হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর গেয়ারভী শরীফ।

৭. হযরত ইউনুস আলায়হিস্ সালাম দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর মাছের পেট থেকে মোসলের নাইনুওয়া নামক স্থানে মুক্তি পেয়েছিলেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি তাঁর সম্প্রদায় লোকদের কাছে কলেমার দাওয়াত দিতে গেলে তারা হযরত ইউনুস আলায়হিস্ সালামকে উল্টো অত্যাচার, নির্যাতন করে ভীষণ কষ্ট দেয়। রাগে ক্ষোভে হযরত ইউনুস আলায়হিস্ সালাম দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে নদী পড়ে যায়। ওপারে যাওয়ার জন্য নদীতে নৌকায় চড়লেন। মাঝপথে তিনি নদীতে ঝাপ দিলে আল্লাহর কুদরতের পরীক্ষা স্বরূপ হযরত ইউনুছ আলায়হিস্ সালাম মাছের পেটে ঢুকে যান। তিনি যেদিন মাছের পেট থেকে মুক্তি পান সেদিনও ছিল আশুরা তথা মুহাররমের

১০ তারিখ। তাই তিনি ওই ১০ তারিখ দিবাগত রাতে শারীরিক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করে বিশেষ ইবাদতে মশগুল ছিলেন। এটাই ছিল হযরত ইউনুস আলায়হিস্ সালামের গেয়ারভী শরীফ।

৮. হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম একশতম বিবাহের কারণে আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে তাওবা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তাওবা কবুল করে খুশি হয়ে যান। ওই দিনটিও ছিল আশুরার দিন। তাই হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম ওই রাতে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। এটা ছিল হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের গেয়ারভী শরীফ।

৯. হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম একবার জ্বিন জাতির কারণে রাজ্য ও সিংহাসন হারা হয়েছিলেন। জিন জাতি তাঁর মুজিজার আংটি লুকিয়ে রেখেছিল। ফলে তার রাজ্য ও সিংহাসন হাতছাড়া হয়ে যায়। চল্লিশ দিন পর জিন জাতি কর্তৃক লুকায়িত তাঁর হারানো আংটি ফেরত পেয়ে তাঁর রাজ্য ও সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং জিন জাতিকে শাস্তি প্রদান করেন। সৌভাগ্যক্রমে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম হারানো নেয়ামতটি যেদিন ফেরত পেয়েছিলেন সেদিন ছিল মুহাররমের ১০ তারিখ। তিনি মহান আল্লাহ্র দরবারে এই নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ ওই রাতে ইবাদত-বন্দেগী করেন। এটা ছিল হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম এর গেয়ারভী শরীফ।

১০. আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে ইয়াহুদি জাতি কখনো বরদাস্ত করতে পারেনি। ইয়াহুদি রাজা হেরো ডেটাস গুপ্তচর মারফত হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে গ্রেফতার ও শহীদ করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে জিবরাঈল ফিরিশতার মাধ্যমে ৪র্থ আসমানে মতান্তরে তুলে নেন এবং ওই গুপ্তচরের আকৃতি পরিবর্তন করে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের আকৃতির অনুরূপ করে দেন। অবশেষে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের শত্রুই ধৃত হয়ে শূলে বিদ্ধ হয়। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম এর আসমানে উত্তোলনের দিনটিও ছিল আশুরার দিন। তিনি ওই মহাবিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে ওই রাতে আকাশে আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন ইবাদতের মাধ্যমে। এটাই ছিল হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম এর গেয়ারভী শরীফ।[৭৩৯]

১১. সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাহমাতুল লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ হিজরীতে চৌদ্দশত সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন। কিন্তু মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক জায়গায় পৌছে মক্কার কুরাইশদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। ১৯দিন পর অবশেষে একটি চুক্তির মাধ্যমে তিনি সে বছর ওমরাহ্ না করেই মদীনার পথে ফিরে যান। সাহাবায়ে কেরাম এটাকে গ্লানি মনে করে মনক্ষুণ্ন হলেও রাসূলে পাকের নির্দেশ নতশিরে মেনে নেন। মদিনার পথে কুরা গামীম নামক স্থানে পৌঁছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলেন। ওইখানে সূরা আল ফাতাহ্ এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। এতে মনক্ষুণ্ন সাহাবায়ে কেরামকে সান্তনা দিয়ে

৭৩৯ . প্রাগুক্ত

আল্লাহ্ তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে বলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার কারণেই হুদায়বিয়ার সন্ধিকে একটি মহান বিজয় হিসেবে দান করেছি। আপনার ওসীলায় আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। যে দিন ওই সুসংবাদ সম্পন্ন আয়াত নাযিল হয়, সে দিনটি ছিল মুহাররম মাসের ১০ তারিখ। মহাবিজয় ও গুনাহ্ মাগফিরাতের সুসংবাদ শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়ার চুক্তির প্রকৃত রহস্য বুঝতে পারেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম ওই ১০ তারিখের রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে দেন। এটা ছিল হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমগণের গেয়ারভী শরীফ।[৭৪০]

এখানে সর্বমোট ১১ জন প্রসিদ্ধ নবী ও রাসূল আলায়হিমুস্ সালাম এর গেয়ারভী শরীফের দলীল ও ইতিহাস তুলে ধরা হলো। এভাবে পয়গাম্বর সকলেই গেয়ারভী শরীফ পালনের প্রমাণ পাওয়া যায়। গেয়ারভী শরীফের ভাবার্থ হচ্ছে প্রত্যেক চন্দ্রমাসের ১১ তারিখের রাতে কোন না কোন নবী রাসূল আলায়হিমুস্ সালাম, মহান আল্লাহ্ পাকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শুকরিয়া স্বরূপ বিশেষ ইবাদত তথা, নামায, তাসবীহ্, তাহলীল, জিকির-আজকার, আল্লাহর কালাম, তিলাওয়াতসহ বিভিন্ন নফল ইবাদত করে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দয়া, অনুগ্রহ, করুণা, ক্ষমা ইত্যাদি পেয়ে তাঁরা প্রিয় পাত্র হয়েছেন। অতএব নবী রাসূলগণ যেহেতু সম্মানিত, আল্লাহ্ পাকের দেয়া আরবী মাস, তথা চন্দ্রমাসগুলো সম্মানিত, সেই হিসেবে উক্ত তারিখের ইবাদতকে 'গেয়ারভী শরীফ' বা একাদশ শরীফ'ও বলা হয়।[৭৪১]

**গেয়ারভী শরীফ পালনের বর্তমান পদ্ধতি**

'গেয়ারভী শরীফ' মূলত খতম ও দু'আ বিশেষ। হযরত বড় পীর গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির অনুকরণে প্রতি চান্দ্রমাসের ১১ তারিখের রাতে বা দিনে গাউছে পাকের পবিত্র রূহে ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামা ও পীর মাশায়েখ উক্ত গেয়ারভী শরীফ বিশেষ নিয়মে খতমের মাধ্যমে পালন করে থাকেন। হযরত গাউছে পাক আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কিভাবে এই গেয়ারভী শরীফ পেলেন সে সম্পর্কে 'মীলাদে শায়খে বরহক' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে-

হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (৪৭১-৫৬১হিজরী) নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত দিবস প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়াল তারিখটি নিয়মিতভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে পালন করতেন। একদিন স্বপ্নযোগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম গাউছে পাককে বললেন- ১২ রবিউল আউয়াল আমার মিলাদ শরীফকে তুমি যেভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আমার মহব্বতে পালন করে আসছ এর বিনিময়ে আমি নবী সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে সম্মানিত নবীগণের 'গেয়ারভী শরীফ' দান করলাম। (সুবহানাল্লাহ্!)

৭৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৭৪১. প্রাগুক্ত।

হযরত গাউছে পাক আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির তরিকাসহ অন্যান্য ত্বরীকার মাশায়েখ ও হযরত গাউসে পাকের অনুসরণে প্রতি চান্দ্র মাসের **১১** তারিখের রাতে বা দিনে বিশেষ নিয়মে এ গেয়ারভী শরীফ পালন করে থাকেন।

### গেয়ারভী শরীফের ফযিলত

'ফাযায়েলে গাউসিয়া' কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতি চাঁদের **১১** তারিখে গেয়ারভী শরীফ পালন করবে, সে অল্পদিনের মধ্যে ধনবান ও স্বচ্ছল হবে এবং দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে। যে এটাকে অস্বীকার করবে, সে দারিদ্যের মধ্যে থাকবে। যেখানে বা যে এলাকায় এই গেয়ারভী শরীফ পালিত হয় সেখানে আল্লাহ্ পাকের রহমত নাযিল হয়। কেননা হাদীস শরীফে আছে- تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ আউলিয়া কেরামের জিকিরের মজলিশে আল-াহর রহমত নাযিল হয়। যে ব্যক্তি গেয়ারভী শরীফ পালন করবে, সে খায়র ও বরকত লাভ করবে। যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে গেয়ারভী শরীফ পালন করবে, সে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবে, দুঃখ ও চিন্তামুক্ত হবে এবং সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করবে।[৭৪২]

### ৭.৪.৫ উরস-ফাতিহা'র ব্যাপক প্রচলন

'উরস' (عرس)-এর আভিধানিক অর্থ বিবাহ। বর ও কনে উভয়কে আরবীতে 'আরূস' (عروس) বলা হয়। বাসর, প্রীতিভোজ, অলিমাহ্ (وليمه - طعام - زفاف)কেও ওরস বলা হয়। এর বহুবচন হয় 'আ'রাস' ও 'উরূসাত' (اعراس وعروسات)। পরিভাষায়, বুযুর্গগানে দ্বীন-এর ওফাত দিবসকে 'ওরস' বলা হয়। এর ভিত্তি হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, মুন্কার ও নাকীর যখন মৃত ব্যক্তির কবরে এসে প্রশ্ন করবে, তখন ওই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করতে সক্ষম হলে মৃত ব্যক্তিকে বলা হয়- نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لاَيُوْقِظُهُ اِلاَّ اَحَبُّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ অর্থাৎ ওই দুলহানের মত ঘুমিয়ে পড়, যাকে পরিবারে তার প্রিয়তম ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ জাগাবে না। ওই দিন মুন্কার ও নাকীর ফিরিশ্তাদ্বয় তাকে 'আরূস' (عَرُوْس) নামে আখ্যায়িত করে। এ জন্য ওই ওফাত দিবসকে 'উরস' (عُرْس) বলা হয়।

অথবা মৃত ব্যক্তি নেক্কার হওয়ার কারণে বিশেষ করে বুযুর্গ হওয়াতে কবরের মধ্যে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্য হবে, যখন মুন্কার ও নাকীর জিজ্ঞাসা করবেন-مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ حَقِّ هٰذَا الرَّجُلِ অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ইশারা করে বলেন, এ নূরানী সত্তা সম্পর্কে তুমি কি আক্বীদা পোষণ করতে? তখন ওই ব্যক্তি দীদারে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পেয়ে আত্মহারা হয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসামূলক উত্তর দেবে। উভয় জাহানের সরদারের দীদার লাভ করে ধন্য হওয়াতে ওই সময় ওই ব্যক্তির জন্য অনেক আনন্দের মুহূর্ত হয়। তাই ওই দিনকে 'উরস' (عُرْس)-এর দিন বলা হয়।

৭৪২. অধ্যক্ষ হাফিয এম এ জলিল, ***কারামতে গাউসুল আজম,*** (ঢাকা : সুন্নি ফাউন্ডেশন, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৭

**‘উরস’ পালনের শর‘ঈ ভিত্তি বা দলীল**

প্রতি বছর ওফাত দিবসে মৃত ব্যক্তি কবর বা আউলিয়া-ই কেরামের মাযার যিয়ারত করা, ক্বোরআন তিলাওয়াত, সাদ্ক্বা-খায়রাত, হালাল পশু যবেহ করে তাবাররুকের ব্যবস্থা করা হয়। এ সমস্ত কাজ ‘উরস’ ‘(عرس) উপলক্ষে করা হয়। শরীয়ত মতে এসব কর্মসূচি শুধু বৈধ নয়, বরং অনেক সাওয়াবের কাজও।

২. ইবনে আবী শায়বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর বর্ণনা-

اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَانَ یَأْتِیْ شُھَدَآءَ اُحُدٍ عَلٰی رَأْسِ کُلِّ حَوْلٍ

অর্থাৎ নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বছরের মাথায় উহুদের শহীদগণের কবরগুলোর নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

৩.

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ أَنَّہٗ کَانَ یَأْتِیْ قُبُوْرَ شُھَدَآءَ عَلٰی رَأْسِ کُلِّ حَوْلٍ فَیَقُوْلُ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِوَالْخُلَفَآءُ الْاَرْبَعَۃُ ھٰکَذَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট তারিখে উহুদের শোহাদা-ই কেরামের মাযারে হাযির হতেন এবং তাদেরকে সালাম পেশ করে দু‘আ করতেন। খোলাফা-ই রাশেদীনও এ আমল করতেন।

শায়খ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি বর্ণনা করেন,

دوم آنکہ بھیئت اجتماعی مردمان کثیر جمع شوند وختم کلام اللہ فاتحہ برشیرینی وطعام نمودہ تقسیم درمیان حاضران کنند ایں قسم معمول درزمانہ پیغمبرخدا صلی اللہ علیہ وسلم وخلفائے راشدین نہ بود اگر کسےایں طور کند باک نیست بلکہ فائدہ احیاء اموات راحاصل می شود

অর্থাৎ অনেক লোক একত্রিত হয়ে খতমে ক্বোরআন করবে, খাবার ও শিরনী পাক করে ফাতেহার মাধ্যমে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করবে। যদিও এ কাজ হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফা-ই রাশেদীনের যুগে ছিলোনা; কিন্তু এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই; বরং এতে জীবিত ও মৃত সকলেরই উপকার সাধিত হয়।

মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী বর্ণনা করেন যে-

کہ شیخ عبد الحق محدث دھلوی از شیخ خود نقل می سازد کہ فرمود کہ ایں عرس در زمان سلف نبود از مستحسنات متاخرین است

অর্থাৎ শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি নিজ ওস্তাদের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, প্রচলিত ওরস শরীফ সালফ-ই সালেহীনের যুগে না থাকলেও পরবর্তী ওলামা-ই কেরামের মতে মুস্তাহাসান, কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সাব্যস্ত আমল।

আল্লামা আযীযুল হক্ব শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি তাঁর ফাতাওয়া-ই আযীযিয়াতে উল্লেখ করেন-

وَفِىْ سِرَاجِ الْهِدَايَةِ لِمَوْلاَنَا جَلاَلُ الدِّيْنِ الْبُخَارِىِّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِىْ حَاشِيَةِ الْمَظْهَرِىِّ وَتُحْتَاطُ فِىْ السَّاعَةِ الَّتِىْ نُقِلَ رُوْحَه فِيْهَا فَاِذَا اَرْوَاحُ الاَمْوَاتَ تَأْتُوْنَ فِىْ اَيَّامِ الاَعْرَاسِ فِىْ كُلِّ عَامٍ فِىْ ذَالِكَ الْمَوْضِعِ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ وَيَنْبَغِىْ يُطْعَمَ الطُّعَامُ وَالشَّرَابُ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَاِنَّ ذَالِك يُفْرِحُ اَرْوَاحَهُمْ وَاِنَّ فِيْهِ تَأْثِيْرًا بَلِيْغًا (هدية الحرمين)

অর্থাৎ মাওলানা জালালুদ্দীন বোখারী হাশিয়া-ই মাযহারীতে 'সিরাজুল হেদায়া'য় বর্ণনা করেন, ওই সময়কে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, যখন বুযুর্গ বা মৃত ব্যক্তির রূহ কব্জ হয়েছে; কেননা। মৃতদের রূহ প্রত্যেক বছর ওরস চলাকালীন ওই সময়ে ওই স্থানে হাযির হয়। অতএব, সে সময় খাবার-তাবাররুকাত পরিবেশন করা দরকার। এতে তাদের রূহ আনন্দিত হয়।

হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (দেওবন্দী আলিমদের পীর) 'ফয়সালা-ই হাফতে মাসয়ালা'য় ওরস বৈধ বলে জোর দিয়ে বলেন-

ফকীর (নিজের) এ বিষয়ে তরীক্বা এযে, আমি প্রত্যেক বছর আমার পীর মুরশিদের এর জন্য ঈসালে সাওয়াবের ব্যবস্থা এভাবে করি যে, প্রথমে ক্বোরআন পাক তিলাওয়াত করা হয়। আর মাঝে মধ্যে সময়ানুপাতে মীলাদ শরীফও পাঠ করা হয়। এরপর উপস্থিত সবাইকে খাবার তাবাররুক হিসাবে বিতরণ করা হয়।[৭৪৩]

উপরোল্লিখিত দলীলাদির আলোকে সাব্যস্ত হল যে, উরস শরীফ পালন করা ইসলামী অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত। এটা শুধু জায়েয নয়; বরং সাওয়াবের কাজ ও ওই অনুষ্ঠানে প্রথমে যিয়ারত করা হয়। আর যিয়ারত করা ক্বোরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস-ই পাকে রাসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُرُوْهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُرُوْا فِاِنَّهَا تُزْهِدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذْكِرُ الاٰخِرَةَ (ابن ماجة)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে প্রথমে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম এখন তোমরা যিয়ারত কর। কেননা এটা দুনিয়া বিমুখতাকে বাড়িয়ে দেয় এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়, সেখানে ক্বোরআন খতম ও অন্যান্য যিক্র-আযকার করা হয়। তা ক্বোরআন-সুন্নাহ মতে, সম্পূর্ণ নেক আমল।

**তৃতীয়ত,** সেখানে বুযুর্গ ও মৃত ব্যক্তির স্মারক আলোচনা করা হয়, যার হাদীসে পাকে আমাদের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ (ابوا داؤد. ترمزى. حاكم. بيهقى. الجامع الصغير)

---

৭৪৩. হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রহ.), *ফায়সালায়ে হাফ্ত মাসআলা, বাংলা অনূদীত*,( চট্টগ্রাম: মোহাম্মদী কুতুবখানা, ২০০১), পৃ. ২৬

অর্থাৎ: হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের ঈমানদার মৃত ব্যক্তিদের ভাল দিকগুলো তুলে ধরো এবং তাদের মন্দ বিষয়সমূহের চর্চা থেকে বিরত থাক।
এছাড়া হাদীস-ই পাকে আরো উল্লেখ আছে-

ذِكْرُ الْاَنْبِيَاءِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَذِكْرُ الصَّالِحِيْنَ كَفَّارَةٌ وَذِكْرُ الْمَوْتِ صَدَقَةٌ وَذِكْرُ الْقَبْرِ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ নবীগণের আলোচনা ইবাদত, নেককার বান্দাদের আলোচনা কাফ্ফারা, মৃত্যুকে স্মরণ করা, সদক্বাহ্ এবং কবরের আলোচনা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটস্থ্ করে দেয়।

**চতুর্থ,** সেখানে খাবার হিসাবে তাবাররুক বিতরণ করা হয়। অপরকে খাবার পরিবেশন সম্পর্কে হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে-

اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ. وَقَالَ اَيْضًا اَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَأَفْشُوْا السَّلَامَ تُوَرِّثُوْا الْجِنَانَ

অর্থাৎ ইসলামের উত্তম কাজ খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে অধিক হারে সালাম দেয়া এটাও এরশাদ করেছেন- তোমরা খানা খাওয়াও, বেশি পরিমাণে সালাম দাও, তাহলে বেহেশতের মালিক হয়ে যাবে। (ঈমানদারদের জন্য)।

**পঞ্চমত,** ওরসে পাকে উপস্থিত ব্যক্তিরাই হলো মেহমান, আর মেহমানদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করা ঈমানের পরিপূর্ণতা। যেমন হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে-

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه

অর্থাৎ যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সমাদর করে।
উপরোক্ত আমলসমূহের সমন্বয়ে ওরসে পাক উদ্যাপিত হয়, তাই ওরস পালন ইসলামের অনুষ্ঠানাদি পালনের মধ্যে অন্যতম এবং সাওয়াবের কাজ।

বর্তমানে দুনিয়া ব্যাপী যে কয়েকটি তরীকাহ্ মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগমান করেছে সেগুলো কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্সবন্দিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া নামে অধিক পরিচিত। হযরত আবদুল কাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্বীনকে পুনর্জীবনদাতা 'মুহীউদ্দীন' হিসেবে যেমন পরিচিত, তেমনি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ত্বরীক্বা 'সিলসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরিয়া'রও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অনুসারী ত্বরীকতপন্থীদের 'কাদেরী' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও রয়েছে এ তরীকার লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরীদ।

বিশেষত: পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'দরবারে আলীয়া ক্বাদেরিয়া সিরিকোট' থেকে আগত গাউসে যামান আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ পেশোয়ারী রহমাতুল্লালি তা'আলা আলায়হি এবং গাউসে যামান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হির প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে আজ এ তরীকার ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁদের মাধ্যমে আজ থেকে নয়শত বছর আগে ইরাকের বাগদাদে উদ্ভূত এ তরীকার যাবতীয় সংস্কৃতি যেমন, যিকির-দরূদ, খতমে গাউসিয়া শরীফ, গেয়ালভী শরীফ ইত্যাদি আমাদের ঘরে ঘরে অনুসৃত হচ্ছে। এ শতাব্দির সংস্কারক অলি, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) প্রবর্তিত 'জশনে জুলূসে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লাম' তথা মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আজ বাংলদেশে গণ ইসলামী সংস্কৃতির অংশ হয়েছে।

আযানের পূর্বে দুরূদ-সালাম এগুলোর মধ্যে অন্যতম। চৌদ্দশ হিজরীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির রচিত না'ত-ই রাসূল 'সবসে আওলা ওয়া আ'লা হামারা নবী' এবং সালাত-সালাম 'মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম' আজ চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইসলামী সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য এনেছে।

# অষ্টম অধ্যায়

## ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) মনে করতেন প্রকাশনা হল কোন জাতি বা গোষ্টির জাতীয় চেতনা, কৃষ্টি, আদর্শ, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রচারের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এটি জাতি গঠনের চালিকাশক্তিও। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ইসলামী শরী'আত ও তরীকতের কার্যক্রম, ইসলামী ভাবধারায় সেবামূলক সংগঠন-সংস্থা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার পাশাপাশি বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। তাই তিনি ধর্মীয় আদর্শিক প্রকাশনাকে বলিষ্ট করার উদ্যেগ গ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের পাশাপাশি তিনি প্রকাশনা জগতে কিছু মূল্যবান সম্পদ উপহার দিয়ে গেছেন। ইসলামী শিক্ষার উপর তাঁর ক্ষুরধার লিখনীর অনেক পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়, যা এখনো অপ্রকাশিত। নিম্নে তাঁর কয়েকটি রচনা ও প্রকাশনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো :

### ৮.১ নূরানী তাকরীর

একটি অসাধারণ রচনা; যা মুলত তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য সংকলন ও কুরআনের তাফসীর। তিনি তাকরির করতেন উর্দু ভাষায়। সাথে সাথে বাংলায় অনুবাদ করে দেয়া হত শ্রোতাদের সুবিধার্থে। তাকরীরগুলোতে 'ইলমে লাদুন্নী'[৭৪৪] অর্থাৎ খোদাপ্রদত্ত অনন্য জ্ঞানের আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। একথা তাকরীরগুলোর বঙ্গানুবাদক মাওলানা আবদুল মান্নান বলেন- এটা শ্রেফ আমার ক্ষুদ্র অনুধাবন সঞ্জাত নয়; বরং চট্টগ্রাম বলুয়ারদীঘি পাড়াস্থ খানকাহ্ শরীফে তাঁর তাকরীরগুলোর অনুবাদ করে শুনাতে গিয়ে আমার পরম শুদ্ধাভাজন তিনজন শিক্ষাগুরু (দু'জন সুদক্ষ অধ্যক্ষ এবং একজন যুগশ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদীস[৭৪৫] নির্দ্বিধায় স্বীকার ও ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁদের অনুবাদের প্রারম্ভে।

আল্লাম তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র মাধ্যমে মুসলিম জাহান, বিশেষ করে সুন্নী দুনিয়া অনেক কিছু অর্জন করেছে। এমনকি সময়োচিত প্রায় সব কিছু অর্জন করেছে। তাঁর অসাধারণ বেলায়তী

---

৭৪৪. সেটি এমন নূর বা জ্যোতি, যা অন্তরে দীপ্তমান হয়, ফলে তা রা অদৃশ্যমানকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সূফীগণ ইলহাম দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে ইলমে লাদুনী বলে থাকেন। এ প্রকারের জ্ঞান কোন মাধ্যম ছাড়াই আলাহ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহে অর্জন হয়ে থাকে। এর অন্য নাম–ইলম আল মা'রিফাত; ইলম আল হাক্বিক্বত; ইলম আল মুশাহিদাত; ইলম আল মুকাশিফাত; ইলম আল বাতিন। এখানে শেষের নামটি ব্যাপক অর্থবোধক আর প্রথমটি বিশেষ অর্থবোধক, অবশিষ্টগুলোতে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। এ ধরনের ইলম কুরআন-হাদীস দ্ধারা প্রমাণিত এবং সালফ-ই সালিহীন দ্বারা স্বীকৃত। (ড.মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ, ***জাহান-ই ইমাম রব্বানী*** (করাচী: রব্বানী ফাউন্ডেশন-২০০৫), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; শায়খ আবদুল কাদির ঈসা আল শাযলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০)

৭৪৫. ওই তিনজন মহান বরণ্যে শিক্ষাবিদ হলেন, হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আলকাদেরী অধ্যক্ষ হাফেয ক্বারী আবদুল জলীল (রহ.) এবং শায়খুল হাদিস আল্লামা মুহাম্মদ ওবায়দুল হক্ব না'ঈমী (মু.যি.আ.)

শক্তি গোটা মুসলিম সমাজকে ধন্য ও সমৃদ্ধ করেছে। তিনি প্রায় প্রত্যেক দিন ফজরের নামাযের পরপর তাকরীর পেশ করতেন। তাঁর তাকরীরগুলোর প্রভাব এতই সতেজ ছিলো যে, সেগুলো প্রতিটি শ্রোতার হৃদয়-মনে অবর্ণনীয়ভাবে রেখাপাত করতো। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলাভাষী শ্রোতাদের নিকট সেগুলোকে আরো সহজবোধ্য কারার জন্য উপরি উক্ত সম্মানিত শিক্ষাবিদ ও যুগবরেণ্য উলামা-ই কেরাম তাক্বরীরগুলো বাংলায় অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতেন।

আরো লক্ষণীয় যে, তাকরীরগুলোর মাহাত্ম্য, তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করে সচেতন শ্রোতাগণ সেগুলোর সংরক্ষণ ও বহুল প্রচারের প্রতি জোর দিতে থাকেন। তাই হুযূরের অতি প্রিয় রূহানী সন্তান, এবং তরীক্বতের অতি গুরুত্বপূর্ণ খালেস ব্যক্তিত্ব, স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান 'রেডিও টোন' দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-এর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব আলহাজ্ব মাহবুবুর রহমান তাকবীর গুলো রেকর্ড করে ক্যাসেট বন্দী করতে থাকেন। দীর্ঘদিন যাবৎ আশেক্ব ভক্ত পীর-ভাই ও জ্ঞানপিপাসুরা ক্যাসেটগুলো সংগ্রহ করে শ্রবণ করতে থাকেন। তারপর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো তাক্বরীরগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশ করার। তাক্বরীরগুলো সংখ্যাও কম নয় সংগৃহীত সব ক'টি তাক্বরীরের সম্পাদনা ও যাচাই-বাছাই'র গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হলো মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবের উপর। তিনি অত্যন্ত যত্ব সহকারে অনুবাদ ও সম্পাদনার পর সম্প্রতি আন্‌জুমান প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ করে পুস্তকারে প্রকাশ করা হয়।

এ পুস্তকে তাঁর সর্বমোট উনিশটি দীর্ঘ পরিসরের তাক্বরীর সন্নিবিষ্ট করা সম্ভবপর হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, পুস্তকটিতে তাঁর প্রত্যেকটা তাক্বরীর হু-বহু সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত: তাকরীরগুলো পবিত্র কুরআনেরই কোন না কোন আয়াত ও সূরা শরীফের বিশুদ্ধ তাফসীর। সুতরাং এ পুস্তকে তাঁর তাফসীর কৃত আয়াত ও সূরাগুলো ধারাবাহিভাবে বিন্যস্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের বিন্যাস অনুসারে ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো লক্ষ্যণীয় যে, প্রত্যেকটি তাকরীরে তিনি যেই আয়াত শরীফ কিংবা সূরার তাফসীর করেছেন, ওই আয়াত ও সূরা শরীফ প্রথমে এক বা একাধিক পৃষ্ঠায় আরবী ভার্ষণে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর ওই পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠাসমূহে ওই আয়াত/আয়াতগুলোর বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ এবং বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে।

বস্তুত: এই পুস্তকের প্রতিটি তাকরীর কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও ক্বিয়াস সম্মত। এতে তাঁর উদ্‌ঘাটিত গূঢ় বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর নসীহতগুলোও অতিমাত্রায় প্রামাণ্য ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর দিকনিদের্শনাগুলো অব্যর্থভাবে অনুকরণ ও পালন যোগ্য। এসবই তাঁর অসাধারণ ইলমে মা'রিফাতের বহিঃপ্রকাশ।

অমূল্য এ পুস্তকে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তা তুলে ধরা হল :

১. হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর তাওবা কবূল হয়েছে। ফেরেশতারা হযরত আদম আলায়হিস সালামকে সাজদার মাধ্যমে মূলত নূর-ই মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। আল্লাহ্‌র রসূল আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সমস্ত সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে বড় ওসীলাহ।[৭৪৬]

---

৭৪৬. আল কুরআন, ২ : ৩৭

২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ফরয। তাঁর প্রতি সামান্যতম গোস্তাখী প্রদর্শন করলেও ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। বিন্দুমাত্র শালীনতা বিবর্জিত শব্দও নবী-ই করীমের শানে ব্যবহার করা হারাম। এমনটি করলে মানুষ কাফির হয়ে যায়, সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায়।[৭৪৭]

৩. নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিকে সব ধরনের পাপ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করেছেন এবং কিতাব, হিকমত, বিধানবলী ইত্যাদি এবং তাদের অজানা অনেক বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন। হুযূর-ই আকরাম আরো শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও তাঁর নি'মাতরাজির শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্যে উভয় জগতের সাফল্য নিহিত।[৭৪৮]

৪. নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমন আনা ও তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন দানের উপর নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গিকার গ্রহণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়দি।[৭৪৯]

৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতা করার ভয়ানক পরিণতির বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির আলোচনা।[৭৫০]

৬. মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র অকাট্য প্রমাণ আর কুরআন-ই করীম সমুজ্জ্বল নূর ইত্যাদি বিষয়ের প্রামাণ্য আলোচনা।[৭৫১]

৭. ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান ইসলামে রয়েছে ইত্যাদি মর্মে হৃদয়গ্রাহী তাক্বরীর বা আলোচনা।[৭৫২]

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র নূর আর কুরআন-ই করীম সুস্পষ্ট কিতাব। 'নুর' নিজেও আলোকোজ্জ্বল এবং অন্যকে আলোকিত করে। কুরআন বুঝার জন্য নবী-ই করীমের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও নূর-ই নুবূয়তের প্রতিফলন আবশ্যক ইত্যাদি বিষয়ে ঈমান সতেজকারী আলোচনা।[৭৫৩]

৯. আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং অন্যান্য মু'মিনগণ প্রত্যেক সাচ্চা মু'মিনের বন্ধু। আল্লাহ্‌র দলই সর্বদা বিজয়ী ও কৃতকার্য। এ সব বিষয়ে সপ্রমাণ ও হৃদয় আলোকিতকারী তাকরীর।[৭৫৪]

১০. 'ফানাফিল্লাহ্' ও 'বাক্বাবিল্লাহ্'র সর্বোচ্চ স্তরে রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই অধিষ্ঠিত। তিনি স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার যাত সত্বা মুবারকের দীদার স্থির চিত্তে করেছেন; আর নিজ যবানে পাকে নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হিসেবে ঘোষণা করতে থাকেন। তৎসঙ্গে সুলতানুল আরেফীন ও মানসূর হাল্লাজ আলায়হিমার রাহ্‌মাহ্‌ও যথাক্রমে 'মা-

---

৭৪৭. আল কুরআন, ২ : ১০৪
৭৪৮. আল কুরআন, ১ : ১৫২-১৫২
৭৪৯. আল কুরআন, ৩ : ৮১
৭৫০. আল কুরআন, ৪ : ১১৫
৭৫১. আল কুরআন, ৪ : ১৭৫-১৭৬
৭৫২. আল কুরআন, ৫ : ৩
৭৫৩. আল কুরআন, ৫ : ১৫
৭৫৪. আল কুরআন, ৫ : ৫৫-৫৬

'আ'যামা শানী ও 'আনাল হক্ব' বলা, পক্ষান্তরে ফিরআউনের 'আনা রাব্বুকুমুল আ'লা বলা'র মধ্যে পার্থক্য আলোচনা।[৭৫৫]

১১. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রদত্ত নি'মাতগুলোকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করার মধ্যে সার্বিক কল্যাণ নিহিত এবং তাতে আপত্তি কিংবা প্রত্যাখ্যানে ধ্বংস অনিবার্য।[৭৫৬]

১২. প্রতিটি মু'মিনের নিকট রসূলে আক্রাম তাশরীফ এনেছেন। মু'মিনদের সাফল্যে তিনি সন্তুষ্ট, পক্ষান্তরে মু'মিনদের কষ্টে পড়া তাঁর নিকট কষ্টদায়ক। এসব বিষয়ে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।[৭৫৭]

১৩. আল্লাহ্‌র  দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করলে তজ্জন্য খুশী উদ্‌যাপন করা কুরআন সুন্নাহ্ সম্মত ও অতি উত্তম কাজ। ঈদে মীলাদুন্নী উদ্‌যাপনের উৎকৃষ্ট দলীল।[৭৫৮]

১৪. রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে দুরূদ-সালাম আরয কারার ফযীলত এবং আনুষঙ্গিক অতীব প্রয়োজনীয় আলোচনা।[৭৫৯]

১৫. দুনিয়ার সকল বাদশাহর দরবারের নিয়মাবলী প্রণয়ণ ও কার্যকর করেন খোদ্ বাদশাহ্ কিংবা তাঁর লোকজন, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারের আদাব বা নিয়মাবলী রচনা ও কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন খোদ্ আল্লাহ তা'আলা।[৭৬০]

১৬. আল্লাহ তা'আলা সব সময় তার হাবীবের প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি কখনো তাঁর হাবীবকে ছেড়ে দেননি। তিনি তাঁর হাবীবকে এতবেশী নি'মাত দিয়েছেন যে, তিনি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তিনি তখনই পূর্ণ সন্তুষ্ট হবেন, যখন তাঁর একজন উম্মতও দোযখে থাকবে না।[৭৬১]

১৭. সূরা আলাম নাশ্‌রাহ্ লাকা'র তাফসীর। হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'শক্বক্বে সদর' বা বক্ষ মুবারক সম্প্রসারণের হিকমত বা রহস্যাবলী ইত্যাদিও হৃদয় আলোকিতকারী আলোচনা।[৭৬২]

১৮. সূরা ত্বীন-এর বিস্তারিত তাফসীর। আল্লাহ্‌র, ত্বীন যায়তুন ও তূর পর্বতের শপথ করার হিকমত। মানবসৃষ্টির রহস্য ও মানুষের সাফল্যের চাবিকাঠি ও তার শুভ কিংবা অশুভ পরিণতির কারণ ইত্যাদির উপর অতি সারগর্ভ আলোচনা।[৭৬৩]

১৯. সূরা ত্বীন'-এর ঈমান সতেজকারী তাফসীর। হুযূরে আক্রামের মক্কা বিজয়ের বিভিন্ন অনন্য বৈশিষ্টের আলোচনা। ইসলামের পরিপূর্ণতার অতি আনন্দময় দৃশ্য স্বর্য় নবী করিম স্বচক্ষে অবলোকনের সুসংবাদ ইত্যাদির অতি উৎকৃষ্ট তাক্বরীর।[৭৬৪]

---

৭৫৫. আল কুরআন, ১০ : ১৭
৭৫৬. আল কুরআন, ৯ : ৫৯
৭৫৭. আল কুরআন, ৯ : ১২৮-১২৯
৭৫৮. আল কুরআন, ১০ : ৫৮
৭৫৯. আল কুরআন, ৩৩ : ৫৬
৭৬০. আল কুরআন, ৪৯ : ১-৫
৭৬১. আল কুরআন, ৯৩ : ১-৫
৭৬২. আল কুরআন, ৯৪ : ১-৮
৭৬৩. আল কুরআন, ৯৫:১-৮

## ৮.২ মাজমু‘আয়ে সালাওয়াতে রাসূল-এর প্রকাশনা

প্রকাশনা জগতে আরেকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তকের নাম মজমু‘আহে সালাওয়াতে রাসূল। যুগের মহাপুরুষ আল্লামা খাজা আবদুর রহমান চৌরভী (রহ.) কর্তৃক রচিত ত্রিশপারা সম্বলিত দুরুদ শরীফ গ্রন্থ "মাজমু'আ-ই সালওয়ালির রাসুল (সা.)" এর তৃতীয় সংস্করণ এর ব্যবস্থা করেন১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। এ গ্রন্থের পূর্ণ নাম 'মুহায়য়্যিরুল উকূল ফী বয়ান আওসাফ-ই-আক্বলিল উকূল মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতির রাসূল' সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। যা মাজমু‘অয়ে সালাওয়াতে রাসূল (সা.) নামে পরিচিত। ত্রিশপারা মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল করীম এর পর ত্রিশপারা বুখারী শরীফ এর পর দুরূদ শরীফের উপর লিখিত ত্রিশ পারার গ্রন্থ। পারা সংখ্যা ৩০। প্রতিপারায় পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪০। দরূদ শরীফের সংখ্যা ৬৬৬৬। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) নির্দেশে এ গ্রন্থের মুকাদ্দমা (ভূমিকা) সর্বপ্রথম মাওলানা জাফর আহমদ কর্তৃক বাংলায় অনুদিত হয় এবং মুজাফফর আহমদ চান্দগাও কর্তৃত প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে পুনরায় আল্লামা জালাল উদ্দীন আল-কাদেরী (অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া) কর্তৃক অনূদিত হয়ে মূল গ্রন্থে সংযোজিত হয়। বর্তমানে আন্‌জুমান রিসার্চ সেন্টার'র তত্ত্বাবধানে বাঙ্গানুবাদ কর্ম এবং প্রকাশনা এগিয়ে যাচ্ছে। ইত:মধ্যে ১২ পারা বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

### প্রকাশকাল

হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.) রচিত মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াত-ই-রাসূল (সা.) কিতাবখানা লিখার কাজ তাঁর জীবদ্দশায় সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশী সময়ের রচনা কাজের বিষয়টি কেউ বুঝতে পারেনি। প্রচারবিমুখ এ মহান সাধক সর্বদা নিজকে গোপন রাখার চেষ্টা করতেন। ত্রিশপারা দুরূদ শরীফের রচনা কাজ সমাপ্ত হলে রেঙ্গুনে অবস্থানরত খলীফা হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)-কে পত্র মারফত তা মুদ্রণ ও প্রকাশে নির্দেশ দেন, মুর্শিদের নির্দেশ পেয়ে তিনি বলেন, "হামতো তাজ্জুব হো গিয়া, হাম তো হামারা আন্দর নাথা, এইসে আযীমুশ্‌শান হাস্তি হামকো নসীব হুয়া, লেকিন আপ আপকো ছুপায়া, উম্মী থে, লেকিন তীস পারা দুরূদ শরীফ লিখা জু দুনিয়া মে বে মেসাল হ্যায়। যব দুরূদ শরীফ ছাপানে কো প্রেস মে দিয়া, চৌহর শরীফ সে খবর আয়া কেহ্ হুযূর সিরিকোটি্ দুনিয়াসে রুখসত ফরমায়া। আগর ইয়ে দুরূদ শরীফ ছাপাওয়াতে তব তো আপকা বেলায়ত ওয়া জযবাত যাহির হো যাতে, ইস্‌কি পহেলে আপ ছুপ গেয়া"।[৭৬৫] হযরত সিরিকোটি (রহ.) এর পত্রে আরো উল্লেখ করা হয়, মাজমুআয়ে সালাওয়াত-ই-রাসূল (সা.) এর যেন একটা মুকাদ্দামাহ্ (ভূমিকা) প্রস্তুত করা হয়। ভূমিকায় দুরূদ শরীফের ফযীলত, তিলাওয়াতের পদ্ধতি ও কিরাতের নিয়মাবলী ব্যক্ত করা হয়। খাজা চৌহরভী (রহ.) জীবদ্দশায় এ কাজের দায়িত্ব মুহ্তারাম মাওলানা আজমত উল্লাহ সিরিকোটি কে অর্পন করেন, তিনি খাজা চৌহরভীর (রহ.) নির্দেশে একটা মুকাদ্দামাহ্ (ভূমিকা) তৈরি করে হযরতের সামনে পেশ করেন। খাজা চৌহরভী (রহ.) বলেন, মুকাদ্দমাহ্ যথার্থ হয়েছে তবে আরো কিছু

---

৭৬৪. আল কুরআন, ১১০:১-৪

৭৬৫. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, মাজমু'আয়ে সালাওয়াতে রাসূল : বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিকত্ব, (চট্টগ্রাম : আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, ১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ১২

সংযোজন দরকার। তাই ২য় সংস্করণে মুকাদ্দামাহ্ সংযোজন করে রেঙ্গুনে হযরত সিরিকোটি (রহ.) নিকট প্রেরণ করেন। মাওলানা আজমত উল্লাহ লিখিত মুকাদ্দমায় আরো কিছু সংযোজন করে খাজা চৌহরভীর (রহ.) সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শাজরায়ে কাদিরিয়াসহ তরতীব দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রেসালা প্রকাশ করা হয়। হযরত খাজা চৌহরভীর (রহ.) নির্দেশে এ বিশাল কিতাবখানা তাঁর খলীফা সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.) দ্বারা কিতাবখানা সর্ব প্রথম ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বার্মার রেঙ্গুন শহরে ছাঁপানো হয়। আহমদ উল্লাহ এবং ভক্ত-অনুরক্তরা। প্রকাশনার খরচ নির্বাহ করেন।[৭৬৬]

হিজরী ১৩৭২ মুতাবিক ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমীর শাহ পেশোয়ারী (রহ.) এর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ করেন। পরবর্তীতে সিরিকোট দরবারের মুর্শিদ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর নির্দেশে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর তত্ত্বাবধানে হিজরী ১৪০২ মুতাবিক ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা, উর্দূ ও ইংরেজি ভূমিকাসহ ৩য় সংস্করণ ছাপানো হয়। পরে মুর্শিদে বরহকের তত্ত্বাবধানে পূর্ণ উর্দূ অনুবাদসহ সিরিকোট দরবার থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সাজ্জাদানশীন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মু.যি.আ) ও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ (মু.যি.আ) এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ উর্দূ অনুবাদসহ ১৪১৬ হিজরী মুতাবিক ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরিকোট দরবার থেকে প্রকাশিত হয়। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর নির্দেশে পাকিস্তানের বিখ্যাত উর্দূ সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আবুল হাসনাত মুহাম্মদ আশরাফ সিয়ালভী এ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করেন।[৭৬৭]

১৯৭৯ সালে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ২২ জন পীরভাইসহ যিয়ারতের উদ্দেশে গাউসে পাক হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মাযার মোবারকে (বাগদাদ শরীফ) উপস্থিত হন। সেখানে অবস্থানকালে একদিন রাত প্রায় ১২ টার পর হুযূর ক্বিব্লা আকস্মিকভাবে আন্‌জুমানের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ জাকারিয়া সাহেবকে ডেকে বললেন- মাওলানা জালালুদ্দীনকো বুলাইয়ে (জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল কাদেরী)। তিনি অধ্যক্ষকে নিয়ে হুজূর ক্বিবলার সামনে উপস্থিত হলে হুজূর কেবলা রহমাতুল্লাহি আলায়হি সকলের উপস্থিতিতে ইরশাদ করলেন- "আভী আভী হুজূর গাউসে পাক শাহেনশাহে বাগদাদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি কি তরফ্‌ছে অর্ডার হুয়া হ্যায় আলমগীর খানকাহ শরীফ বানানা হ্যায়, আউর মাজমুয়ায়ে ছালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাপওয়ানা হ্যায়, আউর ইয়ে বাত ভা-য়ূঁকো ছমঝা দিজিয়ে"[৭৬৮] অর্থাৎ: এ মাত্র হুযূর গাউছে পাক শাহেনশানে বাগদাদ রহমাতুল্লহি আলায়হি'র পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে আলমগীর খানকাহ্ শরীফ তৈরি করতে হবে এবং মাজমুয়ায়ে ছালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাপাতে হবে; আর এ নির্দেশ ভাইদেরকে বুঝিয়ে দিন। তখন হুযূর কেবলা রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র নির্দেশে বিষয়টি অধ্যক্ষ সাহেব ভাইদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। হুযূর কেবলার নির্দেশে মতে পরবর্তীতে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার মাধ্যমে আলমগীর খানকাহ্ এ কাদেরীয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়।

---

৭৬৬. প্রাগুক্ত
৭৬৭. আল্লামা আশরাফ সিয়ালভী, *মুকাদ্দামা-ই মুজমুআয়ে সালাওয়াতে রাসূল* (পাকিস্তান, লাহোর, ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ৫৫
৭৬৮. শাজরা শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

**বৈশিষ্ট্য**

খাজা চৌহরভী (রহ.) রচিত ত্রিশপারা গ্রন্থখানি আল্লাহ্‌র কুদরত, রাসূল (সা.)-এর মুযিজা ও খাজা চৌহরভী (রহ.)-এর আধ্যাত্মিকতার দলীল। এ গ্রন্থের মর্মস্পর্শী আবেদন পাঠক ও শ্রোতাকে আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে যার। গ্রন্থের প্রতিটি বাক্য আল্লাহ্‌ভীতি ও নবীপ্রেমের আকর্ষণীয় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রন্থের তিলাওয়াতের মোহনীয় আস্বাদ পাঠককে মোহিত করে। ভাষার সাবলীলতা ও অলংকার সর্বত্র সমভাবে দীপ্তমান। অভিনব উপস্থাপনা ও অপূর্ব বাচনভঙ্গি পাঠককে মুগ্ধ করে। অনুপম ভাষাশৈলী, অপূর্ব শব্দচয়ন, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, ভাবের গভীরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ইত্যাদির বিচারে এ বিশাল গ্রন্থ শ্রেষ্ঠত্বের মানে অধিষ্ঠিত।

**বিষয়বস্তুর**

রচিত মাজমুয়ায়ে সালাওয়াত-ই-রাসুল (সা.) গ্রন্থের বিষয়বস্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হুযূর (সা.)-এর জীবনধারা পবিত্র হাদীস শরীফ থেকে উৎসারিত। এ গ্রন্থের আবেদন ও বক্তব্যসমূহ শতাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাব দ্বারা সমর্থিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ গ্রন্থের জুড়ি নেই। অলৌকিক ও আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ডে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এ গ্রন্থের আবেদন চিরন্তন। এ গ্রন্থের গভীর আলোচনা ও গবেষণার অবকাশ রয়েছে। এ গ্রন্থে মহান রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বাগত প্রকাশগত শাশ্বত চিরন্তন, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সত্বা অপরিসীম ক্ষমতা, মহান, শ্রেষ্ঠ ও বিশালত্বের বর্ণনা ব্যক্ত হয়েছে। সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন স্তরগত, অস্তিত্বগত, দর্শনগত, তাওহীদ স্তরের বিভিন্ন রহস্যময় আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। রাসূল পাক (সা.) এর সত্ত্বাগত, নূরগত, জ্ঞানগত, গুণগত, চরিত্রগত, কর্মগত, নুবূয়াত-রিসালাত, ইমামত, বেলায়ত, খেলাফত, ইবাদত, রিয়াযত প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় চমৎকারভাবে তাত্ত্বিক আলোচনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। মনোমুগ্ধকর হৃদয়গ্রাহী মহিমা ও বরকতময় এ বিশাল গ্রন্থ রচয়িতার অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, ত্রিশপারার প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা বিষয়বস্তু :

১ম পারা : ফী নূরীহি ওয়া যাহুরিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২য় পারা : ফী সালাওয়াতিহি ওয়া সালামিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

৩য় পারা : ফী বাদ্‌নিহি ওয়া আযায়িহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

৪র্থ পারা : ফী লিবাসিহি ওয়া মালাবাসিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

৫ম পারা : ফী নাসাবিহি ওয়া হাসাবিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

৬ষ্ঠ পারা : ফী আসমায়িহি ওয়া শারাফাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

৭ম পারা : ফী আসমায়িহি ওয়া সিফাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

৮ম পারা : ফী সিয়াদাতিহি ওয়া সায়্যিদিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

৯ম পারা : ফী তাহ্‌মীদিহি ওয়া তামজীদিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

১০ম পারা : ফী  ইসরায়িহি ওয়া মি'রাজিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

১১ শ পারা : ফী তাহলীলিহি ওয়া তাসবীহিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

১২ শ পারা : ফী হিলমিহি ওয়া হুলূমিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

১৩ শ পারা : ফী দু'আয়িহি ওয়া ইলতিযায়িহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

১৪ শ পারা : ফী ক্বা-লিহি ওয়া মাক্বালিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

১৫ শ পারা : ফী হুবুয়্যাতিহি ওয়া রিসালাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

১৬ শ পারা : ফী আয্‌মাতিহি ওয়া ইয্‌মাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

১৭ শ পারা : ফী শাফাআতিহি ওয়া ওয়াসীলাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

১৮ শ পারা : ফী ক্বাদরিহি ওয়া ইক্বতিদায়িহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

১৯ শ পারা : ফী আয়াতিহি ওয়া বিশারাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২০ শ পারা : ফী হুব্বিহি ওয়া মাহ্‌বূবিয়্যাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২১ শ পারা : ফী ইল্‌মিহি ওয়া ইল্‌মি গায়বিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২২ শ পারা : ফী মুজিযাতিহি ওয়া খাওয়ারিক্বাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২৩ শ পারা : ফী দাওয়াতিহি বি তাওয়াস্‌সুলি সালাওয়াতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২৪ শ পারা : ফী আওয়ামিরিহি ওয়া নাওয়ায়িহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২৫ শ পারা : ফী শুহূদিহি ওয়া মাশহূদিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২৬ শ পারা : ফী খুলক্বিহি ওয়া আখলাক্বিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২৭ শ পারা : ফী ক্বুরবিহি ওয়া ক্বারাবাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২৮ শ পারা : ফী ওয়াসলিহি ওয়া মায়িয়্যাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

২৯ শ পারা : ফী লিওয়া-ই হামদিহি ওয়া মাক্বাম-ই মাহ্‌মূদিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

৩০ শ পারা : ফী খায়রি খাল্‌ক্বিহি ওয়া খায়রি উম্মাতিহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম,

বিষয়বস্তুগুলোতে প্রিয়নবী (সা.)-এর শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ, পরিধেয় পোষাক-পরিচ্ছেদের বিবরণ, মহত্ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব বংশগত মর্যাদা, গুণবাচক নামসমূহের ব্যাখ্যা ক্ষমতার ব্যাপকা-বিশালতা, আল্লাহ্‌র ভাষায় নবীর মর্যাদা, নবী (সা.)-এর মিরাজ পরিভ্রমণ নভোমণ্ডলের সর্বোচ্চে পদচারণ, মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জন, মহান প্রভুর গুণকীর্তন, তার সমুন্নত স্বভাব-চরিত্র, আল্লাহ্‌র প্রতি আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনা নূরানী কথামালা, অনুমোদন, সমর্থন ও জীবনাদর্শ বিবরণ, মহিমাময় পবিত্র সত্ত্বার শান-মান ও জীবন-দর্শন, পরকালে তাঁর শাফা'আত লাভে ওয়াসীলা ধারণ,

তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর অনুসরণ-অনুকরণের নির্দেশ পালন, আল্লাহ্‌র কুদরত নিদর্শন ও নবী করীম (সা.)-এর প্রতি সুসংবাদ জ্ঞাপন, তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ তাঁর অসীম মর্যাদা ও অলৌকিক ক্ষমতার বিবরণ, তাঁর আহ্বানে সাড়া দান ও দুরূদ-সালামের ওয়াসীলাহ্ ধারণ, তাঁর আদেশ-নিষেধের যথার্থ পালন, তাঁর স্বত্ত্বাগত ও দর্শনগত পরিচয় অর্জন, তাঁর নৈতিক ও চরিত্রগত অবস্থার বিশদ বিবরণ, তাঁর সান্নিধ্য লাভ ও নৈকট্য অর্জনের গুরুত্ব জ্ঞাপন, তাঁর তিরোধান ও মাওলায়ে হাকীকীর সান্নিধ্য লাভ, তাঁর সমুন্নত মর্যাদা ও বেহেশ্‌তের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিতকরণ, সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠনবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদার বিবরণ ইত্যাদি সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর ও প্রামাণ্য আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছে এ গ্রন্থকে, তিনি এতে রাসূল (সা.)-এর জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাগতিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক একক কথায় নবী জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ তুলে ধরেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে রচিত, সর্ববৃহৎ দুরূদ শরীফের এ গ্রন্থে তাফসীর, হাদীস, ফিক্বহ্, উসূল ফিক্‌হ, মানতিক, বালাগাত, আক্বাইদ, সূফীতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, শরীয়ত তারীক্বাত, দর্শনসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ বলা যাবে। মাজ্‌মুওয়ায়ে সালাওয়াত-ই-রাসূল (সা.) গ্রন্থে অসংখ্য নবী-রাসূল (সা.) এর নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, এতগুলো নবী আলাইহিমুস্ সালাম-এর নাম সম্বলিত কিতাব পৃথিবীর অন্য কোন কিতাবে একসাথে সন্নিবেশিত হয় নি। সালাত আদায় ও নাতে মুস্তাফার পটভূমিতে এ কিতাব রচিত হলেও এ গ্রন্থে ইসলামী শরী'আতের অসংখ্য জটিল-কঠিন বিষয়াদির সুষ্ঠু সমাধান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদির সন্ধান মিলবে। এ কিতাবে রাসূল (সা.) এর দরবারে সালাত-সালামের হাদিয়া নাযরানা পেশ করার পাশাপাশি হাদীসে রাসূলের অসংখ্য দুর্লভ রেওয়ায়েত সন্নিবেশন করা হয়েছে। মানবাত্মার পবিত্রতা অর্জন, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন কল্যান অর্জনে স্রষ্টা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে মুনাজাত বরকতময় দু'আ এককভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দু'আ গুলো আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ ক্বুবুলের নিশ্চয়তা আশা করা যায়। বিপদাপদ, দুঃখ-বেদনা, দুঃশ্চিন্তা-অশান্তিসহ যাবতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে দু'আসমূহ অত্যন্ত বরকতময় ও ফযিলতপূর্ণ এবং মহান প্রভূর পাক আলীশান দরবারে দু'আ প্রার্থনা ক্বুবুলের সহায়ক। এ কিতাবে হুযূর পাক (সা.)-এর মৌল সত্বাগত পরিচয় ও প্রকৃত গুণাবলীর সৌন্দর্য ও সিফাতে কামালিয়ার হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শীভাবে অপূর্ব বাচনভঙ্গি অভিনব পন্থায় এমন চিত্তাকর্ষকরূপে তুলে ধরার প্রয়াস পান, যা পাঠে মুসলিম বিশ্বের বহু খ্যাতনামা আলিম, পীর মাশায়িখ, ত্বরীক্বতপন্থী, সূফীতত্ত্ববিদরা প্রশান্তি অর্জন করে। এ গ্রন্থের উদহারণ গ্রন্থাকার নিজেই। গভীরভাবে অধ্যায়নে এ গ্রন্থের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়।

### ৮.৩ মাসিক তরজুমান

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) মাসিক তরজুমান প্রকাশ করার জন্য আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর কেবিনেট সভায় সিদ্ধান্ত দেন। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকাটি সরকারী রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। ১৯৭৯ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি প্রতি মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। মাসিক পত্রিকাটির বর্তমান পৃষ্ঠপোষকতার আছেন তাঁরাই সুযোগ্য উত্তরসূরী ও খলিফা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.) ও রাহ্‌নুমায়ে শরী'আত ত্বরীক্বত

হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মু.যি.আ.)। বর্তমানে পত্রিকাটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আহলে সুন্নাত আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। পত্রিকাটি বর্তমানে প্রতিমাসে আঠার হাজার কপি ছাঁপানো হয়ে থাকে।[৭৬৯]

**মাসিক তরজুমানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

মাসিক তরজুমানে প্রতি সংখ্যায় দরসে কুরআন, দরসে হাদীস, শানে রিসালাত, এচাঁদ-এমাস শিরোনামে চন্দ্র-মাসের ফযীলত, যুগোপযোগী প্রবন্ধ এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে মাসয়ালা-মাসায়িল সম্পর্কিত অধ্যায় রয়েছে।

দরসে কুরআন শিরোনামের প্রবন্ধে নিয়মিত কুরআনুল কারীমের আয়াতের আনুষঙ্গিক মাসয়ালা-মাসায়িলসহ ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ প্রাঞ্জলময় নির্দেশনা থাকে। এতে সাধারণ মুসলমানরা কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করে আলোকিত জীবন গঠনে সহায়তা পায়।

দরসে হাদীস শিরোনামের প্রবন্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ-দর্শন সম্বলিত সাবলীল লেখা দ্বারা পাঠক সমাজ ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি অনুপ্রাণিত হয়।

এ চাঁদ এ মাস শিরোনামের প্রবন্ধে চান্দ্র মাসের ফযীলতের উপর সম্যক ধারণাসহ স্ব স্ব চন্দ্র মাসে ইন্তিকাল হওয়া সাহাবী, তাবি-তবি তাবিঈ, গাউস, কুতুব, প্রসিদ্ধ অলী বুযুর্গের জীবনী সমৃদ্ধ কালাম দ্বারা পাঠক নতুন নতুন তথ্য সম্পর্কে ওয়াফিহাল হয়ে ধন্য হন।

শানে রিসালাত-শিরোনামের নিয়মিত প্রবন্ধে বাতিলপন্থীদের কুফরী আক্বীদাহ্ মনোভাব ও অসৌজন্য অভিমতের দলীল দ্বারা জওয়াবসহ কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অতুলনীয় মর্যাদা ও অনুপম জীবন চরিত তুলে ধরা হয়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শিরোনামে প্রতি সংখ্যার প্রশ্নোত্তর পর্ব দ্বারা পাঠক শরী'আতের যুগোপযোগী বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়। (দ্র. গবেষকের সরেজমিন প্রতিবেদন)

মাসিক তরজুমান এর অনুসরণে সুন্নি অঙ্গনে আরো যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা ও মাসিক, পাক্ষিক প্রকাশিত হয়ে আসছে[৭৭০]

এ তরজুমান সুন্নী ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করছে। ইসলামী বিপ্লব ও সুন্নী আন্দোলনের কর্মীদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। এ তরজুমান সম্পর্কে তিনি অভিমত ব্যক্ত করতেন।

১) এ তরজুমান বাতিল ফিরকার কবর রচনাকারী।
২) রাসুল (সা.) এর আশেকগণের জন্য এ তরজুমান ক্রয় ও পাঠ করা একান্ত অপরিহার্য।
৩) তরজুমান হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রাণ।
৪) ইনশাআল্লাহ এ তরজুমান অচিরেই উন্নতি লাভ করবে এবং প্রচার জোরদার হবে।

---

৭৬৯. সাক্ষাৎকার: সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, মাসিক তরজুমান ৩২১ দিদার মার্কেট, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম

৭৭০. উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মাসিক পত্রিকা- ১.মাসিক সুন্নি বার্তা, ২. মাসিক জীবন বাতি, ৩. মাসিক আলোক ধারা, ৪. মাসিক আল মু'মিন, ৫. সাপ্তাহিক উজ্জীবন, ৬. মাসিক তাসনীম ইত্যাদি।

কোন আদর্শের ধারক-বাহক এবং প্রচারক হিসেবে প্রকাশনার মতো এত স্থায়ী অথচ গতিশীল মাধ্যম দ্বিতীয়টি নেই। সংগঠন-সংস্থ বা প্রতিষ্ঠানও নানা কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ প্রকাশনায় অন্তত: একটি কপি হলেও সেই আদর্শের অস্তিত্বকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। তাই হুযূর ক্বেবলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর পরিচালিত আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়াকে বিভিন্নমুখী প্রকাশনার প্রতি উৎসাহিত করেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। ১৯৭৮-এ হুযূরের নিদের্শে 'মাসিক তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত' চালু হয়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে হতে পাকিস্তান থেকে মজলিসে গাউসিয়া কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে 'আনওয়ারে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম' নামক একটি নিয়মিত প্রকাশনা। গাউসুল আজম জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও গাউসে দাওরাঁ খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র নিয়মিত ওযীফা সমূহকে হুযূর ক্বেবলা আওরাদুল ক্বাদিরীয়াতির রহমানিয়া নামে সংকলন করে ছাপিয়ে দেন, যা ক্বাদেরিয়া তরীক্বার অনুসারীদের জন্য বিশেষ নেয়ামত। আল্লাহ্‌র  ত্রিশপারা কুরআন ও ছহি বোখারী শরীফের পর তৃতীয় যে ত্রিশ পারা গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বের এক বিস্ময়কর গবেষণার বিষয় বলে গণ্য হচ্ছে সেটি হলো ' মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। প্রতি পারা ৪৮ পৃষ্ঠা করে মোট ৩০ পারা বিশিষ্ট এ বিশাল উচ্চাঙ্গের আরবী ভাষার কিতাবটি লিখেছেন সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র পীর -মুর্শিদ হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। যিনি জীবনে প্রাতিষ্ঠিানিক ও আনুষ্ঠানিক কোনরূপ শিক্ষা গ্রহণ করেননি। শুধু তা নয়, হুযূর ক্বেবলা ১৯৯৩ ইংরেজীতে ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এ 'মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম' গ্রন্থটির আরবী থেকে উর্দু অনুবাদ নিজ তত্ত্বাবধানে আরম্ভ করান এবং ২২ পারা পর্যন্ত অনুবাদ তাঁর বরকতময় জীবদ্দশায়ই সমাপ্ত হয়। এর পরবর্তী অল্প কিছুদিনের মধ্যে পূর্ণ কিতাব অনূদিত হয়ে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে । বর্তমান হুযূর ক্বেবলা আল্লামা তাহের শাহ্ সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুল আলী'র তত্ত্ববধানে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূলের ৩০ পারা পর্যন্ত উর্দূ আনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আরো আনন্দের বিষয় যে, বর্তমান হুযূর ক্বেবলার নির্দেশ ও দো'আয় আল্লামা এম.এ.মান্নান এবং বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের সহযোগিতায়, আন্‌জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার তত্ত্বাবধানে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূলের বঙ্গানুবাদের কাজও দ্রুত এগিয়ে ছলছে। এসব নিয়মিত প্রকাশনা ছাড়াও হুযূর ক্বেবলার নির্দেশে আনজুমান কর্তৃক সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক আক্বীদা ও আমল সংক্রান্ত অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং হুযূর ক্বেবলার আদর্শে উজ্জীবিত আলেম-ওলামা, লেখকগণ ইতিমধ্যেই শতাধিক পুস্তক রচনা করে ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্যের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করেছেন।

### ৮.৪ আওরাদে কাদেরিয়া রহমানিয়া

এটি হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদির জীলানী (রহ.)'র দৈনন্দিন ওযীফা ছিল। এগুলোকে একত্রে 'আওরাদ-ই কাদিরিয়া' বলা হয়। বাগদাদ শরীফের সাজ্জাদানসীন হযরত সৈয়্যদ মুস্তাফা কাদেরী এ ওযীফাগুলো আল্লামা খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.) কে দিয়েছিলেন, তিনি মুসলমানদের আত্মাশুদ্ধি এবং ইহ ও পরকালীন উন্নতির জন্য এ সব ওযীফা এবং নিজের দৈনন্দিন ওযীফাগুলোকে সুবিন্যস্ত করে রাখেন। পরে হস্তলিখিত এ বিন্যস্ত কপি আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) সংগ্রহ করেন। এ সংরক্ষিত একমাত্র কপি আল্লাম সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্

(রহ.) পুস্তাকারে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে গাউসুল আযম আবদুল কাদের জীলানী (রহ.)'র ১৮টি ওযীফা রয়েছে এবং আল্লামা আবদুল রহমান চৌহরভী (র.)'র ১৭টি ওযীফা রয়েছে। তম্মধ্যে প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক ওযীফা ছাড়াও অন্যান্য সময়ে পড়ার জন্যও ওযীফা রয়েছে। এ গ্রন্থের শুরুতে ওযীফাগুলো পাঠ করার নিয়মাবলী উল্লেখ আছে। ইত:মধ্যে এ গ্রন্থটি তিনবার প্রকাশিত হয়েছে।

**প্রথম সংস্করণ**

তত্ত্বাবধানে : আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)

প্রকাশক : আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল : ১৯৮৬ খ্রি.

মুদ্রণে : আজাদী প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম।

**দ্বিতীয় সংস্করণ**

তত্ত্বাবধানে : আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ)।

প্রকাশক : প্রেস এন্ড পাবলিকেশান দপ্তর, আন্জুমান-এ রহামানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল : ২০০২ খ্রি.

মুদ্রণে : ইমেজ সেটিং লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

**তৃতীয় সংস্করণ**

তত্ত্বাবধানে : আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ)।

প্রকাশক : প্রেস এন্ড পাবলিকেশান দপ্তর, আন্জুমান-এ রহামানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল : ২২ জুন, ২০১৭ খ্রি.

## ৮.৫ সাময়িকী, বার্ষিকী ও অন্যান্য প্রকাশনা

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার সাহিত্যমোদী মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর বিদায় স্মারক ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে। পবিত্র ঈদ-ই মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে দেয়ালিকা, ইসলামী ম্যাগাজিন, পোস্টার, ব্যানার-ফ্যাস্টুন এবং জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা, ত্বারীক্বাতের প্রখ্যাত অলীদের ওয়াফাত বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করে। প্রকাশনার কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা হল।

### ক. আল-বশীর দেওয়াল পত্রিকা

জামেয়ার শিক্ষার্থীরা ক্লাসের লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সৃজনশীল লেখক তৈরীতে বদ্ধপরিকর। সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা সিনিয়র ছাত্ররা প্রতি মাসে প্রকাশ করে 'আল-বশীর' দেওয়াল পত্রিকা। জামেয়ার ২১তম কামিল (হাদীস) ব্যাচ এ মেধাবী ছাত্র আবুল ইয়াহ্ইয়া মুহাম্মদ মুহসিনসহ ব্যাচ এ সাহিত্যমনা শিক্ষার্থীদের প্রয়াসে দেওয়ালিকা পত্রিকা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৭৭১]

৭৭১. আল বশীর: বার রবী'উল আউয়াল তারিখটি রাসূল স্মৃতি বিজড়িত একটি মহিমান্বিত দিন। নিখিল বিশ্ব আনন্দ রবে মেতে উঠেছিল সৃষ্টির সেরা আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.)-এর সান্নিধ্য পেয়ে। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার সাহিত্যমনা শিক্ষার্থীরা রাসূল আগমনের এদিনকে বরণ করার প্রয়াসে তাঁর

মেধা, মনন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদর্শ ও মানসম্মত লেখক ফোরাম তৈরির প্রয়াসে আল-বশীর দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়।[৭৭২] সিনিয়র, অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত শিক্ষার্থী সমন্বয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি উপকমিটি রয়েছে। দেওয়ালিকায় ইসলামী মৌলিক বিষয়, প্রিয় নবীজী (স.) আদর্শিক জীবন ও সাহবায়ে কিরামসহ ইসলামী মনীষীদের অনুসরণীয় জীবন ও আদর্শের উপর বিভিন্ন প্রবন্ধ, রচনা, ইসলামী কবিতা ও কৌতুক-কণিকা বাংলা, আরবী, ইংরেজী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত স্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাক্ষরের এ দেওয়ালিকা জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার সাহিত্য ও সংস্কৃতিভাব জাগিয়ে তুলতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। একজন মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীকে ভালমানের লেখক, সাহিত্যিক, প্রাবান্ধিক সৃষ্টি করতে উৎসাহ যোগায়।[৭৭৩]

### খ. আত্-তাসনীম

বিগত কয়েক বছর হতে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীরা 'আত্তাসনীম' নামে আরেকটি দেওয়ালিকা পত্রিকা বের করছে। পত্রিকাটিও বেশ পরিচিত লাভ করে[৭৭৪]

### গ. স্মরণিকা

সাহিত্য চর্চা আধুনিক পড়া লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশে সাহিত্যচর্চা অপরিহার্য। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে সৃজনশীল অবদান রাখছে। কামিল ক্লাস হল দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদায়ী ও সমাপনী ক্লাস। শিক্ষার্থীর স্বর্ণালী ছাত্রজীবনের অনেক খণ্ডচিত্র ভবিষ্যত জীবনে ধরে রাখতে বা অতীতের স্মৃতিকে কর্মময় জীবনে প্রতিফল ঘটাতে চায়। ক্লাসের সহপাঠীরা যেন স্ব স্ব পরিবারের সহোদর ভাই। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে গড়ে ওঠা প্রীতি, ভালবাসা ও স্মৃতি আজীবন অম্লান রাখতে চায়। তাই এ বন্ধন ধরে রাখতে বিদায়ী স্মরণিকা প্রকাশ করে প্রতি বছর।[৭৭৫] বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, আলিয়া মাদ্‌রাসার খ্যাতিমান অধ্যাপক, দেশের বরেণ্য লেখক, গবেষকদের লেখা, সাহিত্যমানের কবিতা ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস-ঐহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে এ স্মরণিকা হয়ে ওঠে সংগ্রহের রাখার মত সাহিত্য সম্ভার। বিদায়ী ছাত্রদের এ স্মারক শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট সমাদৃত।[৭৭৬]

---

আদর্শনীয় জীবন, অনুপম ও অনন্য আদর্শ চরিত্র নিয়ে প্রকাশ করে 'আল-বশীর' দেওয়াল পত্রিকা। এর নামকরণ করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ 'আল্লামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদিরী এবং প্রথম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন কামিল হাদীস ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ক্বাযী মুহাম্মদ আনওয়ারুল ইসলাম খান। (স্বাক্ষাৎকার : আবুল মুহসিন মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, ২১ তম ব্যাচ : কামিল হাদীস, তারিখ : ০১/০৪/২০১৬ খ্রি.)

৭৭২. *আত্-তৈয়্যব : কামিল বিদায়ী স্মরণীকা*, (চট্টগ্রাম : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা ২০০০ খ্রি.) পৃ. ৫০

৭৭৩. প্রাগুক্ত

৭৭৪. গবেষকের সরেজমিন পরিদর্শন

৭৭৫. প্রাগুক্ত

৭৭৬. *বার্ষিক প্রতিবেদন*, প্রাগুক্ত

### ঘ. কামিল শিক্ষার্থীদের বিদায়ী স্মারক গ্রন্থ

| বিদায়ী স্মারক | প্রকাশ বছর | ব্যাচ | বিদায়ী স্মারক | প্রকাশ বছর | ব্যাচ |
|---|---|---|---|---|---|
| রাহমাতুল্লিল আলামীন | ১৯৮১ | ৮তম[৭৭৭] | শাহরুর | ১৯৮৮ | ১৫তম |
| যিকরা | ১৯৯৩ | ২০তম | ‘আবরাত | ১৯৯৫ | ২৩তম |
| ছালছাবিল | ১৯৯৬ | ২৪তম | আত্-তুহফা | ১৯৯৭ | ২৫তম |
| আল্-লিওয়া | ১৯৯৮ | ২৬তম | আল্-‘উয়ুন | ১৯৯৯ | ২৭তম |
| আত্-তৈয়্যব[৭৭৮] | ২০০০ | ২৮তম | আত্-তৈয়্যব | ২০০১ | ২৯তম |
| আত্-তৈয়্যব | ২০০২ | ৩০তম | আত্-তৈয়্যব | ২০০৩ | ৩১তম |
| আত্-তৈয়্যব | ২০০৪ | ৩২তম | আত্-তৈয়্যব | ২০০৫ | ৩৩তম |
| আত্-তৈয়্যব | ২০০৭ | ৩৫তম | আত্-তৈয়্যব | ২০০৮ | ৩৬তম |
| আত্-তৈয়্যব | ২০০৯ | ৩৭তম | আত্-তৈয়্যব | ২০১০ | ৩৮তম |
| আত্-তৈয়্যব | ২০১১ | ৩৯তম | আত্-তৈয়্যব | ২০১২ | ৪০তম |
| আত্-তৈয়্যব | ২০১৩ | ৪১তম | আত্-তৈয়্যব | ২০১৪ | ৪২তম |
| আত্-তৈয়্যব | ২০১৫ | ৪৩তম | আত্-তৈয়্যব | ২০১৫ | ৪৩ তম |

### ঙ. আল-ওয়াফা

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ১৯৯৮ খ্রি. কামিল (হাদীস) ছিল এ প্রতিষ্ঠানের ২৬তম ব্যাচ।[৭৭৯] ২৬ মার্চ ২০০২ খ্রি. আধ্যাত্মিক কেন্দ্র আলমগীর খানকাহ শরীফে এ সনের বিদায়ী ছাত্ররা ছাত্রজীবনের অনেকটা স্মৃতিময় ভালবাসা, সুখ-দু:খ, বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি আমৃত্যু ধরে রাখার জন্য “আল-লিওয়া” নামে একটি ‘সেতুবন্ধন ছাত্র ফোরাম’ গঠন করে। বন্ধুত্বের আবদ্ধে একিভূত হয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও মিল্লাত-মাযহাবের খিদমতের মহা প্রত্যয়ে ‘আল-লিওয়া ছাত্র ফোরাম এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়।[৭৮০] এ ফোরামের ১১ জন শিক্ষাবিদ পরিচালক ও ২৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত পরিষদের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার কৃতি ছাত্র মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন (এম.ফিল গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক

---

৭৭৭. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা তাৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক ১৯৭২ খ্রি. কামিল হাদীস পরীক্ষার অনুমতি লাভ করে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এ স্তরের পরীক্ষায় অনুষ্ঠিত হয়। তাই ১৯৭৪ খ্রি. থেকে কামিল হাদীস'র প্রথম ব্যাচ হিসেবে গণনা করা হয়। ১৯৮১ খ্রি. কামিল হাদীসের শিক্ষার্থীরা ৮ম ব্যাচ ***‘রাহমাতুল লিলআলামীন’*** নামে সর্বপ্রথম কামিল বিদায়ী স্মরণিকা প্রকাশ করে

৭৭৮. ২০০০ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা জালাল উদ্দীন আলকাদেরী বিদায়ী স্মারক এর নাম ‘আত-তৈয়্যব রাখতে সিদ্ধান্ত নেন। এ বছর হতে বিদায়ী স্মরণিকা আত-তৈয়্যব প্রকাশিত হয়। (অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম)

৭৭৯. প্রাগুক্ত

৭৮০. *আল-ওয়াফা :কামিল বিদায়ী স্মরণীকা*, , (চট্টগ্রাম: জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩৬

ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগ, পোমরা জামি'উল 'উলূম ফাযিল মাদ্‌রাসা)। এ ফোরামের ৪র্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সাহিত্যসমৃদ্ধ প্রকাশনার নাম 'আল ওয়াফা'।[৭৮১]

আরবী, বাংলা ও ইংরেজী তিন ভাষায় প্রকাশিত এ প্রকাশনায় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস, ঐতিহ্য, ইসলামী প্রবন্ধ ও কবিতা-কৌতুক ইত্যাদি সাহিত্য সমৃদ্ধে ভরপুর। সুচিন্তিত লেখক, উঁচুমানের সাহিত্যিক ও গবষকের গবেষণামূলক লেখায় প্রকাশনাটি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার সাহিত্য ও প্রকাশনা অঙ্গনে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। বিশেষত এর 'লিওয়া কে তলে[৭৮২] প্রবন্ধটি পাঠক সমাজে সাড়া জাগিয়েছে।

### চ. পাক পঞ্জতন পত্রিকা

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা আবুল আসাদ মোহাম্মদ যুবাইর রজভী সম্পাদিত এবং মাওলানা মোহাম্মদ নুরুন্নবী ও মাওলানা জিয়াউল হক রিযভীর সহযোগিতায় পাক পঞ্জতন পত্রিকাটি প্রতি বছর বার রবিউল আউয়াল উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ ট্যাবলয়েড পত্রিকাটিতে দেশের সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকসহ ইসলামী চিন্তাবিদ ও দক্ষ- অভিজ্ঞ লেখক ও সাহিত্যিকদের গবেষণামূলক লেখা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৭৮৩]

### ছ. জালওয়ায়ে নূর

প্রকাশনা জগতে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার মেধাবী ছাত্ররা পিছিয়ে নেই। ২০১২ খ্রি. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার ফাযিল ও কামিল ক্লাসের মেধাবী শিক্ষার্থীদের 'আল-ইহসান' নামে এক প্রকাশনার আত্মপ্রকাশ হয়। এর সার্বিক দায়িত্বে ছিল মুহাম্মদ গাউসুল হক, মুহাম্মদ শফিউল আলম ও মুহাম্মদ সালাহ্‌ উদ্দীন। সংস্কৃতমনা এ সকল শিক্ষার্থীর প্রকাশনা ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল 'জালওয়ায়ে নূর' নামক পুস্তকখানা। এতে হাম্‌দ, কবিতা ও প্রবন্ধসহ ১৩টি লেখা স্থান পায়।[৭৮৪]

### জ. স্মৃতি

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ফাযিল ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীরা রেখে আসা ছাত্র জীবনের স্মৃতিময় ইতিহাস ধরে রাখার জন্য 'স্মৃতি' নামক স্মারকটি ২০১২ খ্রি. প্রকাশ করে।[৭৮৫] 'আল মাহমুদ' একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আত্মিক সংগঠন এর প্রকাশনায় সাইফুল করিম নাঈম ও শিহাব

---

৭৮১. প্রাগুক্ত

৭৮২. এ প্রবন্ধের প্রবন্ধকার জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার আরবি প্রভাষক হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আনীসুজ্জামান, প্রিয় রাসূল (সা.)'র অনুসারী ও প্রেমিকরাই কিয়ামতের দিন তাঁরই লিওয়া- ই হামদেও (প্রশংসার পতাকা) নিচে আশ্রিত হবে- একথায় এখানে তুলে ধরেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)'র সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীকূল সম্রাট (সা.) এরশাদ করেন, 'ঐ দিন আমার হাতে থাকবে লিওয়াউল হাম্‌দ বা প্রশংসার জয়নিশান। 'হযরত আদম (আ.) এবং পরবর্তীতে আগমনকারী সকাল নবী আমার পতাকা তলে অবস্থান করবেন, এ আমার অহংকার নয়। (*মসনাদ- ই ইমাম- ই আহমদ*, খ. ১, পৃ. ২৮১)

৭৮৩. গবেষকের সরেজমিন প্রতবেদন

৭৮৪. প্রাগুক্ত

৭৮৫. প্রাগুক্ত

উদ্দীন রেজা প্রমুখের সম্পাদনায় ৬৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ পুস্তকে সম্পাদকীয় ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ এর বাণীসহ ১৭টি মূল্যবান লিখা স্থান পেয়েছে। পুস্তকটির শেষে ফাযিল শ্রেণীতে পাঠদানকারী শিক্ষকরা এবং ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নাম ছবিসহ অপসেট কাগজে ছাপানো হয়েছে। বইটির অবয়ব ছোট হলেও এর গবেষণামূলক প্রবন্ধ, কৌতুক ও উপদেশমূলক কবিতাই জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনা ফুটে উঠেছে।[৭৮৬]

**ঝ. আসলাফ-ই জামেয়া**

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, বরেণ্য ফক্বীহ মুফাস্‌সির দ্বীনি খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের শিক্ষাদানে গড়ে উঠেছেন প্রতিভাবান, উলামা-ই দীন। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় ইল্‌মে দীনের খিদমতে নিবেদিত প্রাণ অনেকে জান্নাতবাসী হয়েছেন। এ সকল মনীষীর জীবন ও অনুকরণীয় আদর্শ স্মৃতিচারণ করে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে 'আস্‌লাফ-ই জামেয়া' নামে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ খ্রি. জামেয়া প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবধি ওফাতপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বর্ণালী জীবনের স্মরণে এ স্মরণিকা প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন জামেয়া শিক্ষক পরিষদ। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক প্রথিতযশা শায়খুল হাদীস 'আল্লামা আব্দুল হামীদ (রহ.) সংখ্যা' নামে আসলাফ-ই জামেয়া ২০০৭ খ্রি. ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[৭৮৭] জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফক্বীহ ও সর্বস্তরের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীর জীবনী ও অনুসরণীয় আদর্শ সম্বলিত এ স্মরণিকা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হওয়ায় তা সর্বস্তরে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। এ সকল মনীষীর জীবন ও চরিত্র চর্চা করে পরবর্তী মুসলিম প্রজন্ম ইলম-ই দীন অর্জন এবং দ্বীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করতে প্রেরণা সঞ্চয় করবে স্মরণিকায় ১৫ জন শিক্ষকের জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের অবদানের তথ্য স্থান পেয়েছে। ভবিষ্যতে আরো শিক্ষকমণ্ডলীর স্বর্ণালী জীবনী ও কর্মের উপর স্মরণিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ।[৭৮৮]

---

৭৮৬. প্রাগুক্ত

৭৮৭. ***বার্ষিক প্রতিবেদন***, প্রাগুক্ত, ২০০৯ খ্রি.

৭৮৮. অফিস রেকর্ড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

# নবম অধ্যায়

## বক্তৃতা-বিবৃতি ও পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ভূমিকা

বক্তৃতা বিবৃতি আর পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের ইতিহাস প্রাচীনকাল হতে। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের নিকট পত্র প্রেরণ করে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। হযরত সোলাইমান (আ:) কর্তৃক সাবা রাজ্যের রাণী বিলকিস্'র নিকট পত্র মারফত দ্বীনের দাওয়াত প্রদান প্রনিধানযোগ্য। তারই ধারাবাহিকতায় ইসলামের দাওয়াত পদ্ধতিও ব্যতিক্রম নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাদের নিকট পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে তালিম দিতেন।

### ৯.১ ইসলাম প্রচারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)'র ঐতিহাসিক বক্তৃতা ও পত্রাবলী

আল্লাহ্‌র বিধান তথা ইসলামের শাশ্বত বাণী গোটা বিশ্বে পৌঁছিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মহনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দূত এবং পত্র প্রেরন করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত। এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন- بعثت معلما অর্থাৎ আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত। তাই প্রয়োজনের তাগিদে তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনের নিয়মিত তাকরির পেশ করতেন। ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষন কেবল মুসলমানদের জন্য নয় ; বরং সমস্ত মানব গোষ্টির জন্য এক বিশাল দিক নির্দেশক বলে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। বক্তৃতা-বিবৃতির পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাদের নিকট প্রত্র প্রেরণ করতেন এবং এর প্রভাব ছিল অসাধারণ। এইসব পত্রে তিনি ইসলামের যে দা'ওয়াত দেন, তা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। তাঁর পত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সম্রাট হিরাক্লিয়াস, জুলন্দির দুই পুত্র, হাবশার অধিপতি নাজ্জাশী, কিবতী প্রধান মুকাওকিম্ এবং হাওয়া ইবনে আলী ও হারিস আবূ শমরের প্রতি লেখা পত্র গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**রোম সম্রাটের নিকট পত্র :** রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে তিনি যে পত্র লেখেন তার বাংলা সংক্ষেপ - বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে গ্রীসের মহান অধিপতি হিরাক্লিয়াসের বরাবরে সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তাকে ইসলামের কলেমার প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি। গ্রহণ করুন এবং শান্তিতে থাকবে। আল্লাহ্ আপনার দিগুন সওয়াব দান প্রদান করবেন। আপনি যদি অগ্রাহ্য করেন তবে আপনার প্রজাকুলের পথভ্রষ্টতা আপনার উপর বর্তাবে। আহলে কিতাব সম্প্রাদায়ের লোকজন, এমন একটি ব্যাপারে আমরা একমত হই যাতে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমরা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না। অপর কাউকে শরীক বা সমকক্ষ প্রতিপন্ন করব না। আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র প্রভু। আর তারা যদি একান্তই মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান।
- মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ।[৭৮৯]

৭৮৯. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৫) পৃ. ৫১

**কিবতি জাতির মুকাওকিস বিন ইয়ামিনকে লেখা পত্র**

এই পত্র খানি নবী করিম (সা.) দাহইয়া কালবীর মারফতে বসরায় প্রেরণ করেন এবং বসরার আমীর তা হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করেন। এ সময় আবূ সুফিয়ান সম্রাটের কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবূ সুফিয়ানকে নবী করিম (সা.) সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেন। 'মুসনাদে ইমাম আহমদ' হতে জানা যায় যে হিরাক্লিয়াস পত্রের জবাব দেন এবং লেখেন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আসলে সে ইসলাম গ্রহণ করে নি বরং মুতার যুদ্ধে মুসলামানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

**পারস্য সম্রাট কিসরাকে লেখা পত্র**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সালাম তার প্রতি, যে হেদায়াতের অনুসারী এবং আল্লাহ্ ছাড়া মাবুদ নাই, এমন সাক্ষ্য দেয়। তিনি একক তাঁহার কোন শরীক নাই। মুহাম্মদ তার বান্দা ও রাসূল। আমি সমস্ত জীবন সত্ত্বাকে সর্তককারী যেন অবিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ্র দলিল কায়েম হয়ে যায়।। ইসলাম গ্রহন করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করুন। যদি অগ্রহ্য করেন, তবে দায়ী থাকবেন।

- মুহাম্মদ রাসূলূল্লাহ।

সহীহ বুখারী সাক্ষ্য দেয় : এই পত্রখানি হুযূরের প্রিয় সাহাবী সাহমী বাহরাইনের গভর্নরের কাছে দেন, তিনি তা কিসরার কাছে পাঠান। পত্রখানি পেয়ে সম্রাট অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন এবং পত্রখানি টুকরো টুকরো করে ছিরে ফেলেন। নবী করিম (সা.) এই সংবাদ অবগত হন। কিছুদিন পর কিসরা নিহত হন এবং তার রাজ্য দুই টুকরা হয়ে যায়।

**জুলন্দির দুই পত্রকে লেখা পত্র**

বসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ পক্ষ হতে জুলন্দির দুই পুত্র জাফর ও আবেদকে। শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি, যে হিদায়তের অনুসরণ করে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি পাবে। আল্লাহ্র বান্দাদের আমি সতর্ক করিয়া দেয় এবং ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। তোমরা দুই জন যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে জেনে রেখ, তোমাদের রাজত্ব টিকবে না। আমার সৈন্যরা তোমাদের রাজ্যে ঢুকে পড়বে এবং তোমাদের রাজ্যে নবুয়তের নিদর্শন অচিরেই প্রকাশিত হবে।

-মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ।[৭৯০]

এইভাবে আমাদের নবী করিম (সা.) কিবতী জাতির প্রধান মুকাওকিসের নিকট পত্র লিখেন পত্রখানির বিষয় বস্তু পূর্বের প্রেরিত পত্রসমূহের ন্যায়। পত্রখানি নিয়ে ইবনে আবু বুলতা'আ (র.) মুকাওকিসের দরবারে যান। পত্রবাহক মুকাওকিসকে হুযূর (সা.) সম্পর্কে অনেক কথা বলেন। জবাবে মুকাওকিস বলেন, আমি তাঁর মধ্যে নবুয়তের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি। এর পর তিনি কাতিব ডেকে হুযূর (সা.) এর পত্রের উত্তর লিখেন। উক্ত পত্রখানি এরূপ- 'আপনার প্রতি সালাম। তারপর নিবেদন আপনার পত্রখানা পড়েছি এবং আপনি যা উল্লেখ করেছেন ও দাওয়াত দিয়েছেন, তা উপলব্ধি করেছি। একজন নবী আসা অবশিষ্ট আছে। তা জানতাম। কিন্তু আমার ধারনা তিনি

৭৯০. প্রাগুক্ত

শামদেশে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার দূতের প্রতি সম্মান জনক আচরণ করেছি। আপনার জন্য কিবতী বংশের মর্যদাসম্পন্ন দুইজন কুমারী ও বস্তুসামগ্রী উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করলাম এবং আপনার আরোহনের জন্য একটি খচ্চরও পাঠালাম। আপনার প্রতি সালাম।
-কিবতী প্রধান মুকাওকিস

উল্লেখিত পত্র সমূহে মহানবী (সা.) মহান সৃষ্টি কর্তার একাত্ববাদ এবং ইসলামের শান্তি ও কল্যাণের বাণী প্রচার করিছেন এবং ইসলামের সুশীতল আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির প্রতি ডাক দিয়েছেন। ইসলামের সূচনা লগ্নে রাসূলে পাক (সা.) এর "পত্র দাওয়াতি আমাদের বিস্মিত করে। সীলমোহর অঙ্কিত এইসব পত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম গ্রহণ দাওয়াত সে সময় মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিল। আজিকার সমস্যার জর্জরিত পৃথিবীতে বিশ্বনবীর মহান আদর্শই শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।[৭৯১]

## ৯.২ ইসলাম প্রচারে সাহাবায়ে কিরামের পত্রাবলী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা ও পত্র প্রেরণের যে সূচনা করেছিলেন তারই ধাবাহিকতায় পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও ছিল। বিশেষত: খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেকেই– খতীব ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রহ.) খানায়ে কাবার সামনে বক্তৃতা করতেন। আবার নবীজির ইন্তিকালের পর জুমা'আর নামায়ের পূর্বে দেয়া খুতবায়– সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করতেন। পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের খেদমত আন্জাম দিতেন । পরবর্তীতে খলিফা ওমর (রহ.), হযরত উসমান (রহ.) এবং হযরত আলী (রহ.)'র বক্তৃতা বিবৃতি এবং পত্রাবলী কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

## ৯.৩ ইসলাম প্রচারে আউলিয়ায়ে কিরামের বক্তৃতা ও পত্রাবলী

যুগে যুগে ইসলাম প্রচার-প্রসারে আউলিয়া কিরামের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাঁদের ইসলাম প্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ছিল- ওয়াজ-নসিহত এবং পত্র প্রেরণ, যা পরবর্তীতে পুস্তকাকারেও সংকলিত হয়। যেমন অলিকুল সম্রাট গাউসে পাক হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)'র ফুতুহুল গায়ব হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)'র আনিসুল আরওয়াহ্ এবং মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.)'র মাকতুবাতে রাব্বানী[৭৯২] ইত্যাদি। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ও ইসলাম প্রচারে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি প্রতিদিন ফজরের নামাজের

৭৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৭৯২. হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানি (র.) ভক্ত অনুরক্তদের কাছে অনেক সময় পত্রের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দিতেন। পরবর্তীতে ঐ সমস্ত পত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ৫৩৬ খানি পত্রের সমন্বয়ে তিন খণ্ড মকতুবাত শরীফ যার প্রথম খণ্ডে ৩১৩টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৯টি ও তৃতীয় খণ্ডে ১২৪টি পত্র সংকলিত হয়েছে। মকতুবাত শরীফের তিন খণ্ডে সংকলিত মোট ৫৩৬ খানি মকতুবের মধ্যে ২০ খানি মকতুব তার পীর হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র.)-এর নামে লিখিত, ২ বা ৩ খানি মকতুব তার কোন স্ত্রীলোক মুরিদা-এক ছালেহা আওরত এই শিরোনামায় লিখিত, একখানি মকতুব নাম প্রকাশ না করেয় তৎকালিন বাদশাহকে (সম্ভবত বাদশাহ জাহাঙ্গীর) লিখিত, একখানি মবতুব হৃদয়রাম হিন্দুকে লিখিত এবং অবিশিষ্ট মবতুবগুলি সমসাময়িক মু'তাকেদীন ও মুরিদীনকে লিখিত। (মাকতুবাতে রাব্বানী, ই.ফা.বা. - ১৯১৭) পৃ. ১৮

পর তাফসীর পেশ করতেন এবং ভক্ত অনুরক্তদের নিকট পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিতেন।

## ৯.৪ ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র বক্তৃতালী

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) শুধু পীরে কামেল সাধক পুরুষ ছিলেন তা নয়; বরং জ্ঞান সমুদ্রের একজন সার্থক কাণ্ডারীও বটে। এ কথার সত্যতা ও বাস্তবতা তাঁর সান্নিধ্য প্রাপ্ত, সত্যান্বেষী মুসলিম জনসাধারণের কাছে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তাঁর জীবদ্দশায় এদেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, দেশে বিদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফরকালে বিভিন্ন ইসলামী সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন, সমাবেশ, সুন্নী কন্ফারেন্সে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তাকরীর পেশ করতেন। তাঁর তাকরীরের ভাষা ছিল শ্রুতিমধুর, যুক্তিপূর্ণ তথ্যনির্ভর, সহজ সরল, প্রাঞ্জল হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। তাঁর নূরানী তাকরীর শ্রবণে সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে খোদাভীতি ও নবীপ্রেমের আলোকধারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। তাঁর নূরানী ভাষণগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ও জনপ্রিয় ছিল। তাই শব্দ ধারণযন্ত্র অডিও, ভিডিও'র সাহায্যে তাঁর অনেকগুলো তাকরীর আজো সংরক্ষিত হয়ে দেশ বিদেশের বিভিন্ন ছড়িয়ে আছে। ইত:মধ্যে কিছু কিছু তাকরীর পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে আরো বহু বক্তৃতামালা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে বলে জানা গেছে।[৭৯৩]

আধ্যাত্মিক সাধক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) তরীকতের শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষা ও তা'লীম দেয়ার প্রতিও খুব যত্নবান ছিলেন। তাই তিনি প্রত্যহ ফযরের নামাযের পর পবিত্র কুরআনের তাফসীর পেশ করতেন। দেশবিখ্যাত আলিমগণ তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জ্ঞানের পরিসরকে আরো সমৃদ্ধ করতেন। তিনি আলেমদের খুব ভালবাসতেন, তাঁদের সঙ্গদানে খুশী হতেন এবং তাঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করতেন। তাঁদের ইস্তিক্বামাত তথা আল্লাহ্'র সন্তুষ্টিতে স্থির ও অটল থাকার জন্য দু'আ করতেন এবং বিদায়ের সময় আন্তরিক নিদর্শন স্বরূপ উপহারও প্রদান করতেন। হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ। তিনি সর্বদা 'ক্বা-লাল্লাহু, ওয়া ক্বা-লা রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম' বলেই তাকরীর বা বক্তব্য শুরু করতেন। তাঁর তাকরীরের একটি লক্ষণীয় দিক ছিল কুরআনের তাফসীর কুরআন ও হাদীস দ্বারা করতে তিনি বেশ পছন্দ করতেন। তিনি ইলমে আহকাম ও ইলমে আসরারে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বাংলাদেশে সফরকালীন সময়ে তিনি যে সারগর্ভ তাকরীর করেছেন সেগুলোকে একত্রিত করলে এক বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডারে পরিণত হবে। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর এ সমস্ত বক্তৃতা-বিবৃতি বিশাল ভূমিকা পালন করে। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ নূরানী তাকরীর হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

৭৯৩. মাসিক তরজুমান, ৩৩তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

# تقریر۔۱

## اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم-

## بسم اللہ الرحمن الرحیم-

## لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزعلیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم-

التوبة ۱۲۸۔ ۱۲۹

صدق اللہ مولانا العظیم- وصدق رسوله النبی الکریم-

ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاکرین - والحمدللہ رب العالمن -

اس آیت مبارکہ میں خیال کیجئے، غور کیجیئے، سبحان اللہ، سب سے پہلے اسکو تحقیق کے الفاظ سے شروع فرمایا گیا لــقـــد میں لام تحقیق کا ہے قد بھی تحقیق کا ہے اس سے شروع فرمایا گیا کہ حضور کریم ﷺ کے کمالات سے کفار لوگ منکر ہیں، مسلمانوں ہی ایسے لوگ کلمہ گو مسلمان پیدا ہونے والے تھے وہ آپکے بعض کمالات کے منکر ہیں، اسلیئے اس آیت مبارکہ کو لام تحقیق اور قد کے ساتھ شروع فرمایا گیا اور اسمیں کتنی تعریفیں ہیں غور سے خیال کریں .

'جــــأکــم' تمہارے پاس تشریف لائے، سب سے پہلے اس چیز کا خیال کیا جائے کہ زمین و آسمان کی پیدائیش کے متعلق اور مخلوق کی پیدائیش کے متعلق اللہ تبارک وتعالیٰ نے 'خــلـق' کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یا 'بدیع' کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مگر انبیاءِ کرام اور خصوصا رسول ﷺ کی پیدائیش میں 'خلق' کا لفظ نہیں ہے، 'ارســـلـــنـا' کا لفظ یا 'جـــاء' کا لفظ ہے یا 'بعث' کا لفظ ہے، عام لوگوں کو کہا گیا انسان مگر حضور کریم ﷺ کو رسول فرمایا گیا، اس آیت مبارکہ میں حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے، دوسرا اسمیں ذکر ہے، وہ تمہارے پاس آئے یعنی مؤمنوں کے پاس تشریف لائے، مؤمن جہاں بھی ہوا نکے پاس حضور کریم ﷺ تشریف لائے، جہاں بھی ہو، چاہے وہ مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو، اگرچہ حضور کریم ﷺ کی ولادت مبارکہ مکہ میں ہوئی ہے اور آپکی رہائش مبارک مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، لیکن آپ تشریف لائے تمام مؤمنوں کے پاس، اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے، 'جـــاء کـم' تمہارے پاس آئے تمہارے پاس تشریف لائے، اسکی پابندی کرنی چاہیئے اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ سورج آسمان سے نکلتا ہے، جیسے آسمان پر ہے

سورج، لیکن اسکی روشنی تمام جہاں میں پہنچتی ہے، اسی طریقہ سے حضورﷺ کی پیدائیش مکہ معظمہ میں ہوئی، رہائش ہوئی مدینہ منورہ میں، لیکن آپ مؤمنوں کے دل میں موجود ہیں، اسکا خیال رکھا جائے، اسلئے جب ھم نماز پڑھتے ہیں تو ''السلام علیک ایھا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ'' پڑھتے ہیں، ایسے تو کوئی کسی کو سلام نہیں دیتے ہیں، اگر کوئی نہ ہو تو سلام نہ دو، اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو اسکو بھی سلام مت دو، چونکہ حضور کریمﷺ موجود ہوتے ہیں اسلئے ہم آپکو سلام دیتے ہیں اور آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں- جو خوش نصیب لوگ ہیں آپکے سلام کا جواب سنتے ہیں-

یہاں پر فرمایا گیا ''جآء کم رسول من انفسکم'' عظیم الشان رسول کی تشریف آوری ہوئی ہے تمہاری جانوں سے، اگر حضور کریمﷺ فرشتوں کی طرح ہوتے تو ہم کو نظر نہ آتے، تو ہم کیسے فیض اٹھاتے؟ تو آپ انسانی لباس میں آئے انسانیت کو وہ شرف بخشا کہ وہ تمام فرشتوں پر مکرم ہوگئے-

''عزیز علیہ ماعنتم'' بہت شاق گزرتا ہے ان پر تمہارا کسی مشکل میں ہونا، مشکل میں گر جانا، اور تمہاری دوزخ کی تیاری پر، تمہارے گناہ کرنے سے حضور کریمﷺ کو بہت تکلیف ہوتی ہے- وہ ایسا کریم ہیں کہ ہمارے ہر مشکل پر، ہر پریشانی پر آپکو بہت شاق ہوتا ہے-

''حریص علیکم'' اور تم پر بہت زیادہ حریص ہیں، بہت زیادہ حرص کرنے والے ہیں، مؤمنوں پر کہ تم جیسے تمام لوگ جنتوں کا مستحق ہوجاے، اللہ کے رحمتوں کا مستحق ہوجاے، گناہوں سے باز رہے-

''بالمؤمنین رؤوف رحیم'' مؤمنوں کیلئے آپ بہت ہی رحیم ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، اس بات کا خوب خیال رکھو، کہ رؤف ورحیم اللہ تبارک وتعالیٰ کے اوصاف ہیں، یہاں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے اوصاف سے حضور کریمﷺ کو یاد فرمایا سبحان اللہ! یہ آپ ہی کی شان ہے تو ان کمالات کے باوجود ''فان تولوا'' اگر تم نے منہ پھیرلیا ''فقل حسبی اللہ'' یعنی اے میرے حبیب! تم فرمادو انکو کہ میرے لئے اللہ کافی ہے- (اسکے باوجود اہل حق کا اہل مسند بلکہ ) اگر تمام دنیا مخالف ہوجائے تو کسی قسم کی پرواہ نہیں کرنا چاہئے- آپ ہمت پر اٹھ جائے کسی کی پرواہ نہ کریں اور یہ کہیں ''حسبی اللہ'' میرے لئے اللہ کافی ہے، ''علیہ توکلت'' میں نے اس پر توکل کیا ''وھو رب العرش العظیم'' اور وہ پاک ذات بہت ہی عظمت والے عرش کا رب ہے- اللہ تبارک وتعالیٰ آپکو ہمکو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے-

اٰمین

## বক্তৃতা নং- ১

**অনুবাদ :** "নিশ্চয়ই, তোমাদের মধ্য থেকে একজন মহান রাসূল তাশরীফ এনেছেন। তোমরা যে কোন দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে পতিত হও- এটা তাঁর জন্য খুবই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণের প্রত্যাশী এবং তিনি মু'মিনদের জন্য খুবই দয়ার্দ্র দয়ালু। অতঃপর যদি তারা (আনুগত্যহীন হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আপনি বলে দিন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট'। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। তাঁর উপর আমি ভরসা করেছি এবং তিনিই সম্মানিত আরশের মালিক।" [৭৯৪]

**তাফসীর :** এ মোবারক আয়াতের মধ্যে গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন, গভীরভাবে চিন্তা করুন ! সর্বপ্রথম নিশ্চয়তা সূচক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তা হচ্ছে 'লাক্বাদ'। এর মধ্যে 'লা-ম' নিশ্চয়তাসূচক, 'ক্বাদ'ও নিশ্চয়তাসূচক। এ দু'টি দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। তা এ জন্যই যে, কাফিরগণ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ সব কামালাত (পূর্ণতাসমূহ)–এর অস্বীকারকারী। মুসলমানদের মধ্যেও এমন কতগুলো কলেমাগো মুসলমান সৃষ্টি হবে, যারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কোন কোন পূর্ণতাকে অস্বীকার করবে। এজন্য এ বরকতময় আয়াত 'লা-ম' ও 'ক্বাদ'-এ দু'টি নিশ্চয়তাসূচক শব্দ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। আর এর মধ্যে কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, ''তিনি তোমাদের নিকট এসেছেন।'' এতে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আবির্ভাবের কথা বর্ণনা করেছেন, ''তিনি তাশরীফ আনয়ন করেছেন'' বচন দ্বারা। এখানে লক্ষ্য করা যাক। (আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন অথচ) এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি সম্পর্কে এবং অন্যান্য সৃষ্টিবস্তু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা 'খালাক্বা' (সৃষ্টি করেছেন) বচনটা উল্লেখ করেছেন। অথবা ''বদী'' (নতুন ভাবে সৃষ্টিকারী) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম), বিশেষকরে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আর্বিভাবের ক্ষেত্রে 'সৃষ্টি করেছেন' বলে উল্লেখ করেননি। তাঁদের শানে ব্যবহার করেছেন- 'আরসালনা' অথবা 'জা-আকুম' কিংবা 'বা'আসা' অর্থাৎ যথাক্রমে, হে হাবীব আপনাকে 'প্রেরণ করেছি', 'তিনি তাশরীফ এনেছেন', তিনি (আল্লাহ) প্রেরণ করেছেন ইত্যাদি। অনুরূপ, সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে 'ইনসান' আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'কে বলা হয়েছে 'রাসূল'।

এ বরকতময় আয়াতে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর তাশরীফ আনয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন, মু'মিনদের নিকট এসেছেন। মু'মিন যেখানে থাকুক না কেন, তাদের নিকট হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন– চাই সে (মু'মিন) মাশরিক্বে (প্রাচ্যে) থাকুক, চাই মাগরিবে (পাশ্চাত্যে) থাকুক। যদিও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত মোবারক হয়েছে মক্কা শরীফে এবং অবস্থান গ্রহণ করেছেন মদীনা মোনাওয়ারায়, কিন্তু তিনি তাশরীফ এনেছেন বিশ্বের সমস্ত মু'মিনের নিকট। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন'। এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। এ কথার উদাহরণ হচ্ছে– যেমন ধরুন, সূর্য। সূর্য উদিত হয় আসমান থেকে, সূর্যের অবস্থানও আকাশে। কিন্তু সেটা আলো দেয় গোটা বিশ্বে। সেটার আলো বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে থাকে। অনুরূপ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হয়েছেন মক্কা

---

৭৯৪. আল কুরআন, ০৯ : ১২৮-১২৯

মোকাররামায়, অবস্থান করেছেন মদীনা মুনাওয়ারায়। কিন্তু তিনি প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরেই মওজুদ রয়েছেন। এ কথা মনে রাখা দরকার। এ কারণে, আমরা যখন নামায পড়ি, তখন তাশাহ্হুদে পড়ে থাকি–"আস্‌সালামু আলইকা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু।" অর্থাৎ "হে নবী (সম্বোধন করে) আপনাকে সালাম এবং আপনার উপর বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌র রহমত এবং বরকতসমূহ।" কেউ না থাকলে তো কাউকে সালাম দেয়া হয় না। কেউ যদি সালামের জবাব না দেয় কিংবা দিতে না পারে, তাকেও সালাম দেওয়া হয় না। (কাজেই, বুঝা গেল) যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বত্র মওজুদ (হাযির-নাযির) আছেন, সেহেতু আমরা তাঁকে সালাম দিই। আর তিনি আমাদের জাওয়াবও দিয়ে থাকেন। খোশ্‌নসীব লোকেরা তাঁর সালামের জাওয়াবও শ্রবণ করে থাকেন।

এখানে (আয়াতে) এরশাদ হয়েছে– 'তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন- এক মহান রাসূল তোমাদেরই আত্মাসমূহ থেকে।' (তোমাদের মধ্য থেকে প্রেরণ করার হিকমত হচ্ছে) যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফিরিশতাদের মত অদৃশ্য হতেন, তবে আমরা তাঁর নিকট থেকে ফয়য্ পেতাম কিভাবে ? সুতরাং তিনি মানবীয় পোষাক (আবরণ) পরে (বাহ্যিকভাবে মানুষ হিসেবে) এসেছেন। এতে করে, ইন্‌সানিয়াত (মানবতা) কে মর্যাদাবান করেছেন। এ কারণে, মানুষ ফিরিশতাদের উপর প্রাধান্য পেয়ে গেছে। তিনি মানবীয় পোষাক বা আবরণে এসে মানব জাতিকেই ধন্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কোন মুশকিলে আক্রান্ত হওয়া, তোমাদের দোয্‌খে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, তোমাদের কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়া দেখে আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অতি মাত্রায় দুঃখিত হন। এসব প্রত্যক্ষ করা তাঁর জন্য অতীত পীড়াদায়ক। তিনি এমনই দয়ালু যে, তোমাদের মুশকিল, তোমাদের পেরেশানী ইত্যাদি তিনি বরদাশ্‌ত করতে পারেন না।'

তিনি তোমাদের বেলায় এক কথায় অত্যন্ত প্রত্যাশী যে, তোমরা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশের উপযোগী হয়ে যাও। আল্লাহ্‌র রহমতের উপযোগী হয়ে যাও। গুনাহ থেকে তোমরা প্রত্যেকে বিরত থাক। এসবই তাঁর একান্ত প্রত্যাশার বস্তু।

মু'মিনদের জন্য তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত দয়ালু, মেহেরবান। এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, 'রঊফুন' ও 'রহীমুন' আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি গুণবাচক নাম দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকেও স্মরণ করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! এটা তাঁরই (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শান বা মর্যাদা। সুতরাং এসব পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা অবাধ্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে হে হাবীব! আপনি তাদেরকে বলে দিন, ''আমার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।''

এ থেকে সত্যপন্থীদের স্মরণ রাখা দরকার যে, যদি কোন ক্ষমতাসীন, এমনকি সমগ্র দুনিয়াও যদি বিরোধী হয়ে যায়, তবুও কোন প্রকার ভয় করা উচিত হবে না। আপনারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। আর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিন– "আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন– এ কথাও ঘোষণা কর- "আমি তাঁরই (আল্লাহ্) উপর ভরসা করেছি। আর সেই পবিত্র সত্ত্বা হলেন- মহান আরশের মালিক ও প্রতিপালক। "

আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে ও আমাদেরকে এসব হিদায়ত অনুসারে আমল করার শক্তি দান করুন। আ-মী-ন।[৭৯৫]

৭৯৫. অফিস রেকর্ড, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, খানকাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

## تقریر-۲

اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم-

بسم اللہ الرحمن الرحیم-

### قد جاء کم من اللہ نور وکتاب مبین - المائدۃ : ۱۵

صدق اللہ مولنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم-

ونحن علی ذلک من الشاھدین والشاکرین – والحمدللہ رب العالمین-

اللہ تبارک وتعالیٰ اہل کتاب کوارشادفرماتا ہے-"قد جاء کم من اللہ نور "تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے نور-"کتاب مبین"-اور کتاب مبین آئی ہے تمہارے پاس-اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نور اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے آیا ہے-یعنی دنیا میں آ کر نور نہیں بنا- بلکہ نور بنکر تمہارے پاس آیا- دنیا میں لوگ آتے ہیں تو یہاں عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، کمالات حاصل کرتے ہیں- سب دنیا میں آ کر-لیکن حضور اکرم ﷺ کی تشریف آوری کے متعلق ارشاد ہورہا ہے کہ تمہارے پاس نور آئے-اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے نور بنکر آئے- یہاں آ کر نور نہیں بنے- جو نور اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے ہو اس نور کو کوئی بجھا سکتا نہیں- وہ نور کہ اسکا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا- دنیا میں لوگ ہاتھ جلاتے ہیں- اسکو بجھا سکتا ہے- کیونکہ یہ ہمارے ہاتوں سے بنائی ہوئی ہے-لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے جو نور آئے اسکو کون بجھائے؟ اسکو کون بجھا سکتا ہے؟ اسکی شان کو کون گھٹا سکتا ہے؟ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا نور تمھارے پاس آیا اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے، اسلئے حضور کریم ﷺ کی تشریف آوری کسی شاہی خاندان سے نہیں ہوئی، تا کہ یہ شبہ نہ ہو کہ آپکو یہ جو عزت ملی ہے وہ اس شاہی خاندان کے سبب سے ملی ہے کچھ ایسے ہی خاندان میں آپ تشریف نہیں لائے جو دولتمند ہو، تا کہ کسیکو یہ شبہ نہ ہو کہ دولت کے ذریعے سے آپکو یہ کمالات حاصل ہوئیں، یہ نور، یہ شہرت آپکو دولت کے ذریعے سے ہوئی - ایسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے کہ آپکو والد ماجد، والدۂ ماجدہ، جد کریم سبکا سایہ آپسے اٹھ گیا-اسی طریقہ سے آپکے خاندان کے لوگ جب ظہور نبوت ہوا، اس وقت تقریبًا وہ سب سفر کرگئے- صرف باقی رہے ابولہب وغیرہ، وہ تو جانی دشمن تھے تو حضور کریم ﷺ کے اس نور کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے خود چمکایا- نور اسکو کہتے ہیں جو خود بھی چمکے، دوسرے کو بھی چمکائے-سورج خود بھی چمکتا ہے اور دوسرے کو بھی چمکاتا ہے-لیکن

سورج بعض وقت کچھ گرم ہوتا ہے- بعض وقت تیز ہوتا ہے، بعض وقت مرجھایا ہوتا ہے- لیکن حضور کریم ﷺ کی ذات بابرکات وہ نور ہے، کہ یہاں زوال نہیں ہے، وہ ہر وقت چمکتا ہے- تو جو انکے قریب ہو گیا جسکی انکے ساتھ کنکشن ہو گئی وہ بھی چمک گیا- وہ چمکاتے بھی ہیں- سورج ظاہر کو چمکاتا ہے- لیکن آپ وہ نور ہیں، کہ آپ باطن کو بھی چمکاتا ہے، دل وہ دماغ کو چمکاتا ہے، تزکیہ فرماتے ہیں، ظاہر و باطن کو چمکاتے ہیں اور سورج رات میں طلوع نہیں ہوتا ہے، دن کو ظاہر ہوتا ہے- لیکن حضور کریم ﷺ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے وہ نور ہیں کہ ہر وقت چمکتے ہیں ہر وقت چمکاتے ہیں- جو آپکا قریب ہوتا ہے، جس پر آپکا نور پڑا ہے اسکو چمکا دیتے ہیں- اسلئے اللہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہارے پاس نور آیا- اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے یعنی حضور کریم ﷺ نور بنکر تمہارے پاس آئے- اور ''کتاب مبین'' واضح کتاب تمہارے پاس آئی- کتاب مبین سے مراد یہاں قران پاک ہے- یہاں نور اور کتاب ایک ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب ہمیشہ جو پڑھی جاتی ہے تو روشنی ہی میں پڑھی جاتی ہے- اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی ہے- روشنی دل میں ہوئی تو کتاب پڑھی جاسکیگی- اس سے معلوم ہوا کہ جسکے دل میں رسول ﷺ کی محبت موجود ہے وہ اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے، جسکے دل میں یہ نور نہ ہو، جسکے دل میں حضور کریم ﷺ کی محبت نہ ہو وہ کتاب کو نہیں سمجھ سکتا ہے، کتاب کو سمجھنے کیلئے حضور کریم ﷺ کی محبت کی ضرورت ہے، اس لئے باطل فرقے دھوکا کھا رہے ہیں، دربدر بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں- وہ حضور کریم ﷺ کی شان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں- یہ بے وقوف نالائق نہیں سمجھتے ہیں، اللہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے- ''ورفعنا لك ذكرك''، یعنی جسکی شان کو اللہ تبارک وتعالیٰ بلند فرمائے، کسکی طاقت ہے کہ اسکو کم کرے؟ اسلئے یہ باطل فرقے نہیں سمجھتے- منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں مگر نہیں سمجھتے ہیں- جو کتاب کو سمجھنا چاہے حضور کریم ﷺ کے متبع بن جائے، حضور کریم ﷺ کی محبت کیلئے دل میں جگہ کرلے، جب تک حضور کریم ﷺ کی محبت نہیں ہوگی وہ قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا، ''یضل به كثيرًا ويهدى به كثيرًا''- بہت سے لوگ اس قرآن پاک کے ذریعہ گمراہ ہو گئے اور بہت کو ہدایت ملگئی- اور اس قرآن کو سمجھنے کیلئے حضور کریم ﷺ کے نور کی ضرورت ہے جسکو نور ہوگا، جسکو محبت ہوگی وہ قرآن پاک کو سمجھے گا- اور جو شخص اس سے محروم ہوگا وہ قرآن پاک نہیں سمجھ سکتا- اللہ تبارک وتعالیٰ ہمکو اور آپکو حضور کریم ﷺ کی محبت عطا فرمائے- اٰمین!

## বক্তৃতা নং- ২

**অনুবাদ :** সর্বজ্ঞাতা সর্বশ্রোতা আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি অভিশপ্ত শয়তান থেকে। আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব।"

**তাফসীর :** আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কিতাবীদের (ইহুদী ও খৃষ্টান) উদ্দেশ্যে এরশাদ ফরমাচ্ছেন, "নিশ্চয় তোমাদের নিকট এসেছে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে 'নূর' (জ্যোতি) এবং সুস্পষ্ট কিতাব।"

বিশ্বনবী হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন– এ 'নূর' আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসেছে অর্থাৎ দুনিয়ায় এসে নূর হননি; বরং নূর হয়েই তোমাদের নিকট এসেছে।

পৃথিবীতে মানুষ এসেই এখানে আলিম হয়, ফাযিল হয়, হাফিয হয়, সমূহ পূর্ণতা অর্জন করে, সবই পৃথিবীতে আসার পর অর্জিত হয়। কিন্তু হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমন সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তরফ থেকে 'নূর' হয়েই তিনি তোমাদের নিকট এসেছেন, এখানে এসে হননি।

যে নূর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তরফ থেকে হয়, সে নূরকে কেউ নেভাতে পারেনা, সে নূরের সাথে কেউ মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারে না। পৃথিবীতে আমরা যে হাতবাতি জ্বালাই, সেটাকে আমরা নেভাতে পারি। কেননা, সেটা আমাদের হাতেরই গড়া। কিন্তু আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তরফ থেকে যে নূর এসেছে তাঁকে কে নেভাতে পারে ? তাঁর মান-মর্যাদা কে হানি করতে পারে? আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ ফরমান– ''তোমাদের নিকট এসেছে 'নূর'।" নূর তোমাদের নিকট এসেছে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে।

এ কারণে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমন কোন বাদশাহ্‌র বংশে হয়নি, যাতে করে (কারো মনে) এ সন্দেহ না জাগে যে, তাঁর যে সব মহা মর্যাদা অর্জিত হয়েছে সেগুলো বাদশাহ্‌র বংশের কারণে অর্জিত হয়েছে। কোন এমন বংশেও তিনি তাশরীফ আনেন নি, যারা সম্পদশালী, যাতে করে কেউ এ সন্দেহ করে না বসে যে, ধনৈশ্বর্যের মাধ্যমেই তাঁর এসব পূর্ণতা (কামালাত) হাসিল হয়েছে। এ জ্যোতি, এ খ্যাতি, তাঁর এ ধনৈশ্বর্যের কারণে নয়। অনুরূপ, তিনি এমতাবস্থায় দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছিলেন, যখন তাঁর পিতা ইহধামে ছিলেন না। এর পরপর তাঁর মাতা ও পিতামহ-উভয়ের ছায়া তাঁর উপর থেকে উঠে গিয়েছিল। শুধু তা নয়, তাঁর নুবূয়ত প্রকাশের সময়, তাঁর বংশীয় লোকদের প্রায় সবই পরপারে পাড়ি জমান। বেচে ছিল আবূ লাহাব প্রমুখ। তারাতো তাঁর প্রাণেরই শত্রু ছিল। তখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরকে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলাই চমকিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

'নূর' বলে- যা নিজেও চমকিত, অপরকেও চমকায়। যেমন, সূর্য নিজেও প্রজ্জ্বলিত এবং অন্যকেও তা আলোকিত করে; কিন্তু সূর্য্যের আলো কখনো হ্রাস পায়, কখনো খুবই তেজোদ্দীপ্ত হয়, কখনো আবার ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তার এমন 'নূর' যে, এখানে অস্ত নেই, অন্ত নেই। সেটা সর্বদা আলোকিত, সব সময় চমকিত।

(এমনকি) যাঁরা সেটার নিকটস্থ হয়েছে, সেটার সাথে যাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তাঁরাও আলোকময় হয়ে গেছেন, আর তাঁরাও অপরকেও আলোকিত করতে পারেন।

সূর্য্য বাহ্যিক জগতকে আলোকিত করে; কিন্তু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি  ওয়াসাল্লাম এমন 'নূর' যা অন্তরকেও আলোকিত করে দেয়; অন্তর এবং মস্তিষ্ককেও তিনি চমকিয়ে দিয়ে থাকেন, পবিত্র করেন। তিনি যাহের এবং বাতেনকেও আলোকিত করেন।

আর সূর্য্য তো রাত্রে উদিত হয় না। উদিত হয় শুধু দিনের বেলায়, কিন্তু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি  ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তরফ থেকে ওই জ্যোতি, যা সর্বদা সবসময় আলো দান করে। যেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে আসে, যার উপর তাঁর আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছে, সেটাকেও আলোকময়, আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তরফ থেকে 'নূর' হয়েই তিনি তোমাদের নিকট এসেছেন।

(তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-) 'এবং সুস্পষ্ট কিতাব।' সুস্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। 'কিতাবে মুবীন' বা সুস্পষ্ট কিতাব মানে এখানে কুরআন পাকই। এখানে 'নূর' এবং সুস্পষ্ট কিতাব একসাথে উলে- খ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে–এ কিতাব যখনই পাঠ করা হোক না কেন, তাতো পড়া যায় আলোর মধ্যে, অন্ধকারে পড়া যায় না। আলো থাকলেই তো কিতাব পাঠ করা যাবে। এ থেকে বুঝা গেল যে, যার অন্তরে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা বিদ্যমান, সে-ই 'কুরআন'কে যথাযথ ভাবে অনুধাবন করতে পারবে। যার অন্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম- এর ভালবাসা থাকে না, সে কিতাব-কুরআন বুঝতে পারে না। কুরআন বুঝার জন্য হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে তাঁর অনুসরণের। এজন্যই এসব বাতিল ফেরকা (ভ্রান্ত মতবাদীরা) বিভিন্ন ধরণের ধোঁকা খাচ্ছে, পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর মর্যাদাহানির চেষ্টা চালাচ্ছে। এসব বিবেকহীন অনুপযুক্ত লোকেরা বুঝতে পারছে না।

(আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-) ''আমি আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।'' যাঁর সম্মানকে আল্লাহ্পাক বুলন্দ করেন, কার শক্তি আছে সেটাকে কমানোর ? এজন্যই এসব ভ্রান্ত মতবাদী লোক বুঝছেনা, তারা শুধু মুখে কলেমা উচ্চারণ করে, কিন্তু (কলেমার মর্মার্থ) বুঝছে না।

যে কিতাব (কুরআন মজিদ) বুঝতে চায়, তার উচিত যেন সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী হয়ে যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসার জন্য যেন অন্তরে স্থান করে নেয়। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি  ওয়াসাল্লাম -এর ভালবাসা অর্জিত হয়ে যায়, তারপরই সে কুরআন পাক বুঝতে পারবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা অন্তরে অর্জিত হবে না, ততক্ষণ সে কুরআন পাক বুঝতে সক্ষম হবে না। নবী প্রেম ব্যতীত কুরআন যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম হবে না।

(আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন- "এ কুরআন করীম দ্বারা অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেকের হিদায়ত অর্জিত হয়েছে।" বস্তুতঃ কুরআন করীম বুঝার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরের প্রয়োজন। যার মধ্যে নূর থাকবে, যার মধ্যে ভালবাসা থাকবে সে-ই প্রকৃত পক্ষে কুরআন করীম বুঝবে। পক্ষান্তরে, যে সব লোক তা থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কুরআন পাক বুঝতে পারে না।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে, আপনাদেরকে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর ভালবাসা দান করুন। আ-মী-ন।[৭৯৬]

---

৭৯৬. প্রাগুক্ত; মাওলানা আব্দুল মান্নান সম্পাদিত, ***নূরানী তাকরীর***, (চট্টগ্রাম : আন্‌জুমান প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১০-১৭

# تقریر۔۳

## اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم-
## بسم اللہ الرحمن الرحیم-

**فاما الذین امنوا باللہ واعتصموا بہ فسید خلھم فی رحمۃ منہ وفضل ویھدیھم الیہ صراطا مستقیما -(النساء: ۱۷٤ – ۱۷۵)**

صدق اللہ مولنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم-
ونحن علی ذلک من الشاھدین والشاکرین - والحمدللہ رب العالمین-

یہ آیت مبارکہ حضور کریم ﷺ کی عظیم الشان نعت ہے-تمام مسلمانوں کوخطاب ہےتمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی، برہان آیا، برہان مضبوط دلیل کو کہتے ہیں-حضور کریم ﷺ کو برھان فرمایا کہ یہ میری دلیل ہے-"وانزلنا الیکم" اوراتارا ہمنےتمہاری طرف"نورامبینا" 'واضح نور' "نورامبینا" سے مفسرین کرام میں کوئی مراد لیتے ہیں 'قرآن کریم' کیونکہ دوسری آیت میں اسکی تفسیر آئی-"قد جاء کم من اللّٰہ نور و کتاب مبین" اللہ تبارک وتعالیٰ ارشادفرماتا ہے کہ ہمنے تمہاری طرف برھان بھیجا-دلیل بھیجی-مقدمہ میں کوئی دعوی کرتا ہے تو اسکی دلیل ہوتی ہے-دلیل پیش کرنے سے اسکا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے-وہ دلائل پیش کرتے ہیں- حضور کریم ﷺ بھی اللہ تبارک وتعالیٰ طرف سے دلیل ہے-جولوگ دلیل توڑنا چاہتے ہیں وہ اس مقدمہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں-اسلئے دلیل توڑنا چاہتے ہیں-تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی دلیل ہیں-اسکی خالقیت کی دلیل ہے- لیکن حضور کریم ﷺ وہ دلیل ہے کہ جس پرکیسکو شک پیدا کرنے کا موقع نہیں ہوسکتا ہے-حضور کریم ﷺ اللہ تبارک وتعالیٰ کی وہ مضبوط دلیل ہے جسکے سامنے تمام مخلوق لاجواب ہے-'برھان من ربکم' تمہارے رب کی طرف سے دلیل ہے، برھان ہے-کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ تمام مخلوق کا خالق ہے-اللہ تبارک وتعالیٰ پرورش فرماتا ہے-ظاہر کا بھی باطن کا بھی،جس طریقے سے اللہ تبارک وتعالیٰ نے عالم اجسام کیلئے عالم اجسام کی تربیت کیلئے عالم اجسام کی پرورش کیلئے سورج کو پیدا فرمایا کہ جس سے تمام دنیا کا نظام قائم رہے-اسی طریقے سے عالم اندراللہ تبارک وتعالیٰ نے آفتاب رسالت کو چمکایا جسکے ذریعے سے عالم ارواح کا نظام قائم رہے-عالم ارواح کا نظام حضور کریم ﷺ کی ذات بابرکات سے قائم ہے جس طریقہ سے سورج عالم ظاھر کیلئے ظاھری انتظام قائم کرنے کیلئے قائم ہے-یہی طریقہ سے حضور کریم ﷺ کی ذات برکات عالم ارواح کے نظام کیلئے قائم ہے-اسلئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپکو برھان فرمایا دلیل فرمایا-جولوگ حضور کریم ﷺ پر اعتراض کرتے ہیں وہ حضور کریم ﷺ پر اعتراض نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی دلیل کو کمزور کرنا چاہتے ہیں-یہ بے وقوف ہے-اللہ تعالیٰ ہمکو سبکو سمجھنے کی توفیق بخشے-آمین-

'فاما الذین اٰمنوا باللّٰہ' پس جولوگ ایمان لائے اللہ پر "واعتصموا بہ" اوراسکو مضبوطی سے پکڑے اس آیت میں "بہ" کا مرجع برھان ہے- اس سے مراد حضور کریم ﷺ کی ذات بابرکات ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اورانہوں نے حضور کریم ﷺ کے دامن کو مضبوط پکڑا "فیسدخلھم فی رحمۃ منہ" تو عنقریب ان لوگوں کو اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی رحمتوں میں داخل فرمائیگا- "وفضل" اوراپنے فضل میں داخل فرمائیگا "ویھدیھم" اورانکو راستہ دکھائیگا، اپنا راستہ- پس واضح ہوگیا کہ اس آیت کو غور سے دیکھا جائے، تو فیصلہ ہوگیا کہ کامیابی ان لوگوں کیلئے ہے کہ جن لوگوں نے حضور کریم ﷺ کے دامن کو مضبوط پکڑا- ان لوگوں کیلئے اللہ کی مہربانی ہے، سیدھا راستہ بھی ہے اوران پر اللہ کی رحمت بھی ہے اور جن لوگوں سے انکا دامن چھوڑ دیا وہ محروم ہوگئے- ان کیلئے کچھ بھی نہیں ہے نہ انکا دین ہے نہ انکی دنیا، نہ عبادت ہے کچھ بھی نہیں ہے تمام باطل فرقے اسمیں ہیں، انکی کوشش یہ ہے کہ حضور ﷺ کے دامن ہاتھوں سے چھوٹ جائے، تو آپ کوشاں ہوجائے اوراس دامن کو مضبوط پکڑے اوراسی دامن میں آپ لوگوں کا یہ سلسلہ ہے، اسکی نسبت ہے اس دامن کے ساتھ- جو کچھ آرہا ہے اسی دامن سے آرہا ہے جو کچھ مہربانی آرہی ہے، اسی دامن سے آرہی ہے-

آپ خبردار ہوجائے بیہودہ باتوں میں مت آؤ ایسی حرکت نہ کرو کہ اس رحمت سے چھوٹ جاؤ- بلکہ اس سلسلہ کو مضبوط پکڑو- سلسلہ میں مضبوط ہوجاؤ- دیکھو، سوچو، جانو تاکہ آپ لوگوں کا سلسلہ مضبوط ہوجائے تاکہ آپ پر اللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور جو کچھ اس سلسلہ میں ہے یہ سب حضور کریم ﷺ کی طرف سے ہے- حضور کریم ﷺ کی رحمتیں ہیں، حضور کریم ﷺ کی برکتیں شامل حال ہیں- تو یہ دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے- یہ آیات مبارکہ ہمیشہ خیال رکھئے- "فاما الذین اٰمنوا باللّٰہ" پس جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لے آئے- "واعتصموا بہ" اورانہوں نے رسول کریم ﷺ کے دامن کو مضبوط پکڑا پس ان کیلئے کیا ہے؟ "فسیدخلھم فی رحمۃ منہ وفضل" اللہ تعالیٰ انکو اپنی رحمت میں داخل فرمائیگا اور مہربانی میں شامل کریگا "ویھدیھم صراطًا مستقیمًا" اوراللہ تعالیٰ انکو اپنا راستہ سیدھا راستہ دیکھائیگا جس سے وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ جائیگا، اللہ تبارک وتعالیٰ توفیق بخشے، اٰمین-

## বক্তৃতা নং- ৩

**অনুবাদঃ** "হে মানবকুল! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলো অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর ওই সব লোক, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে, অবিলম্বে তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে আপন রহমত ও অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে নিজের প্রতি সরল পথ প্রদান করবেন।" [৭৯৭]

**তাফসীর :** এ বরকতময় আয়াতে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। এতে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের নিকট তোমাদের

৭৯৭. আল-কুরআন, ৪ : ১৭৫-১৭৬

রবের তরফ থেকে দলিল এসেছে, অকাট্য প্রমাণ এসেছে। ‘বোরহান’ বলা হয় ‘অকাট্য’ প্রমাণকে। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাকে ‘বুরহান’ বলে আখ্যায়িত করে বলেন, ‘তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল এসেছে। (আরো ইরশাদ করেছেন) এবং আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জ্বল জ্যোতি, প্রকাশ্য ‘নূর’ অবতীর্ণ করেছি।’ এখানে ‘নূরাম্ মুবীনান্’ দ্বারা কোন কোন তাফসীরকারক পবিত্র ক্বোরআন এর অর্থও গ্রহণ করেছেন। কেননা, অন্য আয়াতে এর ব্যাখ্যা এসেছে নূর (‘‘ক্বাদ জা-আকুম মিনাল্লাহি নূরূঁ ওয়া কিতাবুম মুবিন’’) ‘‘নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্র নিকট হতে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।’’

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, আমি তোমাদের নিকট ‘বুরহান’ (অকাট্য প্রমাণ) প্রেরণ করেছি। মুকাদ্দমায় কেউ কিছু দাবী করলে তার পক্ষে দলীলও থাকে। দলীল পেশ করলে তার মুকাদ্দমা মজবুত হয়। তাই সে দলীল পেশ করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা‘আলার তরফ থেকে একটা মজবুত দলীল। যারা দলীল খণ্ডন করতে চায়, তারা মুকাদ্দমাকে দূর্বল করে দিতে চায়। একমাত্র এতদুদ্দেশ্যেই তারা দলীল খণ্ডন করতে চায়।

সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্ তা‘আলার দলীল, তাঁর একত্বের প্রমাণ, তিনি সৃষ্টিকর্তা হবার প্রমাণ। কিন্তু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই দলীল, যার সম্পর্কে কারো সমালোচনা করার কোন প্রকার অবকাশ থাকতে পারেনা। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার ওই মজবুত দলীল, যার সম্মুখে সমস্ত মাখলুক নিরুত্তর (লা-জাওয়াব)। তিনি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দলীল (অকাট্য প্রমাণ) কেননা, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা সৃষ্টি কুলের সৃষ্টিকর্তা।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা প্রতিপালন করেন প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সমস্ত সৃষ্টির। যেভাবে আল্লাহ্ তা‘আলা স্থুলজগতের প্রতিপালনের মাধ্যম সূর্য্যকে সৃষ্টি করেছেন, যার মাধ্যমে সমস্ত জগতের নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তদ্রূপ রূহ-জগতকে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা রেসালতের সূর্য্য হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দ্বারা উদ্ভাসিত করেছেন। রূহ জগতের আইন-কানুন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর বরকতময় যাতের মাধ্যমে কায়েম হয়েছে। যেমনিভাবে সূর্য্য প্রকাশ্য (স্থুল) জগতের জন্য জাহেরী এন্তেজাম কায়েম করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনিভাবে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর বরকতময় যাত রূহ জগতের নিয়ম-কানুন কায়েম থাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে বুরহান আখ্যা দিয়েছেন, দলীল বলেছেন।

যারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার ধৃষ্টতা দেখায় তারা আসলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করেনা, বরং আল্লাহ্ তা‘আলার অকাট্য দলীলকে দূর্বল করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। এরা বস্তুতঃ আহমক্ব, নির্বোধ।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা আমাদেরকে বুঝার শক্তি দিন। আমিন!

“অতঃপর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছে”–এ আয়াতে ‘তাঁকে’ সর্বনাম দ্বারা ‘বুরহান’ বিশেষ্যের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। এটার অর্থ হচ্ছে হুযূর

করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জাত। (সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়) যে সব লোক আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনে এবং হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর দামনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে, সে সব লোককে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন রহমত সমূহে প্রবেশ করাবেন, আপন অনুগ্রহে অন্তর্ভূক্ত করাবেন এবং তাদেরকে দেখাবেন সোজা রাস্তা। আর আপন সোজা রাস্তা তাদেরকেই দেখাবেন, যারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দামনকে আকঁড়ে ধরেছে, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মজবুতভাবে ধারণ করেছে। আয়াত এরশাদ হয়েছে– যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে, এবং তাঁর (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দামনকে মজবুতভাবে ধারণ করেছে, অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অবিলম্বে স্বীয় রহমতসমূহে দাখিল করবেন এবং আপন অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন। আর তাদেরকে দেখাবেন, আপন রাস্তা।

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট হলো যে, এ আয়াত শরীফে গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথার ফয়সালা হয়ে যাবে যে, কামিয়াবী ওই সব লোকের জন্য, যারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দামনকে আঁকড়ে ধরেছে, সে সব লোকের জন্য আল্লাহ্‌র দয়া, সোজা পথ এবং আল্লাহ্‌র রহমতও রয়েছে।

পক্ষান্তরে, যে সব লোকের হাত থেকে এ দামন ছুটে গেছে, তারা মাহরূম হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে। তাদের জন্য কিছুই নেই। না তাদের দ্বীন আছে, না আছে তাদের জন্য দুনিয়া।

সমস্ত বাতিল ফেরকার মধ্যে রয়েছে তাদের অব্যাহত অপচেষ্টা। তারা এতেই সচেষ্ট রয়েছে যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর দামন হাত থেকে ছুটে যাক। কাজেই, আপনারা সজাগ হয়ে যান এবং ওই দামনকে মজবুতভাবে ধারণ করুন! স্মরণ রাখবেন, আপনাদের সিলসিলা এর সম্পর্কে হচ্ছে এ দামনেরই সাথে। যা কিছু আসছে সে দামন থেকেই আসছে। যা কিছু মেহেরবানী আসছে, সে দামন থেকেই আসছে। আপনারা সতর্ক হয়ে যান। ভিত্তিহীন কথা-বার্তা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। এমন কোন কাজ করবেন না, যা অনৈক্যের কারণ হয়। যাতে করে আপনারা রহমত থেকে দূরে ছিটকে পড়েন। এ সিলসিলার মধ্যে মজবুত হয়ে যান। লক্ষ্য করুন, জেনে নিন! যাতে আপনাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয় এবং এ সিলসিলায় যা কিছু আছে এসব কিছু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তরফ থেকেই, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর রহমতসমূহ, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতসমূহ এতে শামেলে হাল রয়েছে। মনে রাখবেন, যেন এ দামন হাত থেকে ছুটে না যায়।

এ বরকতময় আয়াতকে সব সময় খেয়াল রাখবেন, অতঃপর যে সব লোক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দামনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছে, তার জন্য কী প্রতিদান রয়েছে? আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আপন রাস্তা অর্থাৎ সোজা রাস্তা দেখাবেন, যাতে তারা আপন মন্‌যিলে মাক্বসদে পৌঁছে যায়।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাওফীক্ব দান করুন![৭৯৮] আ-মী-ন!

৭৯৮. ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) বাংলাদেশ সফরকালে তরীকতের ভাইদের উদ্দেশ্যে এ গুরুত্বপূর্ণ তক্বরীর পেশ করেন। যা রেডিও টোনের স্বত্বাধিকারী আলহাজ্ব মাহবুবুল আলম চৌধুরী সংরক্ষণ ও সরবরাহ করেছেন।

## تقریر-٤

### اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم-

### بسم الله الرحمن الرحيم-

### انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويوتون الزكوة وهم راكعون - (المائدة: ٥٥-٥٦)

صدق الله مولنا العظيم وصدق رسوله النبی الكريم-
ونحن علی ذلك من الشاهدين والشاكرين – والحمدلله رب العالمين-

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے-"انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الاية" سوائے اسکے نہیں کہ تمہارا دوست-اللہ تمہارا دوست ہے-ولی ہے اور اللہ کے رسول تمہارا دوست ہیں ولی ہیں "والذين امنوا" اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، "الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون" اور ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکوۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں "ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا" اور جو لوگ محبت رکھتے ہیں اور دوستی رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ-"فان حزب الله هم الغالبون" تحقیق یہی جماعت یہی گروہ یہی ٹولہ خالص دوست ہیں-یہی اللہ کے گروہ ہیں- یہی فاتح ہیں، یہی غالب ہیں، یہی ٹولہ جنکی اللہ ورسول کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ دوستی ومحبت ہو اور نمازیں قائم کریں اور زکوۃ دیں اور رکوع کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ دوستی اور محبت ہو تو یہی لوگ غالب ہیں- اس آیت کی شان نزول ایسی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم تھے، آپ مسلمان ہوگئے، ایک دن آپ نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ یارسول اللہ بنی قریظہ اور بنی نضیر دو قبیلہ ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بایکاٹ کرلئے ہیں تمام چیزوں پر- اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی-"انما وليكم الله ورسوله" (الایۃ) جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے اگر یہودیوں نے بایکاٹ کرلیا ہے تو آپکا کیا نقصان ہے؟ آپکے ساتھ دوستی ومحبت رکھنے والے تو اللہ ہے- اللہ کے رسول ہیں مؤمنین ہیں- مسلمان ہیں، اگر یہ لوگ تم سے بایکاٹ کرلئے ہیں تو مسلمان جو رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں- وہ لوگ تمہارے دوست ہوگئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا یارسول اللہ میں راضی ہوں اللہ کے رب

ہونے پر اور رسول اللہ ﷺ اللہ کے رسول ہونے پر، اس آیت کی شان نزول تو ایسی ہے لیکن آیت مبارکہ کے مفہوم سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ جنکی محبت ہے وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نمازوں کو اور زکوۃ دیتے ہیں اور رکوع والے ہیں کہ یہی لوگ غلبہ والے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں یہی لوگ غالب ہیں تمام جہان پر، چونکہ یہ اللہ والے ہوگئے ہیں کہ انکو محبت ہے اللہ و رسول کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ تو اللہ کے رسول اور مؤمنین انکے مددگار ہیں اور یہی ٹولہ غالب ہیں کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی امداد انکو حاصل ہوگئی ہے- اللہ کے رسول کی امداد انکو حاصل ہوگئی ہے- تو یہی لوگ غالب ہیں- انکا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا- یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک وتعالیٰ کے ملک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم سے راج کرتے ہیں اور انکی بادشاہی ہے بر و بحر پر، شجر و حجر پر اور انکی بات مانی جاتی ہے جو کہتے ہیں- قران پاک اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ انکی بات مانی جاتی ہے- یہ نہیں کہ وہ لوگ اللہ ہوگئے، بلکہ وہ اللہ کے گروہ ہوگئے اللہ کے ٹولے ہوگئے، اللہ کے گروہ میں شامل ہوگئے- اللہ کے گروہ میں شامل ہوجانے سے اللہ تبارک وتعالیٰ نے انکو یہ مقام دیا، یہ جو کہتے ہیں وہ مانی جاتی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مصر کے گورنر نے خط لکھا کہ یہاں کے دریائے نیل موسم گرما میں خشک ہوجاتا ہے اور قدیم دستور کے مطابق ایک دوشیزہ عورت کو دریا میں غرق کردیا جاتا ہے اسکے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریا کو ایک رقعہ لکھا دریا کے نام پر- حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط میں لکھا کہ اے دریائے نیل تو سرکشی مت کرنا- پس اس دریائے نیل نے آج تک سرکشی نہیں کی- اسمیں بغاوت نہیں آئی کہ تمام چیزیں انکی بات مانتی ہیں- دادا پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ غوث کسکو کہتے ہیں؟ دادا پیر صاحب خواجہ چھوروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غوث اسکو کہتے ہیں کہ اگر اس درخت کو یوں کہے کہ تو آجا- تو وہ آجائے، اس جواب میں یہ سمجھا دیا تو وہ درخت آپکی طرف روانہ ہوگیا- درخت آنے لگا- تو آپ نے فرمایا تجھ پر حکم نہیں دیتا ہوں، غوث کی نشانی سمجھا دے رہا ہوں- مقصد یہ ہے کہ انکی بات ہر چیز مانتی ہے- بحر و بر، شجر و حجر انکی باتیں مانتے ہیں- کیونکہ یہ اللہ والے ہوگئے، یہ اللہ کے گروہ میں شامل ہوگئے، جو لوگ اللہ کے گروہ میں شامل ہوگئے تو ان کیلئے کسی قسم کی تکلیف نہیں- کوئی پریشانی نہیں ہے وہ کامیاب ہیں- اللہ کے گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے- ''الا ان حزب اللّٰہ ھم الغالبون'' آگاہ ہو بیشک اللہ کا گروہ غالب ہیں، یہ گروہ غالب ہیں، اسکی تفسیر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ملک کا حاکم ہوتا ہے، کمشنر ہوتا ہے وہ اس میں دسترس کرتا ہے- لیکن اس دسترس سے وہ بادشاہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ بادشاہ کے ٹولے میں داخل ہوجاتے ہیں، بادشاہ کے گروہ میں داخل ہوجاتے ہیں، وہ حاکم بنتے ہیں- غالب ہوتے ہیں، اسی طرح جو اللہ والے ہوگئے، اللہ

کے گروہ میں شامل ہو گئے ان لوگوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے- وہ ہر جگہ پر غالب ہیں کیونکہ یہ انسان اللہ والے ہو گئے- جنکی محبت ہو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ انکی محبت ہو، انکی دوستی ہو تو انکو شکست نہیں، وہ ناکام نہیں، وہ ہر میدان میں کامیاب ہیں- تو معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی امداد نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول امداد نہیں کر سکتے، اولیاء اللہ امداد نہیں کر سکتے وہ قرآن پاک کی اس آیت کے منکر ہیں- وہ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن پاک فرماتا ہے تمہارے دوست تمہارے مددگار اللہ اور اسکے رسول ہیں اور مؤمنین تمہارے مددگار ہیں- یہاں پر فرمایا جاتا ہے-"انما ولیکم اللّٰہ ورسوله والذین اٰمنوا الذین یقیمون الصلوۃ ویوتون الزکوۃ وھم راکعون" یعنی تمہارا دوست تمہارا امدگار اللہ ہے اللہ کے رسول اور مؤمنین ہیں- پھر ارشاد ہوتا ہے-"وما لکم من دون اللّٰہ من ولی ولا نصیر" اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں کوئی مددگار نہیں، یہ باطل فرقے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی قرآن مجید کی آیت ہے- "ومالکم من دون اللہ من ولی ولانصیر" کی مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی شخص کسیکو امداد نہیں کر سکتا ہے یعنی اللہ اگر چاہے کسیکو سزا دینے کو تو کسیکی طاقت نہیں کہ سزا کو ٹال سکے- اللہ چاہے کہ کسیکو نہ دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اسکو دے "من دون اللہ" سے مراد اللہ کے مقابلہ میں آکر کسیکو کچھ دینا کسیکو امداد کرنا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ امداد نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کر کے- ہم جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں مسلمان ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمکو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور آولیاء کرام جو مزارات میں ہوتے ہیں وہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں وہ مخلوق کی امداد کرتے ہیں- انکی جسمانی تعلق تو ختم ہو گیا، لیکن روحانی تعلق تو قیامت تک جاری رہیگا، روحانی طاقت اور روحانی اماد جو ہے اسکا فناء نہیں وہ باقی ہے تو اسلئے ان لوگوں سے ہوشیار رہے وہ قرآن کریم کی اس قسم آیت پیش کرتے ہیں کہ لوگ انکے چکر میں آجائے- اسلئے مناسب ہے کہ کوئی بھائی اس قسم کی باتیں سنے تو فوراً علماء اہل سنت کے پاس پہنچ جائے اور پوچھے کہ قرآن کریم تو ایسا فرماتا ہے اسکی صحیح حالت کیا ہے؟ یہ آپکو اچھی طرح سمجھا دینگے- نہیں تو ان لوگوں کی پٹی میں آکر ایسا نہ ہو کہ آپنے آپکو خراب نہ کیا جائے برباد نہ کیا جائے- قرآن پاک کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، بہت مشکل ہے- ایک شخص ایک بڑے عالم اور امام کے پاس آیا اور اس نے اس امام سے پوچھا کہ میں آپکے سامنے قرآن کریم پڑھونگا اور ایک آیت پڑھونگا اسکا ترجمہ کرونگا- تفسیر کرونگا- تو آپ نے فرمایا نہیں، تجھے اجازت نہیں ہے تو اس نے کہا تو ایک حدیث پڑھونگا اسکا معنی کرونگا- انہوں نے فرمایا نہیں، تجھے حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں- تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اگر یہ غلط کہدے تو آپ سمجھا دیتے اور اسکا اصلاح فرما دیتے- تو کیوں آپ نے منع فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ بدعقیدہ ہے، اسکی سننے سے اگر میرے ایمان میں ذرہ برابر فرق آجائے تو میں برباد ہو جاونگا میں غرق ہو جاونگا- مجھے کیا ضرورت ہے اس بدعقیدہ سے قرآن سننے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے اس بدعقیدہ سے حدیث سننے کی؟ کہ بدعقیدہ والوں سے الگ رہو اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ- کہ اللہ، اسکے رسول اور مؤمنین تو اچھے لوگوں کے دوست ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا- "انما ولیکم اللہ ورسوله والذین اٰمنوا الذین یقیمون الصلوۃ ویوتون الزکوۃ وھم راکعون"

"ومن یتول اللہ ورسوله والذین اٰمنوا فان حزب اللہ ھم الغالبون" جو لوگ محبت رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور مؤمنین کے ساتھ-"فان حزب اللّٰہ ھم الغالبون" یہی اللہ کے گروہ ہیں اللہ کی جماعت ہیں- یہی جماعت غالب ہے- ہر جگہ ہر مقام پر غالب رہینگے- اللہ تبارک وتعالیٰ آپ لوگوں کو غالب رکھے- امین-

## বক্তৃতা নং- ৪

**অনুবাদঃ** আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিচ্ছি, যিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা-বিতাড়িত শয়তান থেকে। আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন–

এতদ্ব্যতীত নয় যে, তোমাদের একমাত্র বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং ওই সব ঈমানদার, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এমতাবস্থায় যে, তারা রুকু'কারী এবং যারা সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করে (ভালবাসে) আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে এবং তাঁদেরকে, যারা ঈমান এনেছে (নিশ্চয়ই তাঁরা আল্লাহ্‌র দল) আর আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী।[৭৯৯]

**তাফসীরঃ** আল্লাহ্‌র তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেছেন, এতদ্ব্যতীত নয় যে, তোমাদের বন্ধু হন আল্লাহ্, তিনি তোমাদের বন্ধু, তোমাদের অভিভাবক (সাহায্যকারী)। অনুরূপ, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের বন্ধু, তোমাদের অভিভাবক, সাহায্যকারী এবং ওইসব লোকও, যারা ঈমান এনেছে, নামাযসমূহ কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং তারা রুকু'কারী; আর যেসব লোক বন্ধুত্ব রাখে আল্লাহ্‌র সাথে, আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে এবং মু'মিনদের সাথে, নিশ্চয়ই এ জনগোষ্ঠী, এ জমা'আত, এ দল খাঁটি বন্ধু, এরাই জয়ী, এরাই প্রাধান্য অর্জনকারী।

এ মানব গোষ্ঠী, এ দল, যাদের অন্তরে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল এবং মু'মিনদের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকে এবং নামাযসমূহ প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে এবং অন্তরে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল এবং মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখে, তাঁরাই বিজয়ী।

এ আয়াতের শানে নুযূল এরূপ– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, যিনি বনী ঈস্রাঈলের খুব বড় আলিম ছিলেন, (পরে মুসলমান হয়ে গেছেন) একদিন রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহ্ রাসূল! বনী ক্বোরাইযাহ্ এবং বনী নযীর, দুটি গোত্র আমাদেরকে সব বিষয়ে বয়কট করে বসেছে। (সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।) এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে:- انما وليكم الله ورسوله ইন্নামা-ওয়ালিয়্যুকুমুল্লা-হু ওয়া রাসূলু-হু।

যখন এ বরকতময় আয়াত নাযিল হয়েছে তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের মনে শান্তনা এসেছিল। তাদের উদ্যেশে বলা হয়েছে যে, এখন থেকে যদি ইহুদী সম্প্রদায় তোমাদেরকে বয়কট করে, তবে তোমাদের ক্ষতি কি? তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপনকারী তো স্বয়ং আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল ও মু'মিনগণ। যদিও এসব লোক তোমাদের সাথে বয়কট করেছে, তবুও মুসলমানগণ, যারা রুকু'কারী, যারা সাজদাকারী, যারা এ নামায সমূহ প্রতিষ্ঠাকারী, তাঁরাতো তোমাদের বন্ধু হয়ে গেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি আল্লাহ্ প্রতিপালক হবার উপর এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাসূল হবার উপর-আমি রাজি হয়েছি।

এ আয়াতের শানে নুযুল তো এমনিই। তবে এর অন্য তাৎপর্য এসে যায়। তা হচ্ছে–এ থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র সাথে, আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে এবং মু'মিনদের সাথে যাদের বন্ধুত্ব রয়েছে, তারা

---

৭৯৯. আল কুরআন ৫ : ৫৫-৫৬

এবং যারা নামায সমূহ কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, রুকু করে, সেসব লোকই বিজয় অর্জনকারী। এসব লোক কামিয়াব। এসব লোক বিজয়ী সমগ্র জাহানের উপর। সমগ্র জাহানের উপর এরাই বিজয়ের অধিকারী।

যেহেতু এসব লোক আল্লাহ্-ওয়ালা হয়ে গেছেন, তাঁদের মুহাব্বত রয়েছে আল্লাহ্র সাথে, আল্লাহ্র রাসূলের সাথে এবং মু'মিনদের সাথে, সেহেতু আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল এবং মু'মিনগণ তাঁদের সাহায্যকারী হয়েছেন। এ দলই বিজয়ী। কেননা, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সাহায্য তাদের অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ্র রাসূলের সাহায্য হাসিল হয়ে গেছে। কাজেই, এসব লোক এমন বিজয়ী যে, তাঁদের সাথে কেউ মোকাবেলা করতে পারে না। এসব লোক, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালার কর্তৃত্বের মধ্যে রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশে রাজত্ব করছেন এবং তাঁদের বাদশাহী রয়েছে, স্থল ও জলের উপর, তাঁদের বাদশাহী রয়েছে বৃক্ষ ও পাথরের উপর এবং তাঁদের কথা মান্য করা হয়, তাঁরা যা বলেন মান্য করা হয়। কুরআন পাক এবং হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের কথা মান্য করা হয়।

এটা নয় যে, তাঁরা আল্লাহ্ হয়ে গেছেন। এতে তাঁরা আল্লাহ্ হননি, বরং তাঁরা আল্লাহ্র দল হয়ে গেছেন, আল্লাহ্র জমা'আত হয়ে গেছেন। তাঁরা আল্লাহ্র দলে শামিল হয়ে যাবার কারণে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা তাঁদেরকে এ মর্যাদা দিয়েছেন যে, তাঁরা যা বলেন, তার আনুগত্য করা হয়। হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট মিশরের গভর্ণর চিঠি লিখছেন–এখানে নীল নদের প্লাবন স্থগিত হয়ে গেছে। এখানকার জনসাধারণের নিয়ম হচ্ছে যে, তারা তখন একটা যুবতী মেয়েকে সেটার মধ্যে ফেলে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটা চিঠি লিখলেন নীল নদকে, নদের নামে। চিঠিতে লিখছেন, 'হে নদ! তুমি বিদ্রোহী হয়ো না।' অতঃপর ওই নীল নদের মধ্যে আজ পর্যন্ত ব্যতিক্রম আসেনি। দেখুন! সব কিছু তাঁদের কথা মান্য করে।

দাদা পীর খাজা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি র সম্পর্কে প্রসিদ্ধি আছে যে, এক ব্যক্তি আরয করলো, ''হুযূর, গাউস কাকে বলে?'' দাদা পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বললেন, ''গাউস তাঁকেই বলে, তিনি যদি এ গাছটাকে বলেন- এদিকে এসো! তখন সেটা এসে যাবে।'' লোকটার প্রশ্নের জবাবে তিনি এ উদাহরণটা বুঝাচ্ছিলেন মাত্র। অথচ ওই গাছটি তাঁর (দাদা পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ) দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। গাছটা আসতে শুরু করলো। তিনি বললেন, ''(হে গাছ!) তোমাকে তো আসতে হুকুম দিইনি। আমিতো গাউসের চিহ্ন বুঝাচ্ছি।'' উদ্দেশ্য হলো- তাঁদের কথা মান্য করা হয়। তাঁদের কথা প্রত্যেক কিছু মান্য করে। কেননা, তাঁরা আল্লাহ্-ওয়ালা হয়ে গেছেন, আল্লাহ্র দলে শামিল হয়ে গেছেন। যাঁরা আল্লাহ্র দলে শামিল হয়ে গেছেন তাঁদের জন্য কোন কষ্ট নেই। কোন পেরেশানী নেই। তাঁরা কৃতকার্য। আল্লাহ্র দল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- ''শুন! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দলই বিজয়ী।''

এর ব্যাখ্যায় আরয করছি যে, এরা যাঁরা রাজ্যের হাকিম (বিচারক) হন, কমিশনার হন, তাঁরা তাতে নিজেদের ক্ষমতা চালান। কিন্তু এতে তো তাঁরা নিজেরা বাদশাহ্ হন না; বরং বাদশাহ্র দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তাঁরা তো বিচারক, প্রশাসক হয়ে বিজয়ী হন। অনুরূপভাবে, যাঁরা আল্লাহ্-

ওয়ালা হন, আল্লাহ্‌র দলে শামিল হন তাঁদের সাথে কেউ মোকাবেলা করতে পারে না। তাঁরা প্রত্যেক জায়গায় বিজয়ী। কেননা, এসব ইনসান আল্লাহ্‌-ওয়ালা হয়ে গেছেন, যাঁদের মুহাব্বত রয়েছে আল্লাহ্‌র সাথে, আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে এবং মু'মিনদের সাথে, তাঁদের সাথে ভালবাসা ও দোস্তী হলে পরাজয় নেই, তাঁরা প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতকার্য।

কাজেই, বুঝা গেল যে, যেসব লোক বলে বেড়ায় যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে না, আল্লাহ্‌র অলিগণ সাহায্য করতে পারেন না। তারা কুরআন পাকের এ আয়াতকে অস্বীকার করে। তারা জানেনা যে, কুরআন পাকে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন– তোমাদের বন্ধু, তোমাদের সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ।

**প্রসঙ্গতঃ** এক আয়াতে এরশাদ হচ্ছে– "আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই।" আর এখানে এরশাদ হচ্ছে, "তোমাদের দোস্ত, তোমাদের মদদগার হল আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রাসূল ও মু'মিনগণ।" বাতিল ফিরকার লোকেরা মুসলমানদেরকে গোমরাহ করে থাকে এ বলে যে, 'এটা তো ক্বোরআন শরীফেরই আয়াত। এতে এরশাদ হচ্ছে– আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদেরকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।'

**বস্তুতঃ** এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে– আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় এসে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যদি কাউকে সাজা দিতে চান তবে কারো শক্তি নেই যে, সে সাজা দূরীভূত করবে। আর যদি আল্লাহ্‌ কাউকে কিছু দান করতে চান তবে কেউ এতে বাধা দিতে পারে না। 'মিন্‌দূনিল্লা' মানে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় এসে কাউকে কিছু প্রদান করা। এটা হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেছেন, ''আমার মোকাবেলায় এসে কাউকে সাহায্য করতে পারে না।''

আমরা যখন এ পৃথিবী থেকে পরলোকে চলে যাই, পেছনে তখন মুসলমানগণ ঈসালে সাওয়াব করে থাকে। কুরআন ইত্যাদি পড়ে আমাদের রূহে সাওয়াব পৌঁছায়, (এতে মুসলমানগণ উপকৃত হয়।) কিন্তু আউলিয়া-ই কেরাম যাঁরা মাযার সমূহে রয়েছেন, তাঁরা সেখান থেকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উপকার করেন, তাদের সাহায্য করেন। তাঁরা শারীরিকভাবে পরপারে স্থানান্তর গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁদের রূহানী সাহায্যদান খতম হয় না। সেটার ধ্বংস নেই। সেটা স্থায়ী। সুতরাং বাতিল ফির্কার বিভ্রান্তির ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। তারা কুরআন করীমকে এমনিভাবে জনসমক্ষে উপস্থাপন করে থাকে, যাতে সরলপ্রাণ মুসলমানগণ তাদের খপ্পরে পড়ে যায়। এজন্য উচিৎ যদি কেউ এ ধরণের বিভ্রান্তিমূলক কথা শুনেন তবে তৎক্ষণাৎ নিজেদের (হক্কানী সুন্নী) আলেমদের নিকট চলে যাওয়া এবং তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা করে নেয়া- কুরআন তো এমন বলেছে, এর সহীহ ব্যাখ্যা কি? তখন তাঁরা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবেন। নতুবা এ সব লোকের খপ্পরে (চক্রান্তে) পড়লে নিজেদের পরিণাম বরবাদ হবার আশংকা খুব বেশী।

কুরআন পাক বুঝাতো এতো সহজ কাজ নয়। একদা একজন বড় আলিম ও ইমামের নিকট এক ব্যক্তি এসে অনুমতি চেয়ে বললো, ''আমি আপনার সামনে কুরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত করবো, এর একটা আয়াত পড়বো, তারপর সেটার তরজমা (অর্থ) বলবো এবং তাফসীর করবো।"

তিনি বললেন "না, তোমার জন্য এর অনুমতি নেই।" অতঃপর সে বললো, ''তবে আমি একটা হাদীস শরীফ পাঠ করবো এবং তার তরজুমা করবো।"

তখন তিনি (ইমাম সাহেব) বললেন, ''না, তোমার জন্য অনুমতি নেই।" অতঃপর উপস্থিত লোকেরা বললো, ''হুযূর, যদি লোকটা ভুল বলতো তবে আপনি শুদ্ধ করে দিতেন। তবে তো তখন বুঝাতে পারতেন। তা না করে একেবারে অনুমতিই দিলেন না। এর কারণ কি?"

তিনি বললেন, "কথা হচ্ছে লোকটা বদ-আক্বিদা (ভ্রান্ত আক্বিদার অনুসারী), তার নিকট থেকে কিছু শুনে যদি আমার ঈমানে অণু পরিমাণ পার্থক্যও আসে তবে আমি তো বরবাদ হয়ে যাবো। আমি তো ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমর্জ্জিত হয়ে যাব। কাজেই তার থেকে কুরআনের আয়াত শ্রবণ করার কি প্রয়োজন আছে? এ বদ-আক্বীদার নিকট থেকে হাদীস শুনার প্রয়োজনই বা কি? আমার কোন প্রয়োজন নেই।" এটাই সঠিক পন্থা যে, বদ-আক্বীদা লোকদের থেকে দূরে সরে থাক এবং সৎ লোকদের সঙ্গ অবলম্বন কর। তাদের সঙ্গী হয়ে যাও। (কারণ, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং মু'মীনগণ তো সৎ লোকদেরই বন্ধু)। আল্লাহ্ এরশাদ ফরমাচ্ছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধু, তোমাদের সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মীনগণ আর যারা আল্লাহ্ কে, আল্লাহ্র রাসূলকে এবং নামায, যাকাত আদায়কারী এবং রুকু'কারী, মু'মিনগণকে ভালবাসে তাঁরাই আল্লাহ্র দল। আর আল্লাহ্র দলই বিজয়ী। তাঁরাই আল্লাহ্র জমা'আত, তাঁরা সর্বত্র বিজয়ী থাকবেন।[৮০০]

৮০০. নূরানী তাকরীর, পৃ. ২৬-৩৯

## تقریر-۵

### اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم-
### بسم اللہ الرحمن الرحیم-

**الم بشرح لک صدرک- ووضعنا عنک وزرک- الذی انقض ظہرک- ورفعنا لک ذکرک- فان مع العسر یسرا- ان مع العسر یسرا- فاذا فرغت فانصب- والی ربک فارغب- (انشراح: ۱ - ۸)**

صدق اللہ مولنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم-
ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین - والحمدللہ رب العالمین-

اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے-"الم نشرح لک صدرک" کیا نہیں کھولا ہمنے آپ کیلئے آپکا سینہ-"ووضعنا عنک وزرک الذی" اور اٹھالیا ہمنے آپ سے وہ بوجھ- "انقض ظہرک" جس بوجھ نے آپکے پشت کو بوجھل کردیا تھا-"ورفعنا لک ذکرک" اور بلند فرمایا ہمنے آپکے ذکرکو- آپکی شان کو"فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا" بیشک ہر مشکل پر اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے-"فاذا فرغت فانصب" اور جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہوجائیں تو ریاضت میں مشغول ہوجائیں"والی ربک فارغب" اور آپکے رب کی طرف متوجہ ہوجائیں-اس سورہ مبارک میں اللہ پاک حضور کریم ﷺ کو تسلی دے رہا ہے-اس سورہ کا اس وقت نزول ہوا تھا جس وقت حالت یہ تھی کہ مکہ کے بچہ بچہ حضور کریم ﷺ کا دشمن تھا- ہر شخص تکلیف دینے کیلئے، پریشان کرنے کیلئے سینہ سپر تھا ایسی حالت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضور کریم ﷺ کو تسلی دی-ارشاد فرمایا کہ "الم نشرح لک صدرک" کیا نہیں کھولا ہمنے آپ کیلئے آپکا سینہ، یہ جو بار نبوت ہے یہ جو امانت ہے اسکو تو زمیں وآسمان نہیں اٹھا سکے،اس .................کو حضور کریم ﷺ نے اٹھایا، کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپکے سینہ مبارک کو کشادہ فرمادیا تو آپ نے اس عظیم بوجھ اٹھایا- اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بوجھ جسنے آپکے پشت کو بوجھل کردیا تھا اتنا عظیم بوجھ اتنی عظیم ذمہ داری آپ پر جو ڈالی گئی آپ نے اس ذمہ داری کو اٹھایا-"ورفعنالک ذکرک" اور بلند فرمایا ہمنے آپکے ذکرکو- جب جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے آپکی

شان کو بلند فرمایا، کیسا بلند فرمایا؟ حضور کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری شان کو کیسا بلند فرمایا، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ انے آپکی شان کو اسقدر بلند فرمایا کہ جہاں اللہ تبارک وتعالیٰ کا نام لیا جائیگا، جہاں اللہ تبارک وتعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں آپکا ذکر ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا آپ پر درود شریف بھیجو اور آپکی اطاعت کرو، فرمایا ''من یطع الرسول فقد اطاع اللّٰہ'' یعنی جسنے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضور کریم ﷺ کی شان کو بلند فرمایا اب کس کی طاقت ہے کہ آپکی شان کو پست کر سکے، جو بدنصیب لوگ ہیں وہ قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، اسلئے دیکھتے ہیں کہ انکو ایسی کوئی آیت مل جائے، ایسی کوئی روایت مل جائے، ایسی کوئی حدیث مل جائے، جسکے ذریعے وہ لوگوں کے سامنے حضور کریم ﷺ کی شان کو گھٹا سکیں وہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک وتعالیٰ جسکی شان کو بلند فرمایا ہے کسکی طاقت ہے اسکی شان کو گھٹائے؟ ''فان مع العسر یسرا'' پس اسوقت آپ پر جو مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں آپکے صحابہ پر اتنی تکلیفیں ہیں، لوگ دشمن ہیں یہ تھوڑے دنوں کیلئے ہیں، عنقریب یہ لوگ مدعی اسلام بن جائینگے، یہی لوگ آپکے غلام بن جائینگے اور یہی ہوا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد وہی جو کافر تھے خونخوار تھے وہی لوگ غلام ہوگئے وہی دین کے عالم بردار بنگئے۔ ''فاذا فرغت فانصب'' اور جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہوجائے تو ریاضت میں مشغول ہوجایئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ریاضت اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کریم ﷺ کو ارشاد فرماتا ہے کہ آپ جب فرض نبوت سے فارغ ہوجائیں تب ریاضت میں مشغول ہوجائیں۔ یہ جو آپکو طریقت کا سبق دیا جارہا ہے یہ درود شریف، یہ صلوۃ اوابین یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ انہیں سے انسان کی ترقی ہوتی ہے اور انسان کی معراج اسی سے ہوتی ہے اور انسان کے دنیا میں آنیکا مقصد اسی سے حاصل ہوتا ہے انسان کی درجات بلند ہوتے ہیں اور یہ جو اسباق ہیں، اوراد ہیں انکو نہایت محبت کے ساتھ نہایت خلوص کے ساتھ ادا کئے جائیں۔ اس میں بڑا مقصد ہے اور جب اللہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ''فاذا فرغت غانسب'' اور جب آپ فارغ ہوجائیں فرائض نبوت سے تو ریاضت میں لگ جائیں۔ ''والی ربک فارغب'' اور اپنے رب کی طرف متوجہ جائیں۔ اللہ ہمکو، آپکو ان ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امین

## বক্তৃতা নং- ৫

অনুবাদ: আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিচ্ছি, যিনি সর্বজ্ঞ সর্বশ্রোতা, বিতাড়িত শয়তান থেকে। আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

(আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন- আমি কি প্রশস্থ করিনি আপনার জন্য আপনার বক্ষকে? এবং নামিয়ে নিয়েছি আমি আপনার নিকট থেকে ওই বোঝা, যে বোঝা আপনার পৃষ্ঠ মোবারককে ভারী করে দিয়েছিল এবং আপনার শানকে বুলন্দ করেছি।

নিশ্চয় প্রত্যেক কষ্ট ও প্রত্যেক অস্বস্থির সাথে স্বস্থি রয়েছে এবং প্রত্যেক মুশকিল ও প্রত্যেক অস্বস্থির সাথে স্বস্থি রয়েছে। যখন কর্তব্যাদি থেকে অবসর গ্রহণ করবেন, তখন ইবাদতের অনুশীলনের মধ্যে রত হয়ে যান এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশকারী হয়ে যান। (সূরা ইনশিরাহ : ১-৮)

**তাফসীর :** এ সূরা মোবারকের মধ্যে আল্লাহ্‌্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা প্রদান করেছেন। এ সূরা তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন মক্কা মোকার্‌রমার লোকেরা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রু ছিল। তারা তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য, তাঁকে পেরেশান করার জন্য তৎপর ছিল। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্‌্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা প্রদান করেন এবং এরশাদ করেন, আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করিনি? নুবূয়তের বোঝা, আমানত, এমনি দায়িত্বভার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বহন করেছেন। কেননা, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর বক্ষ মোবারককে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি এ মহান দায়িত্বভার বহন করেছেন। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফরমাচ্ছেন যে, ওই দায়িত্বভার, যা তাঁর পৃষ্ঠ মোবারককে ভারী করে দিয়েছিল, এমন মহান জিম্মাদারী, যা তাঁরই উপর দেয়া হয়েছে, তিনি সেটা যথাযথভাবে পালন করেছেন। ইরশাদ করছেন, ''এবং সমুন্নত করেছি আমি আপনার স্মরণকে।" যখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হি সালাম তাঁর পবিত্র দরবারে হাযির হলেন, তখন আরয করলেন, ''হে আল্লাহ্‌্র রাসূল! আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফরমাচ্ছেন যে, আল্লাহ্‌্ তা'আলা আপনার মর্যাদা, আপনার শানকে কেমন সমুন্নত করছেন?" হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, ''আল্লাহ্‌ই জানেন যে, আমার সম্মান কত সমুন্নত।" তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হি সালাম আরয করলেন, ''আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনার শানকে এ পরিমাণ সমুন্নত করেছেন যে, যেখানে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নাম নেওয়া হবে সেখানে আপনার নামও নেওয়া হবে। যেখানে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার স্মরণ করা হবে সেখানে আপনাকেও স্মরণ করা হবে। যেমন (আযানে, খোৎবায়, নামাযে) সর্বত্র যেখানেই আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নাম নেয়া হবে সেখানে আপনার নামও স্মরণ করা হবে।" আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফেরেশতাগণ ও মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা আপনার উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রাসূলের আনুগত্যকে তাঁরই অনুগত্য হিসেবে গণ্য করেছেন। যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ করেন, ''যে ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করেছে, সে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার আনুগত্য করেছে।" সুতরাং যেখানে

আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি  ওয়াসাল্লাম-এর শানকে বুলন্দ করেছেন, সেখানে কার শক্তি আছে যে, তাঁর শানকে ক্ষুন্ন করতে পারে? কেউ একথা চিন্তাও করতে পারে না। কিন্তু যারা বদ-নসীব, এ অপকর্মে লেগে থাকে এবং কুরআন পাক তেলাওয়াত করতে থাকে, কিতাব পর্যালোচনা করে থাকে, তাও এ জন্যই করে যে, এমন কোন আয়াত পাওয়া যায় কিনা, এমন কোন হাদীস পাওয়া যায় কিনা, যা দিয়ে তারা মানুষের সম্মুখে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানকে ক্ষুন্ন করতে পারে। এমন বদ-নসীব লোকও পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যাঁর শানমান সমুন্নত করেন, তাঁর শানমানের হানি ঘটাতে পারে এমন কার শক্তি আছে (কারো নেই।)

অতঃপর ওই সময় (হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি  ওয়াসাল্লাম) আপনার উপর (মক্কার লোকদের পক্ষ থেকে) এতসব মুসীবৎ এসেছে, কষ্ট এসেছে, আপনার সাহাবা-ই কেরামের প্রতিও এতসব কষ্ট পৌঁছেছে, লোকেরা শত্রুতা প্রদর্শন করছে, তবে এগুলো অতি অল্প দিনের জন্যই। অনতিবিলম্বে এসব লোক ঈমানের দাবীদার হয়ে যাবে, এসব লোক ইসলামের দাবীদার হয়ে যাবে, এরা আপনার গোলাম হয়ে যাবে। অনুরূপই হয়েছে বাস্তবে। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ওই লোক, যারা কাফির ছিল, যারা রক্তের পিপাসু ছিল, তাঁরাই আপনার গোলাম হয়ে গেছে। ওই সব লোক-ই দ্বীনের পতাকাবাহী হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি যখন নুবূয়তের দায়িত্বাবলী থেকে অবসর গ্রহণ করবেন তখন রিয়াযত (এবাদত)- সাধনায় মশগুল হয়ে যাবেন।

সুবহানাল্লাহ! এ রিয়াযত (এবাদত-সাধনা) এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন, ''আপনি যখন নুবূয়তের দায়িত্ব পালন করে অবসর হোন, তখন রিয়াযতে মশগুল হয়ে যানে।"

এ যে আপনাদেরকে তরীক্বতের সবক দেয়া হচ্ছে, এ যিক্‌র দুরূদ শরীফ, এ সালাতে আওয়াবীন- এগুলো এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু যে, এগুলো দ্বারা মানুষের উন্নতি হয়। ইনসানের মে'রাজ তো এ থেকেই হয়। আর মানুষের দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্য এ থেকেই হাসিল হয়, মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

আর এ যে সবকসমূহ রয়েছে, তসবীহ–তাহলীল, ওযীফা, সেগুলো যেন অতি মুহাব্বতের সাথে আদায় করা হয়, অতীব নিষ্ঠার সাথে যেন পালন করা হয়। এ'তে বড় উদ্দেশ্য রয়েছে। আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন, "এবং যখন আপনি অবসর পাবেন নুবূয়তের দায়িত্বাবলী পালন করার পর, তখন এর মধ্যে লেগেই থাকুন এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন।" অর্থাৎ নবুয়তের গুরু দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে ইবাদত রত হয়ে যান। আল্লাহ্ আমাদেরকে, আপনাদেরকে আমল করার শক্তি দান করুন। [৮০১]

৮০১. *মাসিক তরজুমান*, জ্বিলক্বদ সংখ্যা, ১৪১৯ হিজরী, পৃ. ১০-১১

## ৯.৫ ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র পত্রাবলী

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র বাংলাদেশে আগমন করতেন বছরে একবার কিংবা দু'বার আবার মাঝে মধ্যে দু'এক বছর আসতে পারেন নি। তাই তিনি ভক্ত, মুরীদ অনুসারী বিশোষত: আনজুমান কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন চিঠি পত্রের মাধ্যমে এবং পত্রের মাধ্যমেই- তিনি প্রয়োজণীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুনের ভাইদের কাছে প্রেরিত পত্রের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও ইত:মধ্যে তাঁর ৭২ টি মূল্যবান পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং আনজুমান রিসার্চ সেন্টারে ঐ সমস্ত পত্র সংরক্ষিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা ছিল না বলে ঐ সমস্ত পত্রই ছিল মুরীদানদের যোগাযোগের অবলম্বন। তিনি মুরীদদের নিকট পত্র নিজেও লিখতেন আবার তাদের প্রেরিত পত্রের উত্তরও দিতেন। কিছুদিন পর পর চিঠি আসত। চিঠির খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত আর মুহুর্তে সবাই একত্রিত হয়ে ঐ চিঠির ভাষ্য জানার জন্য। একজন বিজ্ঞ ও উর্দূ ভাষায় দক্ষ আলেম দিয়ে চিঠি পাঠ করা হতো। আর সবাই নিশ্চুপ মনে গভীরভাবে শুনতেন পঠিত চিঠি। তার পর শুরু হতো চিঠির উপর আলোচনা পর্যালোচনা তার প্রেরিত পত্রাবলীতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মীয়, শরী'আত, তরিকতের আলোচনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীও চলে আসত।

অধিকাংশ পত্রের বিষয়বস্তু ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত এবং পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম; কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা সহ অন্যান্য মাদ্‌রাসার লেখাপড়ার খোজ-খবর নেয়া এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান। তাঁর পবিত্র হস্তে লিখিত কয়েকটি পত্র বঙ্গানুবাদ সহ উপস্থাপন করার প্রয়াস পেলাম :

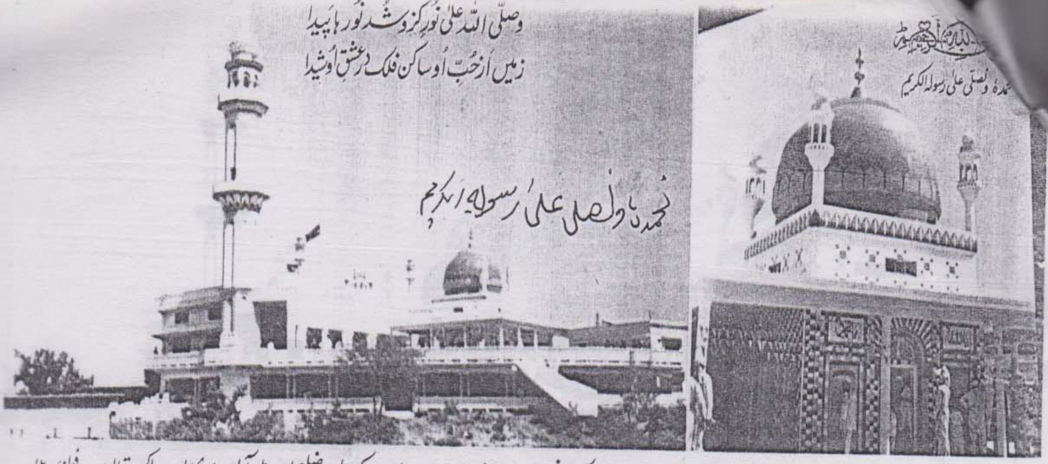


دربارِ عالیہ قادریہ سیّد آباد شریف (شتالو) پوسٹ۔ سرکوٹ، ضلع ایبٹ آباد، ہری پور، پاکستان۔ فون ۱۲

بخدمت جناب الحاج محمد محسن صاحب و احمد حسن صاحب و جملہ احباب اہل بیت و خانقاہ شریف سلمکم اللہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

خیریت طرفین مطلوب ہے: آپکا محبت نامہ وصول ہوا انتہائی خوشی حاصل ہوئی کہ یہ انجمن یہ جلوس
یہ مدرسے یہ خانقاہیں شریعت و طریقت کے باغیچے ہیں یہ سب حضور کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم
کے گنبد نور کے نور سے روشن ہیں طالب و پیاسے و محتاج آتے ہیں سیراب و فیضیاب ہو
ہوکر واپس لوٹتے ہیں مے طیبہ سے (مدینے سے) منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے
توحید کی مے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے
یہ باغیچے قیامت تک جاری رہیں عاشقوں کا جمگھٹا قائم رہے اس عظیم مقصد و عظیم نعمتوں کے
خدمات سے بھائی محروم نہ ہوں اسلئے باہمی اتفاق و محبت کی ضرورت ہے سب بھائیوں کو ساتھ
لیکر چلنا ہے تاکہ اللہ رسول راضی ہوں اور اس عظیم الشان مقصد میں کامیابی نصیب ہو
کام بگاڑنا تو آسان ہے لیکن موقعہ سنبھالنا کام کو بنانا جس کے ذریعے اللہ رسول راضی ہوں
یہ اولوالعزم اور سعادتمندوں کا کام ہے بھائیوں کو ہمت حوصلہ دیجئے اللہ رسول کی رضامندی نصیب ہو
آپ سبکو مبارک ہو کہ محمد صابر کی شادی ڈاکٹر جمیل الرحمن صاحب کی لڑکی سے [illegible]
اطلاع دیجائیگی انشاء اللہ سب کی حواہش بھی [illegible] سے سر انجام پائے [illegible]
کالو گھاٹ میں درس نظامی سے بہت بڑا مقصد پورا ہو جائیگا مولانا عبد الرحمن صاحب کیساتھ مولانا [illegible]
کو بھی خصوصی توجہ دینی ہوگی آپ بھائیوں نے بہت اچھا کیا کہ مولانا عبد الجلیل صاحب کو [illegible] جا کر
انکو حسب سابق پرنسپل مقرر کیا جزاک اللہ

محمد صابر شاہ کی کامیابی کے سلسلے میں آپ بھائیوں کے ٹیلیگرام ٹیلیفونوں اور محبت ناموں کے
ذریعے مبارکبادیاں اور خوشیوں کا اظہار وصول ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھائیوں کے
خلوص و محبت قبول فرمادے آمین صابر کو دین اسلام کی مزید خدمات کا موقعہ میسر ہو اور قبول ہو
نصیب ہوا عالم اسلام پر ہر طرف سے یلغار شروع ہے واقعات بنگلہ دیش بھی اسی سازش کا
کڑی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائیگا
عروج اسلام شروع ہو چکا ہے کافر اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکیں گے ان شاء اللہ
وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ
انشاء اللہ بنگلہ دیش سے اسلام چھیننا چاہتے ہیں یہ اسکی بھول ہے
مسلمان بیدار ہو چکا ہے انشاء اللہ ان کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی
انوار الحسن صاحب کو بچی کی ولادت کیلئے مبارکباد
صحت کاملہ و عمر نصیب ہو
آپکے جملہ اہل بیت و احباب و برادران طریقت و سلسلہ کے بہنوں
و بچیوں کو دعائیں و سلام علیکم قبول ہو سب کو دونوں جہاں کی عزت
کاہر شاہ و محمد صابر و محمد قاسم و محمد کو نصیب ہو آمین ثم آمین
سلام علیکم قبول ہو از کراچی صحت اچھی ہے دعا کی التجا

محمد طالب خوشنود
۱۱ جمادی الثانی ۱۴۱۰ھ
۲۹ دسمبر ۱۹۹۰ء

## পত্র নং-১

নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা হাবীবিহিল কারীম

প্রতি,
জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন সাহেব,
আহমদ হাসান সাহেব,
সমস্ত বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের সদস্যবৃন্দ
এবং খানকাহ্ শরীফের সাথে সংশ্লিষ্টগণ!
মহান আল্লাহ আপনাদেরকে শান্তিতে রাখুন!

আস্ সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

উভয়পক্ষের মঙ্গলকাম্য! আপনার মহব্বতনামা (চিঠি) পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। সমাচার, এই আন্জুমান, এই জুলূস, এ মাদ্‌রাসাগুলো এবং এই খানকাহ্‌গুলো হচ্ছে শরীয়ত ও ত্বরীক্বতের বাগিচা। এ সবই হুযূর-ই করীম রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র সর্বাধিক নূরানী বক্ষের নূর দ্বারা আলোকিত। প্রার্থী ও মুখাপেক্ষী (অভাবী) লোকেরা (অভাব মোচনের প্রার্থনা) নিয়ে আসে, কিন্তু তৃপ্ত, ফয়যপ্রাপ্ত ও ধন্য হয়ে ফিরে যায়। (কবি বলেন-)

অর্থাৎ: মদীনা তৈয়্যবাহ্ থেকে সংগ্রহ করা হয়, বক্ষগুলোতে গোপন রাখা হয়;

তাওহীদের সূধা পেয়ালা দ্বারা নয়,
বরং দৃষ্টি দ্বারা পান করানো হয়।

এসব বাগান ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী (চালু) থাকবে। আশিক্বদের ঔজ্জ্বল্য কায়েম থাকুক। এসব বড় বড় উদ্দেশ্য ও নিয়ামাতের খিদমত থেকে যেন ভাইয়েরা বঞ্চিত না থাকে। এ জন্য চাই পারস্পরিক ঐক্য ও ভালবাসা। সব ভাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে; যাতে আল্লাহ ও রসূল সন্তুষ্ট হন এবং এ মহান উদ্দেশ্যে সাফল্য নসীব হয়।

কোন কাজকে বিনষ্ট করে দেয়া সহজ, কিন্তু সময় মত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া, যথাসময়ে কর্ম সম্পাদন করা; যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ ও রসূল সন্তুষ্ট হন, মাশায়িখ হযরাত সন্তুষ্ট হন, দৃঢ় প্রতিষ্ঠ ও সৌভাগ্যবানদের কাজ। ভাইগণ সদা-সর্বদা আল্লাহ-রসূলের সন্তুষ্টি লাভ করুন- এ দু'আ করছি। আমীন (আল্লাহ্ কবূল করুন)।

কালুরঘাটে দরসে নেযামী অনুসারে শিক্ষাদান ও গ্রহণের ব্যবস্থা দ্বারা অতি বড় উদ্দেশ্য পূরণ হবে। মাওলানা আবদুর রহমান ও মাওলানা নঈমী সাহেবকে এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।...

মুহাম্মদ সাবের শাহ্‌র সাফল্যের পরম্পরায় আপনাদের টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও চিঠিপত্র মারফত অভিনন্দন ও আনন্দানুভূতি পেয়েছি। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনারা ভাইদের নিষ্ঠা ও ভালবাসা কবূল করুন! আমীন!! সাবের শাহ্'র দ্বীন-ইসলামের অধিক খিদমত করার সুযোগ হোক! কবূলিয়াত লাভ করে ধন্য হোক। আমীন!

ইসলামী বিশ্বের উপর চতুর্দিক থেকে হামলা হচ্ছে। দেশের (অনাকাঙ্খিত) ঘটনাবলীও ওইসব চক্রান্তের শিকলে গাঁথা। (চিন্তার কারণ নেই)

অর্থাৎ : ঈমানের নূর কুফরের নড়াচড়ায় আরো বেশি আলোকোজ্জ্বল হয়; এ প্রদীপ মুখের ফুৎকারে নেভানো যাবে না।

ইসলামের উন্নয়ন আরম্ভ হয়েছে। কাফির এর পথে অন্তরায় হতে পারবে না। চিন্তা করবেন না (আল্লাহ  পাক এরশাদ ফরমাচ্ছেন- আর তোমরা কি চাইবে, কিন্তু ওটাই যা আল্লাহ, সারা বিশ্বের প্রতিপালক চান।)

আনোয়ার হোসেন সাহেবের কন্যা তার পিতা-মাতার জন্য মুবারক হোক। পূর্ণ সুস্থতা দীর্ঘজীবন লাভ করুক!

আপনার পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ত্বরীক্বতের ভাইগণ, সিলসিলার বোন ও মেয়েদের সবাইকেও দো'আ জানাচ্ছি। সবাইকে সালাম। উভয় জাহানের সম্মান লাভ করে সবাই ধন্য হোক!

তাহের শাহ্, মুহাম্মদ সাবের শাহ্ ও মুহাম্মদ হামেদ শাহ্'র সালাম দিন! আমি সুস্থতর হতে চলেছি। চিন্তা করবেন না।

দস্তখত

মুহাম্মদ তৈয়্যব
গুফিরা লাহূ
১১ জুমাদাস্ সানী ১৪৯০ হিজরী/২৯ ডিসেম্বর ১৯৯০

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا
زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا

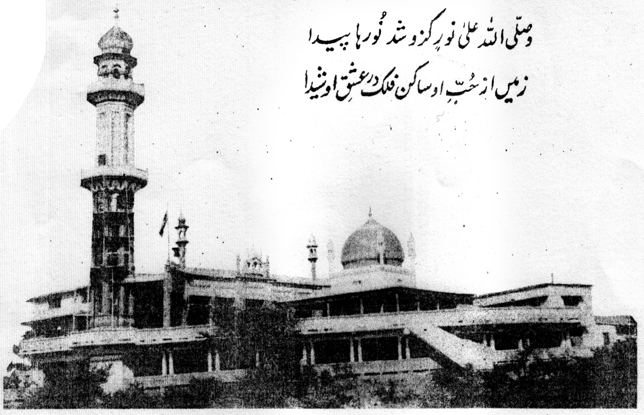

دربار عالیہ قادریہ سید آباد شریف - (شتالو) پوسٹ سرکوٹ - ضلع ایبٹ آباد - ہری پور - پاکستان - فون ۱۲

حامداً ومصلیاً

بخدمت جناب الحاج محمد اشرف علی صاحب سلمہ الرحمن

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

خیریت طرفین مطلوب ہے۔ کراچی محمد صدیق کے پاس جو تین ہزار کی رقم امانت تھا وہ
رقم آپ نے مجھے دیا تھا لیکن یہ پوچھنا تھا کہ اس رقم کو کہاں خرچ کرنا ہے اس رقم کے متعلق مجھے
آگاہ کیا جائے شکریہ حاجی زکریا صاحب نے مدرسہ کے متعلق کاغذات بھیجے ہیں یا نہیں
چیئرمین صاحب کی صحت کیسی ہے اسکے متعلق بھی مطلع کریں جامعہ کے تعلیمی حالات کیسے ہیں
اور چندہ حاصل کرنے کیلئے پارٹی کے شکل میں چندہ مانگا جائے اس میں برکت
ہوگی ہے۔ چیئرمین صاحب بیمار ہیں حاجی سراج الاسلام صاحب بھی رخصت ہوئے ہیں اب بھائیوں پر
ذمہ داریاں بڑھ گئیں ہیں اللہ تبارک وتعالی بھائیوں کو محبت واتفاق نصیب فرمادے
تاکہ سب بھائیوں کے پاس اللہ و رسول کی جو امانت ہے اسکی صحیح خدمت ہوسکے
پرنسپل ابو طاہر صاحب کو سلام علیکم کے بعد واضح ہو کہ بچوں کے تعلیم میں بہت کوشش رکھیں
جاء الحق کو سب کلاسوں میں باری باری سے پڑھائیں تاکہ بچوں کے عقائد صحیح رہیں

اللہ کے فضل سے بنسبت پہلے کے صحت اچھی ہو رہی ہے تسلی رکھیں سب بھائیوں و بہنوں و بچوں کو
دعائیں و سلام علیکم قبول ہو

طاہر شاہ و محمد صابر و محمد قاسم سے سلام علیکم قبول ہو محمد طیب غفرلہ

۱۸ رمضان شریف
۱۴۰۶ھ

**“হামেদান ওয়া মুসাল্লিয়ান”**

তারিখঃ ১৮ রমাদান শরীফ ১৪০৯ হিজরী

প্রতি, জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আশরাফ আলী সাহেব (আল্লাহ তাঁকে শান্তিতে রাখুন)

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

আশা করি উভয় পক্ষ ভাল ও নিরাপদে আছেন। পর সমাচার এই যে, করাচিবাসী মুহাম্মদ সিদ্দিক সাহেবের নিকট তিন হাজার রুপী আমানত রেখেছেন তা তিনি আমার হস্তগত করেছেন। কিন্তু কোথায়/কোন খাতে ব্যয় করব তা স্পষ্ট করেননি। এ ব্যাপারে আমাকে জানালে উপকৃত হব। ধন্যবাদ! হাজী যাকারিয়া (সেক্রেটারী) সাহেব মাদরাসা সম্পর্কিত দলীলের কাগজ-পত্র সমূহ পাঠিয়েছেন কি না অবহিত করলে খুশী হব। চেয়ারম্যান আলহাজ্ব চিনু মিয়ার শারিরীক অবস্থার উন্নতি হয়েছে কি না জানাবেন। জামেয়া কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া মাদরাসার লেখা-পড়ার অবস্থাদি উল্লেখ পূর্বক পরামর্শ দিবেন। মাদরাসার জন্য দলে দলে চাঁদা কালেকশন করার মধ্যে অসীম বরকত নিহীত রয়েছে। চেয়ারম্যান সাহেব অসুস্থ, হাজী সিরাজুল ইসলাম সাহেবও মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই আপনাদের যিম্মাদারী বা দায়িত্ব বেড়ে গেছে। আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে দোয়া করি, ভাইদের মধ্যে আন্তরিক মুহব্বত ও ঐক্য নসীব করেন; আল্লাহ যেন যাতে আপনাদের উপর আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর হাবীবের পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্ব তা যথাযথ নিপুন ভাবে পালন করতে পারেন।

অধ্যক্ষ আবু তাহের সাহেবকে সালাম পেশ করে বলবেন যেন, শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়ার ব্যাপারে অধিক যত্নবান হন। বিশেষ করে “জা'আল হক” কিতাবটি প্রত্যেক ক্লাসে সিলেবাস ভূক্ত করে গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়; যাতে শিক্ষার্থীদের আক্বীদা বিশুদ্ধ হয়।

আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়া ও অনুগ্রহে পূর্বের তুলনায় বর্তমান স্বাস্থ্য ও শারিরীক অবস্থা ভালোর দিকে। এব্যাপারে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। পীর ভাই-বোন এবং ছেলেদেরকে আমার দোয়া ও সালাম জানাবেন। সাথে সাথে (আল্লামা) তাহের শাহ, (আল্লামা) সাবের শাহ ও (আল্লাম) কাশেম শাহ সাহেবের সালামও কবুল করবেন।

তৈয়্যব শাহ

(স্বাক্ষরিত)

# পত্র নং- ৩

﷽

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا
زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا

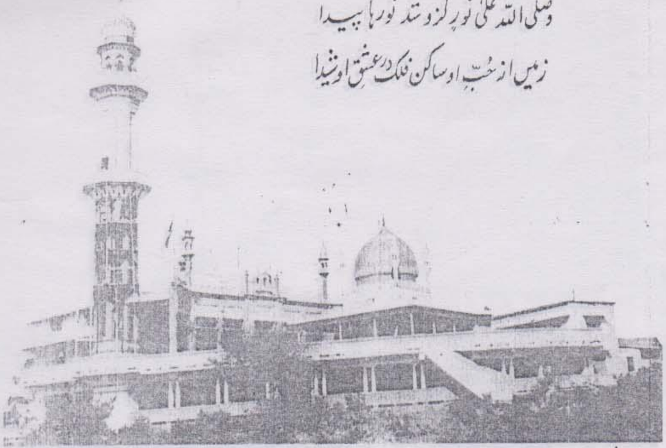

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

دربار عالیہ قادریہ سید آباد شریف – (شتالو) پوسٹ. سریکوٹ – ضلع ایبٹ آباد – ہری پور – پاکستان – فون – ١٢

بخدمت جناب مولانا جلال الدین صاحب پرنسپل جامعہ و مولانا عبید الحق [illegible] صاحب محترم و الحاج محمد محسن صاحب و الحاج محمد [illegible]
و الحاج انوار حسین صاحب و الحاج محمد نذیر احمد صاحب و الحاج سراج الحق صاحب و الحاج عبد الوہاب صاحب قادری و الحاج [illegible]
و الحاج یعقوب علی صاحب و طبیب العالم ابو میاں ذاکر حسین لنشکر صاحب و الحاج محمد مسلم [illegible] صاحب و الحاج [illegible]
و الحاج چودھری سعید احمد صاحب و الحاج تاج الاسلام صاحب و الحاج عبد الحکیم صاحب و الحاج شمس الدین صاحب و الحاج [illegible]
و الحاج ایس اے چودھری صاحب و الحاج رشید الحق صاحب و الحاج غلام سرور صاحب الحاج ڈاکٹر محمد [illegible] صاحب و الحاج ماسٹر [illegible]
بھائیوں کے خطوط سے معلوم ہوا کہ بعض وجوہات کے بنا پر بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جو [illegible]
مسلک کیلئے اور موجودہ دینی ادارے کیلئے اچھی نشانی نہیں ہے ہمیں مناسب ہے کہ ہم اپنی زندگانی میں اخلاص
و محبت و اتفاق و ڈسپلن کا ایسا مثال قائم کریں کہ آئندہ آنے والوں نسلوں کیلئے نشان راہ ہو [illegible]
قیامت تک دینی ادارے انجمن سلسلہ کی خدمات کرنے والوں کیلئے کوئی پریشانی نہ ہو فی الحال تمام ادارے
کمیٹی کو بلا کر جنرل سیکرٹری سے متعلق فیصلہ کریں کمیٹی نے خلوص نیت سے جو فیصلہ [illegible]
انشاء اللہ تین سال کے بعد کمیٹی متفقہ طور پر باکثرت رائے سے جنرل سیکرٹری کے [illegible]
فیصلہ کیا کریں یہ کمیٹی کا کام ہے کہ جنرل سیکرٹری کے حسن کار کردگی پر اسے مزید خدمت کا موقعہ دیں
یا نیا جنرل سیکرٹری مقرر کرے ہر میٹنگ میں ڈھاکہ کے بھائیوں کو بھی بلایا جائے [illegible]
کے ذریعے کریں روس نے افغانستان پر حملہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ڈیمو کریسی [illegible] کا فیصلہ
[illegible] اور انڈیا کو پاکستان پاک ہونے کا بنیاد رکھا انشاء اللہ انڈیا نے بابری مسجد کو گرا دیا اللہ کے غضب
مکمل صحت یاب ہونے تک آپ بھائیوں کے پاس آؤنگا انشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری صحت اچھی ہو رہی ہے
سب بھائیوں و بہنوں کو دعائیں و سلام علیکم قبول ہو
طاہر شاہ و محمد صابر و محمد [illegible] و حامد کے سلام علیکم قبول ہو

محمد طیب عفی عنہ
١٩ جمادی الثانی ١٤١٣ھ
١٢ دسمبر ١٩٩٢ء

প্রতি,
জনাব, মাওলানা জালাল উদ্দিন সাহেব, প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া।
মাওলানা ওবায়দুল হক নঈমী সাহেব মুহাদ্দিস, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন সাহেব, আলহাজ্ব মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন সাহেব, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নযীর আহমদ সাহেব, আলহাজ্ব সিরাজুল হক সাহেব, আলহাজ্ব লোকমান হাকীম সাহেব, আলহাজ্ব এয়াকূব আলী সাহেব, তবিবুল আলম আবূ মিয়া সাহেব, যাকির হোসেন কন্ট্রাক্টার সাহেব, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুসলিম ভূঞা সাহেব, আলহাজ্ব মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব, আলহাজ্ব এস,এ, চৌধুরী সাহেব, আলহাজ্ব রশীদুল হক সাহেব, আলহাজ্ব গোলাম সরোয়ার সাহেব, আলহাজ্ব ডা. মুহাম্মদ হাশেম সাহেব, আলহাজ্ব মাষ্টার আবদুল ক্বাইয়্যূম সাহেব এবং কমিটির সমস্ত কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ!

আস্ সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহূ

সমাচার,
যে কোন কারণেই হোক ভাইদের মধ্যে মতবিরোধ প্রত্যেক দিক থেকে মসলকের জন্য এবং বর্তমান দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য শুভ লক্ষণ নয়। আমাদের উচিৎ হচ্ছে- আমাদের জীবনে নিষ্ঠা, ভালবাসা, ঐক্য ও শৃঙ্খলার এমন উপমা কায়েম করা, যা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মাইল ফলক হয়; যাতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলো, আঞ্জুমান ও সিল্‌সিলার খিদমতকারীদের জন্য কোন দুশ্চিন্তার কারণ না হয়। কমিটি নিষ্ঠাপূর্ণ যেই ফয়সালা করবে, তাই হবে মুবারকবাদ পাবার উপযোগী। পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কমিটির কাজ। জেনারেল সেক্রেটারীর সুন্দর কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে তাঁকে আরো বেশী খিদমত করার সুযোগ দান করা হয়। মিটিং এ ঢাকার ভাইদেরকেও ডাকা হোক। অন্য যে কোন অভিযোগ বা বিষয়ের মীমাংসাও কমিটির মাধ্যমে করাবেন।

রাশিয়া আফগানিস্থানের উপর হামলা করে নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে। ভারত বাবরী মসজিদ শহীদ করে আল্লাহ'র গযবকে দাওয়াত দিয়েছে। আল্লাহ চাইলে, এ অপকর্মটির মাধ্যমে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ভিত্তিই তারা স্থাপন করলো। আল্লাহ্'র অনুগ্রহ ও বদান্যতায় আমার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। পূর্ণ সুস্থতা অর্জিত হলে আপনারা ভাইদের নিকট আসবো- ইন্ শা আল্লাহ্!
তাহের শাহ্, মুহাম্মদ সাবের শাহ্, মুহাম্মদ কাসেম শাহ্ ও হামেদ শাহ্র সালাম গ্রহণ করুন! সকল ভাইবোন ও শিশুদের প্রতিও দু'আ সালাম রইলো।

দস্তখত:
মুহাম্মদ তৈয়্যব
গুফিরা লাহু
১৯ জুমাদাস্ সানী, ১৪১৩হিজরী
১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২ ইংরেজী

**পত্র নং - ৪**

নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু 'আলা হাবীবিহিল কারীম

প্রতি-

মাওলানা ওবাইদুল হক নঈমী,

মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

তবীবুল আলম আবূ মিয়াঁ, আলহাজ্ব মুহাম্মদ যাকারিয়া, আলহাজ্ব মহসিন সাহেব, আলহাজ্ব আনোয়ার হুসাইন সাহেব, আলহাজ্ব লোকমান হাকীম সাহেব, আলহাজ্ব নযীর আহমদ সাহেব, আলহাজ্ব সিরাজুল হক সাহেব, আলহাজ্ব শামসুদ্দীন সাহেব, আলহাজ্ব আবদুর রব সাহেব, আলহাজ্ব যাকির হোসেন কন্ট্রাক্টর সাহেব, আলহাজ্ব মুসলিম ভূঁইয়া সাহেব, আলহাজ্ব সালেহ আহমদ সাহেব, আলহাজ্ব ইয়াকূব আলী সাহেব, আলহাজ্ব গোলাম সারওয়ার সাহেব, আলহাজ্ব আইয়ূব আলী সাহেব, আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ সাহেব, আলহাজ্ব আবদুর রহীম সাহেব, আলহাজ্ব এস এ চৌধুরী সাহেব, আলহাজ্ব মুস্তাফীযুর রহমান সাহেব, মুহাম্মদ রশীদুল হক সাহেব, .আলহাজ্ব নুরুল আমীন সাহেব, ডা. মুহাম্মদ হাশেম সাহেব, আলহাজ্ব শামসুল আলম সওদাগর সাহেব, শেখ নাসির উদ্দীন আহমদ, মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শরীফ সাহেব...মাস্টার আবদুল ক্বাইয়ূম সাহেব, আবুল হায়াত চৌধুরী, আলহাজ্ব আহমদ হুসাইন আমীন, আলহাজ্ব লুৎফুল কবীর, আলহাজ্ব আবদুল জাব্বার সাহেব, আশফাক্ব আহমদ এবং ত্বরীক্বতের অন্যান্য ভাইবৃন্দ-

আস্ সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহূ

এবং আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করবেন তাকে, যে তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শক্তিমান ও সবার উপর বিজয়ী। (আল কুরআন)

এই বরকতময় আয়াতে রব্বুল ইয্‌যত দ্বীনের খিদমতকারীদের সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ'রই জন্য সমস্ত প্রসংসা ও কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যে বান্দার সাথে সাহায্য করার ওয়াদা করেন, ওই বান্দার আর কী চাই? আল্লাহ'র এ সাহায্য এ দুনিয়ায় ও আলম-ই বরযখ কবরে, হাশরে, পুলসেরাত্বেও প্রতিটি জায়গায় শামিল থাকবে। এ দুনিয়ায়ও যে ব্যক্তি সৎ নিয়্যতে, নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের খিদমত করবে, তার অবস্থা দিন দিন উন্নতি করতে থাকবে, বরযখ এবং ক্বিয়ামতেও মান সম্মান নসীব হবে। ইন্‌শা আল্লাহ। আমেরিকা ও ইউরোপ এবং পৌত্তলিক হিন্দু ও ইহুদিরা ইসলামকে ভয় করে। তাদের কথা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের হাতে হুযূর মুস্তফার দামান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয়। তারা মুসলমানদের থেকে কিছু ভাতাভুক এজেন্ট হয়ে গেছে। তারা মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা ছড়াচ্ছে। তারা কুরআনে পাকে শব্দগত ও অর্থগত তাহরীফ (পরিবর্তন-পরিবর্ধন) আরম্ভ করেছে। হুযূর মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র মানহানির অপচেষ্টায় তৎপর হয়ে ওঠেছে। আল্লাহ'র পথে প্রচেষ্টা থেকে লোকজনকে বিমুখ করে তুলছে।

বস্তুত শরী'আত ও তরীকতের খিদমতগুলোই দ্বীনের খিদমত। সহীহ ওলামা-ই দ্বীন (যাঁরা হুযূর আলায়হিস সালাম-এর গোলাম)-এরই সমগ্র দুনিয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ্‌কেই তালাশ করে বেড়াচ্ছে; তাদের মধ্যে এর তৃষ্ণা বিদ্যমান। সাচ্চা ওলামা তৈরি করে দ্বীনের পতাকা দুনিয়ায় উড্ডীন করুন।

শরীয়ত ও তরীকতের প্রতি যাদের তৃষ্ণা রয়েছে, তাঁদের দৃষ্টি জামেয়ার প্রতিই নিবদ্ধ। তাদেরকে উৎসাহিত করুন!

জামেয়ার খিদমত হচ্ছে দ্বীনের খিদমত। সুতরাং জামেয়ার খিদমত থেকে যেন কোন ভাই গাফিল (উদাসীন) না হয়; যাতে উপরোল্লখিত আয়াত অনুসারে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সাহায্য সব সময় পেতে থাকে। আলহাজ্ব তাজুল ইসলাম সাহেব, মাওলানা নঈম উদ্দীন সাহেব, মুহাম্মদ দিদারুল আলম চৌধুরী সাহেব, আলহাজ্ব আবদুল মালেক সাহেব, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেব, ফযল আমীন সাহেব, হাজ্বী আবদুল আলীম সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার লাল মিয়াঁ, ইঞ্জিনিয়ার নূর মুহাম্মদ সাহেব এ নশ্বর পৃথিবী থেকে স্থায়ী জগতের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন। আমি অত্যন্ত শোকাহত হয়েছি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রা-জিউন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করুন। তাদেরকে দয়া করুন! জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন! এঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ভাই। তাঁরা দুনিয়ায় শরীয়ত ও তরীকতের খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। খিদমত করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

সর্বসম্মতিক্রমে ভাইয়েরা জেনারেল সেক্রেটারি'র নাম প্রস্তাবিত করা বড় সম্মানের ব্যাপার। তাঁর নিয়োগকে আল্লাহ তা'আলা মুবারক করুন। তিনি যেন জামেয়া-আন্জুমানের উন্নতির পথে তৎপর থাকেন! যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তা থেকে পিছ পা হওয়া উচিত হবে না; উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া চাই; যাতে পীরভাইগণ হতাশ না হন। সব ভাইয়ের পারস্পরিক ঐক্য ও ভালবাসা থাকা চাই। এ মহান অভিযানে আল্লাহ অনুগ্রহ ও বদান্যতা থেকে, ঐক্য ও ভালবাসা সহকারে জানি ও মালী (প্রাণপণ ও আর্থিক) সাহায্য করুন! আশা করি, রমযান শরীফে (মাদ্রাসার জন্য) চাঁদা ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে। জামেয়া থেকে রেলওয়ে লাইন পর্যন্ত যতটুকু সম্ভব হয় জমি ক্রয় করে নিন। এটা ক্রয় করতে দেরী করবেন না। পারস্পরিক ঐক্য ও ভালবাসা সহকারে থাকুন! আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও বদান্যতায় আমার স্বাস্থ্য পূর্বের তুলনায় ভাল আছে। পূর্ণ সুস্থ হলে দ্বীনের বাগানগুলো দেখার জন্য এসে যাবো -ইন্‌শা আল্লাহ!

সব ভাই-বোন ও সন্তান-সন্ততির প্রতি দু'আ ও সালাম রইল।

দস্তখত:

মুহাম্মদ তৈয়্যব

গুফিরা লাহু

১১ রমযান ১৪১৩ হি

## পত্র নং- ৫

আমার স্নেহের
মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সাহেব
পরম করুণাময় তাঁকে নিরাপদে ও শান্তিতে রাখুন। আপনাদের প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক! উভয় পক্ষের কল্যাণ কাম্য।

আপনার বিস্তারিত মুহাব্বতনামা (চিঠি) পেয়ে অতিমাত্রায় আনন্দিত হয়েছি। উভয় জাহানে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন! মার্শাল ল'র মন্দ প্রভাবাদি থেকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দেশকে এবং সকল ভাইকে নিরাপদ রাখুন! দেশ উন্নতি লাভ করুক ও মজবূত থাকুক! কাফিররা মুসলমানদের দুশমন। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বোধশক্তি ও হুযূর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র অনুসরণের সৌভাগ্য দান করুন!

আমীন সুম্মা আমীন!!

আন্দোলনকারী ছাত্রদের আন্দোলন একটি ষড়যন্ত্র এবং প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ও সমস্ত ভাইয়ের জন্য একটি পরীক্ষা ছিল। আর সমস্ত ভাইকে জাগ্রত করার একটি দুঃখক্লিষ্ট শিক্ষাগ্রহণ ছিল। কেননা, এ ধরনের পরীক্ষাসমূহ দ্বারা ভেজাল-খাঁটি সম্পর্কে জানা যায়। নিষ্ঠা ও ভালবাসা সহকারে আনাগোনা কারীদের অবস্থা সামনে এসে যায়। কারা সাচ্চা, কারা মিথ্যুক- প্রতিভাত হয়। যেহেতু ভাইদের থেকে বড় বড় কাজ নেওয়ার রয়েছে, সেহেতু তাদেরকে সতর্ক করার প্রয়োজন ছিল। প্রতিটি কাজে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার হিকমত (প্রজ্ঞা) থাকে।

খানকাহ্ শরীফ সংলগ্ন ওমদাহ্ মিঞার জায়গাটি ক্রয় করে নেয়ায় অত্যন্ত খুশী হয়েছি। সেটা অতি প্রয়োজন ছিল। খুব বড় বরকতমণ্ডিত কাজ হয়েছে। সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ্‌র! তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ খানকাহ্গুলো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র ভালবাসা ও নৈকট্য অর্জন করার (আড্ডা) কেন্দ্রস্থল। আউলিয়া-ই কেরাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম আজমা'ঈন'র ঠিকানা ও কেন্দ্র। যে সব ভাই এতে অংশ গ্রহণ করেছেন, চেষ্টা করেছেন এবং টাকা-পয়সা দিয়েছেন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কবূল করুন! এ সাদ্ক্বাহ-ই জারিয়া ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে- ইন্ শা-আল্লাহ্ ।

নিজের সমস্ত কাজকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার ক্বুদরতের হাতে সোপর্দ করে দিন! মোটেই কোন চিন্তা করবেন না; বরং আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার এ অগণিত নিয়ামাতের লক্ষ-লক্ষ বার শোকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করুন! আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনাকে আপনার সমস্ত কাজে হযরাতের ওসীলায় সসম্মানে সাফল্যাদি নসীব করুন! আমীন। সুম্মা আমীন!!

জান্নাত-নিশান (বেহেশ্ত সদৃশ) জামেয়ার প্রতিবেশী হওয়ার নসীব হয়েছে। আর সাথে সাথে জামেয়ার প্রতি ভালবাসা ও খিদমতের সামর্থ্য আল্লাহ্ তা'আলা নসীব করেছেন। এতো উভয় জাহানের সাফল্যের মুকুট (তাজ)। তৎসঙ্গে, দুরূদ শরীফ, যিক্র, সালাতে আওয়াবীন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও মুহাব্বত সহকারে সম্পন্ন করুন! এতে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার এবং হুযূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'র নৈকট্যের রায (রহস্য) লুক্কায়িত রয়েছে। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা

আপনারা সব ভাইকে শরীয়ত ও তরীক্বতের উসূল (মূলনীতিমালা)র উপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ রাখুন! আমীন!! সুম্মা আমীন!!

আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম সাহেব ও তরীক্বতের অন্যান্য ভাইদের এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের জন্য কল্যাণের দু'আ রইলো এবং সবাই সালাম আলায়কুম কবূল করুন!!
তাহের শাহ্, মুহাম্মদ সাবির শাহ্ ও মুহাম্মদ কাসেমের পক্ষ থেকেও সালাম আলায়কুম কবূল করুন!! আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। নিশ্চিন্ত থাকুন!!
দস্তখত:

মুহাম্মদ তৈয়্যব
গুফিরা লাহু
১৮ শাওয়াল, ১৪০২ হিজরী

## পত্র নং- ৬

প্রতি,

জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন সাহেব,

আলহাজ্ব মুহাম্মদ যাকারিয়া সওদাগর সাহেব, আলহাজ্ব শামসুদ্দীন সাহেব, আলহাজ্ব ডা. মুহাম্মদ হাশেম সাহেব, জনাব তবিবুল আলম আবূ মিয়া সাহেব, আলহাজ্ব চৌধুরী জয়নুল আবেদীন সাহেব, আল্লামা ওবায়দুল হক নঈমী সাহেব, আলহাজ্ব নযীর আহমদ সাহেব, আলহাজ্ব সিরাজুল হক সাহেব, আলহাজ্ব আনোয়ারুল ইসলাম সাহেব, আলহাজ্ব নূরুল আমীন সাহেব, আলহাজ্ব সালেহ আহমদ সওদাগর সাহেব, আলহাজ্ব তাজুল ইসলাম সওদাগর সাহেব, আলহাজ্ব এয়াকূব আলী সওদাগর সাহেব, আলহাজ্ব লোকমান হাকীম সাহেব, আলহাজ্ব মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব, আলহাজ্ব আইয়ূব আলী সওদাগর সাহেব, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শরীফ সওদাগর সাহেব, আলহাজ্ব সুলতান সওদাগর, আলহাজ্ব আবুল হোসাইন সাহেব, আলহাজ্ব মুসলিম ভূঞা সাহেব, আলহাজ্ব আবদুল হাকীম সওদাগর সাহেব, ডা. মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব, আলহাজ্ব জালাল আহমদ সাহেব, শাহজাদা ফৌজুল আলী খান সাহেব, আলহাজ্ব জাকির হোসেন কন্ট্রাক্টর সাহেব, আলহাজ্ব আবদুস সাত্তার কন্ট্রাক্টর সাহেব, আলহাজ্ব গোলাম সরওয়ার সাহেব, রশিদুল হক সাহেব, মাষ্টার আবদুল ক্বাইয়ূম সাহেব,

আস্ সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহূ

সমাচার,

আল্লাহ তাবরাকা ওয়া তা'আলার অনুগ্রহ ও বদান্যতাক্রমে এ পত্র লিখার সময় পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধব ও আহলে বায়ত (পরিবার-পরিজন) সহ সবাই ভাল আছি। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনারা ভাইদেরকেও পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধসহ এবং ত্বরীকতের সমস্ত ভাইকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখুন! আমীন সুম্মা আমীন!!

আপনারা যে মুহাব্বতনামাগুলো (চিঠিপত্র) দিয়েছেন সে গুলো একের পর এক করে সবক'টিই পেয়েছি। আঞ্জুমানের যে সব মিটিং হয়েছে, সেগুলোর কার্যবিবরণীর বিবরণ সম্বলিত লিপিগুলোও পেয়েছি। আপনারা নিয়মিতভাবে মিটিংগুলোতে উপস্থিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেই আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন তা দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও আপনাদের তৎপরতা দেখে আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের জন্যও একথা বড়ই আনন্দের যে, আপনারা আল্লাহ'র অলিগণের দৃষ্টিতে বাছাইকৃত হয়েছেন। বর্তমান যুগে আপনাদের থেকে দ্বীনের বড় বড় খিদমত নেওয়া হচ্ছে। হুযূর ক্বেবলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র ফরমান- দুনিয়ার মধ্যে বাজির এ দলটিই দৃষ্টিগোচর হয়। এরা সত্যপন্থী, সাধারণত! লোকেরা এটাকে সত্যপন্থী বলে ধারনা রাখে। এ অমীয় বাণী দিনদিন স্পষ্টতর হচ্ছে। তাদের মধ্যকার এমন নিষ্ঠা অন্য কোথাও নজরে পড়ে না। আপনারাও আল্লাহ'র শোকর আদায় করুন যে, দ্বীনের খিদমত, যা সম্মানিত নবীগণ আলায়হিস্ সালাম ও আউলিয়া-ই কেরামের কাজ, তা আপনারা ভাইদের থেকে নেওয়া হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামত রাজির শোকরিয়া আদায় করার তাওফীক দান করুন! আপনাদের ভাগ্যে এ নিয়ামাতগুলো জুটতে থাকুক, আপনাদের সন্তানদেরও নসীব হোক; তারা যেন এ মহান নিয়ামাত থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত বঞ্চিত না হয়। আমীন!

বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

বর্তমানে বাতিল ফির্কার যে তূফান ধেয়ে আসছে, তা থেকে বাঁচার জন্য জামেয়া, সিলসিলা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম এর কিস্তির মতো। তাই জামেয়ার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা চাই। ওইদিকে রাশিয়ার রাজ্যগুলো সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার জন্য ময়দানে নেমে পড়েছে। ভারতে পাঞ্জাব, আসাম ও কাশ্মিরতো স্বাধীনতার জন্য লেগেই আছে। যা কিছু হচ্ছে, সবই একটি প্রোগ্রামের অধীনেই হচ্ছে। দুনিয়ায় যে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, তা প্রকারান্তরে ইসলামের উন্নতি ও কল্যাণের জন্যই হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন-তারা চাচ্ছে আল্লাহ'র নূরকে তাদের মুখ দিয়ে নিভিয়ে ফেলতে। আর আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণকারী, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে। [কুরআন মজীদ]

এ ভবিষদ্বাণীর নিদর্শনগুলো প্রকাশ পেয়েছে। কবি বলেন-

নীল নদের তীর থেকে আরম্ভ করে (চীনের) কাশগরভূমি পর্যন্ত
সমস্ত মুসলিম এক হও, হেরম শরীফের সংরক্ষণের জন্য।

হুযূর ক্বেবলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি যেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, তার সময় সন্নিকটে। এখন ভাইদের যিম্মাদারী হচ্ছে-পারস্পরিক শলা-পরামর্শ, ঐক্য ও ভালবাসার সাথে শরীয়ত ও তরীকতের বাগানগুলোর খিদমত আঞ্জাম দেওয়া। ভাইদের কাতার যেন কখনো বিক্ষিপ্ত না হয়। বাতিল ফিরকাগুলোর প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে। আল্লাহ না করুন! ভাইদের মধ্যে যদি কারো পারস্পরিক বিবাদ দেখা দেয়, তবে সেটা খুব শীঘ্রই মীমাংসা করে নিন, যাতে শয়তান ও মানুষরূপী শয়তানগণ সুযোগ না পায়। গাউসিয়া কমিটি ও এর শাখাগুলোকে অতিমাত্রায় সংগঠিত করুন! সাধারণ ভাইদের মধ্যে আসা-যাওয়া (দাওরাহ) জারী রাখবেন; যাতে তারা বাতিলের মন্দ প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

গোলাম সরওয়ার সাহেবকে বলে দিন-সন্ধি করে নেয়াই উত্তম। যে অপরকে ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালবাসেন। আমার স্বাস্থ্য পূর্বের চেয়ে কিছুটা ভাল। চিন্তা করবেন না। শরীর সুস্থ হলে, ইন্ শা আল্লাহ হাযির হবো। সব ভাইবোনের প্রতি দু'আ ও সালাম রইলো। আল্লাহ তা'আলা সমগ্র ইসলামী দুনিয়াকে আমাদের সবাইকে ও সমস্ত ভাইবোনকে আপন হিফাযতে রাখুন!! আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাহের শাহ্, মুহাম্মদ সাবের শাহ্, মুহাম্মদ কাসেম শাহ্ ও মুহাম্মদ হামেদ শাহ্'র সালাম কবূল করুন! আলহাজ্ব মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেবের লেখা বিস্তারিত চিঠি পেয়েছি। ওরস মুবারকে ভাইদের বিপুল উপস্থিতির খবর জেনে আমরা খুশী হয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করুন! হাজী জালাল সাহেব মরহুমের শোকাহত পরিবার-পরিজনের নিকট গিয়ে আমার তরফ থেকে দু'আ-সালাম জানাবেন এবং আমাদের সমবেদনা জানাবেন আর সবাই কবর জিয়ারত করবেন।

দস্তখত

মুহাম্মদ তৈয়্যব
গুফিরা লাহু
৩০ রজব, ১৪১০হিজরী
২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

## পত্র নং- ৭

ভাইদের সবাইকে ঈদ মুবারক!

স্নেহের
মুহাম্মদ মহসিন সাহেব!
সালাম-ই মাসনূন রইলো।
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার অনুগ্রহ ও বদান্যতায় এ লিপি লেখা পর্যন্ত ভাল ও সুস্থ আছি। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনাকে পরিবারের সব সদস্য সহকারে এবং তরীকতের সব ভাইবোনকে শান্তি ও নিরাপদে রাখুন! আমীন, সুম্মা আমীন!!
যে সব যিম্মাদারী হযরাতের তরফ থেকে আপনারা ভাইদের উপর অর্পিত হয়েছে, সে গুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করার সামর্থ্য নসীব হোক! আমীন, সুম্মা আমীন!!

আপনার চিঠি (মুহাব্বতনামা) পেয়েছি। অত্যন্ত খুশী হয়েছি। লিখিত সব বিষয়ে অবগত হয়েছি। শাহানা আরাকে যে উৎসাহিত করা হয়েছে তাতে খুব খুশী হয়েছি। আল্লাহ, তাবারাকা ও তা'আলা আপনারা ভাইদের মূল্যায়নকে কবূল করুন। আমীন!

জামেয়ার মসজিদ সম্প্রসারণের খবর পেয়ে আনন্দিত হলাম। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। খোদাওয়ান্দ তাবারাকা সেটাকে পূর্ণতার শিখরে পৌঁছিয়ে দিন! আমীন!! ভাইদের সৌভাগ্যের কারণ হবে, যদি খানকাহ্ শরীফের কাজও তাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। যেমনিভাবে শরীয়তের প্রচার-প্রসারের জন্য মাদরাসাগুলোর প্রয়োজন হয়, তেমনিভাবে তরীকতের মাধ্যমে যে সব খোশনসীব (সৌভাগ্যবান) নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাতে চায়, তাদের জন্য খানক্বার প্রয়োজন। আর এ মুবারক কাজ তাদের থেকে নেয়া হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার খাস অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং হযরাতে কেরামের কৃপাদৃষ্টি হবে। এ কাজ যে কেউ করতে পারবে না। যখনই খানক্বার জন্য জমি ক্রয় করার সুযোগ হয় এবং জমিও উপযুক্ত পাওয়া যায়, তখনই তা ক্রয় করে নেয়া চাই। তাতে বিলম্ব করা উচিত হবে না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করা জরুরী। আশা করি, রমযান শরীফে জামেয়ার চাঁদা সংগ্রহের জন্য সংগঠিতভাবে চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কবূল করুন! যে কোন কাজই করবেন ভাইদের সাথে পরামর্শ করে সমাধা করবেন, যাতে ভাইদের ঐক্য ও ভালবাসা কায়েম থাকে এবং কারো আপত্তি করার অবকাশ না থাকে।

জামেয়ার সমস্ত শিক্ষক হযরাতকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এক মুবারক সুযোগ দিয়েছেন। বাতিল ফির্কার সাথে মোকাবেলা করার জন্য মজবুত (দক্ষ) ওলামা তৈরি করে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং সমস্ত হযরাতকে রাজী করে, তাঁরা উভয় জাহান খরিদ করতে পারেন। যদি তাঁরা এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে আপন আপন কবরে পৌঁছে যান, তবে এ সম্মানিত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবেন এবং তাদের মতো বদ-নসীব (হতভাগা) সমগ্র দুনিয়ায় আর কেউ থাকবে না। বস্তুত: এসবের দায়-দায়িত্ব প্রিন্সিপ্যালের উপর বর্তাবে। হাজী আবদুল জব্বার সাহেব তোহফা অর্পণ করেছেন। চিন্তার কারণ নেই। রওয়া-ই

মুবারকের বারান্দার কাজ পরিপূর্ণ হয়েছে। বাকী কাজ রমযান শরীফের পর আরম্ভ হবে। ইন-শা-আল্লাহ।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনারা ভাইদের উভয় জাহানে সসম্মানে রাখুন। মুহাব্বত, ইখলাস ও সমাদর ইত্যাদি কবূল করুন! আমীন, সুম্মা-আমীন।.ঘরের সবাই, ছেলে মেয়ে, তরীক্বতের সমস্ত ভাই বোন, (মাদরাসার) শিক্ষক ছাত্র, সবাইর প্রতি দু'আ ও সালাম রইলো।

তাহের শাহ্, মুহাম্মদ সাবির শাহ ও মুহাম্মদ ক্বাসেম শাহ্র পক্ষ থেকেও সালাম আলাইকুম কবূল করুন!

দস্তখত:

মুহাম্মদ তৈয়্যব
গুফিরা লাহু
২৩ রমযানুল মুবারক, ১৪০৬ হিজরী

উল্লেখিত পত্রাবলীর বিষয় বস্তু থেকে প্রতিয়মান হয় তিনি অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং মুসলিম মিল্লাতের মহান দিকপাল ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রেরিত পত্র পাওয়ার সাথে সাথে-আনজুমান কর্তৃপক্ষ তাঁর পরামর্শ বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠতেন এবং যথাসময়ে কার্যসম্পাদন করে পত্রের জবাব দিয়ে তা অবহিত করতেন। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র পত্রাবলী আজ ইসলামী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যত প্রজন্ম এখান থেকে অনেক শিক্ষা অর্জন করতে পারবে।

# উপসংহার

যুগশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও মহান সংস্কারক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি ছিলেন একাধারে আলিম, হাফিয, ক্বারী, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ্, আবিদ, যাহিদ, আধ্যাত্মিক সাধক, সমাজ সংস্কারক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ক্ষণজন্মা বিরল ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রসার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এতদঞ্চলের জনগণকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রেমে উজ্জীবিত করে ধর্মবিমুখ ও পাপাচারে নিমজ্জিত পথহারা মানুষকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসার জন্য যুগোপযোগী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তাঁর ধর্মীয় সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় হলো ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। মহান পিতা আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও মিশনগুলো এগিয়ে নিতে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তিনি রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নতুন নতুন বহু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এসব প্রতিষ্ঠান অদ্যাবধি অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। এ অভিসন্দর্ভে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামী জ্ঞান জগতে যুগোপযোগী সংযোজন হিসেবে তিনি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় 'মাসিক তরজুমান' নামে সাময়িকী প্রকাশনার নির্দেশ দেন, যা আজো ইসলামী জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুখপত্র হিসেবে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ অভিসন্দর্ভে তাঁর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

মানুষ শুধু বাহ্যিক জ্ঞানে শিক্ষিত হলেই যথেষ্ট নয়; বরং অনেকক্ষেত্রে বিপথগামী হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তাই আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) অনুভব করলেন মুসলিম মিল্লাতকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদশালী করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তিনি সারাদেশে প্রতিষ্ঠা করেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চাকেন্দ্র অনেকগুলো খানকাহ্ শরীফ। এই অভিসন্দর্ভে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্ শরীফের নাম, পরিচিতি ও কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, ইসলামী সংস্কৃতির জগতেও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রচলন করেন জশ্‌নে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী যা বর্তমান বিশ্বে ইসলামী সংস্কৃতির মডেল হিসেবে পরিণত হয়েছে। যার মাধ্যমে সমাজে এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। মানুষকে নবীপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচলন করেন আযানের আগে সালাতু-সালাম যা বর্তমানে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য।

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) তরীকত পন্থী সুন্নী মুসলমানদের কে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষে প্রতিষ্ঠা করেন গাউসিয় কমিটি বাংলাদেশ। তরীকত ভিত্তিক এই সংগঠনটি বর্তমানে দেশে-বিদেশে ইসলামের ব্যাপক খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। এ অভিসন্দর্ভে উক্ত সংগঠনের পরিচিতি ও কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর যে তাফসীর পেশ করতেন, তাতে দ্বীন-মাযহাব-মিল্লাত ছাড়াও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুঠে ওঠত। তাঁর প্রদত্ত্ব অনেকগুলো বক্তৃতা অডিও ক্যাসেটে ধারণ করা হয়। ধারণকৃত বক্তৃতা থেকে নির্বাচিত কয়েকটি বক্তব্য বঙ্গানুবাদসহ এ অভিসন্দর্ভে উপস্থাপনা করা হল।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) বছরে একবার কিছু দিনের জন্য বাংলাদেশে সফর করতেন। অবশিষ্ট সময় তিনি নিজ দেশ পাকিস্তান সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থান করলেও বাংলাদেশে অবস্থানরত আন্জুমানের কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট মুরীদানের খোজ খবর রাখতেন চিঠি-পত্রের মাধ্যমে। তাঁর প্রেরিত চিঠি থেকে নির্বাচিত কয়েকটি চিঠি বঙ্গানুবাদসহ অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক, মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আল্লামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রতিষ্ঠিত ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীরা আজ ইসলামের আলো ছড়াচ্ছে বিশ্বময়। তাঁর নির্দেশে প্রকাশিত 'মাসিক তরজুমান' আজ বাতিল আকীদার জবাব দেয়ার হাতিয়ার হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এই মহান ব্যক্তির অসাধারণ অবদান সম্পর্কে জানতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শিক্ষা ও আদর্শ এবং আউলিয়ায়ে-কিরামের পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধি তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও শান্তি লাভ করার শক্তি দান করুন। আমীন!

ثمّ الحمد لله ربّ العالمين- والصّلواة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين وعلى ألہ الطيّبين وأصحابه الطاهرين-

**و أللہ أعلم بالصواب**

# গ্রন্থপঞ্জি

## আরবী-উর্দূ-ফার্সি


* আল-কুরআন — ---------------------

* আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী : তাযকিরা-ই আকাবিরে আহলে সুন্নাত (লাহোর : ফরিদ বুক স্টল, ২০০০ খ্রি.)
  : আকাবির-ই আহলে সুন্নাত পাকিস্তান (ভারত : কানপুর-ফাইয়্যাজ আল হাসান বুক সাপ্লাইয়ার, তা.বি.)

* আবদুল কাদের ঈসা আল শাযলী, শায়খ : হাকায়িক আনিত তাসাউফ, (মুহাম্মদ আকরাম আযহারী কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত) (লাহোর :যাভীয়া ট্রেডার্স, ১৯৯৮ খ্রি.)।

* আবদুল হক দেহলভী, শায়খ, মুহাদ্দিস : আখবার আল আখইয়ার, (দিল্লী : আদবী দুনিয়া, ১৯৯৪ খ্রি.)
  : আশ‘আত আল লুম’আত, (সাঈদ আহমদ নক্‌শবন্দী কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত) (লাহোর : ফরীদ বুক ডিপো, ২০০৩ খ্রি.)
  : মাদারিজ আল নবুয়ত (লায়েলপুর : মাকতাবা-ই নূরীয়া রিযভীয়া, তা.বি.) ২য় খণ্ড,

* আবদুর রহমান শাওক্ব আমর তাসতারী : সীরাত-ই গাউছ-ই আযম (কানপুর : মাকতুবাত-ই রহীমিয়া, ১৯৭০ খ্রি.)

* আবদুর রহমান চৌহরভী, খাজা : মাজ্‌মু’আয়ে সালাওয়াতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, (চট্টগ্রাম : আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, ১৯৮২ খ্রি.)

* আবুল কাসিম আল হোসাইন ইবন মুহাম্মদ প্রকাশ রাগিব ইস্পাহানী : আল মুফরাদাত ফী গরীব আল কুরআন, (কায়রো : আল মাকতাব আল মায়মানাহ্‌, ১৩২৪ হি.)

* আবদুল মালেক ইব্‌ন হিশাম বসরী : সিরাত-ই ইব্‌ন হিশাম (মিশর : তা. বি.)

* আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইয়াফি‘ঈ : কাসাসুল আউলিয়া, উর্দু অনুবাদক আশরাফ আলী থানবী (ইন্ডিয়া : মাকতাবাত-ই থানবী দেওবন্দ, ১৯৯৫) ১ম খণ্ড

* আব্দুন্নবী কাউকাব, কাযী : হায়াত-ই সালিক (লাহোর : রেযা একাডেমি, ১ম সংস্ক., ১৯৭১ খ্রি.)
  : মাজমু’আহ কাওয়ায়িদুল ফিকহ্‌, (করাচী কুতুবখানা আরামবাগ, ১ম সংস্ক. ১৯৮৬ খ্রি.)

* আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, আল-কাযবীনী : সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.)

* আবু আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী : সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারু ইব্‌ন কাছীর, ৩য় সংস্ক., ১৪০৭ হি.) তাজরীদুল বুখারী, অনুবাদঃ যয়নুদ্দীন, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩)

* আবুল হাসান শাত্বনূফী (র.), আল্লামা : বাহজাতুল আসরার, (বৈরূত, লেবানন)।

* আতহার মুবারকপুরী, মাওলানা, কাযী : খায়রুল কুরুন কী দরসগাহী আওর ওন্‌কা তা'লীম ওয়া তারবিয়ত (দেওবন্দ : শাইখুল হিন্দ একাডেমি, তা.বি),

* আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী, মুফতী : কাওয়াইদুল ফিক্‌হ (ভারত : দেওবন্দ, ইউপি আশরাফী বুক ডিপো, তা.বি)

* আযীযুল হক, আল্লামা, সৈয়্যদ, মুহাম্মদ : দীওয়ান-ই আযীয, (ফার্সী) (চট্টগ্রাম : ইমাম শে'রে বাংলা একাডেমি,২০১০ খ্রি.)

* আলী আল ক্বারী, মোল্লা : মিরক্বাত আল মাফাতীহ শরহু মিশকাত আল মাসাবীহ, (মুলতানঃ মাকতাবা-ই হক্কানিয়া-তা. বি.)

* আলী মুহাম্মদ আস-সালাভী, ড. : আস্-সীরাতুন নববীয়্যাহ্ (বৈরূত : ১ম সংস্ক. ২০০৪ খ্রি./১৪২৫ হি.)

* আলী ইবনে উসমান হাজভেরী দাতা গঞ্জে বখ্‌শ লাহোরী, সৈয়্যদ : কাশ্‌ফ আল মাহযূব, যহীরুদ্দীন বদায়ূনী কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত। (লাহোর : কুতুবখানা শাহ-এ ইসলাম- ১৩২৪ হি.)

* আলী ইব্‌ন সুলতান, মুহাম্মদ, মোল্লা : মিরকাত আল মাফাতীহ্ শরহে মিশকাত আল মাসবীহ, (মুলতান : মাকুবাত-ই হক্কানীয়া, তা.বি.)

* আলী ইব্‌ন বুরহানুদ্দীন হালভী : ইনসানুল 'উয়ূন ফী সীরাতি আমীনিল মা'মুন (সীরাতি হালভীয়া, লিবানন : দারুল মা'রিফাত- তা. বি.)

* আহমদ শাহ্ সিরিকোটি, সৈয়্যদ, আল্লামা : মুকাদ্দমা মাজমূ'আহ সালাওয়াতির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (পেশওয়ার, পাকিস্তান : মন্‌জুরে আম প্রেস, ১৯৫৩ খ্রি.)

* আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী, মুফতি : তাফসীর-ই না'ঈমী, (লাহোর : মাকতাবাত-ই ইসলামীয়া- ১৯৭৩) ১ম খণ্ড।

: মিরাআত আল মানাজীহ শরহে মিশকাত আল মাসাবীহ, (দিল্লী : আদবী দুনিয়া, ১৩৭৮ হি.) খ. ১ম।

: শানে হাবীবুর রহমান (পাঞ্জাব : নাঈমী কুতুবখানা,

তা. বি.)।

: জা'আল হক্ব, (ইউ,পি : মাকতুবাত-ই নাঈমীয়া) ১ম খণ্ড।

: ইসলামী যিন্দিগী (দিল্লী : ফারুকীয়া বুক ডিপো, ১ম সংস্ক., ২০০৪ খ্রি.)

* আহমদ মোল্লা জীয়ন : নূরুল আনওয়ার, (ঢাকা : ইমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৬ খ্রি.)

: আল তাফসীরাত আল আহমদিয়া, (পেশোয়ার : মাক্বতুবাত হক্কানিয়া, তা.বি.)

* আহমদ ইবন শু'আইব আন নাসায়ী : সুনান-ই নাসায়ী (দিল্লী : মাকতাবা-ই আশরাফীয়া, তা.বি.)

* আহমদ গালুশ : আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়্যা উসূলুহা ওয়া ওয়াসায়িলুহা (কায়রো : দারুল মিসরী, ১৩৯৩ হি.)

* আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল কুসতালানী : মাওয়াহিব আল লাদুনিয়া (বৈরূত : মাকতাবা-ই ইসলামিয়া, ১৯৯১ খ্রি.)

* আহমদ রিযা খান বেরলভী : আল আত্বায়া আন নবভীয়া ফিল ফাতাওয়ার রিযভীয়া (করাচী : আলমুজাদ্দিদ আহমদ রিযা একাডেমী, তা.বি)

* আহমদ ইয্যুদ্দীন আবদুল্লাহ্ : আস্ সৈয়্যদ ইব্রাহীম আল দাসুক্বী, (মিশরী : আল ইহরাম আল তিজারিয়া-১৯৯৪ খ্রি.)।

* আহমদ মুহাম্মদ হিজাব : আল ই'যাত ওয়াল ই'তিবার আ-রাউন ফী হায়াতি আল সৈয়্যদ আল বদভী (মিশর : ওয়াযারাহ্ আল্ আওক্বাফ আল মজলিস আল আ'লা লিশ্ শুয়ূন আল্ ইসলামিয়াহ্, ১৯৯৮ খ্রি.)

* আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন মাসউদ : মারাহ আল আরওয়াহ (ভারত : মাকতবা-ই থানভিয়্যাহ, তা.বি.)

* ইলিয়াস কাদেরী, মাওলানা, মুহাম্মদ : ফয়যান-ই সুন্নাত, (করাচি, পাকিস্তান), তা.বি.

* ওয়ালি উদ্দীন আত তাবরীযি, শায়খ : মিশকাতুল মাসাবীহ (দিল্লী : ফারুকিয়া বুক ডিপো, ২০০৫)

* জুরজী যায়দান : তারীখুল-লুগাতিল আরবিয়্যাহ (তা.বি.)

* জানআক মূসাযায়ী, মুহাম্মদ : তাযকিরা (পাকিস্তান : আরাকীনে মজলিশে গাউসিয়া ওয়াডাপগা, পেশোয়ার, ১৯৯৩ খ্রি.)

* জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.), আল্লামা : তারিখুল খুলাফা, উর্দু অনুদিত (দিল্লী : ই'তেকাদ পাবলিকেশন্স হাউস, ১৯৮৭ খ্রি.),

: শারহুস সদূর বিআহওয়ালিল মাউতা ওয়াল কবূর, (লিবাননঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়া,১৯৮৪ খ্রি.)

: তানভীর আল হালাক ফী জাওয়াযি রূইয়াতিন নবী ওয়াল মালাক (কায়রোঃ দারু জাওয়ামি'উল কালিম- ২০০৩ খ্রি.)

⋆ নযীর আহমদ না'ঈমী : সাওয়ানিহ্-ই ওমরী (পাকিস্তান :না'ঈমী কুতুবখানা, তা.বি.)

⋆ বদরুদ্দীন আয়নী, আল্লামা : উমদাতুল কারী (দারুল ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৭ হি.)

⋆ মান্না'আল ক্বাত্বত্বান : মাবাহিছ ফী উলুমিল কুরআন (রিয়াদ : মাকতবাত আল  মা'আরিফ, তা. বি.)

⋆ শফী উকাড়বী, মাওলানা : বরকাত-ই মীলাদ, (করাচি, পাকিস্তান, তা.বি.)

⋆ শফীক আহমদ শরীফী : তাযকিরা-ই আকাবির-ই আহলে সুন্নাত, (ইলাহাবাদ : জামেয়া দারুস সালাম, ১৪১৬ হি.)

⋆ সাঈদুর রহমান ক্বাদিরী, পীরজাদা, মুহাম্মদ : হায়াত-ই তৈয়্যবাহ্ সায়্যিদুনা গাউসুল আযম, (পেশোয়ারঃ আনজুমান-ই কাদেরিয়া হাফিযীয়া রহমানিয়া, তা. বি.)

## বাংলা

⋆ আবদুল ওহাব, কাজী : আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ স্মারক গ্রন্থ (চট্টগ্রাম : ১ম সংস্ক, আগস্ট ১৯৯৪ খ্রি.),

⋆ আবদুল মাবুদ, ড. : ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার অবদান (অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

⋆ আব্দুল মান্নান, মুহাম্মদ : মিরআতুল মানাজীহ শরহ-ই মিশকাতুল মাসাবীহ (বাংলা ভাষায় অনূদিত), (চট্টগ্রামঃ ইমাম আহমদ রিযা রিসার্চ একাডেমী, ১ম সংস্ক. খ. ১ম, ২০০৯ খ্রি.)

: দিওয়ান-ই আযীয (বঙ্গানুবাদ), চট্টগ্রাম : আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা দরবার শরীফ, ২০০৯ খ্রি.

: অনুদিত কান্যুল ঈমান, ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমি, চট্টগ্রাম, ২০০৪ খ্রি.

⋆ আব্দুল হালিম, ড. : অধ্যক্ষ মাও. জালাল উদ্দীন আল কাদেরী (র.): জীবন ও কর্ম, (চট্টগ্রাম : ইমাম মুসলিম ফাউন্ডেশন)

⋆ আব্দুল ওয়াজেদ, মুফতী : সকল যুগের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী, (চট্টগ্রাম : গাউছিয়া প্রকাশনী, ২০১৫ খ্রি.)

শানে গাউসুল আযম, (চট্টগ্রাম : গাউসিয়া প্রকাশনী, ২০০৩)

| | | | |
|---|---|---|---|
| * | আব্দুল অদুদ, ড. | : | বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, (ঢাকা : আল কুরআন একাডেমী) |
| * | আব্দুর রব ও এ.এম. আলাউদ্দিন, অধ্যক্ষ | : | ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশান সোসাইটি, ১৯৯৯ খ্রি.) |
| * | আব্দুল ওয়াহিদ, ড. | : | বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি (ঢাকা : |
| | | : | ইসলামি সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০১ খ্রি.) |
| * | আবদুস সাত্তার, ড., মোহাম্মদ | : | বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.) |
| | | : | আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্ক., ২০০৪ খ্রি.) |
| * | আকবর শাহ্‌ খান ননিবাবাদী, মাওলানা | : | ইসলামের ইতিহাস (বাংলা অনু.), (ঢাকা : ইফাবা, তা.বি) |
| * | আকরম খাঁ, মোহাম্মদ | : | মোস্তফা চরিত (ঢাকা : পুস্তিকা, ১৯৭৫ খ্রি.) |
| * | আমিমুল ইহসান, মুফতী | : | হাদীস সংকলনের ইতিহাস, অনুবাদ, মাওলানা শরীফ মোহাম্মদ ইউসুফ, (ঢাকা : ইসলামী একাডেমী) |
| | | : | হাদীস শাস্ত্রের ইতিকথা (ঢাকা: ইসলামী একাডেমি ১৪১১ হি.) |
| * | আব্দুল গফুর, ড., মুহাম্মদ | : | আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (চট্টগ্রাম : ১৯৯৩ খ্রি.) |
| * | আবদুস সাত্তার, ড. মুহাম্মদ | : | আলীয় মাদ্‌রাসার ইতিহাস (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৮০ খ্রি.) |
| * | আহসান সাইয়েদ, ড. | : | বাংলাদেশে হাদীস চর্চা ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ফেব্রুয়ারী- ২০০৬ খ্রি. |
| * | আমীনূল ইসলাম, ড. | : | মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি (ঢাকা : নওরোজ কিতাবস্তান- ২০০৬ খ্রি., ৫ম প্রকাশ |
| * | আবদুল হালিম, মো: | : | মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ, (ঢাকা : দিব্য |
| | | : | প্রকাশ-২০০২ খ্রি., ১ম প্রকাশ |
| * | আলী আকবর আব্বাসী | : | ফরূগ-এ ইলম মে মুসলমানোঁ কা কিরদার, পাঞ্জাব প্রাদেশিক চতুর্থ কনফারেন্স প্রকাশিত সীরাত-ই রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা (লাহোর : উলামা একাডেমী, ১৯৮৪ খ্রি.) |
| * | আনোয়ারুল ইসলাম খান, কাযী | : | হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান না‘ঈমী (র.)’র জীবন কর্ম (চট্টগ্রাম : ২০০০ খ্রি.) ১ম সংস্ক. |
| * | অছিয়র রহমান, সৈয়্যদ মুহাম্মদ | : | সৈয়্যদ মুহম্মদ তৈয়্যব শাহ্‌ জীবনী গ্রন্থ, চট্টগ্রাম : তাসলীমাএকাডেমী, ১ম সংস্ক. ২০০৬ খ্রি. |
| * | আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), | : | তাফসীর-ই নূরুল ‘ইরফান, মাওলানা মুহাম্মদ |

মুফতী আবদুল মান্নান অনূদিত (চট্টগ্রাম : ইমাম আহমদ রেযা রির্সাচ একাডেমী- ২০০৪ খ্রি.) ১ম খণ্ড,

* আমিনুর রহমান, মুহাম্মদ : মুহাদ্দিসে আ'যমে পাকিস্তান (চট্টগ্রাম : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ২০০৭ খ্রি.)
  : মুফতী সৈয়্যদ আমীমুল ইহছান মুজাদ্দেদী (রহ.)'র গ্রন্থাবলী, (চট্টগ্রাম : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ২০১৩ খ্রি.)
  : খান্দানে রেযভীয়া পরিচিতি, (চট্টগ্রাম : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ২০০৯ খ্রি.)
* আনিসুজ্জমান, হাফিয, মুহাম্মদ : মজমু'আয়ে সালাওয়াতে রাসূল (সা.) পরিচিত, (চট্টগ্রাম : তাহিয়া প্রকাশনী- ২০০৫ খ্রি.)
* আসাদুজ্জামন আসাদ : যশোর জেলার ইতিহাস : (ঢাকা, ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট ১৯৮৯ খ্রি.)
* আবদুস সাত্তার, মাষ্টার : খাজা আবদুল মজিদ শাহ্,
* আজিবার রহমান, মোহাম্মদ : আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর খুলনা জেলার আলিমগণের অবদান (১৯০৫-২০০০ খ্রি.), পিএইচ.ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ খ্রি.
* আবদুল মান্নান তালিব : বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২ খ্রি.)
* আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ : 'বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য', অগ্রপথিক, ১৭ বর্ষ, সংখ্যা ১০, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০২ খ্রি.
* আনিসুজ্জামান, মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ : পাক পঞ্জতন; মীলাদুন্নবী সংখ্যা, (চট্টগ্রাম: ষোলশহর, নাজির পাড়া, ফেব্রুয়ারী- ২০১০ খ্রি.)
* আবদুল হক ফরিদী : মাদ্‌রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রি.)
* আবদুল ক্বাদের জিলানী (রাঃ) : সিররুল আসরাল, (আবদুল জলীল কর্তৃক বাংলায় অনূদিত)
* আ.ন.ম. রইছউদ্দীন ড. ও আব্দুস সালাম খান : উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামী শিক্ষা (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ১৯৯৩ খ্রি.),
* আবু বকর রফিক আহমদ, ড. : একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখার আলোকে আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার প্রস্তাবনা, জাতীয় শিক্ষা সেমিনার-৯৭ (ঢাকা : ১৯৯২ খ্রি.)
* আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, ড. : ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫)

| | | | |
|---|---|---|---|
| * | আবদুল জলীল, অধ্যক্ষ, হাফেয, এম এ | : | *ফতোয়ায়ে ছালাছা*, ২০১০ খ্রি., |
| | | : | মিলাদ-কিয়ামের বিধান, ঢাকা, ২০১০ খ্রি., |
| | | : | নূরনবী (সা.), ২০০৭ খ্রি. |
| * | আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক, ড. | : | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : অতীত ও বর্তমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সংখ্যা জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৬ খ্রি. ঢাকা |
| * | আমীর আলী, স্যার সৈয়্যদ | : | অনু. ড. রশীদ আলম, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫ খ্রি.) |
| * | ইসকান্দর আলম, মুহাম্মাদ | : | অধ্যক্ষ আল্লামা জালাল উদ্দীন আল কাদেরী : জীবন ও কর্ম, (আল্লামা জালাল উদ্দীন ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম : ২০১৭ খ্রি. |
| * | ইব্‌ন ইসহাক | : | অনু. শহীদ আকন্দ, সীরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, (ঢাকা : বাতায়ন প্রকাশন, ২০০২ খ্রি.) |
| * | ইব্‌ন হিশাম | : | অনু. আকরাম ফারুক, সীরাতে ইব্‌ন হিশাম (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.) |
| * | ইব্‌ন খালদুন | : | আল-মুকাদ্দিমা, বাংলা অনু., ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ ২০০৭ খ্রি.) |
| * | ইনাম-উল হক, ড. মুহাম্মদ | : | ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (ঢাকা : বাংলা একাডেমী -১৯৯৫ খ্রি.) প্রথম পুর্ণমুদ্রন |
| * | ইদ্রিছ রজভী মুফতি, মুহাম্মদ | : | হুঁশিয়ার মুসলমান (চট্টগ্রাম : রজভী মঞ্জিল - ২০১১ খ্রি.) |
| * | ইসমাঈল হোসেন, অধ্যক্ষ, আলহাজ্জ, মোঃ | : | বীর মুজাহিদ পীর শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহ.) (পিরোজপুরঃ ছারছীনা মাদরাসা মুসলিম স্টোর, ২০১১ খ্রি.) |
| * | এমিলি বার্নস | : | মার্কসবাদ, বাংলা অনুবাদক সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ- ১৯৪৫ খ্রি.) |
| * | এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ | : | ধর্মের কাহিনী (চট্টগ্রাম : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন - ১৪১৮ বা.) |
| * | এম সেলিম খান চাটগামী | : | বাগে সিরিকোট, (চট্টগ্রাম : তৈয়্যবিয়া সোসাইটি বাংলাদেশ- ১৯৯৮ খ্রি.) |
| * | এস. এস. মো. নূর নবী ও মাক্‌সুদুর রহমান খান, মোঃ | : | রাজনৈতিক তত্ত্ব ও সংগঠন, লেখাপড়া, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ খ্রি. |

| | | |
|---|---|---|
| * | এ এফ. এম. আমীমুল হক, ড. | : মুফতী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান, ইফা, ২০০২ খ্রি., |
| * | এম. এ. মুহাইমেন | : ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ |
| * | এ,এ,রহীম | : বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস (বাংলা একাডেমী, ২য় খণ্ড, ১৯৮২ খ্রি.) |
| * | ওয়াজাহাত রসুল কাদেরী | : আপনে দেশ বাংলাদেশ মে, মা'আরিফ-ই রিযা (সাময়িকী) জানুয়ারী ২০০৫ খ্রি.(পাকিস্তানঃ করাচি) |
| * | কে.আলী | : ইসলামের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৯২ খ্রি. |
| * | খুরশীদ আহমদ, অধ্যাপক | : ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি, অনুবাদঃ অধ্যাপক নাজির আহমদ (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), |
| * | গোলাম সাকালায়েন, ড. | : বাংলাদেশের সূফী-সাধক ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্কারণ, ২০০৩ খ্রি., |
| * | জিয়াউল হক, মুহাম্মদ | : ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া'র অবদান, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫ খ্রি. |
| * | তোফাজ্জল হোসেন শেখ, সম্পাদিত | : বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি.) |
| * | নূরুল আমিন মুহাম্মদ ও অন্যান্য | : সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ২০০৮ খ্রি.), ২য় সংস্করণ |
| * | নুরুল ইসলাম হাশেমী, কাযী | : তাযকেরাতুল কেরাম, (আল্লামাা হাশেমী মিশন), চট্টগ্রাম |
| * | নেজাম উদ্দীন, মুহাম্মদ | : আল্লামা গাযী শে'রে বাংলা ও দীওয়ানে আযীয, চট্টগ্রাম, ২০০৬ খ্রি. |
| * | নেজাম উদ্দীন, মুহাম্মদ | : মাজমু'আয়ে সালাওয়াত-ই রাসূল *ঃ বৈশিষ্ট ও অলৌকিকত্ব* (চট্টগ্রাম : আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন- ১৯৯৯ খ্রি.) |
| * | প্রণব কুমার চট্রোপাধ্যয় | : আধুনিক ভারত, ( কলিকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯২) ১ম খণ্ড |
| * | বদিউল আলম রেযভী, মুহাম্মদ | : সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন (চট্টগ্রাম : রেযা ইসলামিক একাডেমী, ১ম সংস্ক, ১৯৯৮), |
| | | : ষড়যন্ত্রের অজানা ইতিহাস, (চট্টগ্রাম : রেযা ইসলামিক একাডেমী- ২০০০ খ্রি. ) |
| | | : সুন্নীযতের পঞ্চরত্ন, (চট্টগ্রাম রেযা ইসলামিক একাডেমী ১৯৯৮ খ্রি.) ১ম সংস্করণ। |
| * | বখতিয়ার উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ | : দালায়িলে না'ঈমীয়া (বঙ্গানুবাদ) ১৯৯৮ খ্রি. |

* পি.কে. হিট্টি : আরব জাতির ইতিহাস (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯ খ্রি.)
* মান্নান সাহেব : কানযূল ঈমান উর্দূ ভাষায় অনুবাদ ও তাফসীর কারক যথাক্রমে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) ও আল্লামা না'ঈমুদ্দীন মুরাবাদী (রহ.)।
* মজিদ আলী খান : শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাংলা অনূদিত, (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.)
* মাকসুদ আলী, সৈয়দ : রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপ-মহাদেশ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খ্রি.)
* মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার : ইসলামের মহান সংস্কারক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)
  : 'আলা হযরতের চিন্তাধারা ও শাহেনশাহে সিরিকোট,
  : গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচী (চট্টগ্রাম : গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ২০১২ খ্রি.)
  : সিরিকোট থেকে রেঙ্গুন, চট্টগ্রাম: চাটগাঁ প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, ২০১০ খ্রি./ ১৪৩১ হি.
* মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, ড. : সাহাবী কবি ও তার অমর কাব্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১ম সংস্ক., ১৯৮৪, শ্লোক নং- ৫২
* মুস্তফা কামাল (সম্পাদিত), ড. মুহাম্মদ : জার্নাল অব দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) : ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান, দি ফ্যাকাল্টি অব
* রিয়াসাত আলী নদভী, মাওলানা সৈয়দ : ইসলামী নেজামে তালিম (ভারত, ইউপি : ১৯৯২ খ্রি.)
* রশীদুল আলম, ড. : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন- ২০০৯ খ্রি.) ষষ্ঠদশ সংস্করণ
* রিদওয়ান আশরাফী, মুহাম্মদ : পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী যুগে যুগে দেশে দেশে, ২০১৫ খ্রি.
* রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. : বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৩৮৫ বাংলা
* শ.ম. শওকত আলী : কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম প্রচার (ই.ফা.বা. ডিসেম্বর-১৯৯৫ খ্রি.)
* শাহজাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল : সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়ার মাশায়েখ পরিচিতি, (ঢাকা :আল সিরাজ ফাউন্ডেশন ২০১৬)
  নূরে সিরিকোট, (ঢাকা :আল সিরাজ ফাউন্ডেশন, ২০১৬)

* শামসুল আলম, এ. জেড. এম. : মাদ্‌রাসা শিক্ষা (চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ, কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ২য় সংস্ক., ২০০২ খ্রি.)
* শহিদুল ইসলাম, মোঃ : ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ঝিনাইদাহ জেলার অবদান (এম.ফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩ খ্রি.)
* সাইফুল আলম, ড. মুহাম্মদ : আব্দুল রহমান চৌহরভী (রহ.) : ইসলামী শিক্ষা ও আরবী সাহিত্য তাঁর অবদান (অপ্রকাশিত অভিসর্ন্দভ) ইসলমি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া,
* সুলাইমান নদভী, সাইয়েদ : মুসলমান কে আইন্দা তালিম, (ভারতঃ আযমগড়, মা'আরিফ সংখ্যা ৪২, ১৯৩৮ খ্রি.)
* সাইয়েদুল ইসলাম, মুহাম্মদ : ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩ শ খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রি.,
* সফিউল আলম, ডা. : *আল্লামা গাজী সৈয়্যদ আযিযুল হক শে'রে বাংলা (রহ.) জীবনী গ্রন্থ* (চট্টগ্রাম:আল-হাসনাইন একাডেমী, ১৯৯৬ খ্রি.
* সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত : বাংলাপিডিয়া, খণ্ড ১, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম পুনমুদ্রণ, মার্চ ২০০৪ খ্রি.
* হাসান আলী চৌধুরী, মুহাম্মদ : রংপুরে ইসলাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৬ খ্রি.),
* হাসান জামান, ড. : *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - ২০০৭ খ্রি.) ৩য় সংস্করণ


## অভিধান


* আলাউদ্দীন আল-আজহারী, মুহাম্মাদ : আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪ খ্রি.)
* আহমদ শরীফ : বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী- ২০১০ খ্রি., পুণমুদ্রন।
* শৈলেন্দ্র বিশ্বাস : সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, (ঢাকা : সাহিত্য সংসদ- ১৯৯৫ খ্রি.) অষ্টাদশ মুদ্রণ
  : সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৯৮ খ্রি.,
* আরবী-বাংলা অভিধান : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০০৬ খ্রি.), ১ম প্রকাশ, ২য় খণ্ড,
* ইসলামী বিশ্বকোষ : (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খ. ৫, ১৯৯৫ খ্রি.)

* ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯০ খ্রি,
* বাংলা বিশ্বকোষ : ২য় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, তা. বি.)
* মাওলানা মুহিউদ্দীন খান : আল কাওছার আধুনিক বাংলা আরবী অভিধান কাওছার পাবলিকেশন্স লি. ঢাকা, ১৪০০ হিজরী,
* তাসাদ্দুক হুসাইন রিযভী, সায়্যিদ : লুগাত-ই কিশ্ওয়ারী, করাচী : দারুল ইশায়াত-তা.বি
* সিরাজ রাব্বানী : ফরহঙ্গে রব্বানী, ঢাকা - আশরাফিয়া লাইব্রেরী।
* A. S. Hornby : Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, Oxford University press, London; 2000,
* Sailendra Biswas : Samsad English-Bengali Dictionary, \ Calcutla: August 1997,

অফিস রেকর্ড : আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, দিদার মার্কেট, চট্টগ্রাম।
: জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
আরবী বিভাগ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
: ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
: আরবী বিভাগ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চ. বি।
: ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, বছিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
: মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
: কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
: জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
: মাদ্রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
: দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
: মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।
: তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।
: তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নুরুল হক জরিনা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

সাক্ষাৎকার : হাজী হাবিবুর রহমান কাদেরী, তারিখ-০৫.০৭.২০১৩ খ্রি.
: মুফতী ইবরাহীম আল কাদেরী, রাউজান, চট্টগ্রাম, তারিখ-০৫.০৭.২০১৭ খ্রি.

: মাওলানা এম. এ. মতিন, তারিখ-০৫.০৭.২০১৬ খ্রি.

: আলহাজ আনোয়ারুল হক, সহ সভাপতি, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ তারিখ-০৫.০৭.২০১৬ খ্রি.

: আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, জয়েন্ট সেক্রেটারী, আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম, তারিখ-০৪.০৭.২০১৬ খ্রি.

: মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী, অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) চন্দ্রঘোনা, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম, ০৩.০৭.২০১৬

: সাংবাদিক জুলফিকার খান না'ঈমী ও স্থানীয় ছাত্র আরশাদ সাকলা'ঈন বাদায়ূন, তারিখ- ২৬.০৫.২০১০খ্রি.)

: আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী, সদস্য সচিব, গর্ভর্নিং বডি, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (স্নাতক), হালিশহর, চট্টগ্রাম। ০৩.০৭.১৬

: আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রিজভী, অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া (আলিম), ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। ০১.০৭.২০১৬

: মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানী, অধ্যক্ষ, দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম। ০৪.০৬.২০১৬

: মুহাম্মদ মারফতুন নূর, উপাধ্যক্ষ, দারুল ইসলাম ফাযিল (স্নাতক) মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম। ০৪.০৬.২০১৬

: সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, মাসিক তরজুমান, ৩২১ দিদার মার্কেট, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম। ০১.০৬.২০১৭

: আবুল মুহসিন মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, ২১ তম ব্যাচ : কামিল হাদীস, তারিখঃ ০১.০৪.২০১৬ খ্রি.)


## ইংরেজী


- ⋆ Ayub Ali, Dr.A.K.M : History of Traditional Islamic Education in Bangladesh. Islamic Foundation,1983.
- ⋆ Ishwari prasad : A Short History of muslim Rule in India, The Indian press limited, Alahabad, 1939.
- ⋆ Irfan habib : An Atlas of mughal Empire, oxford Univetsity press, Delhi, 1966
- ⋆ Sekender Ali Ibrahimi, Dr. : Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal, Vol.3 (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh,1985), Introduction.

* Sirajul Islam : History of Bangladesh, 1904-1971, Vol.1-2, Asiatic society of Bangladesh, Dhaka, 1997
* Sufia Shmed : muslim Community in Bengal, the university press limited, Dhaka, 2002
* Sila sen : Muslim politics in Bengal,1937-1947, Impex India, New Delhi, 1981.
* Tripathy, R.P. : Rise and Fall of mughal Empire, central Book Depot Allahabad, 1966
* Vincent Arthur smith : Oxford History of india, oxford university press, New Delhi, 1970
* Zubaid Ahmed, Dr. M. G : The contribution of Indo Pakistan to Arabic Literature (Lahore, Pakistan : 1968)

## পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও জার্নাল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা) : ৪৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৫
: ৪৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৫
: ৪৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী মার্চ, ২০০৯
: ৫২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৯
: ৫১ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী মার্চ, ২০১২
: ২৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০১২
: ৫৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৪

দি ঢাকা ইউনিভর্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ : বর্ষ ১ সংখ্যা, ২ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৭
: বর্ষ ২ সংখ্যা, জুলাই- ডিসেম্বর, ২০০৭
: বর্ষ ২ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, ২০০৮
: বর্ষ ২ সংখ্যা, জুলাই- ডিসেম্বর, ২০০৮

মাসিক তরজুমান : ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ২০০৩, ২৩তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা।
: নভেম্বর, ২০০১, ২১ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।
: আগস্ট- সেপ্টেম্বর, ২০০৭, ২৭ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।
: জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি, ২০১০, ৩০ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

| | | |
|---|---|---|
| | : | ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ২০০৮, ২৮ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। |
| | : | ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ২০০৩, ২৩ তম বর্ষ, ১১ ম সংখ্যা। |
| | : | জুন-জুলাই, ২০১২, ৩৩ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। |
| | : | নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৫, ৩৭ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। |
| | : | ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ২০১৬, ৩৬ তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। |
| | : | মার্চ- এপ্রিল, ২০১৬, ৩৭ তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। |
| | : | এপ্রিল- মে , ২০১৬, ৩৭ তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। |
| | : | ত্রয়োদশ বর্ষ, ১৯৯৪, ১২শ সংখ্যা। |
| | : | পঞ্চদশ বর্ষ, ১৯৯৬, ১১ ও ১২শ সংখ্যা। |
| | : | ত্রয়োদশ বর্ষ, ১৯৯৩, ১ম সংখ্যা। |
| রাহমাতুল লিল আলামীন | : | অক্টোবর, ১৯৯৬ |
| | : | মার্চ ২০০৭ |
| | : | সেপ্টেম্বর, ২০০৮ |
| | : | ফেব্রুয়ারী, ২০১০ |
| | : | ডিসেম্বর, ২০১৫ |
| আত্-তৈয়্যব (কামিল শিক্ষার্থীদের বিদায়ী স্মরণীকা) | : | ১৯৯৫ খ্রি. |
| জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া | | |
| | : | ১৯৯৮ খ্রি. |
| | : | ২০০০ খ্রি. |
| | : | ২০০৪ খ্রি |
| | : | ২০১৫ খ্রি. |
| শাজরা শরীফ | : | সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া (চট্টগ্রাম : আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ১৯৯৭ খ্রি.) |

# পরিশিষ্ট - ১

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)

# পরিশিষ্ট -২

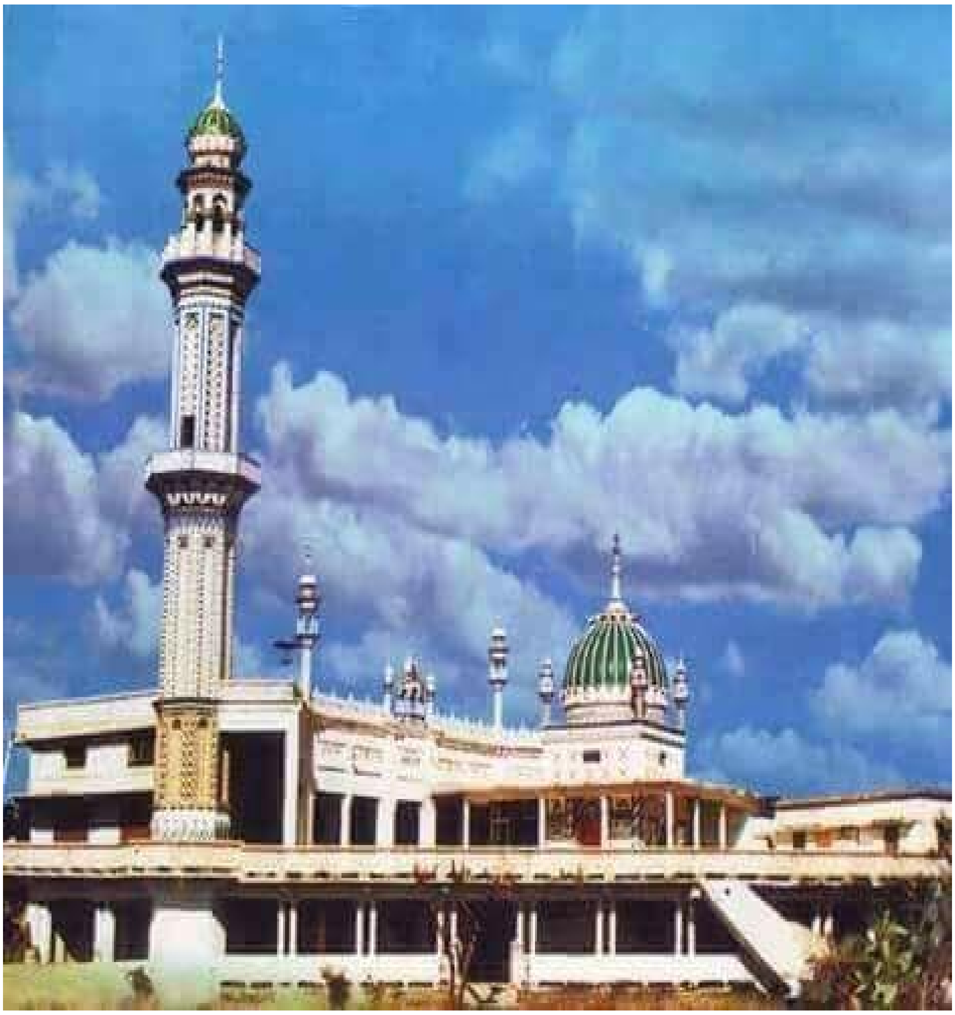

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রঃ)'র মাযার শরীফ

## পরিশিষ্ট- ৩

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রঃ)'র  প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

## পরিশিষ্ট- ৪

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রঃ)'র  পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

## পরিশিষ্ট- ৫

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রঃ)'র প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায়ে -এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

## পরিশিষ্ট- ৬

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রঃ)'র প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, চন্দ্রঘোনা, চট্টগ্রাম ।

## পরিশিষ্ট-৭

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র:)'র  মাযার সংলগ্ন মাদ্‌রাসা
জামেয়া তৈয়্যবুল উলূম, সিরিকোট শরীফ, পাকিস্তান।

## পরিশিষ্ট- ৮

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র:)'র নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত আলমগীর খানকাহ্-এ
কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়্যা তৈয়্যবিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম ।

## পরিশিষ্ট- ৯

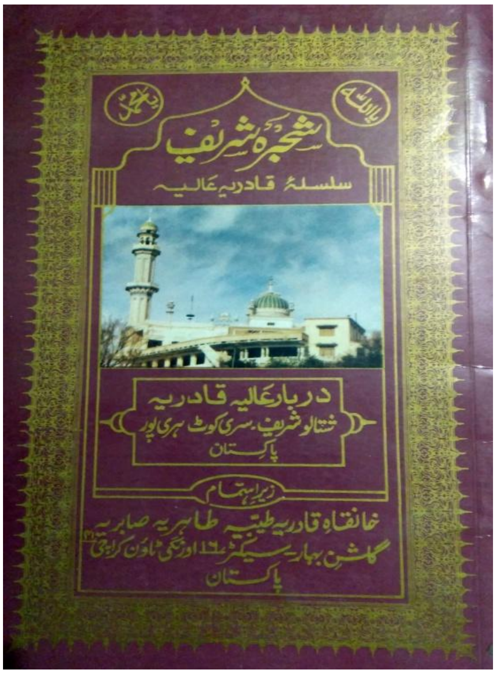


শাজরা শরীফ (উর্দূ)

## পরিশিষ্ট- ১০

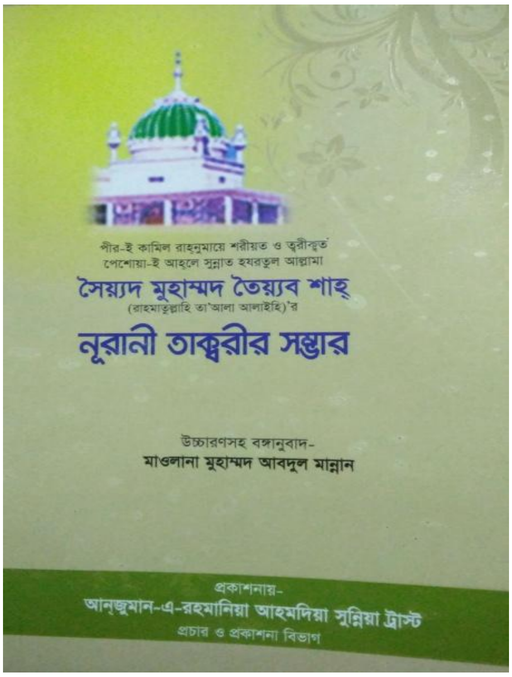


নূরানী তাক্বরীর সম্ভার

## পরিশিষ্ট- ১১

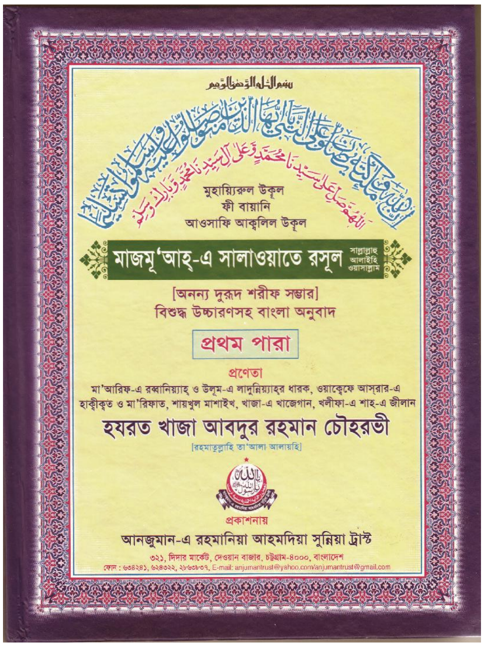


মাজমূ'আয়ে সালাওয়াতে রাসূল

## পরিশিষ্ট- ১২

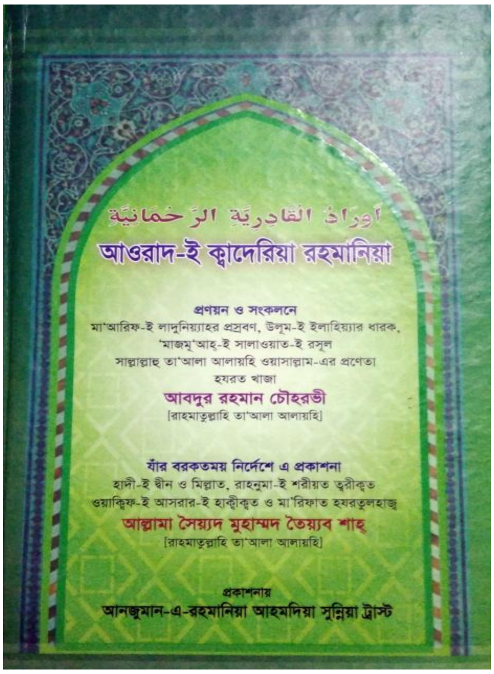


আওরাদ-ই ক্বাদেরিয়া রহমানিয়া

# পরিশিষ্ট- ১৩

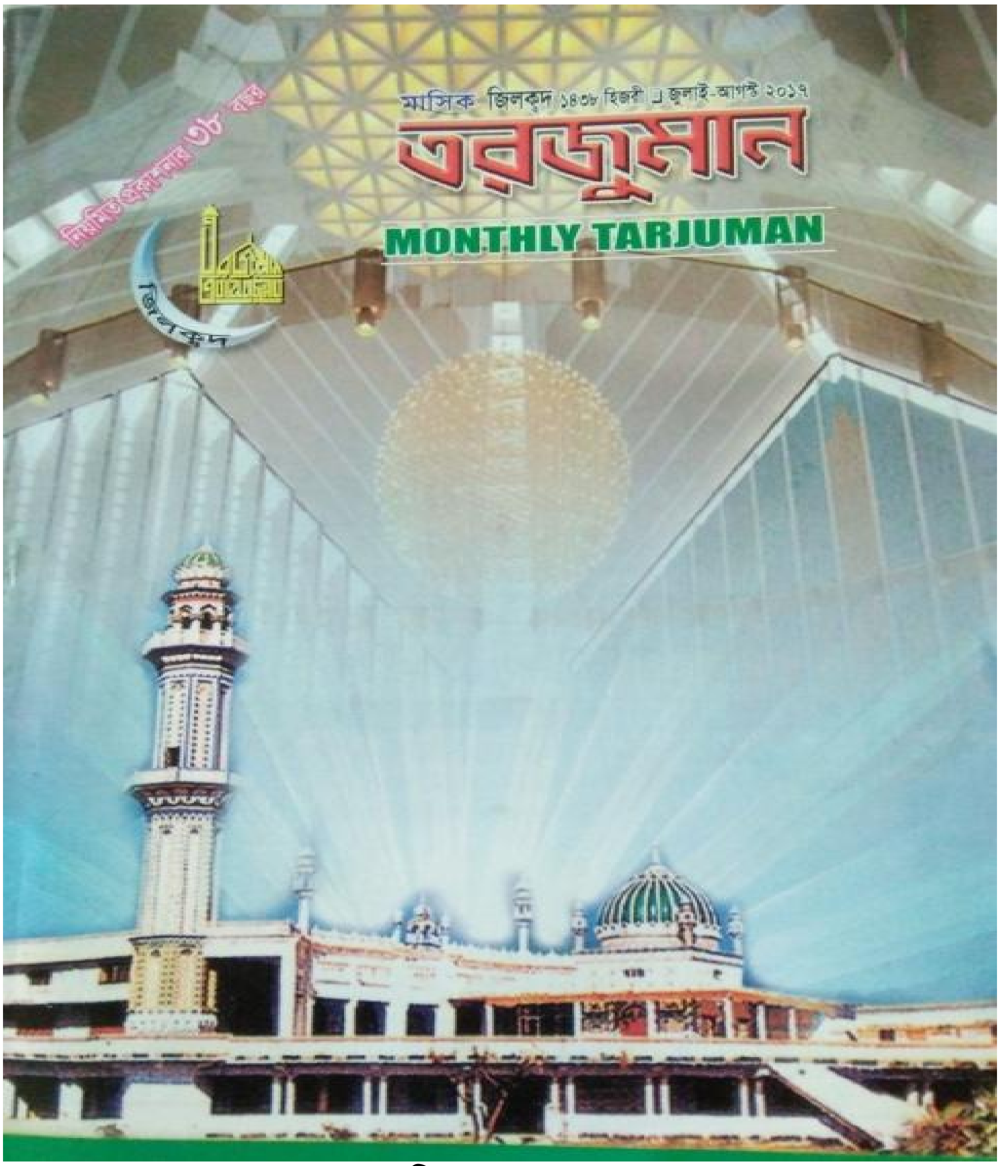


মাসিক তরজুমান

# পরিশিষ্ট- ১৪

دربارِ عالیہ قادریہ سید آباد شریف (شتالو) پوسٹ سرکوٹ، ضلع ایبٹ آباد، ہری پور، پاکستان۔ فون ۱۲

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র স্বহস্তে লিখিত পত্র-১

# পরিশিষ্টি- ১৫

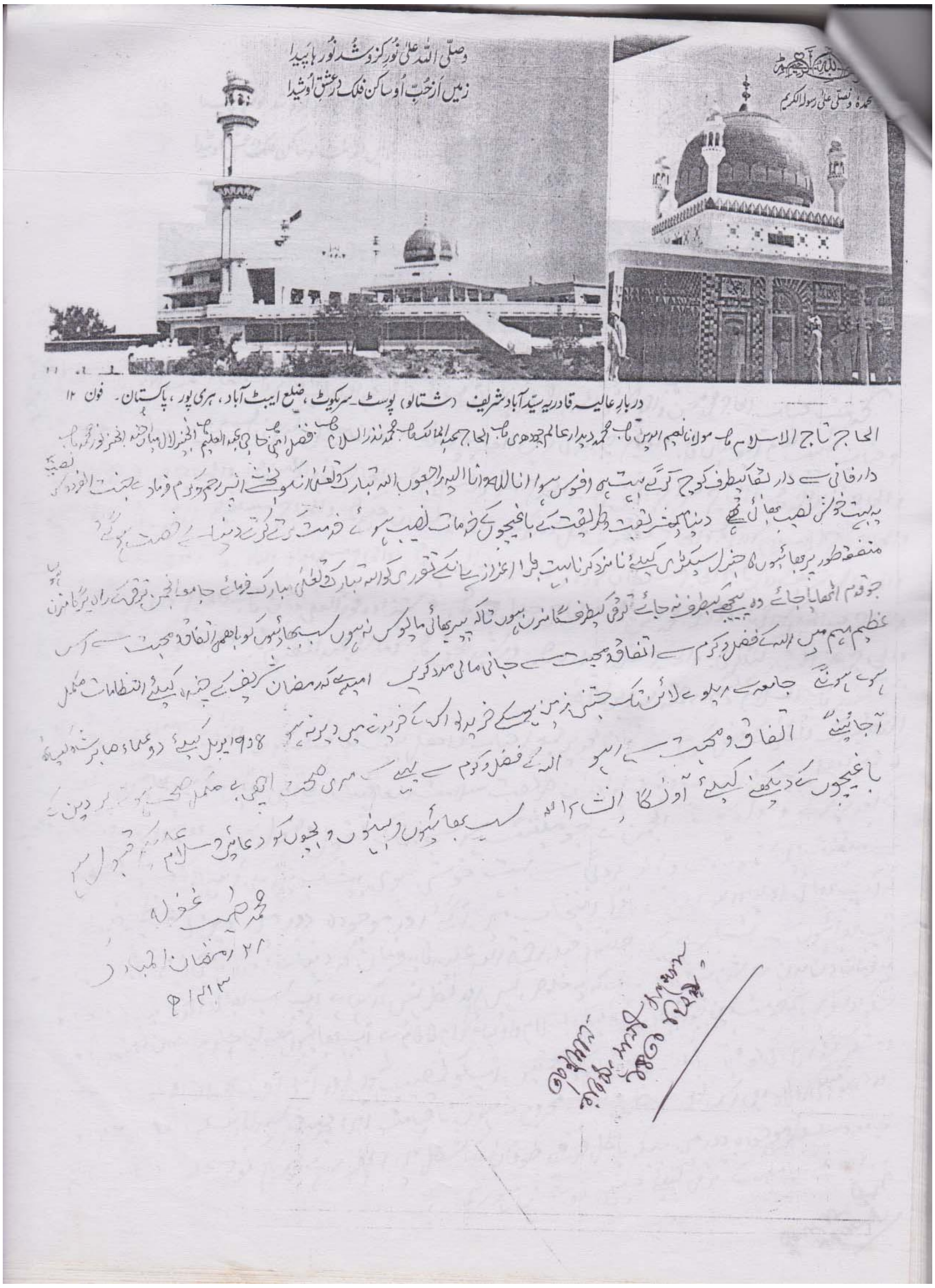


আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র স্বহস্তে লিখিত পত্র - ২

# পরিশিষ্ট-১৬

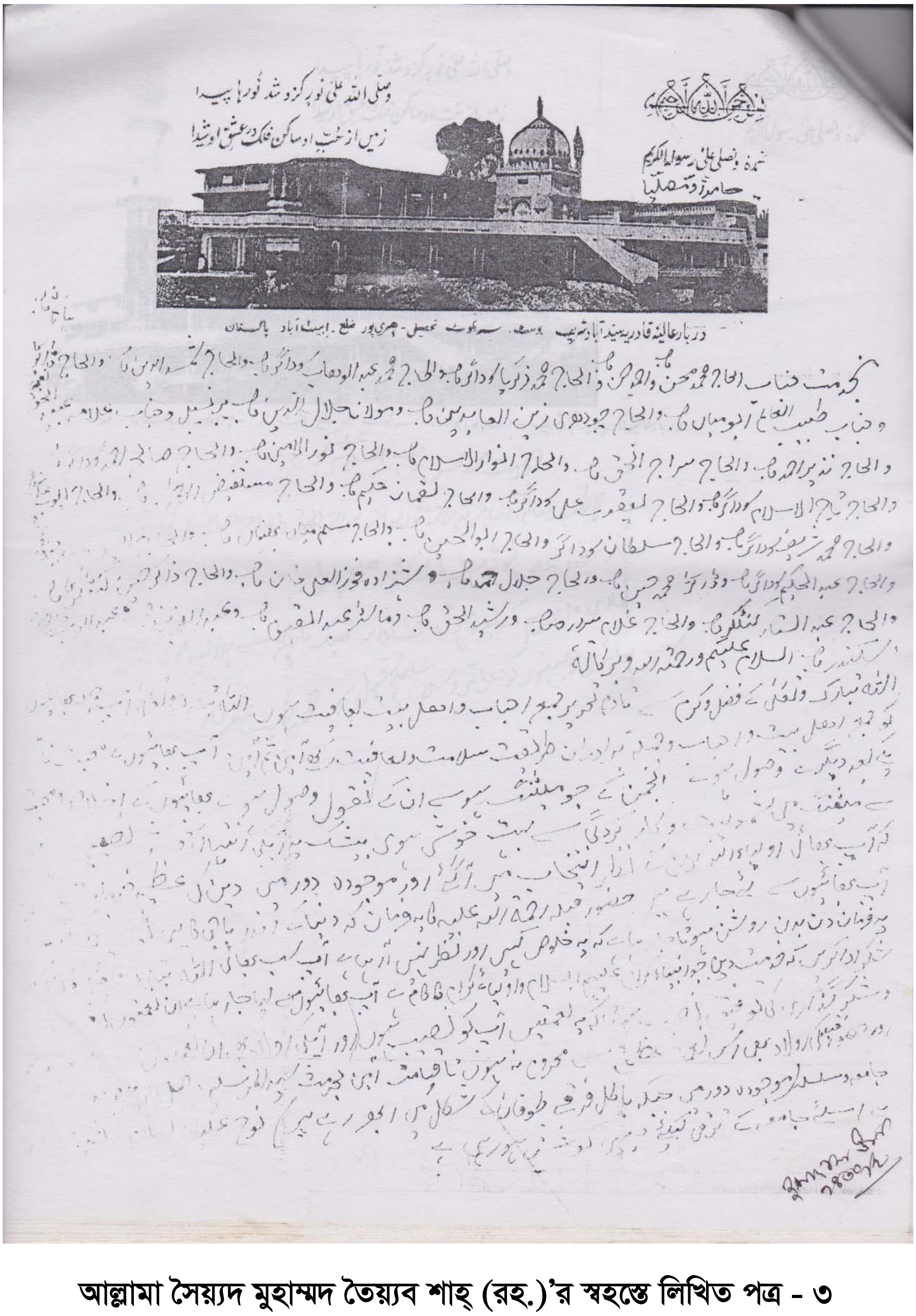

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

حامدًا ومصلیًا

وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا
زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا

دربار عالیہ قادریہ سید آباد شریف پوسٹ سرکوٹ تحصیل ہری پور ضلع ایبٹ آباد پاکستان

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র স্বহস্তে লিখিত পত্র - ৩

# পরিশিষ্ট- ১৭

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
حامداً ومصلیاً

وصلی اللہ علی نورے کزو شد نورہا پیدا
زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا

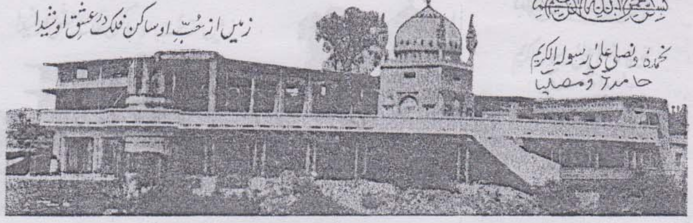

دربار عالیہ قادریہ سید آباد شریف (شتالو) پوسٹ۔ سریکوٹ ضلع۔ ایبٹ آباد تحصیل۔ ہری پور پاکستان

بخدمت جناب محمد محسن صاحب والحاج جعفر احمد کودا گر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

[illegible]

آলল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র স্বহস্তে লিখিত পত্র - ৪

# পরিশিষ্ট-১৮

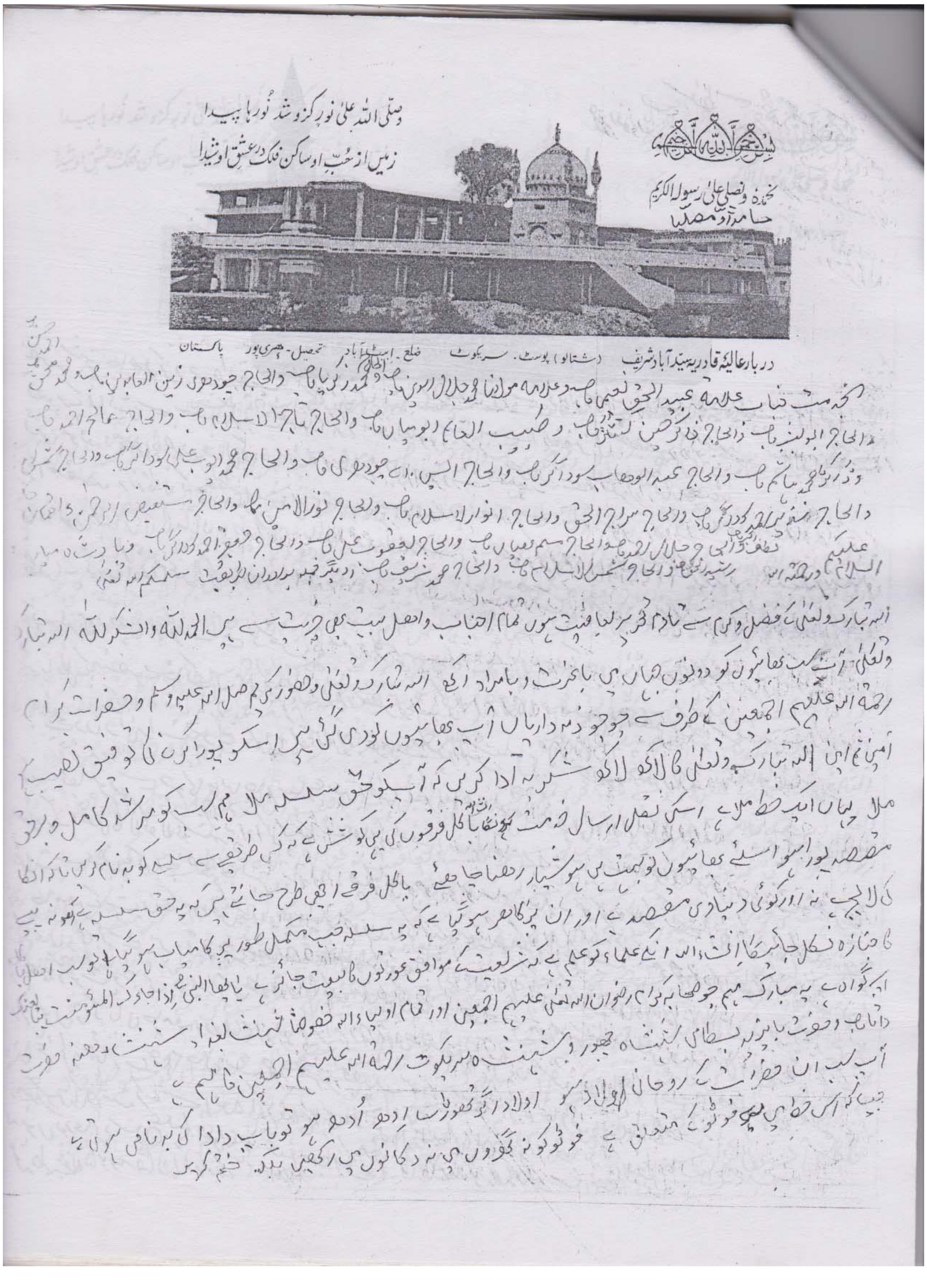


আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র স্বহস্তে লিখিত পত্র - ৫

## পরিশিষ্ট- ১৯

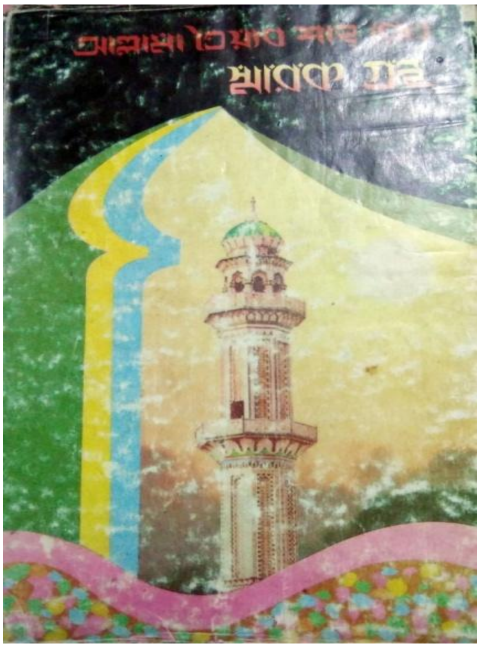

স্মারক গ্রন্থ

## পরিশিষ্ট- ২০

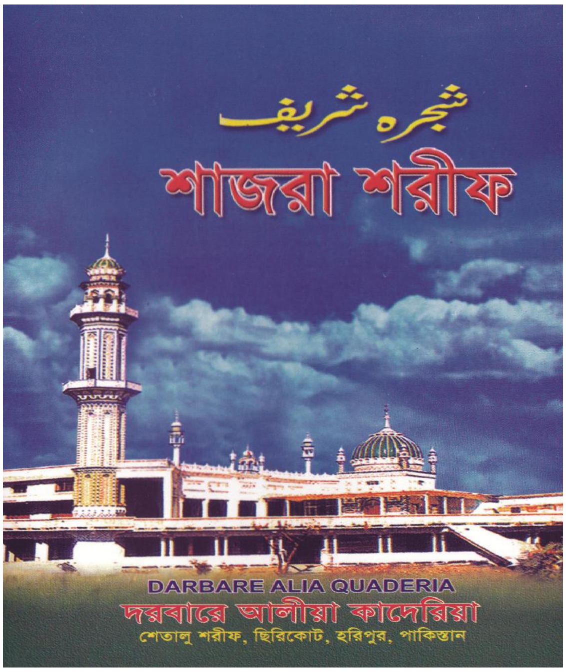


শাজরা শরীফ (বাংলা)

# পরিশিষ্ট- ২১

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সাথে একান্ত সাক্ষাতে বাংলাদেশের
সাবেক সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল নুর উদ্দীন খান।